ভগিনী নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল

প্রস্তাবনা

ভগিনী নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত ও রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল নামে পরিচিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে উদ্‌যাপিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে ভগিনীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নানাভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের সহিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাঁহার একখানি প্রামাণিক জীবনী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর বহু বর্ষ অতীত হইয়াছে। অতএব রচনাকালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করিলে তাঁহার জীবন-কাহিনীতে সহজেই ভ্রম ও কল্পনাপ্রসূত ঘটনার বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কোন প্রকারে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত না করিয়া আমরা সহজ, সরল ও যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে এই জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ভগিনী নিবেদিতার স্বরচিত পুস্তক, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, পত্রাবলী ও দিনলিপি এবং তাঁহার সমসাময়িক পরিচিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এই গ্রন্থের প্রধান উপাদান। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি পরিচ্ছেদ প্রধানতঃ ভগিনীর 'স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' (The Master as I Saw Him) ও 'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে' (Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda) পুস্তক অবলম্বনে রচিত। কোন কোন স্থলে ভাষা পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, তাঁহার আশীর্বাদ ও উৎসাহ আমাদিগকে এই কার্যে বিশেষ প্রেরণা দিয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে আমরা ভগিনীর পরিচিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি—পরলোকগত আচার্য যদুনাথ সরকার ও রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কুমুদবন্ধু সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মাখনলাল সেন, ডক্টর কালিদাস নাগ, প্রবাসী-সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার সুধাংশুমোহন বসু, বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু, হিমাংশুমোহন বসু, সরলাবালা সরকার, প্রফুল্লমুখী দেবী, প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (সরলা দেবী), গিরিবালা ঘোষ ও নির্ঝরিণী সরকার। শেষোক্ত

চারজন ভগিনীর ছাত্রী। ভগিনী নিবেদিতার প্রতি ইঁহাদের সকলের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই গ্রন্থ রচনায় আমাদের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ বি. এস. কেশবন্ বিভিন্ন গ্রন্থ, পুরাতন মাসিক পত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপত্র প্রভৃতি দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের অন্তর্গত স্বামী বিবেকানন্দের পত্রগুলির বাংলা অনুবাদ উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত স্বামিজীর পত্রাবলী হইতে গৃহীত। চিত্রের ব্লকগুলি উক্ত কার্যালয় ও মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু দুইখানি সুন্দর স্কেচ আঁকিয়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী অনুগ্রহপূর্বক গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সংশোধন ও সম্পাদন করিয়া দেওয়ায় ইহার গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া বহু মূল্যবান উপদেশ দানে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তকের সুলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে মহা যুগচক্র-পরিবর্তনের সময় আগতপ্রায়। বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা পরিত্যাগপূর্বক ঐ পরিবর্তনে সহায়তার জন্য তিনি নরনারী-নির্বিশেষে সকলকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার উদাত্ত আহ্বানে সমগ্র নারীজাতির পক্ষ হইতে ভারতমাতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন একমাত্র ভগিনী নিবেদিতা। তাই যে-সকল নারী স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত আদর্শের অনুগামিনী, তাঁহাদের নিকট তিনি প্রণম্যা। এই গ্রন্থখানি রচনার দ্বারা ভগিনী নিবেদিতার প্রতি তাঁহাদের অকপট শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদিত হইল।

শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি
১৩৬৫

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ভগিনী নিবেদিতা

জন্ম ও শৈশব

সমগ্র সৃষ্টির মূলে যে অখণ্ড চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান, বিভিন্ন লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহারই অনির্বচনীয় প্রকাশ নিখিল বিশ্বকে মহিমা দান করিয়াছে। মানব জীবনে তাহারই অনুপম অভিব্যক্তি। যে জীবন অবলম্বন করিয়া সেই চৈতন্যসত্তার দিব্য স্ফুরণ ঘটে, তাহার প্রতি কার্যে, প্রতি আচরণে যে মধুর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়, তাহা সমাগত জনমণ্ডলীকে কেবল আকৃষ্টই করে না, নবচেতনায় উদ্বুদ্ধও করে। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে সেই চৈতন্যের মহিমময় আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াই শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।'

যে যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও আধ্যাত্মিক শক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর লীলাবিগ্রহধারণ এবং ভারতাত্মার পূর্ণ প্রতীক রূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব, ভারতের পুনর্জাগরণের সেই গৌরবময় শুভ মুহূর্তে ভগিনী নিবেদিতার অভ্যুদয়ও সুপরিকল্পিত। ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে তাঁহার অবদানও অতুলনীয়। ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের, কল্যাণ-সাধনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া গেলেন, তাহার কী অপূর্ব প্রকাশই না ভগিনী নিবেদিতার জীবনে দেখা গিয়াছে! যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র শিক্ষাকে স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র দুইটি সংক্ষিপ্ত শব্দে নির্দেশ করিয়া জগৎসমক্ষে স্থাপিত করিলেন, 'ত্যাগ ও সেবা'। আর ভগিনী নিবেদিতার জীবনে সেই ত্যাগ ও সেবা বাস্তবরূপ গ্রহণ করিল।

দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আত্মসাক্ষাৎকারের দুরূহ সাধনাই কি মানবজীবনকে সর্বাপেক্ষা গৌরব দান করে নাই? জীবনের সেই পরম উদ্দেশ্যের সংসাধনে তিনি শ্রীগুরুর নিকট একান্তভাবে ত্যাগ ও সেবার যে অপূর্ব মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, আজীবন তাহার প্রাণপাত সাধনাই ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্য। অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র ভারতভূমি ছিল

তাঁহার কর্মস্থল। তাঁহার কর্ম পরিণত হইয়াছিল উপাসনায়; আর সেই উপাসনার ক্ষেত্রে জগজ্জননীর সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন ভারতমাতা। বস্তুতঃ সমগ্র জীবনকে তিনি এক অখণ্ড সাধনায় পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই নিজেকে দেবতার চরণে নিঃশেষে উৎসর্গ করা তাঁহার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়াছিল।

'তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে, অনেকসময় তাঁহাকে দেখিয়া রক্তমাংস-গঠিত দেহের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাইতে হইত। কখনও তিনি লোক শিক্ষয়িত্রী, কখনও স্নেহবিগলিতা জননী, কখনও কর্তব্যৈকনিষ্ঠ মায়া-মমতাবর্জিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখনও বিনীতা ছাত্রী, অথবা সেবিকা, আবার কখনও ভগবদ্ভাবে বিভোরা।' বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল একই চরিত্রে—আর সব ভাবগুলিই যেন তাঁহার জীবনে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তদানীন্তন বাংলা দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানিগুণীর মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যিনি এই সম্পূর্ণ ভোগসুখবিরহিত, স্বার্থগন্ধশূন্য অনন্তভাবময়ীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হন নাই।

জীবনী অপেক্ষা জীবন অনেক মহত্তর। জীবনের সম্পূর্ণ কাহিনী জীবনী-রচনায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে, তেমনই অসম্ভব যুক্তি ও ব্যাখ্যা দ্বারা এক মহৎ জীবনের সমগ্র কার্যাবলীর অনুধাবনের প্রচেষ্টা। যে জীবন মহৎ, অসাধারণ, তাহা মৃত্যুর সহিত নিঃশেষ হইয়া যায় না। দ্রুত, সর্ববিধ্বংসী কালের প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়া তাহার শাশ্বত ভাবধারা ভাবী যুগের প্রেরণা বক্ষে লইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মধ্য দিয়া যে দৈবী শক্তির এক বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছিল, ভারতের জাতীয় জীবনের নবজাগরণের প্রতি পদক্ষেপে তাহার পরিচয় পাই। শিক্ষায়, সেবায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, রাজনীতিতে তাঁহার অবদান ভারত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনকালকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে। এই তিনটি পর্বের মধ্যে একটি চমৎকার পরম্পরা রহিয়াছে। প্রথম পর্ব—তাঁহার জন্মকাল হইতে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রের অনন্যসাধারণ গুণগুলির সম্যক্ বিকাশের সহিত প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা। একদিকের সংশয়ের তাড়নায় মানসিক অবসন্নতা ও হতাশা, আবার তাহারই সহিত অন্তরের অন্তস্তলে এক পরম আশ্বাস—যে মহা আহ্বানের জন্য তিনি প্রতীক্ষারত, তাহা একদিন তাঁহার সমগ্র সত্তাকে উদ্ভাসিত করিয়া এক ঊর্ধ্বস্তরে জাগ্রত করিবে। আমাদের অত্যন্ত পরিচিত সাধারণ

জীবন তাঁহার জন্য নহে। স্বামী বিবেকানন্দের দৈববাণীর মাধ্যমে সেই প্রত্যা-দেশ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর নিবেদিতার জীবনের যে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয় তাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্ব বলা যাইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা তিনি কতখানি প্রবাভিত হইয়া-ছিলেন, তাঁহার চিন্তারাজ্যে কতদূর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, নিবেদিতার স্বলিখিত পুস্তকগুলি তাহার অসংখ্য নিদর্শন বহন করিতেছে। তৃতীয় পর্বে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনের মহত্তর প্রকাশ। নীরব, অনলস কর্মের মধ্য দিয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আত্মবিসর্জন—ইহাই নিবেদিতার ব্রত। আর নিবেদিতা জানিতেন, 'ব্রতের উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নহে।'

ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। উত্তর আয়ল্যাণ্ডের টাইরন্‌ প্রদেশের ডানগ্যানন নামক ক্ষুদ্র শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ রেভারেণ্ড জন নোব্‌ল ছিলেন এক গীর্জার ধর্ম-যাজক। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ স্কটল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের রস্ট্রেভর শহরে বসবাস করেন। জন নোব্‌ল ইংলণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ছিল ধর্মানুরাগের সহিত স্বদেশানুরাগ। ইহার ফলে যে বৈশিষ্ট্য, আদর্শ-নিষ্ঠা এবং গভীর মানবতার দৃষ্টি তাঁহাকে সাধারণ লোক হইতে পৃথক করিয়া নোব্‌ল পরিবারকেও খ্যাতি প্রদান করিয়াছিল, তাহা কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সুদূরে ভবিষ্যতে তাঁহার পৌত্রী মার্গারেটের চরিত্রে সংক্রমিত হইয়াছিল। মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাসের সহিত জন নোব্‌লের পরিণয় ঘটে। স্যামুয়েল রিচমণ্ড ইঁহাদের চতুর্থ সন্তান। স্বামীর মৃত্যুর পর মার্গারেটকেই সন্তানগুলিকে প্রতিপালন করিতে হয়। যথাকালে মেরী ইজাবেল হ্যামিলটনের সহিত বিবাহের পর স্যামুয়েল রিচমণ্ড উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে টাইরন্‌ অঞ্চলের ডানগ্যানন শহরে তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করিলেন। পিতার পথ অনুসরণ করিয়া তিনি ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। জীবনকে তিনি একটি আদর্শবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ গতানুগতিক জীবনযাত্রার সংকীর্ণ গণ্ডির ঊর্ধ্বে যে আদর্শবাদ পিতা এবং পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কোনও মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের দুরন্ত প্রয়াসে নিযুক্ত করিয়াছিল, বংশের তৃতীয় পুরুষ মার্গারেটের চরিত্রে বোধ করি সেই প্রয়াস সুসংহত হইয়া প্রবলবেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পিতা

এবং মাতা—উভয় বংশের সকল সদ্‌গুণগুলি মার্গারেট লাভ করিয়াছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর এই ডানগ্যানন শহরে মার্গারেট জন্মগ্রহণ করেন। দেখা যায়, জগতে অনন্যসাধারণ কার্যের জন্য যাঁহারা খ্যাতিলাভ করেন, তাঁহাদের জীবনের প্রারম্ভে বহু ক্ষেত্রেই তাহার একটা অস্ফুট ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়; তবে সমসাময়িক সংকীর্ণ পরিধির বাহিরে সেই ইঙ্গিতের অর্থ সুপরিস্ফুট হইয়া ধরা দেয় না। যথাকালে পূর্ণ অভিব্যক্তির ক্ষণেই তাহার পরিচয় ঘটে। মার্গারেটের জীবনে ভগবৎপাদপদ্মে ঐকান্তিক আত্মাহুতিরূপ যে নিবেদন পরবর্তী কালে তাঁহার নিবেদিতা নামে সার্থকতা লাভ করে, তাহার সূত্রপাত তাঁহার জন্মের পূর্বেই মাতৃগর্ভে ঘটিয়াছিল। প্রথম সন্তানধারণের ভয় ও ব্যাকুলতা মেরী হ্যামিলটনকে অভিভূত করিয়াছিল। বর্তমানের ভাবাবেগ সকল সময়েই ভবিষ্যতের প্রয়োজনবোধকে ঠেলিয়া রাখিতে চাহে। তাই ভবিষ্যতের চিন্তা না করিয়া হয়তো মনের আবেগেই ধর্মভীরু মেরী অনাগত সন্তানের জন্য দেবতার চরণে একান্ত মনে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—নিরাপদে যদি সে জন্মগ্রহণ করে, তবে দেবতার কার্যেই তাহাকে উৎসর্গ করিবেন। বস্তুতঃ সরল ধর্মবিশ্বাসের সহিত হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণে বিচলিত মেরী দেবতার উদ্দেশ্যে সেদিন যে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী কালে কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত ছিল কিনা সন্দেহ। তবে যেদিন কন্যার জীবনে সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল, সেদিন অভিভূতের মত তিনি পূর্ব কথা স্মরণ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি তিনি বহুদিন পরে মার্গারেটের পরম বান্ধবী মিস ম্যাকলাউডের নিকট বর্ণনা করেন।

নিরাপদে শিশু জন্মগ্রহণ করিল। পিতামহীর নামানুসারে শিশুর নামকরণ হইল মার্গারেট এলিজাবেথ। নোব্‌ল পরিবার একত্র হইয়া উৎসব-কোলাহলের মধ্য দিয়া নবাগত শিশুকে স্বাগত জানাইল। কে তখন ভাবিয়াছিল উত্তরকালে এই শিশুর কীর্তিকলাপ নোব্‌ল-পরিবারের খ্যাতি অতিক্রম করিয়া যাইবে!

আদর্শবিলাসী স্যামুয়েলের মন বিপুল সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিত। বৈচিত্র্য ও সংগ্রামহীন জীবনের জড়তা তাঁহার জন্য নহে। ক্ষুদ্র শহর ডানগ্যানন পিছনে পড়িয়া রহিল। স্যামুয়েল ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেস্টারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে ধর্মযাজকের পদ লাভ করিয়া স্যামুয়েল ওল্ডহ্যামে গমন করেন। যাজকের কর্ম ব্যতিরেকে দরিদ্রের সেবা ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। যাজকের ভাষণগুলিকে

তিনি প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেন তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের সহজ প্রেরণায় ও অপূর্ব বাগ্মিতায়। কঠোর পরিশ্রমে ওল্ডহ্যামে আসিবার পূর্বেই স্যামুয়েলের শরীর ভাঙিয়া যায়। চার বৎসর পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডেভনের গ্রেট টরেণ্টন পল্লীতে তিনি কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন। স্যামুয়েলের মধ্যে যে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিটি বাস করিত, তাহার সংস্পর্শে প্রকৃতই চারিদিকে একটি সহজ আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ রচিত হইত। পৃথিবীর সর্বত্রই তখন জীবনযাত্রা ছিল অনেক পরিমাণে সরল ও অনাড়ম্বর; বিজ্ঞানের দান বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের উৎকট প্রভাবে উহা জটিল হইয়া উঠে নাই। অপেক্ষাকৃত শান্ত পল্লীপ্রকৃতির ক্রোড়ে ধর্মজীবনের যে স্বতঃস্ফুরণ হয়, তাহাতে সুকুমার মনে সহজেই ধর্মবিশ্বাসের একটি গভীর ছাপ পড়ে। মার্গারেটের শৈশব কাটিয়াছিল পিতামহীর নিকটে। চারিদিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবেষ্টনী, সঙ্গিগণের সহিত খেলাধূলা, পরম নিষ্ঠাবতী পিতামহীর সারাদিন অনলস কর্মের সহিত ভগবদুপাসনা—সব মিলিয়া মার্গারেটের শিশুচিত্তে এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল। একটু বড় হইয়া ওল্ডহ্যামে পিতামাতার নিকট আসিবার পর মার্গারেটের মনে হইল, তিনি যেন এক অপরিচিত জায়গায় আসিয়াছেন। শিশুমনের সহজ সুরটি যে তন্ত্রীতে বাঁধা হইয়াছিল, এই জনাকীর্ণ নগরে তাহা তেমন করিয়া বাজে না। টরেণ্টন আসিবার পর মার্গারেট আবার শৈশব-জীবনের সুরটি ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার বয়স তখন আট বৎসর। তিনি ছিলেন পিতার প্রিয়পাত্রী। পিতাপুত্রীর মধ্যে একটি সহজ ভাববিনিময় ঘটিয়াছিল। পিতার উপাসনাপদ্ধতি এবং অন্তরের ভগবদ্ভক্তিপ্রসূত ভাষণগুলি মার্গারেটের কিশোর মনকে আকৃষ্ট করিত। বাইবেলের বিচিত্র কাহিনী তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মনে কেবল খোরাক জোগাইত তাহা নহে, বাস্তব জীবনের বাহিরে একটি রহস্যময় ঊর্ধ্বলোকের সন্ধান দিত, আকুল প্রার্থনাগুলি চিত্তে আবেগ সঞ্চার করিত। অনুমান করা যায়, ধর্মের প্রতি মার্গারেটের গভীর অনুরাগবোধ এই পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যেই গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। দিনগুলি আনন্দেই কাটিতে লাগিল। স্যামুয়েলের বন্ধু, ভারত-প্রত্যাগত এক ধর্মযাজক একদিন স্যামুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মার্গারেটের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত কোমল মুখ ও ধর্মের প্রতি একটি আন্তরিক অনুরাগ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। মুগ্ধ হইয়া তিনি বালিকাকে আশীর্বাদ করিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলেন, 'ভারতবর্ষ একদিন তোমাকে ডাক দিবে।' মার্গারেট বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন ভারতবর্ষ কোথায়!

টরেণ্টনে আসিবার এক বৎসর পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে স্যামুয়েল দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে পত্নীকে বলিয়া গেলেন,

মার্গারেটের জীবনে এক বৃহত্তর আহ্বান আসিবার সম্ভাবনা—তিনি যেন কন্যাকে সাহায্য করেন। কন্যার চরিত্রে কয়েকটি দুর্লভ গুণের সমাবেশ হয়তো পিতার মনে আশা জাগাইয়াছিল; কঠোর পরিশ্রম ও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হইবার পূর্বে হয়তো স্যামুয়েল মার্গারেটের এক উজ্জ্বল গৌরবময় ভবিষ্যতের কল্পনায় নিজের মনে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। যে মহৎ সম্ভাবনার স্বপ্ন তাঁহার সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়াছিল, তাহা সর্বতোভাবে কন্যার জীবনে পরিণতি লাভ করুক—অন্তরের সহিত এই প্রার্থনা করিয়া স্যামুয়েল ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

ইতিপূর্বে পিতামহীর মৃত্যু মার্গারেটের কিশোর হৃদয়ে আঘাত দিয়াছিল। পিতাকে তিনি কেবল ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা নহে; উভয়ের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য ছিল। সুতরাং পিতার মৃত্যুতে গভীর বেদনার সহিত মার্গারেট এক প্রচণ্ড অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। কৈশোরের সুখময় স্বপ্নজীবন অতর্কিত মৃত্যুর আগমনে বিষাদে পরিণত হইল।

স্যামুয়েল ছিলেন আদর্শের পূজারী। অর্থোপার্জন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং তাঁহার জীবিতকালেই পরিবারকে অভাবের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এ পর্যন্ত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে মেরী অচঞ্চল ছিলেন; কিন্তু এখন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। বিদেশে একাকী শিশু পুত্র কন্যা লইয়া বাস করা অসম্ভব। অতএব তিনি দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র লইয়া পিতা হ্যামিলটনের নিকট আসিলেন। আবার আয়র্ল্যাণ্ড। হ্যামিলটন ছিলেন রাজনীতির একজন বিশিষ্ট নেতা। আইরিশ হোমরুল (স্বায়ত্ত-শাসন) আন্দোলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। হ্যামিলটনের সংস্পর্শে মার্গারেটের কিশোর চিত্তে ধীরে ধীরে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত আইরিশ জাতির, বিশেষতঃ তাঁহার পূর্বপুরুষগণের অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহা অলক্ষ্যে মার্গারেটের হৃদয়ে দৃঢ় হইতে লাগিল।

যথাকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইল। মার্গারেট ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী মে হ্যালিফ্যাক্স কলেজে প্রেরিত হইলেন।

শিক্ষাব্রতী

হ্যালিফ্যাক্স বিদ্যালয় কংগ্রিগেশনালিষ্ট চার্চের অধীনে। বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন বোর্ডিং-এ মার্গারেটের যে নবজীবন আরম্ভ হইল, তাহার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পারিবারিক জীবনের অবকাশমণ্ডিত অনাড়ম্বর সহজ গতি সেখানে নাই। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত মুহূর্তগুলি ঘড়ির কাঁটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লেখাপড়া, খেলাধূলা, উপাসনা—সকলেরই সময় নির্দিষ্ট, তথাপি মার্গারেটের তীক্ষ্ম বুদ্ধি শীঘ্রই বাহ্য নিয়ন্ত্রণের পশ্চাতে অধ্যয়নে আনন্দের আস্বাদ পাইল। শিক্ষয়িত্রীগণের সহযোগিতায় এই প্রাথমিক আকর্ষণ ক্রমে অনুরাগে পরিণত হইল। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকগুলির বিষয়বস্তু তাঁহার দৃষ্টিকে বর্তমানের গণ্ডি ছাড়াইয়া বহুদূরে লইয়া যাইত। সময় পাইলেই মার্গারেট বাহিরের অন্যান্য পুস্তকও গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। জীবনের বহুবিধ সমস্যার প্রতি তিনি তখন হইতেই ক্রমশঃ সচেতন হইয়া উঠিতে-ছিলেন। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালেই সাহিত্য ব্যতীত সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ জন্মে। আবার পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার প্রতিও তাঁহার চিত্তে গভীর ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইয়াছিল। শৈশব হইতেই সকল বিষয় একান্ত করিয়া আয়ত্ত করিবার আগ্রহ মার্গারেটকে অধীত যে কোনও বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিত। এইরূপে একসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন ও প্রখর কল্পনাশক্তির উন্মেষণ দ্বারা তাঁহার সৃজনী প্রতিভা উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতেছিল। আবার ইহার সহিত ছিল দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়। যখন যেটি জানিবার আগ্রহবোধ করিতেন, তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় মার্গারেট সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতেন, এবং গভীর তন্ময়তা দ্বারা বিষয়বস্তু অধিগত না করা পর্যন্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহার স্বভাবে ছিল না। যাহা জানিব, তাহা একান্ত করিয়াই জানিব, তাহার মধ্যে লেশমাত্র ফাঁকি অথবা অস্পষ্টতা থাকিবে না—মার্গারেটের সমগ্র শিক্ষার মূলে এই তত্ত্বটি কাজ করিত ; এবং এই একান্তভাবে জানিবার সাধনাই তাঁহাকে বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও আনন্দদান করিত।

অবশ্য বিদ্যালয়ের জীবন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ছিল না। নিরন্তর কঠোর নিয়মের অধীনে মার্গারেটের স্বাধীন চিত্ত মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহঘোষণা করিত। তবে শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে সংযমের মঙ্গলময় দিকটা আপনার করিয়া লওয়ার ফলে একদিন প্রাণ ভরিয়া সহজ অনাবিল আনন্দোচ্ছল জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যাইবে; ভাবী জীবনের এই কল্পনায় অনেক জিনিসই সহনীয় হইয়া উঠে। মার্গারেটের চরিত্রে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণও এই সময় দেখা গিয়াছিল, যাহার ফলে তিনি সহজেই সহপাঠিনীদের নেতৃত্ব লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য ও চিন্তাশীলতা স্বভাবতঃই তাঁহাকে সাধারণ হইতে উচ্চে স্থাপিত করিয়াছিল, যদিও কোন কোন সঙ্গীর দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন গর্বিত, জেদী, অসহিষ্ণু ও তার্কিক।

যথাকালে অন্তিম পরীক্ষার সহিত শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইল। এবার কর্ম-জীবনের আরম্ভ। শিক্ষার প্রতি সহজাত অনুরাগবশতঃ মার্গারেট পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন তিনি শিক্ষয়িত্রী হইবেন। শীঘ্রই কর্ম জুটিয়া গেল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া তিনি কেস্‌উইক যাত্রা করিলেন।

শিক্ষাকার্যে মার্গারেটের জন্মগত অধিকার। কেবলমাত্র জীবিকা-নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ না করিয়া যাহারা শিক্ষাদানের মধ্য দিয়া নিজের সত্তাকে প্রকাশ করিয়া এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে, তাহাদের শিক্ষাদান-প্রণালী স্বভাবতঃই চিরাচরিত পথ হইতে ভিন্ন। মার্গারেটের বয়স অল্প এবং শিক্ষা-কার্যে তিনি নূতন ব্রতী হইলেও, তাঁহার আন্তরিকতা ও উৎসাহ নব নব অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান-প্রণালীকে সহজ ও প্রাণবান করিয়া তুলিল।

কেস্‌উইকে অবস্থানকালে সেখানকার হাইচার্চের সংস্পর্শে আসার ফলে ধর্ম সম্বন্ধে মার্গারেটের মনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। অধ্যাত্মবিষয় সম্বন্ধে একটি সত্যকারের পিপাসা অথবা গভীর ঔৎসুক্য এখন হইতে তাঁহার মনে একটি বড় স্থান অধিকার করিল। এক বৎসর কেস্‌উইকে কাটিয়া গেল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্গারেট রেক্সহ্যাম শহরে কর্ম লইলেন। রেক্সহ্যাম জায়গাটা খনি-অঞ্চলের মধ্যে। শহরের ঠিক মাঝখানে সেণ্ট মার্কস চার্চ। পিতার প্রভাব মার্গারেটের উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। সুতরাং ধর্মযাজক পিতার জীবনাদর্শ অনুসরণ করিবার আগ্রহবোধ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। শিক্ষা-কার্যের অবসরে চার্চের কর্মিহিসাবে সমাজকল্যাণে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মার্গারেট উপলব্ধি করিলেন, সমাজসেবায় চার্চের কাজ নির্দিষ্ট গণ্ডি ধরিয়া চলে; সাহায্যদান চার্চের মতামত-নিরপেক্ষ নহে। অপরদিকে তাঁহার কোমল চিত্ত নির্বিচারে সকলের বেদনায় সাহায্যদানে উন্মুখ। কেহ চার্চের অনুশাসন মানিয়া চলিতেছে কিনা, অথবা নিয়মিত গীর্জায় গমন করে কিনা, সাহায্যদানের ব্যাপারে ইহা তাঁহার নিকট গুরুতর প্রশ্ন নহে। অতএব চার্চের কর্মকর্তাদের সহিত মনোমালিন্য ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। মার্গারেট চার্চের সংস্রব ছাড়িলেন। জনসেবা যদি করিতে হয়, স্বাধীনভাবেই করা ভাল। তিনি কেবল হৃদয়ের অনুশাসন মানিয়া চলিবেন। মার্গারেটের মন অত্যন্ত বিচারশীল। 'ধর্ম' কি এত সংকীর্ণ যে অকপটে

সকলকে গ্রহণ করিতে পারে না? তাঁহার আহত চিত্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, সমগ্র সৃষ্টির মূলে যদি এক পরম পিতা বর্তমান, তবে ইহার মধ্যে এত ভেদাভেদ কেন?

এই সময়ে মার্গারেটের জীবনে একটি বড় রকমের ঘটনা ঘটিয়া গেল। কেস্‌উইকে অবস্থানকালে তিনি অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে আগ্রহবোধ করিতে-ছিলেন, এমন কি, মধ্যে মধ্যে কোন কনভেণ্টে যোগদান করিবার চিন্তাও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত; তথাপি সে আগ্রহ এত গভীর ছিল না যে, দাম্পত্য-জীবনের আকাঙ্ক্ষা একেবারে নির্বাসিত হইয়াছিল। রেক্সহ্যামে শিক্ষকতার সহিত জনসেবার বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়া মার্গারেট ক্রমশঃই নিজের শক্তির পরিচয় পাইতেছিলেন। নানারূপ সংগঠনমূলক কর্ম ও বিভিন্ন প্রবন্ধরচনার দ্বারা আত্মতৃপ্তির সহিত তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে, বিস্তৃত কর্মের মাধ্যমেই তাঁহার সত্তার প্রকাশ ঘটিবে। এমন সময়ে ওয়েলসবাসী এক তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল। পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তখন পর্যন্ত মার্গারেটের জীবনাদর্শ ছিল ধর্মজীবন-যাপনের সহিত জনসেবা। ইহার জন্য তিনি কোন অসাধারণ জীবনযাত্রার কল্পনা করেন নাই। সুতরাং সাধারণ নরনারীর ন্যায় সংসারজীবনের স্বপ্ন দেখা বিচিত্র নহে। তাঁহার পিতামহ, পিতা এবং মাতামহ সকলেই সংসারের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন; কিন্তু সংসারের গণ্ডির মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন না। ধর্ম এবং সেবারূপ কর্মের সমন্বয় তাঁহাদিগকে সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে উন্নীত করিয়াছিল। মার্গারেটের প্রাথমিক জীবনের মূলেও এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকাই ছিল স্বাভাবিক। এইরূপে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বেড়াইলেও তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মনে প্রাণে আদর্শবাদী। তাঁহার আদর্শপ্রবণ মন যতদিন পর্যন্ত পরমার্থকে খুঁজিয়া না পাইয়াছিল, ততদিনই সাধারণেব মত সাধারণ নানা-বিষয়ের মধ্যে পরিতৃপ্তি অনুসন্ধান করিয়াছিল। আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে তখন তাঁহার কোনও স্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও উহা যে গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে, তাঁহার অবচেতন মনে তাহার আভাস ছিল। তাই পরবর্তী কালে যে মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে তিনি এক মহৎ আদর্শের স্বরূপ দেখিলেন, সেই মুহূর্তেই অজ্ঞাতসারে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে আবার মার্গারেট ছিলেন অতিমাত্রায় আবেগময়ী। কোন ব্যক্তি অথবা বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করিলে তিনি নিজের চিত্তকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন না। পরবর্তী কালেও তাঁহার চরিত্রে এই আবেগপ্রবণতা সর্বদাই দেখা গিয়াছে। তরুণ ওয়েলসবাসীর মধ্যে সম্ভবতঃ মার্গারেট এমন

কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছিল, জীবনের লক্ষ্যপথে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইবার ইনি একজন উপযুক্ত সঙ্গী। স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল না। পরস্পর বাগদত্ত হইবার পূর্বেই অতর্কিত রোগের আক্রমণে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মার্গারেটের বন্ধু ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই মার্গারেট যখন ভাবী সুখময় জীবনের রঙিন কল্পনায় বিভোর, তখন সহসা এই কঠোর আঘাত তাঁহাকে নিদারুণ মর্মবেদনার সহিত জানাইয়া দিল যে, বাস্তবজীবন ও কল্পলোকের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান।

রেক্সহ্যামের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মার্গারেট চলিয়া আসিলেন চেস্টারে।

কর্মজীবন গ্রহণ করিবার পর হইতেই তিনি পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন। একক জীবনের নিঃসঙ্গতা এখন যেন তিনি বেশী করিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। মাতার কথা মনে পড়িল। আত্মীয়স্বজনের স্নেহমমতার বন্ধনে মার্গারেট দুঃখের ভার লাঘব করিতে চাহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী মে-ও লিভারপুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য গ্রহণ করিয়াছেন। দুই বোনের উপার্জনে কোনরকমে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া মার্গারেট পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। আয়র্ল্যান্ড হইতে মাতা মেরী চলিয়া আসিলেন লিভারপুরে মে-র কর্মস্থলে। মার্গারেটের একমাত্র ভ্রাতা রিচমন্ড নোব্‌ল ওখানকার কলেজেই পড়িতেন। সকল ব্যবস্থা হইয়া গেল এবং স্থির হইল, মার্গারেট উপস্থিত আসাযাওয়া করিবেন। বহুদিন পরে একত্র হইয়া ক্ষুদ্র পরিবারটির সকলেই আনন্দিত।

শিক্ষা সম্বন্ধে মার্গারেট বরাবর কৌতূহলী। বেদনাহত মন লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন তথ্যসংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে নব শিক্ষাপদ্ধতির স্রষ্টা হিসাবে পেস্তালৎসির নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। শিক্ষা সম্পর্কে জগৎকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিলেন পেস্তালৎসি। পুরাতন শিক্ষাপ্রথায় প্রধান স্থান ছিল শিক্ষণীয় বিষয়গুলির; শিশু সেখানে অবহেলিত। নব শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুর স্থান সর্বাগ্রে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পেস্তালৎসির শিক্ষাবিজ্ঞানকে আরও উন্নত করেন ফ্রবেল। নব শিক্ষাক্ষেত্রে ইঁহারা দুইজনে অগ্রদূত। এই দুই শিক্ষাবিদের অভিনব ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মার্গারেটকে মুগ্ধ করিল। তাঁহার মধ্যে যে আজন্ম শিক্ষক বাস করিতেছিল, এই দুই মনীষীর চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার জাগরণ ঘটিল। ইংলণ্ডে তখন কয়েকজন শিক্ষাব্রতী নব শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া পরীক্ষামূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মার্গারেটেরও

উৎসাহের অন্ত রহিল না। শিশুমনস্তত্ত্বে জ্ঞান-আহরণ এই পরীক্ষামূলক কার্যের প্রথম সোপান। শিশুকে সযত্নে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাহার শিক্ষণকার্য চলিবে পীড়নের দ্বারা নহে; ধীরে ধীরে খেলাধুলার মাধ্যমে। দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহার মনের স্বাভাবিক গতির প্রতি। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েক জন শিক্ষাব্রতীর সহিত মার্গারেটের আলাপ হইল। তাঁহারাও এই নব শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে চলিতেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রথম আলাপ হইল লজম্যানদের সহিত, পরে তাঁহাদের মারফৎ ডাচ মহিলা মিসেস ডি-লীউএর সহিতও তাঁহার পরিচয় ঘটে। মার্গারেট সমগ্র মনপ্রাণ এই নব শিক্ষা পদ্ধতি আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় অর্পণ করিলেন। ইহা যেন আত্মপ্রকাশের এক নূতন পথ। দুর্জয় প্রাণশক্তি লইয়া তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন; নব নব কর্মের মধ্যে সে শক্তি ক্রমাগত সৃষ্টি করিয়া চলিত। পরিচিতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। লজম্যানদের সহায়তায় মার্গারেট 'গুড্ সানডে ক্লাবে'র সদস্যা হইলেন। ক্লাবে বক্তৃতা দেওয়া এবং রচনাপাঠের সুযোগ মিলিল। ক্লাবের অন্যান্য সদস্যাগণ শীঘ্রই আবিষ্কার করিলেন মার্গারেট একজন লেখিকা। সুচিন্তিত ভাষণ অবলম্বনে তাঁহার সুপ্ত বাগ্মিতা আত্ম-প্রকাশ করিল। সাহিত্যালোচনার সুযোগে মননশক্তি বৃদ্ধি পাইল। ধীরে ধীরে মার্গারেট গভীর চিন্তাশীলা অথচ সদা উৎসাহী এক মহীয়সী নারীতে পরিণত হইলেন।

নব শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া কৃতিত্বের সহিত মার্গারেট যখন গবেষণায় রত, তখন একদিন মিসেস ডি-লীউএর নিকট হইতে আহ্বান আসিল। তিনি লণ্ডনে একটি বিদ্যালয় খুলিবেন, মার্গারেট কি তাঁহার সহিত যোগ দিবেন? সম্পূর্ণ নূতন কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তোলার মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা-লাভের সম্ভাবনা, তাহার উত্তেজনায় মার্গারেট মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করিয়া সম্মতি দিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের উইম্ব্‌ল্‌ডনে মার্গারেটের নূতন বিদ্যালয়ের কর্ম আরম্ভ হইল।

লিভারপুল ত্যাগ করিয়া মেরী নোব্‌ল উইম্ব্‌ল্‌ডনে চলিয়া আসিলেন এবং এখানেই পরিবারটির স্থায়ী বসবাস আরম্ভ হইল।

নূতন অভিজ্ঞতা। একান্ত উৎসাহে মার্গারেট নূতন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-মূলক কার্যে লাগিয়া গেলেন। প্রচলিত বিধি-নিয়মের গণ্ডি এই বিদ্যালয়ে নাই। শিশু শিক্ষা করিবে নিজের অভিপ্রায় ও স্বভাব অনুযায়ী। পাঠ্য পুস্তকের বোঝা ঘাড়ে চাপাইয়া তাহার কোমল চিত্তকে ভারাক্রান্ত করা হইবে না। শিক্ষয়িত্রীর কাজ অলক্ষ্যে থাকিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। শিশু

স্বয়ং তাহার মধ্য হইতে নির্বাচন করিবে কোনটি তাহার স্বভাবের উপযোগী। একটি ক্ষুদ্র চারাগাছ রোপণ করিয়া উদ্যানের মালী যেমন তাহা দিনের পর দিন সযত্নে নিরীক্ষণ করে, তাহার প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত আলো, বাতাস ও জলের ব্যবস্থা করে, মাটির কাঁকর বাছিয়া তাহার গতিপথের বিঘ্নগুলি অপসারণ করিয়া দেয়, শিক্ষকের কাজও তাহার অনুরূপ। শিশু প্রকাশ করিবে নিজেকে নিঃসঙ্কোচে; তাহার জন্য প্রয়োজন স্বাতন্ত্র্য, সাহায্য। মার্গারেটের সন্ধানী মন এই সমীক্ষণ কার্যে প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করিল। যে শিশুগুলি তাঁহার তত্ত্বাবধানে, তাহাদের সহজাত বৃত্তিগুলি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাদের অপরিণত মন কেমন করিয়া চতুর্দিকের যাবতীয় পদার্থের প্রতি বিস্ময় ও ঔৎসুক্য প্রকাশের সহিত জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতেছে, তিনি মুগ্ধ হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করেন।

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে মার্গারেট শীঘ্রই বিশেষ অভিজ্ঞা হইয়া উঠিলেন। এই কার্যে তাঁহার সত্যকারের পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল, যাহার ফলে সুদূর ভবিষ্যতে এক নূতন পরিবেশের মধ্যেও তিনি অতি সহজে নিজের কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর মার্গারেট স্থির করিলেন, অতঃপর তিনি নিজেই একটি বিদ্যালয় খুলিবেন। তাঁহার মধ্যে ছিল প্রখর এক স্বাতন্ত্র্যবোধ, যাহা দীর্ঘকাল অপরের অধীনে অথবা সহযোগিতায় কার্য করিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। মার্গারেট যাহা করিতে চাহিতেন তাহাতে অপরের হস্তক্ষেপ চলিত না। অপরের মতামত তিনি সকল সময় নির্বিচারে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না; আপস করিয়া চলিবার মত দুর্বলচিত্তও তাঁহার একেবারেই ছিল না। সুতরাং স্বয়ং বিদ্যালয় খুলিয়া স্বাধীনভাবে শিক্ষাকার্যে পরীক্ষা চালাইবার আগ্রহ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উইম্বল্‌ডনেই তিনি পৃথক বিদ্যালয় খুলিলেন। যে কয়জন শিক্ষাব্রতী তাঁহার সহিত যোগদান করেন, শিল্পী এবেনীজার কুক তাঁহাদের অন্যতম। ফ্রবেলপদ্ধতির অনুশীলন করিতেন কুক রঙ ও তুলির সাহায্যে। এবেনীজার কুকের নিকট মার্গারেট আগ্রহের সহিত চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষণবিদ্যায় কুকের শক্তির উপর তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। পরবর্তী কালে কলিকাতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কুকের ন্যায় একাধারে শিল্পী ও যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা মার্গারেট বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে তিনি যে সুচিন্তিত ব্যাখ্যা বা তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহার প্রাথমিক জ্ঞান তিনি আহরণ করেন কুকের নিকট।

ব্যক্তিত্ব আপন পথ করিয়া লয়। লণ্ডনের বিদগ্ধসমাজে মার্গারেট শীঘ্রই সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। লেডি রিপন ও লেডি ইজাবেল মার্জেসনের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইঁহাদের একটি ছোটখাট সাহিত্য-আসর ছিল। সমবেত প্রচেষ্টায় সাহিত্য-আসরটি বিখ্যাত 'সেসেমি ক্লাবে' পরিণত হইল। সংগঠনকার্যে মার্গারেট ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী—পরে তিনিই হইলেন ক্লাবের সেক্রেটারী। এই ক্লাবে নিয়মিত শিল্প ও সাহিত্য-সমালোচনার সহিত নারীজাতির বিভিন্ন সমস্যা এবং রাজনীতি সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা চলিত। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডের জন্য পুনরায় পার্লামেণ্টে 'হোমরুল' বিল উত্থাপিত হয়। মার্গারেট উৎসাহের সহিত এ বিষয়ে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতেন, জোরের সহিত স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতেন অসঙ্কোচে।

শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতাবলীও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। বার্নার্ড শ, হাক্সলী প্রভৃতি নামজাদা লেখক ও বৈজ্ঞানিক মধ্যে মধ্যে সেসেমি ক্লাবে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় ও আলোচনার সুযোগ মার্গারেটের চিন্তাশক্তি-বুদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ক্লাবে ও সমাজে তাঁহার বিশেষ স্থান হইয়া গেল। তাঁহার চারিপার্শ্বে যে শিক্ষিত, চিন্তাশীল, মার্জিত-রুচিবিশিষ্ট সম্প্রদায় বিরাজ করিত, তাহার সংস্কৃত পরিবেশে মার্গারেটের চিন্তাশীল ও উৎসাহী মন বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। শিক্ষাকার্যে সাফল্য তাঁহার সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছে ; বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ তাঁহাকে লেখিকারূপে গণ্য করিয়া তুলিয়াছে ; লণ্ডন মহানগরীর অনন্ত সম্ভাবনার পথ মার্গারেটের নিকট উন্মুক্ত। তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, রচনাশক্তি ও বাগ্মিতা লণ্ডনসমাজে তাঁহাকে কেবল সুপরিচিত নহে, সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সাধারণ নরনারীর যাহা জীবনের কাম্য, সেই অভীপ্সিত পথে মার্গারেট কৃতিত্বের সহিত আগাইয়া চলিয়াছেন। জীবনের যাত্রাপথ মনে হইতেছে সরল, দীর্ঘ প্রসারিত। নিত্য নূতন আলোচনা, চিন্তার অভিনবত্ব এবং পণ্ডিতমণ্ডলী ও সুধীজনের সাহচর্যে মার্গারেটের কল্পনা ও ধীশক্তি প্রখরতর হইয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে অন্য এক লোকে। অবলীলাক্রমে তিনি চলিয়াছেন যোদ্ধার ন্যায় দৃঢ় পদক্ষেপে, সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা লইয়া।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দের লণ্ডনে প্রথম আগমন। উদ্দেশ্য বেদান্ত-প্রচার। মার্গারেটেরও জীবনের গতি ঘুরিয়া গেল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে।

সত্যানুসন্ধানে

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ মার্গারেটের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। ইহার ফলে যে নূতন অধ্যায় শুরু হইল, তাহার গতি ও পরিণতি তাঁহার নিকট কেবল অপ্রত্যাশিত নহে, অভাবিত। যে অভ্যস্ত ও পরিচিত জীবনপ্রবাহে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, কালের ইঙ্গিতে অকস্মাৎ তাহা থামিয়া গেল। বহুপ্রতীক্ষিত জীবন-দেবতার আহ্বান তিনি শুনিতে পাইলেন। এই আহ্বানকে একান্তভাবে গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি কতকটা অজ্ঞাতসারেই চলিতেছিল ; তাই ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল না।

স্বামিজীর সহিত পরিচয়ের পূর্বে বহির্জীবনে মার্গারেট যে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চিত্তকে পূর্ণ করিতে পারে নাই। সংশয় ও দ্বন্দ্ব তাঁহার অন্তররাজ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বাল্যকালে ধর্মের প্রতি তাঁহার যে সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল, যৌবনের প্রখর বিচার বুদ্ধি ও সংশয়ের নিকট তাহার পরাজয় ঘটিয়াছিল। হ্যালিফ্যাক্স বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁহার মনে ধর্ম সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন জাগে। ঐ বিদ্যালয় কংগ্রিগেশনালিস্ট চার্চের অধীনে। ঐ জাতীয় বিদ্যলয়গুলিতে নীতিশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। সেই প্রচলিত নীতিশিক্ষা একদিকে যেমন দীনতা, সংযম, স্বার্থত্যাগ, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণরাজির সম্যক্ বিকাশের সহায়তা করিত, অপর দিকে উহার কঠোরতা, অত্যধিক বিধিনিষেধ ও অন্য ধর্মের প্রতি অনুদার মনোভাব চরিত্রে উদারতা-সম্পাদনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত। অল্প বয়স হইতেই মার্গারেটের চিত্ত সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার বিরোধী। সুতরাং বিদ্যালয়ের এই পরিবেশ তাঁহাকে পীড়িত করিত। তথাপি তখন পর্যন্ত প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতি তাঁহার মনে আনন্দ সঞ্চার করিত। যুক্তি তখনও প্রবল হইয়া সহজ বিশ্বাস ও আবেগকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

মার্গারেটের বয়স যখন পনেরো, ইংলণ্ডের চার্চসমূহের Tractarian[১] আন্দোলনের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই আন্দোলনে চার্চের রূপান্তর ঘটিল। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলি বর্ণসুষমায় উজ্জ্বল রূপ ধারণ

[১] ঊনবিংশ শতাব্দীতে চার্চের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জন কেব্‌ল, ডক্টর পুসি ও ডক্টর নিউম্যানের নেতৃত্বে অক্সফোর্ডে এক ধর্ম-আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইহাদের মুখপত্র Tracts of time হইতে ইহা Tractarian আন্দোলন নামে পরিচিত।

করিল। বিচিত্র সুরের সংযোজনায় প্রার্থনা-মন্দির সঙ্গীত-মুখরিত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন উপাসনায় নানাবিধ প্রতীকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইল। বর্ণ, আকার ও সুরের বিচিত্র সমারোহের সহিত স্বীকৃত হইল যে, ধর্মজীবনে অন্তরের আকুল অনুরাগ, ঐকান্তিক ভক্তি ও কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। কিশোরী মার্গারেটের কল্পনা এই আন্দোলনে বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে ইহাই প্রথম এবং প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম প্রভাব। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রভাব হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। আবার এই সময়েই স্বাভাবিক নীতিবোধ এবং অলঙ্ঘ্য নিয়মানুবর্তিতার অসংখ্য দাবী-দাওয়া তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যৎ কার্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার নৈতিক ও সামাজিক জীবন এইরূপে সুনিয়ন্ত্রিত হইলেও এবং চার্চ-নির্ধারিত ধর্মজীবনের প্রতি তিনি অনুরাগ পোষণ করিলেও বয়স বৃদ্ধির সহিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের অপর দিকগুলি ক্রমেই মার্গারেটের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ধর্মজীবনে এত অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা কেন? হৃদয় এখানে অহরহ নিপীড়িত, ক্লিষ্ট ; ধর্মানুভূতির সহগামী উদার আনন্দের এখানে অভাব। ধর্মজীবনে চলিবার একটা পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর চার্চ যেন উদ্যত শাসনদণ্ড হস্তে ভ্রূকুটি করিয়া চাহিয়া আছে ; এতটুকু এদিক ওদিক হইলেই সর্বনাশ। যাহারা ইহার অনুগামী তাহাদের মধ্যে দাক্ষিণ্যের অভাব। সর্বদাই তাহারা অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণু। নীতির আবেগহীনতা চরিত্রের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত করিয়াছে। মার্গারেটের মনে নিরন্তর প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—এই যাজকীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে কোন উদার এবং মানবীয় ধর্ম কি নাই?

চার্চের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি গুরুত্ববোধ ও নিষ্ঠা মার্গারেটকে একটি জিনিস শিখাইয়াছিল—তাহা প্রচলিত ঐতিহ্যের মূল্য। ফলে উত্তরকালে হিন্দুধর্মের বিশাল, সর্বজনীন বেদান্ততত্ত্ব যেমন তাঁহার তীক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, ইহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিচিত্র এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলিও তাঁহার হৃদয়ে তেমনই আবেগ সঞ্চার করিত। তাহাদিগকে তিনি মর্যাদা দিতে পারিয়াছিলেন।

অতঃপর মার্গারেট ইংলণ্ডের ব্রড চার্চ স্কুলে (Broad Church School) যোগদান করেন। কিন্তু ইহার মতবাদও তাঁহার আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিল না। এখানেও কেবল শুষ্ক নীতির ব্যাখ্যা। ভক্তহৃদয়সুলভ আকুল আবেগের অভাবে ধর্মানুষ্ঠানগুলি প্রাণহীন। উপরন্তু এখানে ছিল মানবতার প্রতি বিদ্বেষ, আর অপর ধর্মমাত্রই কুসংস্কার অথবা অজ্ঞানমূলক

বলিয়া প্রচন্ড অবজ্ঞা। মার্গারেটের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা অপরিপূর্ণই রহিয়া গেল।

শিশু যীশুর প্রতি মার্গারেটের অন্তরের অনুরাগ ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছায় বিপুল আত্মোৎসর্গের জন্য সমগ্র হৃদয় দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিলেও মার্গারেটের মনে হইত, মানবজাতির উদ্ধারের জন্য যীশু যে স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহার তুলনায় তাঁহার নিজের ভক্তি বা পূজা যথেষ্ট নয়।

মার্গারেটের বিচারশক্তি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করিয়া হাক্সলী প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। যে যত যুক্তিবাদী, তাহার সংশয়ও তত প্রবল। মাত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়সেই মার্গারেটের চিন্তাশক্তি আশ্চর্য পরিণতি লাভ করিয়াছিল। যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গিয়া খ্রীস্টান মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ জাগিল ; উহার বহু বিশ্বাস ও আচার মনে হইল মিথ্যা, অসঙ্গত। ফলে আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। তবে মার্গারেটের সংশয় আস্তিক্যবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাশ্চাত্যদেশের তদানীন্তন বহু পন্ডিত ব্যক্তির নাস্তিবাদ ও সংশয়পূর্ণ চিন্তা-ধারায় তিনি যোগদান করেন নাই। তাঁহার নিকট ধর্ম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ; তাহাকে অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠে না। এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ; কিন্তু কী তাহার যথার্থ স্বরূপ, যাহা জানিলে আপাত-বিরোধী বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে একটি সমন্বয়-সাধন সম্ভব?

ক্রমে মার্গারেট গীর্জায় যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। প্রাণহীন, শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি সময়ে সময়ে মানসিক যন্ত্রণার তীব্রতা ও নৈরাশ্য যখন হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া তুলিত, তখন অভ্যাসবশতঃ তিনি আবার গীর্জায় ছুটিয়া যাইতেন—ভাবিতেন ইহার অনুষ্ঠানগুলিতে মগ্ন হইয়া হৃদয় ভার লাঘব করিবেন! কিন্তু সমস্তই মনে হইত বৃথা আড়ম্বর। পরমার্থলাভের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় যাহার অন্তরাত্মা নিপীড়িত, তাহার জন্য সেখানে কোন শান্তি নাই ; এমন কোন অবলম্বন নাই, যাহার সাহায্যে মার্গারেট এক চিরন্তন, অবিরুদ্ধ, অখন্ড তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে পারেন।

এইরূপে গতানুগতিক অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে বহুদিন হইতে সংশয় ও উৎকণ্ঠা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলেও উহা তাঁহার জীবনের একটা দিক মাত্র ছিল। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার-রচনার স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার চিত্ত প্রবলভাবে সত্যাভিমুখ হয়।

দীর্ঘ সাত বৎসর কাটিয়া গেল। মার্গারেটের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল এই সন্দেহসংঘর্ষে। ইতিমধ্যে তিনি বহু পুস্তক পড়িয়াছেন, বহু জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তদানীন্তন দার্শনিক মতবাদ-গুলির উপর চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়তো প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে, কারণ বিজ্ঞান বাস্তবতা ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ; সেখানে কল্পনা বা ভাবুকতা দ্বারা সত্যনির্ণয়ের প্রচেষ্টা নাই। অতঃপর চলিল বিজ্ঞানের সাধনা। সৃষ্টির উৎপত্তি এবং জগতের সর্ববিধ পদার্থের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া মার্গারেট আবিষ্কার করিলেন, প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে সর্বত্র একটি সঙ্গতি বিদ্যমান। কিন্তু ইহার ফলে শতগুণ হইয়া দেখা দিল প্রচলিত ধর্মমতে অসঙ্গতি। কিন্তু তিনি তো ধর্মকে পরিহার করিতে চাহেন না, তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ধর্ম তাঁহার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক ; কেবল ইহার মধ্যে যেন কোন বিরোধ না থাকে। মার্গারেটের মনে হইল, তিনি ক্রমাগত চলিয়াছেন এক কূল হইতে অপর কূলে। এই সংশয়ক্ষুব্ধ, বিস্তীর্ণ সাগর হইতে কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে?

এমন সময় সহসা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল বুদ্ধের জীবনী 'Light of Asia'. আগ্রহের সহিত তিনি উহা পড়িতে লাগিলেন। এই-বার হয়তো যথার্থ তত্ত্বের উদ্ঘাটন হইবে প্রখর দিবালোকের ন্যায়। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। তথাপি বুদ্ধের জীবন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। তিনি সাগ্রহে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সংশয়বিমুক্ত তিনি হইতে পারিলেন না, তবে তাঁহার ধারণা দৃঢ় হইল যে, মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধের বাণী খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকদের মুক্তিব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত।

আচারপঙ্কিল ধর্ম সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা চিত্তকে নিরানন্দ ও পীড়িত করিয়া তুলিলেও অধ্যাত্মবাদ তাঁহার জীবনে ক্রমশঃই সুদৃঢ় হইতেছিল। চার্চ-প্রচলিত ধর্মাচরণে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পূর্বের সেই সহজ-সরল আবেগপূর্ণ ধর্মীয় মনোভাবটি ছিল না ; তাহার পরিবর্তে জাগ্রত হইয়াছিল সত্যকে জানিবার এক কঠোর সংকল্প, জীবনের চিররহস্য ভেদ করিবার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। ধর্ম কি সত্য হইতে পৃথক? মার্গারেটের যুক্তি-বাদী মন বলে, 'না, ধর্ম ও সত্য এক।' তবে কোথায় সেই ধর্ম? যে ধর্মে সকলের স্থান, যাহা উদার এবং অকপটে সকলকে আলিঙ্গন করিতে পারে? যে ধর্মে মুক্তি কেবল নির্দিষ্ট পন্থাবলম্বী কয়েকজনের পক্ষে নহে, পরন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পক্ষে লভ্য!

প্রচলিত ধর্মানুসারে ঈশ্বরকে জগৎপিতা রূপে উপাসনা করার প্রতি বিশ্বাস যখন নষ্ট হইল, তখন মার্গারেট ভাবিলেন, ইহার বাস্তব সত্যতা না থাকিলেও ধারণা বা কল্পনা হিসাবে একটা মূল্য থাকিতে পারে। সুতরাং সে মূল্যে নির্ধারণে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাহচর্য বিচারশক্তি ও বুদ্ধিকে খাদ্য দিতে পারে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্যলাভের দুরন্ত পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারে না। মার্গারেট হৃদয়ঙ্গম করিলেন, য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় সত্যের প্রত্যক্ষ সন্ধান নাই। হাক্সলী, টিণ্ডল, স্পেন্সার প্রভৃতি মনীষিগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, মানবতা কোন ঊর্ধ্বশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত. প্রকৃতির ক্রম-বিবর্তন উহার মৌলিক কারণ নহে। সৃষ্টির আদি কারণ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত এই যে, উহা মনোবুদ্ধির অগোচর। নাস্তিবাদ অথবা অজ্ঞেয়বাদ তাঁহারা পরিহার করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্তার আভাস দিতে তাঁহারা অক্ষম। তাঁহাদের অসংখ্য মতবাদের ঘূর্ণিপাকে সত্য ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে।

আধ্যাত্মিক জীবনের এই সংগ্রামে মার্গারেট অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অন্তরে এক প্রবল শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলেন। সকল যুক্তি ও তর্কের অতীত দুর্জ্ঞেয় সত্য কি তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইবে না? জগতে এমন কেহ কি নাই যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে পারেন?

জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব স্বামী বিবেকানন্দের, যে জীবনদেবতার উদার অভ্যুদয় মার্গারেটকে সকল সংশয় ও দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিয়া অনন্তলোকের সন্ধান দিয়াছিল। কেবল মার্গারেট কেন, তদানীন্তন পাশ্চাত্যজগতের যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনযাপন করিতেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আগমন তাঁহাদেরও নিকট শান্তির বার্তা বহিয়া আনিল। সে সংশয়মুক্তির শুভক্ষণ সম্বন্ধে মার্গারেট লিখিয়াছেন—

'আমাদের অনেকের নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তৃষ্ণার্তের নিকট সুশীতল পানীয়ের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম সম্বন্ধে ক্রম-বিবর্ধমান অনিশ্চয়তা এবং হতাশা বিগত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে আমাদের অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন হইয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অনুশাসনে আস্থা রাখা আমাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব, আবার এখনকার

ন্যায় আমাদের নিকট এরূপ কোন অস্ত্র ছিল না, যাহার সাহায্যে মত রূপ আবরণ ছিন্ন করিয়া ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রকৃত তত্ত্বের মর্ম-উদ্ঘাটন করা যাইত। স্বীয় প্রত্যক্ষ-উপলব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে এই সকল ব্যক্তিগণের যে সন্দেহ ছিল, বেদান্ত তাহা সমর্থন করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে। অন্ধকারে যাহারা দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারা আলোক দেখিতে পাইয়াছে।'

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে আগমন করিলেন। হিন্দু যোগী রূপে শীঘ্রই তিনি সর্বত্র পরিচিত হইয় উঠিলেন। লেডি মার্জেসন একদিন তাঁহার ড্রইংরুমে এই হিন্দু যোগীকে আহ্বান করিলেন কিছু বলিবার জন্য। সেই সঙ্গে অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধুরও আমন্ত্রণ হইল। মার্গারেট তাঁহাদের অন্যতম। যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁহারা জানিতেন, অধ্যাত্মবাদ মার্গারেটের জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং জগতের সত্যাসত্যনির্ণয়ের অক্ষমতায় তিনি হতাশ, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। আমন্ত্রণের পূর্বমুহূর্তে লর্ড রিপনের এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা মার্গারেটকে বলিলেন, এই হিন্দু যোগী হয়তো তাঁহাকে সত্যান্বেষণের পথে সাহায্য করিতে পারেন। লেডি মার্জেসনের আমন্ত্রণ কি তিনি গ্রহণ করিবেন? মার্গারেটের মনে হইল ক্ষতি কী? এ পর্যন্ত বহু মতবাদ ও ব্যাখ্যা তিনি ধৈর্য সহকারে শুনিয়াছেন অন্তরের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য। তাই নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তিনি হিন্দু যোগীকে দেখিতে যাওয়া স্থির করিলেন। মার্গারেট তখনও জানিতেন না, সত্যপ্রকাশের শুভলগ্ন সমাগত-যাহার প্রতীক্ষায় তিনি ব্যাকুল, উদ্‌ভ্রান্ত।

শ্রেয়োলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা কখনও ব্যর্থ হয় না।

আচার্য বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতাত্মার পূর্ণ-জাগ্রত প্রতীক, ভারতের মহা-জাগরণের স্রষ্টা। বিশ্বসভায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-সম্পাদনের তিনিই পুরোহিত। পাশ্চাত্যভূমিতে তাঁহার আগমন ভারত-ইতিহাসের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে; উত্তরকালে যে মহাভাবতরঙ্গে সমগ্র বিশ্ব স্পন্দিত হইবে তাহারই ইঙ্গিত মাত্র।

সমগ্র ভারত পরিভ্রমণান্তে কন্যাকুমারিকার শেষ প্রস্তরখণ্ডে উপবিষ্ট পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এক অখণ্ড ভারত —যুগ যুগ ধরিয়া অধ্যাত্ম-সম্পদে মহিমময় যে অতীত ভারত, তাহা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। সম্মুখে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান। চারিদিকে দুঃখ, দারিদ্র্য, বন্ধন ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জমান নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর আকুল আর্তনাদ। ভগবান তথাগতের ন্যায় এই সন্ন্যাসীর বিশাল হৃদয় মানবজাতির দুঃখ-বেদনায় অধীর হইয়া উঠিল। বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত চিত্তে সংকল্প জাগিল, ইহাদিগকে মুক্তির সন্ধান দেওয়া হইবে তাঁহার জীবনের ব্রত।

ভারতের অতীত-ইতিহাস-অধ্যয়ন ও বর্তমান জীবনের অনুধাবন তাঁহাকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছিল যে, দেশের এই ঘোর অবনতির জন্য দায়ী ধর্ম নয়, পরন্তু ধর্মের নামে প্রচলিত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও কুসংস্কার। সুতরাং প্রকৃত ধর্মসংস্থাপনের উপরেই নির্ভর করিতেছে ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণ। ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ভারত পুনরায় তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার ভাবী গৌরব অতীত গৌরবকে অতিক্রম করিবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন মানবের অন্তর্নিহিত প্রসুপ্ত দেবত্বের উদ্বোধন—প্রয়োজন আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আর প্রয়োজন ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্র ত্যাগ ও সেবায় প্রবুদ্ধ, স্বার্থহীন, ঈশ্বরে সর্বস্ব অর্পিত শত শত নরনারীর জীবন-বলি।

অর্থ কোথা হইতে আসিবে? হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সন্ন্যাসী উপলব্ধি করিয়াছেন, ভারতে দরিদ্রের জন্য অর্থসাহায্যের প্রত্যাশা নিরর্থক। অর্থসংগ্রহের সম্ভাবনা একমাত্র প্রতীচ্যে। জড়বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতীচ্যের ভোগ-বিলাসপূর্ণ সমাজ-জীবনে ভারতের শ্রেষ্ঠ

সম্পদ অধ্যাত্মবাদ যদি স্বীকৃতি লাভ না করে তবে তাহার পরিণাম ধ্বংস। স্বামী বিবেকানন্দ স্থির করিলেন, পাশ্চাত্যে তিনি ঘোষণা করিবেন ভারতের শাশ্বত, সনাতন ধর্ম, আর তাহার বিনিময়ে ভারত লাভ করিবে ব্যবহারিক জীবনের ঐশ্বর্য। আদান প্রদানের মধ্য দিয়া ঘটিবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার সংমিশ্রণ। কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের কল্যাণ-সাধনের জন্য প্রয়োজন ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের, কল্পনার সহিত বাস্তবের, ভাবপ্রবণতার সহিত বিচারবুদ্ধির এবং আদর্শবাদের সহিত কর্ম-তৎপরতার সমন্বয়।

সংকল্প স্থির হইল। অতি প্রিয় স্বদেশভূমি তিনি পরিত্যাগ করিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় তাঁহার প্রথম পদার্পণ। উদ্দেশ্য শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান। কোন পরিচয়পত্র তাঁহার সঙ্গে ছিল না। কিন্তু মধ্যাহ্নের সূর্য কি পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে? প্রখর দীপ্তিমান ভাস্করের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দের মহিমময় আবির্ভাবে সমগ্র শিকাগো শহর বিস্ময়-চকিত হইয়া উঠিল। ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত উদার, গম্ভীর, অপূর্ব ভাষণ পরিচয়হীন, কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসীকে মুহূর্তমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যে পরিণত করিল। তাঁহার সমুন্নত ললাটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বিজয়টীকা। দেখিতে দেখিতে তরুণ যোগীর খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। বিপুল জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল তাঁহার উদার ধর্মমতের সমন্বয়রূপ ব্যাখ্যা শুনিতে। যে জ্ঞানৈশ্বর্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আহরণ করিয়াছিলেন, অকৃপণ হস্তে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

নব সভ্যতার পাদপীঠ আমেরিকা—ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে গর্বিত, বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবনকে সর্বপ্রকারে সম্ভোগ করিবার অসংখ্য উপায় তাহার কর-তলগত। সেই জড় সভ্যতার সেবার আহ্বানে আত্মবিস্মৃতপ্রায় নরনারীর কর্ণে তরুণ হিন্দু যোগী ঘোষণা করিলেন আত্মার অমরত্ব। মন্ত্রমুগ্ধের মত বিস্মিত তাহারা শ্রবণ করিল, তাহারা অমৃতের সন্তান—অমৃতত্ব লাভে তাহাদের জন্মগত অধিকার।

'হে দিব্যলোকনিবাসী অমৃতের পুত্রগণ, সকলে শ্রবণ কর, আমি সেই অনাদি, শাশ্বত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, যিনি সকল অজ্ঞানের পারে; তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, পরিত্রাণ লাভের অন্য পথ নাই।

'তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ, তোমরা এই মর্ত্যভূমির দেবতা। তোমরা পাপী? অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই

মহাপাপ। মানবমাত্রেই পবিত্র, মুক্ত, নিত্যানন্দময় আত্মা,—যে আত্মা সর্ব-ব্যাপী, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, একমেবাদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ।'

স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুধর্মের শিক্ষা সমদর্শন, সর্ববিধ মত গ্রহণ। হিন্দুধর্মের সেই চিরন্তন বাণী স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিলেন নূতন করিয়া। 'প্রত্যেক ধর্মই সত্য, প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর বর্তমান। বিভিন্ন ধর্ম একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ।' এ উদার তত্ত্ব আমেরিকাবাসীর নিকট নূতন, কিন্তু বেদান্তের এই সার্বভৌমিক ভাবটি তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। স্বামিজী বলিলেন, 'হিন্দুর নিকট সমগ্র ধর্মজগৎ নানা রুচিবিশিষ্ট নর-নারীর বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া সেই একমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া মাত্র। একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্য দিয়া আসিতেছে বলিয়াই পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয়। সকলেরই অন্তস্তলে বিরাজমান এক সত্য। "মণিগণ যেমন সূত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সকল ধর্মই সেইরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে।" এই ধর্ম জগতের সর্বপ্রকার ভেদ দূর করিবে। সকল নরনারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবে।'

বেদান্তের প্রচার বাড়িয়াই চলিল। হিন্দুধর্ম যে একদা প্রচারশীল ছিল তাহার অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। কালক্রমে প্রচারকার্য ব্যাহত হইয়াছিল। ভগবান তথাগত-প্রচারিত সত্য পরে বিশাল বৌদ্ধধর্মে পরিণত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় প্রচারযুগের অবসানের বহু শতাব্দী পরে ব্যাপকভাবে জগৎসমক্ষে পুনরায় ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

আমেরিকায় স্বামিজী গুণমুগ্ধ অগণিত বন্ধু এবং অনুগামী লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য বিরোধী দলও ছিল, যাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে। কিন্তু যিনি আত্মবলে বলীয়ান তাঁহার কে কী করিতে পারে! বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইল। স্বামিজী নিয়মিতরূপে বক্তৃতা ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহারা আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার নিকট বেদান্ত শিক্ষা করিলেন, তাঁহাদের অনেকেই পরে স্বামিজীর কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর এইরূপে চলিবার পর আমেরিকায় বেদান্ত শিক্ষার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্বামিজী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার সংকল্প পাশ্চাত্য-বিজয়। ইংলণ্ডকে বাদ দিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং ইংলণ্ড গমনের কথা স্বামিজী বহুবার চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় মিস হেনরিয়েটা মুলার ও মিঃ ই. টি স্টার্ডির নিকট হইতে অনুরোধ আসিল। মিস মুলার পূর্বেই আমেরিকায়

স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না হইয়াছিলেন। মিঃ স্টার্ডি ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। ভারতের উত্তরাখণ্ডে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি তপস্যা করেন এবং অনুরাগের সহিত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমেরিকায় স্বামিজীর সাফল্যলাভে উভয়েই উৎসাহিত হইয়া স্থির করিলেন, লণ্ডনেও বেদান্তপ্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বামিজীর মনে হইল এ আহ্বান দৈব-প্রেরিত। দুই বৎসরের অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন। সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে ভাবিয়া বন্ধুগণও আগ্রহান্বিত হইলেন। ইতিমধ্যে স্বামিজীর অন্যতম গুণমুগ্ধ বন্ধু মিঃ লেগেট তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে স্বামিজীকে য়ুরোপ আসিতে আমন্ত্রণ করিলেন। ১৮৯৫ খৃীষ্টাব্দে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মিঃ লেগেটের সহিত স্বামিজী নিউইয়র্ক হইতে রওনা হইয়া ঐ মাসের শেষে প্যারিস পেঁৗছিলেন।

য়ুরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি প্যারিস স্বামিজীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তথায় কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি ১০ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন রওনা হইলেন। লণ্ডনে মিঃ স্টার্ডি ও মিস মুলার তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মিঃ স্টার্ডির গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। লণ্ডনে আগমনের পর স্বভাবতঃই স্বামিজীর মন নানা চিন্তায় আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ড-শাসিত দেশের অধিবাসী। এখানে তাঁহার আগমন সেই বিজিত দেশের অধ্যাত্মসংস্কৃতির প্রচারকরূপে। দেড় শত বৎসর ধরিয়া যে দেশ ইংরেজের অধীন, তাহার প্রচারককে ইংরেজ জাতি কিরূপে গ্রহণ করিবে? যে পূর্বপুরুষের জন্য তিনি গর্ব বোধ করেন, তাহাদের ধর্ম ও দর্শন কি ইংরেজ জাতি সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিবে? বিশেষতঃ এই জাতির প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব লইয়া তিনি ইংলণ্ডের উপকূলে পদার্পণ করেন নাই।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামিজীর কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। অবকাশ-সময়ে লণ্ডনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতে তিনি ভাল-বাসিতেন। ক্রমে প্রচার বাড়িয়া চলিল। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং অভিজাত সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার আলোচনা সভাগুলিতে লেডি ইজাবেল মার্জেসন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাগণও যোগ দিতে লাগিলেন। এই প্রিয়দর্শন 'হিন্দু যোগী'কে দেখিবার ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আগ্রহ বিপুলভাবে দেখা গেল। দর্শকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি

হইতে থাকায় যে হলঘরে ক্লাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়া পড়িল।

অতএব ২২শে অক্টোবর পিকাডিলির 'প্রিন্সেস হলে' স্বামিজীর প্রকাশ্য বক্তৃতার আয়োজন হইল। বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'আত্মজ্ঞান'। তাঁহার বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ শত শত শিক্ষিত নরনারী সেদিন 'প্রিন্সেস হলে' উপস্থিত। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামিজীর গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা সেদিন লণ্ডনের সুধীবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

পরদিন সকালে বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বক্তৃতার অনুকূল সমালোচনা করিল। 'দি স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের সহিত এই হিন্দু যোগীর বক্তৃতার তুলনা করিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়া লিখিল—'বক্তৃতামুখে তিনি আমাদের কারখানা, ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া এবং পুস্তকের দ্বারা মানবসমাজের যে সামান্য উপকার হইয়াছে, বুদ্ধ এবং যীশুর কয়েকটি বাণীর সহিত তাহার তুলনা করিয়া অতি নির্ভীক, তীব্র সমালোচনা করেন।...তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দ্বিধাহীন।'

'দি লণ্ডন ডেলী ক্রনিকল' লিখিল—'জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অবয়বে বুদ্ধদেবের চিরপরিচিত মুখের সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত পরিস্ফুট। আমাদের বণিকসমৃদ্ধি, যুদ্ধ, ধর্মমত সম্পর্কে তিনি তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন—এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা আমাদের শূন্যগর্ভ আস্ফালনপূর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হইবে না।'

'দি ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট' লিখিল—'কথা কহিবার সময় স্বামিজীর মুখ বালকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।...নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ইনি একজন মৌলিক-ভাবপূর্ণ ব্যক্তি।'

লণ্ডনের সর্বত্র স্বামী বিবেকানন্দের নাম ছড়াইয়া পড়িল। মার্গারেট তখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। তিনি কি সংবাদপত্রে বিবেকানন্দের আগমনবার্তা, অত্যাশ্চর্য বক্তৃতা ও গভীর পাণ্ডিত্যের কথা পড়েন নাই?[১]

[১] নিবেদিতার একজন চরিতকার (শ্রীযুক্ত মণি বাগচি) তাঁহার পুস্তকে ২২শে অক্টোবর পিকাডিলি 'প্রিন্সেস হলে' নিবেদিতার স্বামিজীকে প্রথম দর্শন সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু 'The Master as I Saw Him' নামক স্বলিখিত পুস্তকে (পৃঃ ১) প্রথম দর্শন সম্বন্ধে নিবেদিতা যে সময় লিখিয়াছেন, তাহা নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি, এবং উহা ঘটে এক ড্রইংরুমে।

প্রথম সাক্ষাৎ

জীবনের বিশেষ ক্ষণ অথবা পরম লগ্ন, কখন যে আসিয়া উপস্থিত হইবে, কাহারও জানা নাই ; মার্গারেটও জানিতেন না, কৌতূহলী হইয়া তিনি যে এক হিন্দু যোগীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, ইহা তাঁহার জীবনের আশ্চর্য, অসাধারণ ঘটনা।

সেদিন নভেম্বর মাসের এক রবিবারের মনোরম অপরাহ্ন। স্থান ওয়েস্ট এণ্ডের (West-End) একটি ড্রইংরুম। অভ্যাগতের সংখ্যা বেশী নয়, মাত্র পনেরো-ষোলো জন। শ্রোতৃবর্গ অর্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে অগ্ন্যাধারে প্রজ্বলিত অগ্নি। একটি ঘরোয়া ক্লাস। মার্গারেট যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। এই প্রথম দর্শনের স্মৃতি মার্গারেটের হৃদয়ে বিশেষরূপে অঙ্কিত ছিল। প্রাচ্য-পরিচ্ছদ-মণ্ডিত সন্ন্যাসী এবং যে পরিবেশে তাঁহাকে দর্শন করেন উভয়ই বিস্ময়কর। প্রাচ্য-জগতের আবেষ্টনীর মধ্যেই তিনি প্রাচ্য আচার্যের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং পরবর্তী কালে মার্গারেটের মনে হইত, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য যে, স্বামিজীকে প্রথম দর্শনের সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উভয়ের সঙ্গে প্রাচ্য জীবনের একটা সাদৃশ্য ছিল। উহা, 'ভারতীয় উদ্যানে, অথবা সূর্যাস্ত-কালে কূপের সমীপে কিংবা গ্রামের উপকণ্ঠে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সাধু এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ', প্রাচ্যের এইরূপ এক দৃশ্যেরই কৌতুককর রূপান্তর বলিয়া স্বামিজীরও মনে হইয়া থাকিবে।

সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক পরিচ্ছদ, আকৃতি উজ্জ্বল ও বীরত্বব্যঞ্জক, প্রবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ আয়ত নয়ন ; আর প্রশান্ত আননে রাফেল-অঙ্কিত দিব্য শিশুর কমনীয়তা!

অপরাহ্ন শেষ হইয়া গোধূলি ও অন্ধকারের মিলন এক অপূর্ব তন্ময়তা সৃষ্টি করিল। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী প্রায়ই সংস্কৃত শ্লোক সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন। এই সুরের ঝঙ্কার ইংলণ্ডের গীর্জাগুলিতে প্রচলিত গ্রিগরি-প্রবর্তিত সুরের কথা মনে করাইয়া দেয়, অথচ উহা হইতে কত ভিন্ন! ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ়তর হইয়া আসিল। স্বামিজী মাঝে মাঝে 'শিব!'

'শিব!' বলিয়া উঠিতেছেন। সমস্ত পরিস্থিতিই নূতন; পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রার সহিত কোন অংশে সঙ্গতি নাই, অথচ কী গভীর চিত্তাকর্ষক!

কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিলেন, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে আদর্শ-বিনিময়ের সময় আসিয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহার পাশ্চাত্যে আগমন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সূত্রটির অদ্বৈত ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'বিভিন্ন রূপ সেই এক অদ্বিতীয় সত্তার বিভিন্ন বিকাশ।' গীতা হইতে 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন, 'সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় এই সমস্ত আমাতে অবস্থিত।'

স্বামিজী যখন বলিলেন, হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন শরীর ও মন এক তৃতীয় পদার্থ আত্মার দ্বারা পরিচালিত তখন মার্গারেট বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট বোধ করিলেন। তাঁহার মনে হইল এক নূতন তত্ত্ব। বিশ্বাসের (faith) পরিবর্তে প্রত্যক্ষানুভূতি (realisation) শব্দটি ব্যবহার করিতে স্বামিজীর আগ্রহ দেখা গেল। ঐ দিন বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান সে সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গ সকলেই গভীর আগ্রহ বোধ করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিল ফ্রেডারিক ডেনিসন মরিসের শিষ্য ও বন্ধু, এক বৃদ্ধা রমণী। অগ্রণী হইয়া সম্পূর্ণ শিষ্টাচারের সহিত তিনিই প্রশ্নাদি করিতেছিলেন। এক নূতন, অপরিচিত হিন্দু যোগী কি এমন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিতে পারেন? সকলের অন্তরেই এইরূপ একটি উদাসীনতা ও গর্বের ভাব ছিল। কিন্তু মন্ত্র-মুগ্ধের মত সকলে স্বামিজীর কথা শুনিতেছিলেন। অনর্গল তিনি বলিয়া যাইতেছেন। মনে হয়, তিনি যেন কোন এক দূর দেশের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন।

সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া স্বামিজী একটি ভারতীয় প্রবাদ-বাক্য উদ্ধৃত করিলেন, 'কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু উহার গন্ডির মধ্যেই মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর।' কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান আত্মলাভের তিনটি উপায়। সকল ধর্মের একমাত্র শিক্ষা 'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।'

হিন্দু সন্ন্যাসী ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলেন, তৎকালে পাশ্চাত্যে বিশেষ প্রচলিত কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায় কাঞ্চনাসক্তিবশতঃ অচিরেই বিনষ্ট হইবে। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন, 'মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে অগ্রসর হয় না, সত্য হইতে সত্যেই অগ্রসর হইয়া থাকে।' সকল ধর্মই সমভাবে সত্য, এবং সেইজন্যই তাঁহার পক্ষে কোন অবতারের বিরুদ্ধে সমালোচনা অসম্ভব। কারণ অবতার-গণ সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র।

অবশেষে তিনি গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন,

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।'

বক্তৃতা শেষ হইল। সন্ন্যাসীর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর কক্ষের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেদিন এই হিন্দু যোগীকে দেখিবার জন্য যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও ধর্মে তেমন আস্থা ছিল না। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং মনস্তত্ত্বই ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র, এই প্রচলিত আধুনিক আন্দোলনের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুতঃ সেদিন অপরাহ্ণে এরূপ ব্যক্তিগণকেই আহ্বান করা হইয়াছিল, যাঁহারা সহজে কোন ধর্মমতে আস্থা স্থাপন করিবার বিরোধী। ধর্মপ্রচার ব্যাপারে যে কিছু সত্য থাকিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহাদের প্রত্যয় জন্মানো কঠিন।

অতএব প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সকলেই গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর নিকট অভিযোগ করিয়া গেলেন, 'সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই।'

কিন্তু সত্যই কি তাই? এই হিন্দু যোগী কি কোন নূতন বার্তা বহন করিয়া আনেন নাই? পরে মার্গারেটের মনে হইয়াছিল, এই যে নূতন ভাবকে গ্রহণ করিবার, এমন কি, যাচাইয়া দেখিবারও আগ্রহের অভাব, ইঁহার মূলে আছে বৃথা বিচারবোধের গর্ব, অর্থাৎ সর্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করা —অবিবেচনাপ্রসূত অনুরাগ যেন হৃদয়কে অধিকার না করে। বস্তুতঃ এত সহজে বক্তার কথাগুলি সম্বন্ধে নিঃসংশয় অভিমত প্রকাশ করা চলে না। হিন্দু যোগীর ব্যক্তিত্ব মার্গারেটকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

মার্গারেটের ন্যায় মনস্বিনী নারী, যাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রবল ধীশক্তি এবং অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা অতি সহজেই তাঁহাকে যে কোন সমাজের পুরোভাগে স্থাপন করিত, তাঁহার পক্ষে সহজে কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আশ্চর্য নহে কি? বিশেষতঃ তিনি নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সর্বদাই পূর্ণ সচেতন। অথচ সেই আশ্চর্য ব্যাপারই ঘটিয়া গেল। কে এই গৈরিকধারী, অদ্ভুত, প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসী, যিনি পূর্ণ প্রত্যয়ের সহিত গম্ভীর, সুললিতকণ্ঠে প্রাচ্য দর্শন ও বিভিন্ন মতবাদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দ্বারা সকলকে

মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিতে পারেন? অথচ পাশ্চাত্য ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টি-ভঙ্গী! সর্বোপরি, পরিচ্ছিন্ন দেশ, কাল, নিমিত্তের অতীত যে অনন্ত সত্তা, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সন্ন্যাসী এক পরম আশ্বাস বহন করিয়া আনিয়াছেন।

মার্গারেট উপলব্ধি করিলেন, এই প্রাচ্য সন্ন্যাসীর বাণীর মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা উপেক্ষণীয় নহে।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করে, এবং তাহার ফলে যে অভাবনীয় নূতন যাত্রাপথে তিনি চলিতে শুরু করেন, তাহা স্মরণ করিয়া মার্গারেট পরবর্তীকালে তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'এইবার আমার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ এল।' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে, 'The Web of Indian Life' প্রকাশিত হইবার পর ২৬শে জুলাই-এর পত্রে লেখেন,

'মনে কর, যদি সে সময়ে স্বামিজী লণ্ডনে না আসতেন? জীবনটা নিরর্থক হয়ে যেত। কারণ আমি সর্বদাই জানতাম আমি এক সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি। সব সময়ে বলে এসেছি একটা আহ্বান আসবে, আর সত্যই সে আহ্বান এল। যদি নিজ জীবন সম্বন্ধে আমার আরও নিবিড় পরিচয় থাকত, তাহলে হয়তো আমার সংশয় জাগত, পরম লগ্ন যখন আসবে, তাকে চিনতে পারব কিনা! ভাগ্যবশতঃ আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, তাই সংশয়পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। এই মুহূর্তে বইখানির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, "যদি তিনি না আসতেন!" সকল সময়ে আমার মধ্যে এই জ্বলন্ত আকূতি আমি অনুভব করেছি ; কিন্তু ছিল না প্রকাশ করবার ক্ষমতা। কত সময় গেছে, যখন কলম নিয়ে বসে আছি কথা বলব বলে—কিন্তু ভাষা জোটে নি। আর আজ মনে হয় কথার যেন অন্ত নেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জগতে আমি যে কাজের যোগ্য হয়েছি, সেই কাজে আমার প্রয়োজনও আছে।'

স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের পর মার্গারেট গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যথাযথভাবে প্রতিদিনকার অভ্যস্ত জীবন চলিতে লাগিল। তিনি কিন্তু হিন্দু যোগীকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, বরং ধীরে ধীরে তাঁহার মনে যোগীর কথাগুলির প্রভাব দেখা গেল। মার্গারেট লিখিয়াছেন, 'সেই সপ্তাহের নির্দিষ্ট কাজগুলি করিয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে আমার নিকট ইহা প্রতিভাত হইল যে, এক অপরিচিত সংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত, এক নূতন ধরনের চিন্তাশীল ব্যক্তি যে বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা এইরূপে

উড়াইয়া দেওয়া কেবল অনুদারতার পরিচয় নহে, পরন্তু উহা অন্যায়। আমার মনে হইল, এই হিন্দু যোগী যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কথা পূর্বে আমি শুনিয়া অথবা ভাবিয়া থাকিতে পারি ; কিন্তু এ পর্যন্ত যাহা কিছু আমার নিকট শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে, সে সমস্ত মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করিতে পারেন, এরূপ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার জীবনে ঘটে নাই।'

অতঃপর পুনরায় স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ বোধ করা মার্গারেটের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামিজীর লণ্ডন বাসের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আর দুইটি মাত্র বক্তৃতায় মার্গারেট যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন।

১৬ই নভেম্বর ও ২৩শে নভেম্বর স্বামিজী পর পর দুইটি বক্তৃতা দেন। মার্গারেট উভয় বক্তৃতারই সারাংশ লিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আমাদের মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে, বার বার শ্রবণে তাহা বর্ধিত ও গাঢ় হয়। সেইরূপ, সেই বক্তৃতার সারাংশ এখন পড়িতে পড়িতে তখনকার অপেক্ষা বহুগুণ বিস্ময়কর মনে হইতেছে।'

বস্তুতঃ স্বামিজীর কথার মর্মার্থ মার্গারেট বহুদিন পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে তখন যে তত্ত্ববোধের অভাব ছিল, তাহার জন্য পরে তাঁহার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। স্বামিজীর বক্তৃতা দুইটি তিনি স্থানে স্থানে টুকিয়া লইয়াছিলেন শুনিতে ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া, কিন্তু ঐ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই ; মানিয়া লওয়া দূরের কথা।

স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি অনেকেরই চিন্তারাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। চিন্তাশীল এবং সন্দেহবাদীর পক্ষে কোন বিষয় সহজে মানিয়া লওয়া কঠিন। কিন্তু স্বামিজীর কতকগুলি উপদেশের সত্যতা সহজেই বোধগম্য। যেমন, 'সকল ধর্মই এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সমভাবে সত্য', স্বামিজীর এই উক্তি অনেকেই তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। মার্গারেটের প্রবল বিচারবুদ্ধি যে কোন বিষয় গ্রহণ করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করিত। সুতরাং স্বামিজীর সকল মতগুলিকেই তিনি বহুদিন ধরিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বামিজী যে বাণী প্রচার করিতেন, তাহা উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে ইহার মধ্যে যে দৃঢ়তা ও বিশ্বাস বিরাজ করিত, তাহার প্রভাব মার্গারেটকে অভিভূত করিত, এবং সেজন্যই বিশেষ করিয়া তিনি স্বামিজীর কথাগুলির মহিমা যুক্তি দ্বারা খর্ব করিবার চেষ্টা করিতেন।

স্বামিজীর লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁহার ক্লাসগুলিতে নিয়মিতরূপে যোগদান করিবার সময়ে মার্গারেট ছিলেন বিরুদ্ধ যুক্তি অবতারণায় অগ্রণী। তাঁহার মুখে 'কিন্তু' এবং 'কেন' এই দুইটি শব্দ লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু যুক্তি-প্রদর্শন এবং সন্দেহ-উত্থাপন দ্বারা স্বামিজীর মতগুলিকে খণ্ডন এবং বর্জন করিবার যতই চেষ্টা করিয়া থাকুন, তাহাদের প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

যে অসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ববলে স্বামিজী জগৎ জয় করিয়াছিলেন, তাহার দুর্নিবার প্রভাব অতিক্রম করিবার ক্ষমতা বিদুষী ও বিচারসম্পন্না মার্গারেটেরও ছিল না। সুতরাং ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্বেই তিনি তাঁহাকে আচার্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন তাহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার স্বজাতিপ্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য স্বীকার, ইহা শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই।'

স্বামিজীর চরিত্রের পূর্ণ মাহাত্ম্য ভারত-আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মার্গা-রেটের নিকট উদ্ঘাটিত হয় নাই। তিনি কেবল বুঝিয়াছিলেন, স্বামিজীর প্রচারিত তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন অসংলগ্নতা নাই ; দৃঢ়তার সহিত সত্যকে প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আর সেজন্যই তাঁহার নিকট মার্গারেটের শিষ্যত্ব-গ্রহণ। স্বামিজীর প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি হাতেকলমে প্রমাণিত না করা পর্যন্ত মার্গারেট উহাদিগকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

২৭শে নভেম্বর স্বামিজী আমেরিকা যাত্রা করিলেন। পর বৎসর এপ্রিল মাসে তিনি পুনরায় লণ্ডনে আগমন করেন। মার্গারেট যথেষ্ট সময় পাইলেন চিন্তা করিবার। স্বামিজীর যে কথাগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া-ছিলেন, দীর্ঘ চার মাস ধরিয়া তাহাদের উপর গভীর চিন্তার ফলে ভারতীয় ভাবধারার কয়েকটি দিক তাঁহার নিকট অত্যন্ত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ স্বামিজীর উদার ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষা, যাহা অন্যান্য ধর্ম ব্যাখ্যাতাদের সহিত তাঁহার মূলগত পার্থক্য নির্ণয় করে ; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ভাবগুলির মধ্যে যে যুক্তিবিচার ছিল তাহার অপূর্ব নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য। তৃতীয়তঃ মার্গারেট হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর, ধর্মের নামে স্বামিজী তাহাকেই আহ্বান করিয়াছেন। আর এই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্যই কি মার্গারেট আকুলভাবে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন না?

নব জাগরণ

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল নিউইয়র্ক ত্যাগ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় ইংলণ্ডে আগমন করিলেন। তাঁহার নির্দেশানুযায়ী স্বামী সারদানন্দ পূর্বেই লণ্ডনে আসিয়াছিলেন ও সেণ্ট জর্জেস রোডে ই. টি. স্টার্ডির গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। লণ্ডনের বন্ধু ও অনুরাগীর দল স্বামিজীর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি আসিবামাত্র সর্বত্র উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল। শীঘ্রই স্বামিজী তাঁহার কার্য আরম্ভ করিলেন। মে মাসের প্রথম হইতে ক্লাস খুলিয়া ধারাবাহিকরূপে 'জ্ঞানযোগ' এবং ঐ মাসেরই শেষ হইতে প্রতি রবিবার পিকাডিলি নামক স্থানে 'রয়েল ইন্স্টি-টিউট্ অব পেণ্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স' গ্যালারীতে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতাগুলি অদ্ভুত সাফল্য লাভ করায়, জুন মাসের শেষ হইতে জুলাই মাসের গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রতি রবিবারে প্রিন্সেস হলে বক্তৃতার আয়োজন হয় ; বিষয় 'ভক্তিযোগ', 'ত্যাগ' ও 'প্রত্যক্ষানুভূতি'। উক্ত বক্তৃতাগুলি ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে তিনি পাঁচটি করিয়া ক্লাস করিতেন, এবং প্রতি শুক্রবারের সন্ধ্যাটি রাখিয়াছিলেন প্রশ্নোত্তরের জন্য। নিয়মিত বক্তৃতা ও ক্লাস ছাড়া স্বামিজী ড্রইংরুম, ক্লাব এবং বহু লোকের বাসভবনে বক্তৃতা, আলোচনাদি করেন।

লণ্ডনে এবার প্রথমেই যে সকল পুরাতন অনুরাগী স্বামিজীর চারি-পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন, মার্গারেট নোব্ল তাঁহাদের অন্যতম। তিনি স্বামিজীর উভয় প্রকার ক্লাসেরই নিয়মিত ছাত্রী ছিলেন। স্বামিজী যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার উপর গভীর চিন্তা মার্গারেটের সম্মুখে ক্রমশঃ এক নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত করিতেছিল। স্বামিজীর জ্ঞানের গভীর-তার পরিমাপ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজের জ্ঞানপিপাসু হৃদয় লইয়া তিনি অধীর আবেগে আশা করিতেছিলেন, এইবার তাঁহার সকল প্রশ্নের উত্তর মিলিবে ; সকল সংশয়-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়া সত্যের আলোকে তাঁহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সুতরাং কেবল অনুরাগ-পোষণ নহে, স্বামিজী-প্রচারিত বেদান্ততত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রতি কথায় সংশয় প্রকাশ করিতেন। প্রশ্নোত্তর ক্লাসে চেষ্টা করিতেন যুক্তির চোখা চোখা বাণগুলি নিক্ষেপ করিয়া স্বামিজীর মতবাদকে বিশ্লেষণ

করিতে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে মার্গারেটের ব্যক্তিত্ব স্বভাবতঃই স্বামিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনিও বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। বেদান্ততত্ত্ব গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিবার জন্য ইতিপূর্বে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী তিনি লাভ করিয়াছেন, এই তরুণী ঠিক তাহাদের পর্যায়ভুক্ত নহে। ইহার চোখেমুখে প্রতিভার ব্যঞ্জনা, চালচলনে গাম্ভীর্যের সহিত তীব্র উৎসাহ, যে কোন গূঢ়তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার মত মনীষা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামিজীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, অতীন্দ্রিয় সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য প্রচণ্ড ব্যাকুলতার সহিত এক মহান্ আদর্শের বেদীমূলে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এই তরুণীকে অপর সকল হইতে পৃথক করিয়াছে। আর দশ-জনের মত চিরাচরিত সামাজিক জীবন যাপনের সহিত চরম সত্য সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য পোষণ, এবং তাহার নিবৃত্তির জন্য চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দের অনুসরণ, মার্গারেটের জন্য নহে। কেবল শোনা অথবা চিন্তা করা নয়, আদর্শকে বাস্তবজীবনে রূপদান করিতে সে অধীর। স্বামিজীর অতীত জীবনের সহিত ইহার কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে।

মার্গারেট যে স্বামিজীর মতগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করিবার একান্ত বিরোধী, তাহা ক্লাসের কাহারও নিকট অজ্ঞাত ছিল না। বহুদিন পরে এই কথা উল্লেখ করিয়া স্বামিজীর একজন শিষ্য নিজের সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি কিন্তু বরাবরই স্বামিজীর সকল কথা মানিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বামিজী সে সময়ে ঐ কথায় মনোযোগ না দিয়া পরে একান্তে মার্গারেটকে বলিয়াছিলেন, 'আমি দীর্ঘ ছ বছর ধরে আমার গুরুদেবের সঙ্গে লড়াই করেছি, ফলে আমার পথের খুঁটিনাটি আমার নখদর্পণে। সুতরাং তুমি দুঃখ করো না যে, তোমাকে বোঝাবার জন্য কাউকে বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়েছে।'

বস্তুতঃ, মার্গারেটের সংশয়-প্রকাশ, যুক্তির তীব্রতা ও নির্বিচারে সকল কথা মানিয়া লওয়ার অক্ষমতা স্বামিজীকে বিচলিত করে নাই। সত্যের যথার্থ পূজারী যে, সে সত্যকে যাচাইয়া লইবেই। স্বামিজী নিজেও কি তাহাই করেন নাই? দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি কি তাঁহার গুরুর অপ্রাকৃত জ্ঞানের উপলব্ধিকে অস্বীকার করেন নাই? তাঁহার নিরন্তর ভাবমুখে অবস্থিতিকে মাথার খেয়াল অথবা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন নাই? স্বামিজী জানিতেন, মার্গারেটের দ্বিধা, সতর্কতা, সংশয়—সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে জ্ঞানরাজ্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করিবার তীব্র ব্যাকুলতা।

স্বামিজীর দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আগমনের পর মার্গারেটের অন্তররাজ্যে প্রবল আলোড়ন শুরু হইয়াছিল। তাঁহার সকল কথার প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করা সত্যই কঠিন ছিল। বিশেষতঃ, শৈশবের সরল ধর্মের প্রতি আস্থা হারাইলেও কতকগুলি আদর্শকে মার্গারেট নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ; স্বামিজী সেগুলিই এক এক করিয়া চূর্ণ করিলেন। অন্ততঃ 'পরোপকার' শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মার্গারেটের ধারণা ছিল। স্বামিজী বলিলেন, 'ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ, পরে বিদ্যাদান, আর যে কোন প্রকারের দৈহিক বা জাগতিক দান সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের।' বহু পরে মার্গারেটের নিকট ইঁহার প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। 'বিশুদ্ধ বায়ু আবশ্যক, এবং আশেপাশের বসতিসমূহ যেন স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়', এই নীতির প্রতি পাশ্চাত্যদেশে যে অত্যাধিক আগ্রহ প্রকাশ—যেন ঐগুলিই সাধুত্বের অন্যতম লক্ষণ—তাহার বিরুদ্ধে স্বামিজী কঠোর শিক্ষা দিলেন, 'জগতের প্রতি উদাসীন হও।' প্রত্যেক উক্তিটি অভিনব। মার্গারেট হতাশ হইয়া পড়েন—এই শিক্ষার রহস্য কি তিনি কোনদিন ভেদ করিতে পারিবেন ? যে সকল অসাধারণ পুরুষ কুশলতার সহিত সাংসারিক সকল কার্যের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতি মার্গারেটের যে শ্রদ্ধা ছিল তাহারও পরিণতি ঐরূপ ঘটিল। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে স্বামিজী ঘোষণা করিলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় সাংসারিকতার স্থান নাই (spirituality cannot tolerate the world) ৷' মার্গারেট ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করিলেন, জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা পরিবর্তন করিবার সময় আসিয়াছে।

স্বামিজী একদিন বলিলেন, 'ইংরেজরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, আর সর্বদা তাদের চেষ্টা দ্বীপেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।' এই উক্তির সত্যতা মার্গারেট পরে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তাঁহার আদর্শগুলি কতদূর সঙ্কীর্ণ ছিল।

ধীরে ধীরে তাঁহার চিন্তাজগতে বিপুল পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। 'সত্যকে সজীব করিয়া তোলে চরিত্র, সর্বপ্রকার সাহায্যের সফলতা নির্ভর করে প্রেমের উপর, কোন বাক্যের পিছনে চিত্তের যতটা একাগ্রতা তাহাই বাক্যটিকে শক্তি প্রদান করে।' পরীক্ষা দ্বারা মার্গারেট এই তত্ত্বটির সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। আর স্বয়ং স্বামিজীর মধ্য দিয়াই কি এই তত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হয় নাই! মার্গারেট বুঝিলেন, এতদিন পরে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ তিনি পাইয়াছেন, যিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শী। যুক্তি

এবং তর্ক প্রয়োগ করিলেও মার্গারেট স্থির করিলেন, স্বামিজীর মতবাদ আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন।

অবশ্য প্রথম শ্রোতার পক্ষে বেদান্ততত্ত্ব আয়ত্ত করা কঠিন। বিশেষতঃ মার্গারেট দেখিলেন, কয়েকটি তথ্য পাশ্চাত্য চিন্তাধারার নিকট সম্পূর্ণ বিজাতীয়, ফলে বহু সময় বিরাগ সঞ্চার করে। যেমন 'পুনর্জন্ম' শব্দটি তাঁহার দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হইল। সেইরূপ 'অজ্ঞানই পাপ', এই তথ্যও কেবল অপরিজ্ঞাত তাহা নহে, 'পাপ' সম্বন্ধে বেদান্তের সিদ্ধান্তটি খ্রীষ্টান ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে বেদান্তোক্ত মানুষের প্রকৃত স্বরূপ এবং আভাসিক সত্তার মধ্যে যে আপাত-বিরোধ ও তাহার সমাধান, চিন্তাজগতে বোধ করি তাহার স্থান সর্বোচ্চে। কিন্তু এই সকল বাদ দিলে 'সকল ধর্মেই সত্য বিদ্যমান', বেদান্তের এই সমন্বয়-সাধন মার্গারেটের মনে হইল সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তত্ত্ব। যে ধর্ম বিশ্বজনীন উদারতা প্রচার করে এবং শিক্ষা দেয়, 'আমরা সত্য হইতে অধিকতর সত্যে উপনীত হই, মিথ্যা হইতে সত্যে নহে', সেইরূপ একটি ধর্মের ধারণাই তাঁহার নিকট যথেষ্ট। এইরূপ ধর্মই তিনি অন্বেষণ করিতেছিলেন।

মার্গারেট লক্ষ্য করিলেন, বেদান্তের এই সর্বজনীনতা কেবল তাঁহার নিকট নহে, পরন্তু বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। যাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার, তাহারা বিশ্বের যে কোন প্রান্ত হইতে প্রচারিত সত্যকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উন্মুখ। মার্গারেট দেখিলেন, ঐ সকল উদার-হৃদয় ব্যক্তিগণের ধর্ম সম্বন্ধে পুরাতন অভিজ্ঞতা-গুলি বেদান্তের আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আবার যে সকল তত্ত্বপিপাসু গভীর অনুরাগের সহিত রহস্যময় কাব্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে গিয়া কখনও কখনও তাহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার চকিত স্ফুরণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট স্বামিজীর 'সোঽহম্' ধ্বনি যেন চিরপরিচিত, পূর্বে তাহা উচ্চারিত হয় নাই মাত্র।

সর্বোপরি মার্গারেটের মনে হইল, খ্রীষ্টান ধর্ম-নিহিত নিঃস্বার্থ সেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন ও পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য 'মানবের ঐক্য'রূপ মহান্ তত্ত্বেরই প্রয়োজন।

এই সময়ে স্বামিজী যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'মায়া' সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইংরেজী ভাষায় মায়াবাদ ব্যাখ্যা করা এক দুরূহ ব্যাপার, এবং প্রাচ্য দর্শনের সহিত পরিচয় না থাকিলে শ্রোতার পক্ষেও উহার অনুধাবন বিশেষ কঠিন। তথাপি স্বামিজী মায়া সম্বন্ধে তাঁহার

ধারণাগুলি শ্রোতাদের হৃদয়ে দৃঢ়বন্ধ করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মায়াবাদের বাস্তবতা প্রদর্শন ও ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিলেন—

'এই জগৎ যে "ধোঁকার টাটি", ইহাতে যে সুখের লেশমাত্র নাই, কেবল পরিশ্রমই সার, আমরা যে ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, অথচ জানি না ইহাও বলিতে পারি না—ইহা কোন মতবাদ নহে, পরন্তু বস্তুস্থিতির উল্লেখমাত্র। স্বপ্নের মধ্যে অর্ধনিদ্রিত, অর্ধজাগরিত অবস্থায় সঞ্চরণ, সমগ্র জীবন এক অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে যাপন—প্রত্যেকের ইহাই অদৃষ্ট। সমগ্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই এই পরিণতি। আর ইহারই নাম জগৎ।' (The Master as I Saw Him, p. 21)

মায়া অর্থে মার্গারেট বুঝিলেন, সেই চাকিতের ন্যায় প্রকাশমান, এই আছে, এই নাই, অর্ধসত্য, অর্ধমিথ্যা, ইন্দ্রিয়জগতের পিছনে ক্রমাগত অশ্রান্ত-ভাবে ছুটিয়া চলা—যাহাতে চরম নিশ্চয়তা নাই, তৃপ্তিও নাই—ইহারই নাম মায়া। এই সকলের মধ্যে যিনি ওতপ্রোত রহিয়াছেন, তাঁহাকেই মহেশ্বর জানিও—'মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।' মার্গারেটের মনে হইল, পাশ্চাত্যে স্বামিজীর সমগ্র হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যার মূলে এই দুইটি ভাবই মূলতঃ পাশাপাশি বিদ্যমান। অন্যান্য উপদেশ ও ভাবগুলি ইহাদের অনুবর্তী মাত্র। সমগ্র তত্ত্বটির মধ্যে একটি চমৎকার পরম্পরা ও যুক্তি রহিয়াছে। মায়াতে তন্ময় হইয়া থাকার নামই 'বন্ধন', আর এই বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলার নামই 'মুক্তি'। বন্ধন যদি ভাঙ্গিতে চাও, ভোগের অন্বেষণ হইতে বিরত হও। ত্যাগকে জীবনের মূল-মন্ত্ররূপে গ্রহণ কর।

য়ুরোপের বিচারমূলক ধর্মকে স্বামিজী অস্বীকার করেন নাই। জড়বাদী ঠিকই বলে, জগতে মাত্র একটি বস্তুই বিদ্যমান। পার্থক্য কেবল, জড়বাদীর মতে সেই অদ্বিতীয় বস্তু জড়, আর স্বামিজীর মতে তাহাই ঈশ্বর। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি'—হে মানব, তুমিই সেই। লক্ষ্যবস্তুকে ধীরে ধীরে নিকটে আনিতে হয়। যিনি স্বর্গস্থ ঈশ্বর, তিনিই এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর। ঋষিগণ যাহাকে অন্বেষণ করিয়াছেন, সেই আত্মা আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই, হে মানব, তুমিই সেই।

স্বামিজী বলিলেন, 'ধর্মকে পরীক্ষা করিয়া লও ; ধর্মকে এমন রূপ প্রদান কর, যাহা কিছুতেই সত্যকে ভয় করিবে না। ধর্ম ও সত্য এক। মনে রাখিও, আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে, প্রকৃতিই আত্মার জন্য।'

মার্গারেট তন্ময় হইয়া শোনেন। হৃদয়ের অন্তস্তলে অবিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত বহিয়া চলে। সংশয়-কুহেলিকার আবরণ ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে [illegible]।

সত্যরূপ সূর্যের আলোক প্রকাশ পায়। বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির তীক্ষ্ণতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায়। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ এমন করিয়াই হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন করিয়া সকল দ্বন্দ্বের অতীত সেই অনির্বচনীয় সত্তাকে প্রকাশ করেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভেদ ক্রমেই মার্গারেটের নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। দুই বিভিন্ন সুর ; একটি সুর যেন অতি প্রত্যূষে কোন নদীতীর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে—বাঁশীর সুরের মত সুমিষ্ট, কিন্তু উহা জাগতিক অন্যান্য সুমধুর সঙ্গীতের অন্যতম। আর একটি সেই সুর-লহরীই, কিন্তু শ্রোতা ক্রমশঃ তাহার সমীপবর্তী হইয়া অবশেষে এতদূর তন্ময় হইয়া যান যে, তাঁহার সমগ্র সত্তা সেই সুরে বিলীন হইয়া যায়—শ্রোতা পরিণত হন গায়কে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হয় ত্যাগের মাহাত্ম্য। সেই মুক্ত, অপরিসীম, অপ্রতিহত জীবনের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া কপর্দকবিহীন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন এবং দিবারাত্র আত্মনিবেদনের এক প্রবল প্রলোভন, আর তাহারই জন্য সংসার-ত্যাগের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মার্গারেটের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

মার্গারেট অনুভব করিলেন, স্বামিজীর উপদেশগুলি তাঁহার পূর্ব-উপলব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিতর এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করিয়াছে ; পরস্পরবিরুদ্ধরূপে প্রতিভাত ভাবগুলি আজ যেন মনে হয় একই সত্তার বিভিন্ন অংশ। এই নূতন অভিজ্ঞতা এক নূতন তাৎপর্য লইয়া নূতন জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিল ; আর তাহারই ফলে পরাধীন জাতির দুঃখে তাঁহার সদা জাগ্রত সহানুভূতি অতি সহজেই উদ্বুদ্ধ হইল।

প্রস্তুতি

স্বামিজী ইতিমধ্যে ধারাবাহিক ক্লাস করা ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতেন। মিসেস অ্যানি বেশান্তের আমন্ত্রণে তিনি লণ্ডনে তাঁহার এভিনিউ রোডস্থ বাসগৃহে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের কার্যক্রম সম্বন্ধে মার্গারেটেরও ধারণা হয়। একদিন 'সেসেমি ক্লাবে' স্বামিজীর বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শিক্ষা'। মার্গারেট ঐ ক্লাবের সেক্রেটারী। এই উপলক্ষ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামিজীর অভিমত বিশেষ করিয়া জানিবার সুযোগ হইল। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ করিয়া স্বামিজী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষ তৈরী, বর্তমানকালের মত কতকগুলি তথ্য মুখস্থ করানো নহে।' কেবল মার্গারেট কেন, স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার বেদান্তবাদের প্রতি যাঁহারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিবার চেষ্টা করিতেন। সুদূর আমেরিকা হইতে মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড লণ্ডনে ঘরভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন কেবল স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য।

প্রতি শুক্রবারের সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর-ক্লাসগুলিই বিশেষ জমিয়া উঠিত। সকলেই নিঃসঙ্কোচে আপন মতামত ব্যক্ত করিয়া স্বামিজীর কথাগুলি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে প্রশ্ন এবং প্রতিপ্রশ্নের দ্বারা তর্কও ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া উঠিত। প্রশ্নোত্তর-ক্লাসে মার্গারেট ছিলেন অগ্রণী।

একদিন এইরূপ এক ক্লাসে বেশ একচোট বাদ-প্রতিবাদের পর স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'জগতে আজ কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, "ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল।" কে কে যেতে প্রস্তুত?' বলিতে বলিতে স্বামিজী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিতে লাগিলেন, যেন, কাহাকে কাহাকেও তিনি ইঙ্গিত করিতেছেন তাঁহার সহিত যোগদান করিতে। সে বজ্রগম্ভীর আহ্বান মার্গারেটের হৃদয়ে তীব্র আঘাত করিল। মার্গারেটের মনে হইল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইবেন। স্বামিজী আবার বলিলেন, 'কিসের ভয়?' তারপর দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত পুনরায় তাঁহার গম্ভীরকণ্ঠে

উচ্চারিত হইল, 'যদি ঈশ্বর আছেন এ কথা সত্য হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি এ কথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কী?'

ক্লাস শেষ হইয়া গেল। মার্গারেটের কানে কথাগুলি বাজিতে লাগিল, 'যদি এ কথা সত্য হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি এ কথা সত্য না হয়, তবে জীবনেই বা ফল কী?'

ধীরে ধীরে মার্গারেটের হৃদয়ে নূতন জীবন গ্রহণের সংকল্প দৃঢ় হইতে লাগিল। তাঁহার ভাবপ্রবণতা বিচারবুদ্ধি-নিরপেক্ষ ছিল না। সুতরাং সহসা ভাবাবেগে বিচলিত হইয়া কোন সংকল্প স্থির করিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অপর দিকে, নিঃসংশয়ে সত্য এবং আদর্শ বলিয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবার মত মানসিক দৃঢ়তা তাঁহার ছিল। অন্তরে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা দ্বারা মার্গারেট বুঝিয়াছিলেন, অতঃপর জীবনযাত্রায় তাঁহাকে নূতন পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে। স্বামিজীর বজ্র-গম্ভীর আহ্বান দিবারাত্র তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহাকে সর্বস্ব ত্যাগ করিতেই হইবে। হৃদয় যদি ভাঙিয়াও যায়, তথাপি এই আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার নাই। যে নবজীবন তিনি গ্রহণ করিবেন তাহার কি পরিণতি তিনি জানেন না। এই জীবনে কি ধরনের সংগ্রাম তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত। আর যাঁহাকে কর্ণধার করিয়া তিনি সর্বস্ব ত্যাগ ও এই অপরিচিত জীবন বরণ করিতে প্রস্তুত, তিনিই বা কতদূর সাহায্য করিবেন তাহাও মার্গারেটের জানা নাই। লক্ষ্য, পথ, সবই নূতন, অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁহাকে যাইতে হইবে। বস্তুতঃ স্বামিজীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলেও প্রাচ্যের গুরু-শিষ্যের সেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্গারেটের ধারণা তখনও পরিষ্কার এবং দৃঢ় হয় নাই। অপরপক্ষে, স্বামিজীর চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যতখানি জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই যে, স্বামিজী কোন প্রকার ব্যক্তিগত বন্ধন গ্রহণে সম্পূর্ণ অপারগ। যাঁহার কথাবার্তা, চালচলন এবং প্রতি আচরণের মধ্যে সর্ববিধ বন্ধনের বাহিরে চলিয়া যাইবার প্রচেষ্টা নিরন্তর বিদ্যমান, তাঁহার নিকট ব্যক্তিগত বন্ধনের স্থান কোথায়? মার্গারেট তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই, স্বামিজীর প্রতি তাঁহার যে অকপট আনুগত্য, শ্রেষ্ঠ আচার্যের ন্যায় স্বামিজী তাহাও উপেক্ষা করিবেন।

মার্গারেট নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিলেন। যদি তিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, যদি মুক্তিলাভ তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য হয়, তবে

তাহার সন্ধান দিতে পারেন একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ। আর জীবনের সেই শ্রেয়োলাভের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার মূল্য দিবার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' 'ওঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া জীবনের পরমতত্ত্ব অবগত হও।' বহু বৎসর ধরিয়া মার্গারেট যে আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিলেন, আজ সেই আহ্বান আসিয়াছে ; তিনি তাহা উপেক্ষা করিবেন না। তথাপি আশ্চর্য—অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রশ্ন জাগে, স্বামিজীর আহ্বানের যথার্থ স্বরূপ কী?

দিনের পর দিন মার্গারেট অস্থিরচিত্তে কাটাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর যে মহৎ আদর্শের নিকট তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিতে প্রস্তুত, সে আদর্শের সংজ্ঞা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন—যাহাতে সকল বিভ্রান্তি ও যুক্তির অবসান ঘটে।

৭ই জুন স্বামিজী মার্গারেটকে লিখিলেন,

'প্রিয় মিস নোব্‌ল,

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারে—মানুষের নিকট তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি কার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা-নির্ধারণ।

কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ এই সংসার। যে উৎপীড়িত, সে পুরুষ হউক অথবা নারীই হউক, তাহাকে আমি করুণা করি ; আর যে উৎপীড়ক, সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই একটা ধারণা আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সকল দুঃখের মূল অজ্ঞতা, আর কিছু নহে। জগৎকে আলোক দিবে কে? আত্মোৎসর্গই ছিল অতীতের নীতি, এবং হায়! যুগ যুগ ধরিয়া তাহাই চলিতে থাকিবে। যাঁহারা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বরেণ্য, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন।

জগতের ধর্মগুলি আজ প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত। জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজ সেইরূপ লোকদেরই প্রয়োজন, যাহাদের জীবন প্রেম-প্রদীপ্ত, যাহারা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রত্যেক বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। ইহা আর তোমার নিকট কুসংস্কার নহে নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আর ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসিবে। আমরা চাই সাহসপূর্ণ বাণী, আর তাহার অপেক্ষা অধিক সাহসিক কর্ম। হে মহাপ্রাণ, উঠ, জাগো! জগৎ যন্ত্রণায়

দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা আহ্বান করিতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়া না দেন। জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় আর কী আছে, ইহা অপেক্ষা আর কোন্ কাজ মহত্তর? আমার অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত কর্ম-পন্থা আসিয়া পড়িবে। আমি কোন পরিকল্পনা করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়িয়া ওঠে ও কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি জাগো, জাগো। অনন্ত কালের জন্য আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ।'

পত্র পড়া শেষ হইয়া গেল। মার্গারেট স্তব্ধ, অভিভূত। কী সংক্ষেপে অথচ উজ্জ্বলভাবে স্বামিজী তাঁহার আদর্শকে ব্যক্ত করিয়াছেন! লেশমাত্র অস্পষ্টতা নাই। 'হে মহাপ্রাণ, জাগো! জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?' ধর্মের নামে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের নামে, পৃথিবীর সর্ব নরনারীর কল্যাণকামনায় স্বামিজীর সেই বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত আহ্বানে মার্গারেটের সমগ্র সত্তা একান্তভাবে সাড়া দিল। তাঁহার ভিতরকার মহাপ্রাণ সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত বাধাবন্ধন উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ, প্রেম ও করুণার মূর্তি-মান বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হইল।

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে সামান্য উপলক্ষ্যে স্বামিজী মার্গারেটের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয়, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।' সাক্ষাৎ আহ্বান! মার্গারেট ক্রমাগত ভাবিতেছিলেন, স্বামিজীর আহ্বানের যথার্থ প্রকাশ কোন্‌রূপে ঘটিবে। আজ বুঝিলেন, জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। ভাবী জীবনের যে চিত্র অঙ্কনে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করা কষ্ট বোধ হইতেছিল। সেজন্য স্বামিজীর সংকল্পগুলি কী ধরনের তাহা তিনি জানিতেও চাহিলেন না। শুধু অনুমান করিলেন, অনেক জিনিস তাঁহাকে শিখিতে হইবে এবং জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাকে এদিক ওদিক করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সহজ কি এই চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রা, জীবনের সুনির্দিষ্ট গতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এ সকল ত্যাগ করিয়া যাওয়া! যে আহ্বানের জন্য তিনি এতদিন অতন্দ্রনেত্রে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কে জানিত সত্যের সেই আহ্বান এত কঠোর! এক দিকে হৃদয়ের সমস্ত দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া আত্মা অবারিত পথে চলিবার জন্য ব্যাকুল, অপর দিকে সে ঐ বন্ধনগুলিকেই মমতার সহিত লালন করিতে চায়। মুক্তি ও বন্ধনের পরস্পরের প্রতি অভিযান!

অধিক পরিশ্রমে স্বামিজী পরিশ্রান্ত বোধ করিতেছিলেন। সুতরাং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিস মুলারের আমন্ত্রণে জুলাই মাসের মাঝামাঝি তিনি সুইজারল্যান্ড এবং য়ুরোপের অন্যান্য স্থানগুলিতে বেড়াইতে গেলেন। সেপ্টেম্বরে স্বামিজী লন্ডন প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন মিঃ সেভিয়ারের হ্যাম্পস্টেডের বাড়িতে এবং পরে রিজওয়ে গার্ডেনসে মিস মুলারের এয়ারলি লজে অবস্থান করেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর অদ্বৈত ব্যাখ্যা এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা লন্ডনের বিদ্বৎসমাজকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত বহু ধর্মযাজকের উপরেও বেদান্ত-মতবাদের প্রভাব বিশেষরূপে পড়িয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যে কয়জন শুধু বক্তৃতায় যোগদান না করিয়া স্বামিজীর প্রচারিত তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং বাস্তবজীবনে উহাকে রূপায়িত করিবার আগ্রহ বোধ করিতেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। মিস হেন্‌রিয়েটা মুলার, মিস মার্গারেট নোব্‌ল, মিঃ ই. টি. স্টার্ডি, মিঃ গুডউইন্‌ এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার ইঁহাদের মধ্যে প্রধান। স্বামিজীর নিকট ইঁহারা সকলেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। মিস মুলার প্রভূত সম্পদের অধিকারিণী, স্বামিজীর সহিত ভারতে গমন করিয়া তাঁহার কার্যে জীবন ও সম্পত্তি সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। সেভিয়ার দম্পতি স্থির করিয়াছেন, স্বামিজীর সহিত ভারতে গমন করিয়া হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে একটি আশ্রম স্থাপন করিবেন এবং তথায় অবশিষ্ট জীবন তপশ্চর্যায় অতিবাহিত্‌ করিবেন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি স্বামিজী স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। ভাবী সংঘের কল্পনা ইতিমধ্যে তাঁহার মনে নির্দিষ্ট আকার লইতেছিল। সন্ন্যাসীরূপে আদর্শ প্রচার করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য ; কিন্তু যুগাচার্যরূপে তাঁহার মন সঙ্গে সঙ্গে আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার সুস্পষ্ট পন্থা অনুসন্ধান করিতেছিল।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বামিজীর মনে সংঘগঠনের সংকল্প পরিস্ফুট ও দৃঢ় হয়। আদর্শের কেবল প্রচার নহে, প্রতিষ্ঠাও প্রয়োজন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত এক পত্রে সংঘ সম্বন্ধে তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৭)। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আগমনের পর স্বামী সারদানন্দের নিকট দেশের সবিশেষ সংবাদ পাইয়া তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে মঠ সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়া পত্র লেখেন (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮২)। ভারতের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধেও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। স্বভাবতঃই পাশ্চাত্যদেশ ও ভারতের কার্যপ্রণালী পৃথক হইবে। জাগতিক

অভ্যুদয়ের কেন্দ্রীভূত পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল বেদান্তপ্রচারের। দারিদ্র্য ও কুসংস্কারে নিমগ্ন ভারতে আবশ্যক ছিল 'কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ'। এই কার্যে তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণ সাহায্য করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য প্রধানতঃ পুরুষ-জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। নারীগণের মধ্যে কে এই কার্যভার গ্রহণ করিবে? মার্গারেট কেবল ভাবুক এবং চিন্তাশীল নহেন, উৎসাহী কর্মীও বটে। স্বামিজীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে চিনিতে ভুল করে নাই। মার্গারেটের অন্তররাজ্যের বিপুল পরিবর্তন ও আদর্শকে জীবনে লাভ করিবার মহৎ আকাঙ্ক্ষা স্বামিজীর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। 'নারীজাতির অভ্যুদয় ব্যতীত জগতের কল্যাণ সম্ভব নহে', এবং সেই কার্যে মার্গারেট হইবেন তাঁহার প্রধান সহায়।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের কার্যে স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে নিযুক্ত করিয়া স্বামিজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল, সেভিয়ার দম্পতি এবং সেক্রেটারীরূপে জে. জে. গুডউইন্ স্বামিজীর সঙ্গেই যাইবেন; মিস মুলার এক সঙ্গিনী, মিস বেল সহ কিছুদিন পরে যাত্রা করিবেন।

মার্গারেট ইতিমধ্যে মন স্থির করিয়াছেন। স্বামিজীর সহিত এখনই চলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংসারের সকল দায়িত্ব তাঁহার উপর; তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। হয়তো পর বৎসর তিনি যাইতে পারিবেন; কিন্তু স্বামিজীকে জানাইয়া রাখা প্রয়োজন যে, মার্গারেট তাঁহার কার্যে নিজেকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। মিস মুলারের সহিত মার্গারেটের সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। তিনিও মার্গারেটকে অনুরোধ করিতেছিলেন তাঁহার সহিত ভারতে যাইবার জন্য। ইচ্ছা দুজনে একত্র কার্য করিবেন। সঙ্কোচবশতঃ, অথবা যে কারণেই হউক, মার্গারেট তখনও স্বামিজীকে তাঁহার সংকল্পের কথা খুলিয়া বলেন নাই। অবশেষে এক সন্ধ্যায় স্বামিজীর সহিত তিনি যখন মিস মুলারের বাসভবনে আগমন করিলেন, তখন মিস মুলার তাঁহার অনুরোধে স্বামিজীকে জানাইলেন, মার্গারেট তাঁহার কার্যে যোগদান করিতে দৃঢ়সংকল্প। স্বামিজী কিছু বিস্মিত হইলেন। মার্গারেট নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না; কিন্তু তিনি যে ইতিমধ্যে সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা জানিতেন না। মার্গারেটের ত্যাগ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। ধীরে ধীরে স্বামিজী বলিলেন, 'আমার কথা

বলতে গেলে, আমি স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে যে কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, তা সম্পন্ন করবার জন্য প্রয়োজন হলে দু'শ'বার জন্মগ্রহণ করব।'

কী গভীর অনুরাগ স্বদেশের প্রতি! ইহা কেবল ভাবুকতার উচ্ছ্বাস নহে, আবেগবশতঃ দেশের কয়েকটি সংস্কারসাধনের ইচ্ছাও নহে। নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া তিনি স্বদেশের আমূল পরিবর্তন সাধনে বদ্ধপরিকর। এক জন্মে না হইলে শত শত জন্মে সে উদ্দেশ্যসাধনে প্রস্তুত।

১৬ই ডিসেম্বর স্বামিজীর যাত্রা স্থির হইল। ১৩ই ডিসেম্বর, রবিবার, পিকাডিলিতে 'রয়েল সোসাইটি অব পেন্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স'এ তাঁহার বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন হইল। প্রায় পাঁচ শত শ্রোতার সমাগমে সভাগৃহ পূর্ণ। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। সকলের অন্তর বেদনায় রুদ্ধ। অনেকেরই চক্ষু সজল। ইংরেজজাতি মনোভাব-প্রকাশের বিরোধী। এই তরুণ সন্ন্যাসী কেবল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা নহে, তাঁহার অপূর্ব মানবপ্রেমের দ্বারাই সকলের চিত্ত জয় করিয়াছেন। তাঁহার উদার বাণী সকলের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছে প্রেম ও শান্তি।

সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করা হইলে স্বামিজী গম্ভীর, স্নেহ-পূর্ণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন। সমবেত জনতার মধ্য দিয়া যাইবার সময় আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'হাঁ, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়।'

আহ্বান

স্বামিজী ভারতবর্ষে চলিয়া গেলে ইংলণ্ডের কার্যভার গ্রহণ করিলেন স্বামী অভেদানন্দ। ইংলণ্ডে স্বামিজীর বেদান্তপ্রচারকার্যে মিঃ ই. টি. স্টার্ডি ছিলেন সর্বপ্রধান উদ্যোগী ; এখন ক্রমে ক্রমে মার্গারেট তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী স্বামিজী কলম্বো পদার্পণ করেন। সেই মুহূর্ত হইতে ভারতের সর্বত্র তিনি যে সাদর-অভ্যর্থনা লাভ করেন তাহা অভাবনীয়। কপর্দকশূন্য, পরিচয়পত্রহীন সন্ন্যাসীর পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচার তাঁহার স্বদেশকর্তৃক সমর্থিত নহে, এই অপপ্রচার বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। স্বদেশের সর্বত্র বিরাট সংবর্ধনা ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিপুল অভিনন্দন পাশ্চাত্যবাসীদিগকে বিস্মিত করিল। মাদ্রাজ হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে স্বামিজী কলিকাতায় আগমন করিলেন। মঠ তখন আলম-বাজারে। ভারতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত, মঠকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চিন্তা তাঁহার হৃদয় বিশেষ অধিকার করিয়াছিল। মিসেস বুল ইতিপূর্বে মঠ-প্রতিষ্ঠার কার্যে তাঁহাকে যে অর্থসাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, স্বামিজী তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর কর্মপন্থা নির্ণয় করা। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তিনি আলমবাজার মঠ হইতে মিসেস বুলকে লিখিলেন, কলিকাতায় ও মাদ্রাজে দুইটি কেন্দ্র খুলিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প। ঐ পত্রেই লেখেন, 'সন্ন্যাসীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইলে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে।'

মেয়েদের জন্য যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি উৎসুক ছিলেন, তাহার পরিচালনার জন্য মার্গারেটের কথা মনে হওয়া বিশেষ স্বাভাবিক। ভারতের কোন নারী যদি এই কার্যে জীবন উৎসর্গ করেন, স্বামিজী তাহার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকা-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা ঘোষালকে লিখিত স্বামিজীর ৬ই ও ২৪শে এপ্রিলের পত্র দুইখানি হইতে জানা যায়, এই বিদুষী ও স্বদেশের কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী মহিলার উপর স্বামিজী কতদূর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। অকপট উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও

স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।' কত আশা লইয়া ঐ পত্র দুইখানিতে স্বামিজী ভারতের বর্তমান অবনতি, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় এবং ঐ কার্যে নারী-জাগরণের আবশ্যকতা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। 'কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার এবং ঐ উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান শহরগুলিতে কেন্দ্র স্থাপন—কেবল পুরুষগণের জন্য নহে, নারীগণের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা অতীব কঠিন। এই উদ্দেশ্যসাধনে অর্থ কোথা হইতে আসিবে? ধর্মবলে পাশ্চাত্য বিজয় করিলে পাশ্চাত্য হইতেই অর্থ সংগৃহীত হইবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না?' স্বামিজীর আশা পূর্ণ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত নরনারীর দুঃখ বেদনায় অধীর স্বামী বিবেকানন্দের মর্মস্পর্শী আবেদন কোন ভারতীয় নারীকে নয়, বিদেশিনী মার্গারেটকে সর্বস্বত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তদিগকে একত্র করিয়া বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর গৃহে এক সভা আহবান করিলেন। সভায় স্বামিজী সংঘ-গঠনের আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামানুসারে সংঘের নামকরণ হইল। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল। সংঘের উদ্দেশ্য ও আদর্শ লোকসাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা তাহারও পূর্বে। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথের হস্তে ত্যাগী সন্তানগণের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং সে মঠের পত্তন করিয়া যান। পরে বরাহনগরে ও আলমবাজারে তাহার সম্প্রসারণ ঘটে। যে মহাপুরুষগণ পরবর্তী কালে অনন্ত করুণা, প্রেম ও আশীর্বাদ লইয়া মানবসমাজের কল্যাণার্থে তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন, নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহাদের অলৌকিক তপস্যা, ধ্যান-ধারণা, তিতিক্ষা—কোনটাই অপরিকল্পিত নহে। প্রস্তুতির কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ এখন কুশলী নেতা রূপে সকলকে সংঘবদ্ধ করিয়া সমগ্র শক্তিকে সুসংহত করিলেন। বুদ্ধযুগের পর এই প্রথম ভারতবর্ষে এমন এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সংগঠিত হইল, যাহার উদ্দেশ্য 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আত্মনিবেদন।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার চার দিন পরে, ৫ই মে মার্গারেটের পত্রের উত্তরে স্বামিজী তাঁহাকে ভারতের কার্যের আরম্ভ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া নানা

কথার পর লিখিলেন, 'এ পর্যন্ত তো কেবল কাজের কথা গেল। এখন তোমার নিজের কথা পাড়িতেছি। প্রিয় মিস নোব্‌ল, তোমার যে মমতা, ভক্তি, বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা আছে, উহাতেই কেহ জীবনে যত পরিশ্রমই করিয়া থাকুক্‌, তাহার শতগুণ প্রতিদান হইয়া যায়। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল হউক। আমার মাতৃভাষায় বলিতে গেলে, আমার সারাজীবন তোমারই সেবায় অর্পিত।'

স্বামিজীর প্রায় প্রতি পত্রেই ভারতবর্ষের কার্যের ধরন এবং বিবরণ থাকিত। মার্গারেট যে ভারতের একজন ভবিষ্যৎ কর্মী ; তাই তাঁহার একান্ত প্রয়োজন বিস্তৃত খবরের। সেভিয়ার দম্পতি নিভৃতে হিমালয়ের ক্রোড়ে শান্তিপূর্ণ আশ্রমজীবন যাপন করিবেন ; কিন্তু মার্গারেটকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে অজ্ঞ জনসাধারণের সেবায়। সেই আদর্শ লইয়াই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত—কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ।

পত্রের মাধ্যমে স্বামিজী ভারত এবং তাঁহার কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে মার্গা-রেটের একটা ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন।

'কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। একটি পুরাতন, জরাজীর্ণ বাড়ি ছ সাত শিলিংএ ভাড়া লওয়া হইয়াছে। এবং তাহাতেই প্রায় ২৪ জন যুবক শিক্ষা-লাভ করিতেছে।

'...আমি নিজেও যে ভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই গাছতলা আশ্রয় করিয়া এবং কোন প্রকারে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া কাজ শুরু করিয়া দিয়াছি। আমার কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠাইয়াছি। ইহাতে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হইয়াছে। আমার চিরকালের ধারণা—আর এখন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে, কেবল হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জগতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারা যায়। সুতরাং বর্তমান পরিকল্পনা হইতেছে বহুসংখ্যক যুবককে গড়িয়া তোলা।...জনকয়েক ছেলে ইতিমধ্যেই শিক্ষা পাইতেছে। কিন্তু কার্যের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা বিগত ভূমিকম্পে ভাঙিয়া গিয়াছে ; তবে ইহাই রক্ষা যে ওটি ভাড়া-বাড়ি ছিল। যাহা হউক, ভাবিবার কিছু নাই ; বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে।...এ পর্যন্ত আমাদের সম্বল কেবল মুণ্ডিত মস্তক, ছিন্ন বস্ত্র ও অনিশ্চিত আহার। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আবশ্যক, এবং পরিবর্তন হইবেও নিশ্চয় ; কারণ আমরা মনে প্রাণে এই কার্যে লাগিয়াছি' (২০শে জুন, ১৮৯৭)।

স্বামিজীর এই সময়কার পত্রগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, পাশ্চাত্য-

দেশের অন্যান্য বন্ধুগণকে লিখিত চিঠিগুলির সুর হইতে মার্গারেটকে লিখিত চিঠির সুর সম্পূর্ণ পৃথক।

মিশনের কলিকাতা বিভাগের সভাপতি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনিই লণ্ডনে নিয়মিত মিশনের কার্যবিবরণী পাঠাইতেন। মিশনের কার্য সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মার্গারেট স্বামী ব্রহ্মানন্দকে যে প্রশ্নগুলি করেন, স্বামিজীই তাহার উত্তর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়া পাঠান (৩০।৯।৯৭)। ঐ পত্রে কতগুলি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, উপস্থিত কার্য-ধারা কিরূপ, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী রূপে গৃহীত যুবকগণের কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর ছিল। প্রশ্নগুলি উত্থাপনের দুইটি কারণ ছিল। প্রথম, পরিকল্পনা-বিহীন কোন কার্যে পাশ্চাত্যবাসীর আস্থা নাই; দ্বিতীয়, মার্গারেটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, লণ্ডনের বেদান্ত সমিতিতে মিশনের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা, যাহাতে সদস্যগণ ভারত সম্বন্ধে অনুকূল ও উদার মত পোষণ করিতে পারেন।

লণ্ডনে বেদান্তপ্রচার কার্যে স্বামী অভেদানন্দকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন মার্গারেট। উইম্বল্‌ডনেও তিনি একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। নিয়মিতভাবে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় তিনি বেদান্ত-প্রচারের সংবাদ পাঠাইতেন। ক্লাসগুলির পরিচালনা করিতেন স্বামী অভেদানন্দ। গ্রীষ্মকাল আসিলে ক্লাস বন্ধ হইয়া গেল। মার্গারেট লিখিলেন, 'ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, বেদান্ত আমাদের নিকট লুপ্ত। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা, এই ক্ষণ-বিরতি, বিশ্বাস বৃদ্ধির পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহায়ক। প্রথম শ্রোতার নিকট বেদান্ত-দর্শন এত বিরাট ও নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, সহজে উহা ধারণা করা যায় না। উহার জন্য প্রয়োজন অবসর ও নির্জন পরিবেশ। কিন্তু ভাগ্যের বিধান এইরূপ যে, কোথায় আমরা জনশূন্য-স্থানে গিয়া ঐ সকল অনুসন্ধান করিব, না তৎপরিবর্তে আমাদের শিক্ষক-গণই অজ্ঞানের সহিত আমাদিগকে লড়াই করিতে দিয়া দূরে চলিয়া যাইবেন।'

মিঃ স্টার্ডির সহিত স্বামী অভেদানন্দের নানা কারণে মনোমালিন্য ঘটিতেছিল; সুতরাং লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় গমন করেন। তিনি চলিয়া গেলে লণ্ডনের বেদান্তকার্য সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল। একই কারণে গ্রীষ্মাবকাশের পর উইম্বল্‌ডনেও পুনরায় বেদান্ত-চর্চার ব্যবস্থা সম্ভব হইল না। কিন্তু মার্গারেটের উৎসাহের অন্ত ছিল না। যাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ, তাঁহাদের লইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে সম্মিলন এবং ঐ সকল সম্মিলনে পাঠ ও আলোচনাদির ব্যবস্থা করিলেন। ঐ প্রকার

সম্মিলনে সর্বপ্রথম আলমবাজার মঠ হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক প্রেরিত রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী পড়া হয়। মার্গারেট লিখিলেন, 'এই বিবরণী ছাপাইয়া লণ্ডন এবং আমেরিকার বন্ধুবর্গের নিকট বিতরণ করা হইবে।... যাঁহারা এই চিত্তাকর্ষক এবং সম্পূর্ণ বিবরণটি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ভারতীয় ভ্রাতৃগণের সহিত যথার্থ সংযোগ-স্থাপনের নিমিত্ত আমরা এক বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি। রামকৃষ্ণ মিশন একটি ভাব বা আদর্শ। আমাদের নিকট এই মিশনের আবেদন কেবল যে মহাপুরুষের নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে, এবং যাঁহাকে ইংলণ্ডের অধিবাসী অনেকেই হৃদয়ের ভালবাসা দিতে শিখিয়াছে, তাঁহার প্রতি সম্মানার্থে নহে ; পরন্তু ইহার লক্ষ্য এবং উপায় উভয়ই আমাদের প্রকৃতির পরিপোষক অথবা অনুকূল বলিয়াই। জড়বাদী পাশ্চাত্য প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের বিরুদ্ধে যে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উত্থাপন করিতে চাহে, এই মিশন এবং আলমবাজার দুর্ভিক্ষের কার্যবিবরণী উহার চমৎকার প্রতিবাদ।'

ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় মার্গারেটের লিখিত প্রবন্ধগুলি প্রমাণ করে যে, কেবল বক্তৃতা ও আলোচনাদি দ্বারা বিদ্বৎসমাজে বেদান্ত প্রচার করিয়াই মার্গারেট নিরস্ত হন নাই, নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কার্যের প্রতি সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেও তিনি যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন। মিঃ স্টার্ডি ব্যতীত, মিঃ এরিক হ্যামণ্ড ও মিসেস অ্যাস্টন জনসন মার্গারেটের কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন।

কিন্তু মার্গারেটের মন পড়িয়াছিল ভারতবর্ষে। উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই তিনি যাত্রা করিবেন। স্বামিজীর বিভিন্ন পত্রে মার্গারেটের অকপট প্রশংসা থাকিত। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন, উৎসাহ দিয়া কর্মের প্রেরণা যোগাইতেন। যেমন, 'তোমাকে অকপটভাবে জানাইতেছি যে, তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার নিকট মূল্যবান এবং প্রত্যেকটি চিঠি বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। যখনই ইচ্ছা ও সুযোগ হইবে, তখনই তুমি নিঃসঙ্কোচে লিখিও, এবং জানিয়া রাখ, তোমার একটি কথাও ভুল বুঝিব না, একটি কথাও উপেক্ষা করিব না' (২০শে জুন, ১৮৯৭)।

'আশ্চর্যের কথা, আজকাল আমার উপর ইংলণ্ড হইতে ভাল, মন্দ উভয় প্রকার প্রভাবেরই ক্রিয়া চলিয়াছে ; প্রত্যুত, তোমার চিঠিগুলি উৎসাহ ও আলোকপূর্ণ, এবং আমার হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার করে। আমার হৃদয়ও এখন ইহার জন্য লালায়িত। প্রভুই জানেন।

'...আমি তোমাদের সমিতির কার্যপ্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ একমত ; এবং

ভবিষ্যতে তুমি যাহাই কর না কেন, ধরিয়া লইতে পার যে, তাহাতে আমার সম্মতি থাকিবে। তোমার ক্ষমতা ও সহানুভূতির উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ইতিমধ্যেই আমি তোমার নিকট অশেষ ঋণে বদ্ধ হইয়াছি, এবং প্রতিদিন তুমি ঐ ঋণভার বাড়াইয়া যাইতেছ। সান্ত্বনা এই যে, এ-সকলই পরের জন্য' (৪ঠা জুলাই, ১৮৯৭)।

সম্ভবতঃ স্বামিজীর কোন পত্রেই ভারতযাত্রার নির্দেশ না থাকায় মার্গারেট হতাশ হইয়া অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে স্বামিজী লিখিলেন,

'কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এবং বর্তমানে দুর্ভিক্ষ নিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং কাজ চলিতেছে—দুর্ভিক্ষ-সেবা, প্রচার এবং সামান্য শিক্ষাদান। এখন পর্যন্ত অবশ্য খুব সামান্যভাবেই চলিতেছে; যে সব ছেলেরা শিক্ষাধীন আছে তাহাদিগকে সুবিধামত কাজে লাগানো হইতেছে।...আগামী সপ্তাহ হইতে তোমাকে সমস্ত কাজের একটি করিয়া মাসিক বিবৃতি পাঠান হইবে।

'...তুমি এখানে না আসিয়া ইংলণ্ড হইতেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করিতে পারিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন' (২৩শে জুলাই, ১৮৯৭)।

চিঠি পড়িয়া মার্গারেট হতাশ হইলেন। যে সময় তিনি পূর্ণ উৎসাহ লইয়া অধীরভাবে ভারতযাত্রার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন, সেই সময় স্বামিজীর এই প্রস্তাব তাঁহাকে আহত করিল। মার্গারেটের চরিত্রে কেবল তেজই ছিল না; ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাসের সহিত দৃঢ়-প্রত্যয়। বিশেষতঃ তাঁহার অসহিষ্ণু প্রকৃতি মনোমত পথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। স্বামিজী তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন তাঁহার স্বদেশের নারীগণের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য; স্থির ছিল, ভারতে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই তিনি যাইবেন। অথচ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর স্বামিজী সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই; উপরন্তু লিখিলেন, 'তুমি এখানে না আসিয়া ইংলণ্ড হইতেই আমাদের জন্য অধিক কার্য করিতে পারিবে।'

নানারূপ অভিজ্ঞতা হইতে স্বামিজীর ধারণা হয়, যে কোন পাশ্চাত্য-বাসীর পক্ষে ভারতে কার্য করা কঠিন। ইহার কারণ—ভারতের উষ্ণ জলবায়ু, য়ুরোপীয় ধরনে জীবযাত্রার অসুবিধা এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অনন্ত সম্ভাবনা। সেভিয়ার দম্পতি আলমোড়ায় যে আশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী, তাহা আদর্শের দিক হইতে উচ্চ হইলেও উহা ভারতের

জনসাধারণের জন্য নয়। গুড্‌উইন মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত কাজ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে নানা বাধা-বিপত্তি তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল। সুতরাং স্বামিজী ভাবিতেছিলেন, ইংলণ্ডেই মার্গারেট তাঁহার আদর্শ-প্রচার-কার্যে অধিক সাহায্য করিতে পারিবেন। বাগ্মিতা ও লেখনীর সাহায্যে তিনি ইংলণ্ডের জনগণকে ভারতের প্রকৃত অনুরাগী বন্ধুতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন। সর্বোপরি, ভারতের জন্য অর্থ সাহায্য করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব।

মার্গারেটের এ কথা মনোমত হয় নাই। যেদিন হইতে তিনি স্থির করিয়াছেন ভারতে গমন করিয়া স্বামিজীর কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন, সেইদিন হইতে তাঁহার জাগ্রত চিত্তে একটি মাত্র চিন্তা—কবে ভারত যাইবেন! তাঁহার চরিত্রে ছিল সকল বাধা-বিপত্তির প্রতিকূলে কার্য করিবার অনন্ত ক্ষমতা। দুর্দমনীয় শক্তির প্রকাশই তাঁহার চরিত্রকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল। যে সকল অবস্থা সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীকে হতাশ হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিত, মার্গারেটের নিকট সেগুলিই অদম্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবার প্রেরণাদায়ক। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে ভারতের জন্য কার্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মার্গারেট ভারতে আসিতে কৃতসঙ্কল্প, একথা তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ অবগত ছিলেন। মিঃ স্টার্ডি ও মিস মুলারের পত্রে স্বামিজী জানিতে পারিলেন, মার্গারেট ভারতে আসিয়া মিস মুলারের সহিত একসঙ্গে কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মিস মুলার ইতিমধ্যে ভারতে আগমন করিয়া আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অর্থ সাহায্য করিতে পারেন, এবং অর্থের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু স্বামিজীর দূর-দৃষ্টিতে মিস মুলারের অব্যবস্থিত চিত্ত এবং তাঁহার নেত্রীসুলভ অহমিকা শীঘ্রই ধরা পড়িয়াছিল।

ক্রমে মার্গারেট সম্বন্ধে স্বামিজী মত পরিবর্তন করিলেন। তাঁহার মনে হইল. ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেকে উৎসর্গ করিবার এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দমন করা যুক্তিযুক্ত নহে। মিস মুলার সম্বন্ধেও মার্গারেটকে সতর্ক করা প্রয়োজন। অন্তর হইতে স্বাগত জানাইয়া স্বামিজী লিখিলেন, 'তোমাকে অকপটভাবে বলিতেছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভারতের কার্যে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হইবে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর—একজন

প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করিতে পারিতেছে না, তাই অন্য জাতি হইতে তাহাকে ধার করিতে হইবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারী-রূপে গঠন করিয়াছে।

'কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কীদৃশ, তাহা তুমি ধারণা করিতে পার না। এদেশে আসিবার পর তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইবে। তাহাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; তাহারা শ্বেতাঙ্গদিগকে, ভয়েই হউক বা ঘৃণায় হউক, এড়াইয়া চলে, এবং তাহারাও ইহাদিগকে তীব্র ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে ছিটগ্রস্ত মনে করিবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখিবে।...যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।

'কর্মে ঝাঁপ দিবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করিও, এবং কর্মান্তে যদি বিফল হও, কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক হইতে নিশ্চয় জানিও যে, আমি আমরণ তোমাকে সাহায্য করিব—তা তুমি ভারত-বর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরিয়াই থাক। "মরদ্‌কী বাত হাথীকে দাঁত"—একবার বাহির হইলে আর ভিতরে যায় না।

'...তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, মিস মূলার কিংবা অন্য কাহারও আশ্রয় লইলে চলিবে না।

'...অনন্ত ভালবাসা জানিবে' (২৯শে জুলাই, ১৮৯৭)।

এই পত্রে স্বামিজী এক দিকে যেমন মার্গারেটকে সাদর আহ্বান জানাইয়া তাঁহার ত্যাগের ভাবটিকে উচ্চ প্রশংসা দ্বারা যথার্থ সম্মান দিলেন, অপর দিকে তেমনি সংক্ষেপে এদেশে কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হইবে, তাহারও আভাস দিলেন। মার্গারেটকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, এবং সর্বোপরি আশ্বাস দিলেন, আমরণ তিনি সাহায্য করিবেন।

১৮৯৬ খৃীষ্টাব্দের ৭ই জুনের পত্রে স্বামিজী আবেগভরে মার্গারেটের যে অন্তর্দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, ১৮৯৭ খৃীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই সেই জাগ্রত অন্তর্দেবতাকেই তিনি স্বাগত জানাইলেন। ২৯শে জুলাইএর পত্র ৭ই জুনের পত্রের পরিণতি।

মার্গারেট প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রত্যাদেশ আসিয়াছে; অনিশ্চয়তার অবসান। এখন কেবল ভাবী জীবনের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করিয়া তোলা।

কিন্তু স্বামিজী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মার্গারেটের মধ্যে আছে প্রচণ্ড কর্মশক্তি, যাহার উত্তেজনা মার্গারেটকে শান্ত হইতে দেয় না; এবং সেই শক্তিকে যথাযথ পরিচালনা করিবার দায়িত্ব তাঁহার। আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কর্ম, তাহার সহিত প্রভেদ আছে নিছক সমাজ-সেবার। প্রথমটির উদ্দেশ্য বলিষ্ঠ কর্মের মধ্য দিয়া চিত্তের বিশুদ্ধি-সম্পাদন—সেখানে কর্মের সকল ফল অর্পিত হয় জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে। যে কর্ম কর্মীকে কর্মের প্রকারভেদ অস্বীকার করাইয়া পরম ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে, তাহার প্রকাশ হয় দম্ভে বা পৌরুষে নয়, দীন আকৃতিতে। দ্বিতীয় কর্মের প্রকৃতি বিভেদ সৃষ্টি করে। সেখানে কর্মকে ছাপাইয়া উঠে কর্মীর আত্মম্ভরিতা। নিজেকে লোপ না করিয়া জাহির করিতে সে ব্যস্ত থাকে। ভারতে আসিয়া কার্য করিবার পূর্বে মার্গারেটকে কর্মীর সকল অহংকার বিসর্জন দিয়া আসিতে হইবে। তাঁহাকে ভাবিতে হইবে, 'ইহা আমার সৌভাগ্য যে আমি তাঁহার অধীনে কার্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি।'

ইহা ব্যতীত স্বামিজী জানিতেন, মার্গারেট তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহাকেই জীবনের পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া,—ভারতবর্ষে আসিতেছেন। একান্তভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করার পরিবর্তে মার্গারেট যাহাতে স্বাধীন-ভাবে নিজের কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং, সর্বোপরি, নারীসুলভ কোমলবৃত্তি—যাহা বন্ধনকেই ক্রমাগত লালন করিতে চাহে—একেবারে উপেক্ষা করিয়া সবল, উদার দৃষ্টিভঙ্গী সহ কর্মে অবতরণ করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহাকে সতর্ক করা প্রয়োজন ছিল। মার্গারেট সাধারণ নারী নহেন—অনন্যসাধারণ তাঁহার বুদ্ধি, চরিত্র-দার্ঢ্য ও প্রতিভা। তথাপি পাশ্চাত্য স্বভাবের যে অসহিষ্ণুতা ও অহমিকা, তাহা মার্গারেটের মধ্যেও যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। আর ছিল, স্বামিজীর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব চরিত্রের প্রতি শুধু অকপট শ্রদ্ধা নয়, একান্ত অনুরাগ। এই ব্যক্তিত্বের পূজার ঊর্ধ্বে যে নৈর্ব্যক্তিক সাধনা, তাহাই জীবনের লক্ষ্য। স্বামিজী প্রথম হইতে মার্গারেটকে সে বিষয়ে সচেতন করিতে চাহিয়াছিলেন।

'বড় অসুবিধা এই যে, আমি দেখিতে পাই, অনেকে তাহাদের প্রায় সবটুকু হৃদয় দিয়াই আমায় ভালবাসা অর্পণ করে। কিন্তু প্রতিদানে কাহাকেও আমার সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ তাহা হইলে একদিনেই সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে। অথচ নিজের গণ্ডির বাহিরে দেখিতে অনভ্যস্ত এমন লোকও

স্বামী বিবেকানন্দ
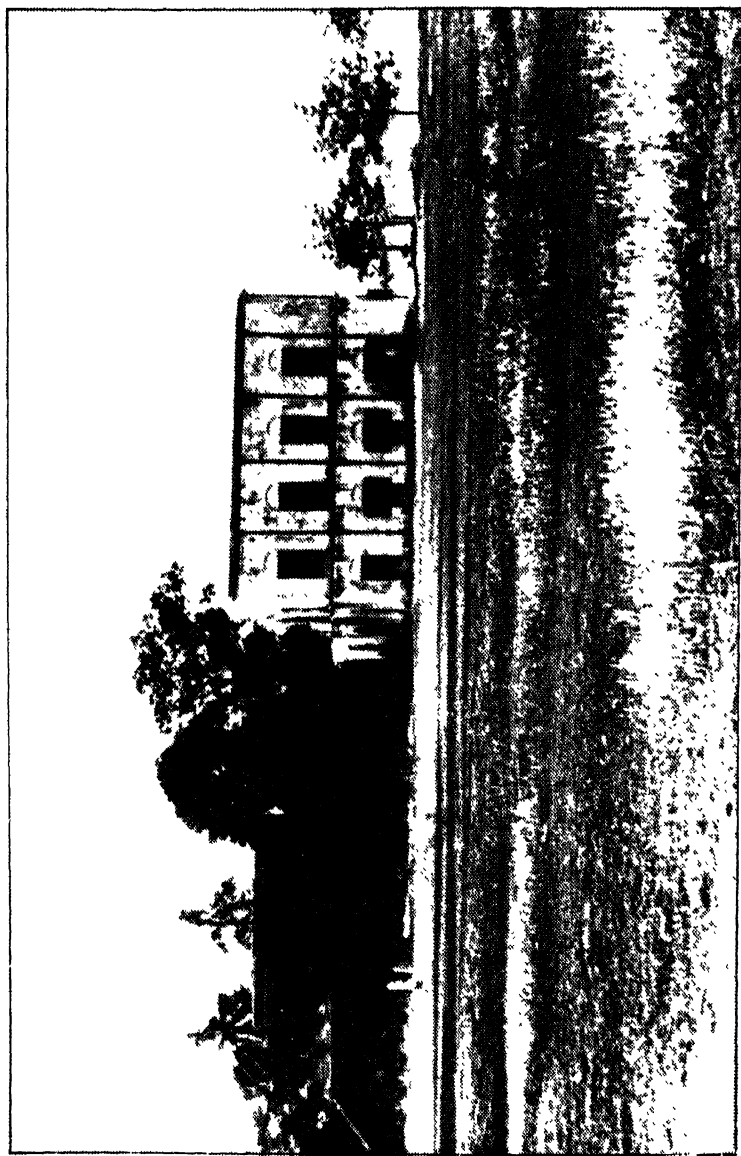
গঙ্গাতীরস্থ বাড়ি—--বেলুড়মঠ

আছে যাহারা প্রতিদানই চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য ইহা আবশ্যক যে, যত বেশী লোক সম্ভব আমাকে মনে প্রাণে ভালবাসুক: অথচ আমাকে সম্পূর্ণ-ভাবে সকল গণ্ডির বাহিরে থাকিতে হইবে। নেতা যিনি, তিনি থাকিবেন সব গণ্ডির বাহিরে।

'আমার বিশ্বাস, তুমি এ কথা বুঝিতে পারিতেছ। আমি এ-কথা বলিতে চাহি না যে, তিনি পশুর ন্যায় অপরের শ্রদ্ধাকে নিজের কার্যে লাগাইবেন আর মনে মনে হাসিবেন। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট ; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, কিন্তু তেমনই আবার প্রয়োজন হইলে—বুদ্ধদেব যেমন বলিতেন, "বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়" —আমি নিজ হস্তেই আমার হৃদয়কে উৎপাটিত করিতে পারি। প্রেমে আমি উন্মাদ; কিন্তু তাহাতে তিলমাত্র বন্ধন নাই' (১।১০।৯৭ এর পত্র)।

মার্গারেটের চরিত্রের অত্যধিক ভাবপ্রবণতা স্বামিজী অবগত ছিলেন। 'অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—ইহাই হইবে আমাদের মন্ত্র।' স্বামিজীর মার্গারেটকে লিখিত বিভিন্ন পত্রগুলির মধ্য দিয়া ইঁহার চরিত্রের একটি পূর্ণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য মার্গারেট পত্রগুলির মর্মার্থ গ্রহণ করিয়া নিজেকে কত-খানি প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। ভারতবর্ষে আগমনের পর সাধনার কঠোরতা তাঁহার দৃঢ়চিত্তকে কত পীড়িতই না করিয়াছিল!

অবশেষে তাঁহার ভারত-যাত্রার দিন আসিল। মেরী নোব্‌ল কন্যার এই পথনির্বাচনে আপত্তি করেন নাই। তিনি তো বহু পূর্বেই জানিতেন, তাঁহার কন্যার ডাক এক দিন আসিবে। স্বামীর অন্তিম অনুরোধ মনে পড়িল—যেদিন মার্গারেটের নিকট দেবতার আহ্বান আসিবে, মেরী যেন তাহাকে সাহায্য করেন।

মার্গারেটের ভারত-গমন উপলক্ষ্যে লণ্ডনে এক সম্মিলন আহূত হইল। তাঁহার পরিচিত এবং বন্ধুগণ যোগদান করিলেন তাঁহাকে বিদায় সংবর্ধনা জানাইতে, 'মার্গারেটের যাত্রা-পথ যেন শুভ হয়।'

লণ্ডনের বিদ্বৎ-সমাজে মার্গারেটের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাই তাঁহার ভারত গমনে অনেকেই দুঃখবোধ করিতেছিলেন ; সান্ত্বনা এই যে, ভারতবর্ষে গিয়া তিনি যে মহৎ কার্য সাধন করিবেন, তাহা দ্বারাই সোসাইটিতে তাঁহার অভাবের ক্ষতিপূরণ হইবে।

মার্গারেটের অন্যতম বন্ধু মিঃ হ্যামণ্ড তাঁহার ভারত অভিমুখে যাত্রাকালের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

'অনন্যসাধারণ জ্যোতির্ময়ী এক তরুণী। নীল উজ্জ্বল নয়ন। বাদামী-স্বর্ণাভ কেশ। স্বচ্ছ, উজ্জ্বল বর্ণ। মুখের মৃদু হাসিতে এক আকর্ষণীয় শক্তি। দীর্ঘ অঙ্গের প্রত্যেকটি পেশী যেন গতিশীল, আবেগে চঞ্চল। আগ্রহ, উদ্যমে পূর্ণ হৃদয়, নির্ভীক। আইরিশ জাতির উত্তরাধিকারলাভে গর্বিত আবার উদার, আবেগ-উৎসাহে পূর্ণ। ব্যক্তিত্বের মাধুর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি কেল্টিক জাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলির যেন প্রতিমূর্তি। আর এ সবই তিনি মণিময় দ্বীপ আয়র্ল্যাণ্ড হইতে ইংলণ্ড এবং সেখান হইতে তাঁহার নবলব্ধ মাতৃভূমি ভারতে বহন করিয়া লইয়া যান।'

মার্গারেট যেদিন অতি প্রত্যূষে উইম্‌ব্‌ল্‌ডন পরিত্যাগ করিলেন, সেদিন চারিদিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন। প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে, তথাপি তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং বহু বন্ধুবর্গ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বিদায়-বেদনায় সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

ইংলণ্ড বহু প্রচারক পাঠাইয়াছে ভারতবর্ষে। উদ্দেশ্য, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতাবিহীন, অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ভারতীয়-গণকে উদ্ধার করা! মার্গারেটের এই যাত্রা যেন সেই মূঢ়তার প্রতিবাদস্বরূপ। ধর্ম প্রচার করিতে নহে, ভারতমাতার পদতলে বসিয়া এবং কায়মনোবাক্যে ভারতের শাশ্বত সাধনার সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া আত্মজ্ঞানের মহিমময় আলোকে অভিষিক্ত সমগ্র জীবনকে একটি অর্ঘ্যের মত নিবেদনের আকাঙ্ক্ষায় মার্গারেটের এই জয়যাত্রা সেদিন বিধাতা কি প্রসন্ন মনে নিরীক্ষণ করেন নাই?

ইংলণ্ড পিছনে পড়িয়া রহিল।

ভারত তীর্থে

জাহাজের নাম 'মম্বাসা'। য়ুরোপের উপকূল ত্যাগ করিয়া উহা মার্গারেটকে যতই দূরে লইয়া যাইতে লাগিল, মার্গারেটের হৃদয় ততই ভাবী আশা ও অজানা আশঙ্কায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। এক নূতন অপরিচিত দেশে তাঁহার যাত্রা। সেখানে কোন্ ধরনের অভ্যর্থনা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা অজ্ঞাত।

৭ই জানুয়ারী সকালে সাইনাই দেখা গেল। প্রাচ্য ভূখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। ১২ই জানুয়ারী জাহাজ এডেন পেঁাছিল। ২৪শে জানুয়ারী সকাল দশটায় মাদ্রাজ বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিল। ভারতবর্ষ! মার্গারেটের কল্পনার, ধ্যানের ভারতবর্ষ! তিনি ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সবই অপরিচিত, তথাপি কেন একান্ত আপনার বোধ হয়! পরদিন বেলা দশটার সময় পুনরায় জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল। শেষ মুহূর্তে গুড্‌উইন আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। এতক্ষণে একটি পরিচিত মুখ দেখিয়া আনন্দিত হওয়া মার্গারেটের পক্ষে স্বাভাবিক। গুড্‌উইনও তাঁহারই মত স্বামিজীর কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। একই পথের সহযাত্রী তাঁহারা।

এবার মম্বাসার শেষ গন্তব্যস্থল কলিকাতা। সহসা মার্গারেট অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেকের জন্য মনে হইল তিনি কি ভুল করিয়াছেন! কলিকাতার দু'একজন ইংরেজ কর্মচারীর সহিত পত্র-বিনিময় হইয়াছে, তাঁহারাও যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াছেন; কিন্তু সে চিন্তা কিছুমাত্র সান্ত্বনা দিল না। কলিকাতায় তাঁহাকে একাকী থাকিতে হইবে। মিস মুলার ইতিপূর্বেই আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি তখন আলমোড়ায়।

১৮৯৮ খৃীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী। জাহাজ ধীরে ধীরে কলিকাতা বন্দরে আসিয়া থামিল। দ্রুত-স্পন্দিত হৃদয়ে, উৎসুক দৃষ্টিতে মার্গারেট তীরের দিকে চাহিলেন। তাঁহার আশা ব্যর্থ হয় নাই। মার্গারেটকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ জেটিতে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। এতক্ষণে মার্গারেট সাহস ফিরিয়া পাইলেন।

পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী মার্গারেট চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক হোটেলে উঠিলেন। পরে মিস মুলার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান করেন। স্বামিজীর পত্রে জানা যায়, মিস মুলার তাঁহাদের

বাসের জন্য পূর্বেই এক বাড়ি ভাড়া লইয়াছিলেন। নূতন জীবন আরম্ভ হইল। স্বামিজী প্রথমেই বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। চৌরঙ্গী অঞ্চলে যে সকল ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের সহিত পরিচয় হইয়া গেল। প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশের পর ইডেন গার্ডেনে ভ্রমণের সময় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ আরবাথনট প্রভৃতি কেহ না কেহ সঙ্গী হইতেন। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হইল—মিউজিয়াম, ফোর্ট, বটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি। একদিন ক্যাথিড্র্যাল চার্চে গিয়া উপাসনায় যোগ দিলেন।

তখনকার চৌরঙ্গী অঞ্চল বহু পরিমাণে জন-বিরল, পরিষ্কার এবং সুসজ্জিত। চৌরঙ্গী ও ইংরেজ পল্লী দেখিয়া প্রকৃত কলিকাতা ও তাহার যথার্থ অধিবাসিগণের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। পাশ্চাত্যবাসী কাহারও পক্ষে তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু মার্গারেট জানিতেন, এদেশে কার্যের জন্য তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন 'নেটিভ' পল্লীগুলি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা। সুতরাং যেদিন কেহ সঙ্গে থাকিত না, একলাই ঘোড়ার গাড়ি করিয়া তিনি ঐগুলি আবিষ্কার করিতেন। এদেশে ভাবী কর্মজীবনের জন্য আরও দুইটি বিষয়ের দরকার ছিল। প্রথম, বাংলা ভাষা আয়ত্ত করা ; দ্বিতীয়, এদেশের শিক্ষাকার্য সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা। মার্গারেট প্রতিদিন বাংলা শেখায় নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতেন। কলিকাতার তদানীন্তন বিদ্যালয়গুলিতেও তাঁহার যাতায়াত ছিল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মঠ আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। কার্যোপলক্ষ্যে স্বামিজী কখনও কখনও বাগবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান করিতেন। সেই সময় তিনি মার্গারেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন এবং বাংলা পড়াশুনা কিরূপ চলিতেছে অনুসন্ধান করিতেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী স্বামী সারদানন্দের সহিত মিসেস স্যারা বুল ও মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড বোম্বাই হইয়া ট্রেনে কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বামিজী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড হোটেলে উঠিয়াছিলেন। দুই একদিন পরে তাঁহারা বেলুড়ে স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। তখন বর্তমান বেলুড় মঠের জমি কিনিবার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে এবং বায়না দেওয়া হইয়াছে। স্বামিজী ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া জমি দেখাইতে লইয়া গেলেন। জমিটিকে সমতল করিয়া গৃহাদি-নির্মাণ-কার্য সময়সাপেক্ষ। জায়গাটি মিসেস বুল ও

মিস ম্যাকলাউডের অত্যন্ত পছন্দ হইল। বিশেষতঃ এখানে অবস্থান করিতে পারিলে তাঁহারা প্রতিদিন স্বামিজীর দুর্লভ সঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন। নদীর তীরেই অবস্থিত পুরানো অসংস্কৃত বাড়ীটিতে তাঁহারা বাস করিবার অভিপ্রায় জানাইলে স্বামিজী সম্মতি দিলেন। মোটামুটি সংস্কার-সাধন করিয়া এবং কিছু আসবাবপত্র কিনিয়া বাড়ীটিকে বাসের উপযুক্ত করা হইল। স্বামিজীর অভিপ্রায় বুঝিয়া মিসেস বুল মার্গারেটকে অতিথিরূপে তাঁহাদের সহিত বাসের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

মিসেস স্যারা বুল ছিলেন নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলি বুলের স্ত্রী। বস্টনে ইঁহার গৃহে স্বামিজী আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্বামিজী অপেক্ষা তিনি বয়সে বড় ছিলেন। বেলুড় মঠের প্রথম গৃহাদি-নির্মাণের জন্য এবং পরবর্তী কালে ভগিনী নিবেদিতার কার্যে তিনি যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। আমেরিকায় বহু ভারতীয় তাঁহার সদয় আতিথেয়তা ও সাহায্য লাভ করিয়াছে। উদারহৃদয়া মিসেস বুলের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উপর দৃঢ় আস্থাবশতঃ স্বামিজী তাঁহার নাম দিয়াছিলেন 'ধীরা মাতা' এবং তাঁহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড স্বামিজীর শিষ্য না হইলেও পরম সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। স্বামিজী তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'জয়া' এবং পত্রে বহু সময় 'জো' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভারতে প্রথম আগমনের পর মিস ম্যাকলাউড জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামিজী, কি ভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী উত্তর দিলেন, 'ভারতবর্ষকে ভালবাস।'

একবার স্বামিজী তাঁহাকে কাজের জন্য অর্থাভাবের কথা জানাইলে ম্যাকলাউড তাঁহাকে প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার করিয়া দিবার অঙ্গীকার করেন এবং তৎক্ষণাৎ তিন শত ডলার অগ্রিম দেন। স্বামিজী-প্রদত্ত সেই তিন শত ডলার লইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত নবপ্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার ব্যয়-নির্বাহ করেন। স্বামিজীর দেহত্যাগের পরেও ইনি বহুদিন ধরিয়া বেলুড় মঠে বাস করিয়াছেন এবং নানাভাবে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে সাহায্য করিয়াছেন।[১]

অধ্যাত্ম-জগতে নিবেদিতা ছিলেন স্বামিজীর কন্যাস্বরূপা।

স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল, মার্গারেট মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সহিত

[১] ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার হলিউড বেদান্ত সমিতিতে প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে মিস ম্যাকলাউডের মৃত্যু হয়।

বেলুড়ে অবস্থান করেন। মার্গারেটের সহিত দেখা হইলে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'ধীরা মাতার বাড়িটি তোমার মনে হবে স্বর্গ, কারণ এর আগাগোড়া সবটাই ভালবাসা-মাখা।' সুতরাং মিসেস বুলের সাদর আহ্বানে মার্গারেট নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। লণ্ডনে স্বামিজীর ক্লাসগুলিতে যোগদানকালে মিস ম্যাকলাউড মার্গারেটের সহিত পরিচিত হন। স্বামিজীর পত্র হইতে তাঁহারা পরস্পরের ভারত-আগমনের সংবাদও অবগত ছিলেন।

বেলুড়ে বাসকালে এবং পরে উত্তর-ভারত-ভ্রমণের সময় স্বামিজীকে কেন্দ্র করিয়া এই তিনটি নারীর মধ্যে এক মধুর সখ্য ও ভালবাসার বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা তিনজনেই স্বামিজীর আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে জমি ক্রয় হইয়া গেলেই মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড বেলুড়ে চলিয়া আসেন। মার্গারেট কয়েকদিন পরে তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। ১২ই মে স্বামিজী মিসেস বুল প্রভৃতিকে লইয়া উত্তর-ভারত-পরিক্রমায় বাহির হন। সুতরাং ইঁহারা প্রায় দুই মাস বেলুড়ে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

২৮শে জানুয়ারী হইতে ১১ই মে পর্যন্ত মার্গারেটের জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়—২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসবে যোগদান, ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে প্রথম বক্তৃতা দান, ১৭ই মার্চ সংঘজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে দর্শন এবং ২৫শে মার্চ ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষালাভ।

২২শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮) শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-পূজা এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সাধারণ উৎসব প্রতিপালিত হয়। স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে ঐ উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। জন্মতিথি পূজার দিন স্বামিজী প্রায় পঞ্চাশ জনকে গায়ত্রী মন্ত্র ও উপবীত প্রদান করেন। সাধারণ উৎসব বেলুড়ে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।

মার্গারেট ও মিস মুলার স্থির করিলেন, উৎসবে যোগদানের পূর্বে তাঁহারা দক্ষিণেশ্বর দেখিবেন। তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। হাওড়া হইতে নৌকা করিয়া তাঁহারা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। জলে, স্থলে সর্বত্র যেন সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। চাঁদনীর ঘাটে অবতরণ করিয়া বামপার্শ্বের ক্ষুদ্র রাস্তা ধরিয়া চলিবার সময় শিবমন্দিরের চূড়াগুলির মধ্য দিয়া কালীমন্দিরের সু-উচ্চ চূড়া তাঁহাদের চোখে পড়িল। তাঁহারা জানিতেন,

ঐ মন্দিরে প্রতিমার বেদীতলে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীর আরাধনায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। কেমন সেই মন্দিরের অভ্যন্তর—যেখানে পূজারীর ব্যাকুলতায় মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইয়াছিলেন! কিন্তু খ্রীষ্টান বলিয়া মন্দিরে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের বাসকক্ষ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা তাঁহার সাধনার পীঠস্থান পঞ্চবটী অভিমুখে গেলেন। গঙ্গা-তীরে বাঁধানো পোস্তার উপর অল্পক্ষণ বসিলেন। দক্ষিণেশ্বর পুণ্যতীর্থে যাপিত এই কয়টি ক্ষণ মার্গারেটের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। মার্গারেট দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন। কিছু দূরে একটি বৃক্ষতলে দুইজন পরি-ব্রাজক সন্ন্যাসী আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। এক পার্শ্বে তাঁহাদের লাঠি ও কাপড়ের পুঁটলি। মাথায় জটা, একমুখ দাড়ি, দেখিতে জংলী লোকের মত! কিন্তু তাঁহাদের মুখে চোখে আনন্দের চিহ্ন!

সামনেই তরঙ্গমালিনী জাহ্নবী। বৃক্ষপত্রের মর্মর শব্দের সহিত মিলিত হইয়াছে বিহগকুলের বিচিত্র গুঞ্জন। মার্গারেট ও তাঁহার সঙ্গিনী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। সেই পবিত্র স্থানের স্বর্গীয় সৌন্দর্যে অন্তর ভরিয়া উঠিল। গভীর নিশীথে এইখানে, এই বৃক্ষতলে বসিয়া সেই মহাপুরুষ যখন ধ্যান-নিমগ্ন হইতেন, তখন চরাচর প্রকৃতি কি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিত না!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটি ছোটখাট জনতা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া বাদানুবাদ চলিল। তারপর সহসা অযাচিত ভাবেই তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দরজা খুলিয়া তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশের আহ্বান জানাইল। ইহাদের সঙ্গী রাখালবাবু সুপণ্ডিত। বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি জনতাকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছিলেন যে, ইঁহারা বিদেশিনী হইলেও ভক্ত। কিন্তু মার্গারেটের মনে হইল, এই যে দরজা খুলিয়া তাঁহাদের ভিতরে যাইতে আহ্বান করা, ইহা শাস্ত্র-বচন-উদ্ধৃতির ফল নহে; ইহার মূলে আছে হৃদয়ের সহজাত ভালবাসা ও সহানুভূতি। কক্ষের ভিতর সর্বত্র সযত্ন হস্তের পরিচর্যা পরিস্ফুট—তাঁহার ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি যে ভাবে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ভাবেই রহিয়াছে; দেওয়ালে যে চিত্রগুলি টাঙ্গানো আছে, তাহার মধ্যে অন্যতম চিত্র মেরী ম্যাজডলেনের—নির্জন, পরিত্যক্ত স্থানে ক্রুশবিদ্ধ ভগবানের পদতলে প্রার্থনারতা।

কী পবিত্র স্থান! দ্বারপ্রান্তে উৎসুক মুখগুলির সহিত মার্গারেট এক নিবিড় স্নেহবন্ধন অনুভব করিলেন।

দক্ষিণেশ্বর হইতে পুনরায় নৌকাযোগে তাঁহারা গঙ্গার অপর পারে

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘাটে অবতরণের পূর্বে উৎসবের কোলাহল শোনা গেল। বাহিরের প্রাঙ্গণে সজ্জিত উৎসব-মন্ডপ, সঙ্গীত-ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। শত শত বাঙ্গালী যুবক অপেক্ষা করিতেছে, কখন স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিবেন। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার আয়োজনে কর্মরত সন্ন্যাসিগণ।

মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি পূর্বেই আসিয়াছিলেন। পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু। এখানেই সঞ্চরণশীল জনতার মধ্যে তাঁহারা জীর্ণবস্ত্র-পরিহিতা, জপে মগ্ন 'গোপালের মা'র প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। গোপালের মার কথা ইঁহারা পূর্বেই অবগত ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গোপালরূপেই দর্শন করিয়াছিলেন এবং গোপালভাবেই তাঁহাকে দেখিতেন। পরবর্তী কালে শ্রীমতী অঘোরমণি 'গোপালের মা' বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচিত ছিলেন। গোপালের মা চিবুক স্পর্শ করিয়া বিদেশিনীগণকে সস্নেহে চুম্বন করিলেন। কেহ কাহারও ভাষা বোঝেন না, সুতরাং আলাপের প্রশ্ন ওঠে না, প্রয়োজনও ছিল না। গোপালের মার স্পর্শে তাঁহারা এক আন্তরিকতা অনুভব করিলেন। কোন কথা না বলিয়া গোপালের মা তাঁহাদের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরিকাগণের নিকট লইয়া গেলেন। এখানেও বিস্ময়ের সহিত সাদর অভ্যর্থনা। মার্গারেটের মনে হইল, এইরূপেই ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত মনীষার পরিমাপ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণেশ্বরে এবং উৎসব-প্রাঙ্গণে প্রথম ভারতের সাধারণ নরনারীর সংস্পর্শে আসা মার্গারেটের নিকট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তী কালে সর্বদাই সাধারণ নরনারীকে 'our people' (আমাদের জনসাধারণ), 'our women' (আমাদের নারীগণ) বলিয়া তাঁহার উল্লেখের মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুর প্রকাশ পাইত, তাহাদের সহিত এই প্রথম সাক্ষাতে হৃদয়ের সংযোগ সাধন হইয়া গেল। আর যে গোপালের মা পরে তাঁহার জীবনের বিশেষ অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিও তিনি অন্তরের গভীর অনুরাগ পোষণ করিলেন।

মার্গারেট অপেক্ষা করিতেছিলেন, কবে স্বামিজী তাঁহাকে অভীপ্সিত কার্যের ভার দিবেন। ইতিমধ্যে শ্রীমতী সরলা ঘোষাল ও শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসুর সহিত তাঁহার আলাপ এবং শিক্ষা সম্বন্ধে নানা আলোচনাদি হইয়াছে; তাঁহারাও সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত। তিনি শ্রীমতী বসুর স্কুল, বেথুন স্কুল, মাতাজীর পাঠশালা প্রভৃতি দেখিয়া

আসিয়াছেন ; উদ্দেশ্য এখানকার বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা। মিস মুলারও প্রস্তুত আছেন অর্থসাহায্যদানে। কিন্তু যিনি তাঁহাকে কার্যের ভার অর্পণ করিবেন, সেই স্বামিজী কিছুই বলেন না। মার্গারেট জানিতেন না, স্বামিজী অপেক্ষা করিতেছেন উপযুক্ত সময়ের জন্য। কার্যে নিযুক্ত হইবার পূর্বে প্রয়োজন ভারতবর্ষকে জানা, আরও প্রয়োজন ভারতবর্ষকে ভালবাসা। যে নারীজাতির উন্নতিকল্পে মার্গারেট জীবন উৎসর্গ করিবেন, ভারতবর্ষের সেই নারীগণের সহিত তাঁহার পরিচয় আবশ্যক। তিনি বিদেশিনী, ভারতের নারীজাতির মর্মকথা যদি তিনি অনুভব না করেন, ভারতের প্রাণের সুরটি যদি তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত না হয়, তবে তাঁহার দ্বারা ভারতের নারীজাতির কল্যাণসাধন কি সম্ভব? তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়া। ধীরে ধীরে মার্গারেটের অন্তরে এদেশের সহিত যোগসাধন হউক, হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীর প্রীতির উৎস খুলিয়া যাক্ ; তারপর একান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যখন তিনি এদেশের সেবাকার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন, তখনই জন্মিবে কার্যে প্রকৃত অধিকার। বিশেষতঃ মার্গারেটের উৎসর্গ-অনুষ্ঠান এখনও সম্পন্ন হয় নাই।

বস্তুতঃ এই সময়ে স্বামিজী পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষকে যথার্থভাবে জানার প্রতি সমধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যে সকল যুবক মঠে নূতন যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের শিক্ষাভার স্বহস্তে গ্রহণ-পূর্বক নিয়মিত জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়া চরিত্রগঠনের প্রতি যেমন তিনি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তেমনি যাহারা সুদূর বিদেশ হইতে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া এবং বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের ভারও তিনি আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজী জানিতেন, ইহারা আসিয়াছে ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়া ভারতবর্ষের সত্যকার পরিচয়ের সন্ধানে। পাশ্চাত্যে স্বামিজী সগর্বে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা। ঘোষণা করিয়াছেন, 'জীবো ব্রহ্মৈব'—প্রতি মানবের মধ্যে সেই অব্যক্ত সত্তার বিকাশ। বলিয়াছেন, 'অভীঃ—ভয়শূন্য হও ; বিস্তারই জীবন, সংকোচই মৃত্যু ; আত্ম-বিশ্বাসী হও।' তাঁহার তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ভারতের যে শাশ্বত বাণী, আত্মার যে মহিমা ঘোষিত হইয়াছিল, যাহার কল্পনামাত্র মানবকে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধান দেয়, স্থূল দৃষ্টিতে বহুশতাব্দী-নিপীড়িত, প্রাণপণে প্রাত্যহিক জীবন ধারণের গ্লানিযুক্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে তাহার আভাস পর্যন্ত

কোথায়! বিশ্বের দরবারে স্বামিজী-প্রচারিত ভারতবর্ষের সহিত বাস্তব ভারতের কি বিরাট পার্থক্য! তাঁহার শিষ্যগণের নিকট কি গোপন থাকিবে এদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য, দাসসুলভ মনোভাব এবং জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণাবিশিষ্ট বুভুক্ষু নরনারীর দল! সে অভিপ্রায়ও স্বামিজীর ছিল না। এদেশের প্রকৃত অবস্থা তিনি সকলকে, বিশেষতঃ মার্গারেটকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামিজীর আরাধ্য ছিল এই সকল বহির্দৃশ্যের অন্তরালে বিরাজমান তাঁহার সেই মহিমময় মাতৃভূমি ভারতবর্ষ, যাহার উত্তুঙ্গ পর্বতমালা অনাদি কাল হইতে গভীর ধ্যানমগ্ন, অশ্রান্ত কল্লোলধ্বনি করিয়া সমুদ্র যাহার পাদস্পর্শ করিয়া যাইতেছে, বহু অভিযানের ফলে বাহিরে সর্বরিক্ত হইয়াও যে অন্তরের অধ্যাত্ম-সম্পদকে ফল্গুধারার মত নিভৃতে বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহার কাছেই জগতের অক্ষয় শান্তির সন্ধান, আর সেই শান্তির বার্তাবাহক স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের সেই আন্তর রূপ উদ্ঘাটন করিবার দায়িত্ব তাঁহারই।

বিশেষতঃ, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড ভ্রমণান্তে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন ; কিন্তু মার্গারেট আসিয়াছেন এই দেশকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিবার সংকল্প লইয়া। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি স্বামিজী অধিক দায়িত্ব অনুভব করিতেন।

নবজীবনে দীক্ষা

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে যে জীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়িটিতে ধীরা মাতা প্রভৃতি বাস করিতেন, তাহার পরিবেশ যথার্থই স্বর্গীয়। 'শ্যামল বিস্তৃত শষ্পরাজি, উন্নত নারিকেল-বৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রঙের কুটিরগুলি— সবই সুন্দর। অদূরে বৃক্ষের উপর একটি নীলকণ্ঠ পাখী কুলায় নির্মাণ করিয়াছিল—সে যেন সদাশিবের আশিস বহন করিয়া আনিত। অপর তীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বৃক্ষশীর্ষগুলি দৃষ্টিগোচর হইত। সমস্ত পরিবেশই সুন্দর; আবার এক মহাপুরুষের আগমনে বাড়িখানি যেন সত্যই তীর্থে পরিণত হইত।'

এই বাড়িতেই স্বামিজী প্রতিদিন সকালে পাশ্চাত্য শিষ্যগণের সহিত প্রাতরাশে যোগদান করিতেন। এখানেই প্রাতঃকালীন জলযোগ সমাপ্ত হইবার পর বৃক্ষতলে বহুক্ষণ ধরিয়া স্বামিজীর অফুরন্ত ব্যাখ্যাপ্রবাহ চলিত। ভারতীয় জগতের কোন না কোন গভীর রহস্য তিনি উদ্ঘাটিত করিতেন। কদাচিৎ প্রশ্নোত্তর স্থান পাইত।

স্বামিজী যখন তাঁহার গম্ভীর, সুললিত কণ্ঠে ভারতবর্ষের তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিতেন—জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, পরম তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য বেদান্ত-মতবাদ, অথবা আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় ভারতীয় ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহার আবেগপূর্ণ, অগ্নিময় বাণীর প্রতি অক্ষরে ঝরিয়া পড়িত ভারতমাতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি। ধীরে ধীরে শ্রোতৃবর্গের নিকট বর্তমান স্থান-কাল অবলুপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহাদের তন্ময় চিত্তে ভাসিয়া উঠিত ভারতমাতার প্রাচীন মহিমময় মূর্তি। স্বামিজীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা প্রাচীন ভারতকে উপলব্ধি করিতেন। ভারতের আচার, অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, সাহিত্য, কাব্য, জাতীয় ভাব—বস্তুতঃ কোন্ বিষয় না স্বামিজী আলোচনা করিতেন! তাঁহার অনুপম ব্যাখ্যার গুণে প্রতি বিষয় সজীব হইয়া উঠিত; আর সকল বর্ণনার মধ্যে নিরন্তর প্রয়াস ছিল অদ্বৈত অনুভূতির আভাস দেওয়া।

ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শিষ্যগণের কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণাকে নির্মম-ভাবে চূর্ণ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। অথবা তাহারা করুণার চক্ষে ভারতকে দেখিবে, তাহাও তিনি সহ্য করিতেন না। ভারতবর্ষকে ভালবাসিলে

তবেই সেবার অধিকার জন্মে, এবং ভালবাসিতে গেলে তাহাকে জানা প্রয়োজন। ভারতের প্রাচীন গৌরব-কাহিনী সগর্বে বর্ণনা করিলেও বর্তমান ভারতকে তিনি উপেক্ষা করিতেন না। প্রাচীন ভারত হইতেই বর্তমান ভারতের জন্ম, আর এই বর্তমান ভারত হইতেই আবির্ভূত হইবে প্রাচীন গৌরবকে ম্লান করিয়া মহিমময় ভবিষ্যৎ ভারত। সুতরাং প্রাচীন ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বহু-সমস্যা-বিজড়িত, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অনগ্রসর ভারতকেও ভালবাসিতে হইবে। এই জানা এবং ভালবাসা নিতান্ত সহজ ছিল না। জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গী এতই পৃথক যে, ভারতীয় ভাবগুলি ধারণা করিতে পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে বহু সময়ে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তথাপি স্বামিজী ছাড়িবেন না। সত্যের সহিত কোনপ্রকার আপস চলিবে না। ভারতীয় বেদান্তে জ্ঞানলাভের জন্য আবশ্যক ভারতীয় প্রত্যেক ভাবের মর্মার্থ গ্রহণ, আর তাহার জন্য প্রয়োজন ভারতীয় বাহ্য জীবনের অনুসরণ। ভারতের প্রত্যেক কার্য, চিন্তা, আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে ওতপ্রোত রহিয়াছে অধ্যাত্ম-বাদ। তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তবেই উহার আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়-মান কুসংস্কার বা ভ্রান্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। ভারতীয় জীবন-যাত্রাকে অস্বীকার করিয়া তাহার অধ্যাত্মবাদকে বুঝিবার চেষ্টা করা নিরর্থক। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যে স্বামিজী তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ছিলেন কেবল বেদান্ত-প্রচারক ও স্নেহময় বন্ধু, ভারতে তাঁহার পরিচয় আচার্য ও স্বদেশপ্রেমিকরূপে।

শিক্ষাকালে মার্গারেট পুনরায় সেই সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ভাবটিকে স্বামিজী কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করিতেন। যেমন, 'পরোপকার-বৃত্তির পুষ্টিসাধন অপেক্ষা চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদনেই মনোযোগ দেওয়া উচিত', এবং ব্যক্তিত্বের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করিতে হইবে, এই তত্ত্বের পরিবর্তে স্বামিজীর উপদেশ ছিল, 'সাক্ষিস্বরূপ হও' ; কারণ আমার শত্রু আছে, এই চিন্তা তাঁহার মতে দ্বেষবুদ্ধির প্রমাণ। সর্বপ্রকার শিক্ষার মধ্যে মার্গারেট লক্ষ্য করিলেন, জীবাত্মার স্বাধীনতাই স্বামিজীর মূল লক্ষ্য। বন্ধনমাত্রকেই তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং যাহারা 'শৃঙ্খলকে ধর্মের আবরণে ঢাকিতে চায় তাহারা তাঁহার নিকট ভয়ঙ্কর লোক।' ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণে কখনও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। নিরন্তর এইসকল ভাবধারার ব্যাখ্যা এবং তৎসহিত স্বামিজীর নিজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মার্গারেটের চিন্তাধারার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনিয়াছিল। নিবেদিতারূপে তাঁহার পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি স্বামিজীর নিকট এই শিক্ষাকালেই মার্গারেটের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছিল।

তাঁহাকে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে না দিবার সম্ভবতঃ আরও একটি কারণ ছিল। মার্গারেট তখন পর্যন্ত মিস মুলারের উপর নির্ভরশীল। অথচ তিনি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে কার্য আরম্ভ করেন, ইহাই ছিল স্বামিজীর ইচ্ছা। ইতিপূর্বেই তিনি মিস মুলার সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া মার্গারেটকে লিখিয়াছিলেন, 'তাঁহার মঠস্বামিনী হইবার সংকল্পটি দুটি কারণে কখনও সম্ভব হইবে না—তাঁহার রুক্ষ মেজাজ এবং তাঁহার অদ্ভুত অব্যবস্থিতচিত্ততা।' কিন্তু মার্গারেট তখনও একথা উপলব্ধি করেন নাই। মিস মুলারের অর্থবল ছিল। যে কোন কার্যেই অর্থের প্রয়োজন, এবং সে অর্থ মিস মুলার দিতে প্রস্তুত —এই বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরপূর্বক সম্পূর্ণ একাকী কার্য আরম্ভ করিবার প্রয়োজন মার্গারেট তখনও অনুভব করেন নাই। অপরপক্ষে, স্বামিজী অর্থের অপেক্ষা রাখিতেন না। তাঁহার মতে মানুষ থাকিলে অর্থ আপনিই আসিবে। মার্গারেটকে কার্যে নামিতে দেওয়ার পক্ষে আর এক বাধা ছিল। স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়া যে উদ্দেশ্যে মার্গারেটের আগমন, তাহাও কতদিন বজায় থাকে দেখা প্রয়োজন। বস্তুতঃ বহুদিক বিবেচনার ফলেই তাড়াতাড়ি কিছু আরম্ভ করিতে দেওয়া স্বামিজীর নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই।

ইতিমধ্যে জনসাধারণের নিকট মার্গারেটকে পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে বক্তৃতার আয়োজন হইল। স্বামিজী স্বয়ং সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। স্বামিজীর বহু অনুরাগী ও ভক্ত পূর্বেই মার্গারেটের ভারত-আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়াছিলেন। অতএব স্বামিজী যখন মার্গারেটের পরিচয় দিতে উঠিলেন, তখন জনতা বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিল। ইংলণ্ডের উপহার-রূপে মিস মুলার ও শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের উল্লেখ করিয়া স্বামিজী বলিলেন, 'ইংলণ্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়াছে—মিস মার্গারেট নোবল। ইঁহার নিকট আমাদের অনেক আশা। আমি অধিক কথা না বলিয়া আপনাদের সহিত মিস নোবলের পরিচয় করাইয়া দিতেছি।'[১]

মার্গারেট উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র জনতা পুনঃপুনঃ হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইল। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব'।

ইহাই মার্গারেটের ভারতে প্রথম বক্তৃতা। বহু যত্নে তিনি বক্তৃতাটি

[১] ব্রহ্মবাদিন, ১৮৯৮, পৃঃ ৫৫৫-৫৬৮ দ্রষ্টব্য।

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সুচিন্তিত ভাষণে তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মতবাদের পার্থক্য আলোচনা দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যজাতির নিকট যে উচ্চতত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন, নিপুণভাবে তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবার এই প্রথম বক্তৃতাতেই তাঁহার ভারত-সেবার আকাঙ্ক্ষা কি সুন্দরভাবেই না ব্যক্ত হইয়াছিল!

'আপনারা এমন এক রক্ষণশীল জাতি, যে জাতি দীর্ঘদিন ধরিয়া সমগ্র জগতের জন্য শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ সযত্নে বক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আর ঐ কারণেই সেবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভারতকে সেবা করিবার জন্যই আমার এদেশে আগমন।'

নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যও তিনি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ জনতা যখন বারবার হর্ষধ্বনি করিতেছিল, তখন কি তাহারা এই বিদেশিনীর মধ্যে তাহাদের ভবিষ্যৎ নিকটতম আত্মীয়কে চিনিয়াছিল? বক্তৃতার উপসংহার করিলেন মার্গারেট 'শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি' বলিয়া।

তদানীন্তন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ সালজার সভায় উপস্থিত ছিলেন। মার্গারেটের বক্তৃতায় ভারতীয় অদ্বৈতবাদের উচ্চ প্রশংসা স্বভাবতঃই তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই, সুতরাং তিনি দু-একটি মন্তব্য করেন। মার্গারেটও তাহার উত্তর দেন।

এই বক্তৃতায় স্বামিজী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সকলের নিকট মার্গারেটের উচ্চ প্রশংসা করেন ও কথাপ্রসঙ্গে বলেন, 'এর পর দেখবি নিবেদিতার কার্যকরী শক্তি। নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ। তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশঃ কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র। জানবি, এর কথা শুনে সবার তাক লেগে যাবে! নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি।'[১]

মার্গারেট সম্বন্ধে স্বামিজীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিলেন, 'মিস নোব্‌লের মত মেয়ে সত্যই দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, বাগ্মিতায় সে শীঘ্রই মিসেস্ বেশান্তকে ছাড়াইয়া যাইবে।..কলিকাতায় জনসাধারণেব জন্য আমাদের দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল—

[১] নিবেদিতা—উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৬, পৃঃ ১০

মন্তব্য—স্বামিজী মার্গারেট অথবা মিস নোব্‌ল বলিয়াই নিশ্চিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, কারণ 'নিবেদিতা' নাম তখনও দেওয়া হয় নাই।

একটি মিস নোব্‌লের এবং অপরটি আমাদের শরতের। তাহারা দুইজনেই খুব চমৎকার বলিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।'

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসটি ঘটনাবহুল এবং মার্গারেটের জীবনে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। ঐ বৎসর (বাংলা ১৩০৫ সাল) শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আগমন করিয়া বাগবাজার ১০।২ নং বোসপাড়া লেনে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীমার কথা মার্গারেট প্রভৃতি পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে, যখন তিনি নিতান্ত বালিকা, এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটে। বিবাহের পর কঠিন সাধনায় রত স্বামী পত্নী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। আঠার বৎসর বয়সে পত্নী পল্লীগ্রাম হইতে পদব্রজে গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে স্বামি-সকাশে উপস্থিত হইলে তাঁহার দাম্পত্য-বন্ধনের কথা স্মরণ হইল। কিন্তু তাঁহার জীবনের আদর্শ যে অন্যরূপ! পত্নী কি তাঁহাকে সংসারপথে লইয়া যাইতে চাহেন? প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সহিত পত্নী জানাইলেন, তাঁহার ধর্মজীবনে তিনি সহায়তা করিবেন। একাধারে সন্ন্যাসিনী ও ধর্মপত্নী; আবার শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই শ্রীসারদাদেবী, ভক্তগণের শ্রীশ্রীমা।

১৭ই মার্চ মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সহিত মার্গারেট শ্রীমার প্রথম দর্শন লাভ করেন। সেদিন সেণ্ট প্যাট্রিকের জন্মদিবস (St. Patrick's day)। মার্গারেট তাঁহার ডায়েরীতে লিখিলেন, 'day of days' (সেরা দিন)। বাস্তবিক শ্রীমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের এই দিনটি প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করিত।

শ্রীমার এই বিদেশিনীগণের সহিত ব্যবহার অপূর্ব। সকলকেই তিনি 'আমার মেয়ে' বলিয়া সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন। কেহই কাহারও ভাষা বোঝেন না, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! ভাবের প্রকৃত বিনিময় ঘটে হৃদয়ে, ভাষা তাহার কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে! শুভ্র বস্ত্র-পরিহিতা, অবগুণ্ঠনবতী সেই পবিত্রতা-স্বরূপিণীর নিকট বসিয়া মার্গারেট প্রভৃতি তাঁহার অপার্থিব করুণা ও স্নেহ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পল্লীজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে যিনি আবাল্য প্রতিপালিত, সুবিস্তৃত জগতের সহিত বাহিরের দিক দিয়া যাঁহার কোন পরিচয় ছিল না, চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠান যিনি সর্বতো-

ভাবে পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া, কত সহজে ে
বিদেশিনীগণকে কন্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়া অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলে
তাহা সত্যই বিস্ময়কর। কেবল কি তাহাই, মিস ম্যাকলাউডের সনির্ব
অনুরোধে তিনি তাঁহাদের সহিত একত্র আহার করিলেন। স্বামিজী এ
তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের নিকটেও ইহা অপ্রত্যাশিত। স্বামিজী রামকৃষ্ণানন্দ
লিখিতেছেন, 'শ্রীমা এখানে আছেন। য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলা
সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহি
একসঙ্গে আহার করিয়াছেন!' বহু দিক দিয়াই এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 'যখন যেমন তখন তেমন, এবং যেখানে যেমন সেখা
তেমন' এই শিক্ষা কি শ্রীমা এমন করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন! অথবা ই
তাঁহার সহজাত অপূর্ব বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার নিদর্শন যে সর্বাবস্থায় তাঁহা
আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত হইত!

শ্রীমা জানিতেন, এই মহিলাগণ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি
বশতঃ একান্ত শ্রদ্ধা লইয়া এদেশে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবা
একজনের উদ্দেশ্য এদেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা। সুতরাং ইঁহাদে
সহিত কোন আচরণ যেন দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া বেদনা না দেয়। তাঁহার অকপট
মধুর ব্যবহার সর্বপ্রকার ব্যবধানের সম্ভাবনা দূর করিয়া দিল। পরে ভগিন
নিবেদিতাকে তাঁহার সহিত বাসের অনুমতি দিয়া শ্রীমা তাঁহার মানসিব
উৎকর্ষ এবং সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, সে যুগে তাহা বাস্তবিব
আশ্চর্য।

মার্গারেটের মনে হইল, এই পরম নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলার সাদর
অভ্যর্থনার দ্বারা তিনি যেন হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন।

শ্রীমার সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহারা স্বামিজীর সহিত নৌকায় করিয়া
বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মঠে যাইবার পূর্বে স্বামিজী মার্গারেটকে
জানাইলেন, তাঁহাকে তিনি ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিবেন।

২৫শে মার্চ মার্গারেটের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। কার্যোপলক্ষ্যে তাঁহাকে
কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল। ২৩শে রাত্রে মার্গারেট পুনরায় বেলুড়ে
প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে স্বামিজীর নিয়ম ছিল সকালের দিকে কয়েক
ঘণ্টা বিদেশী শিষ্যগণের সহিত অবস্থান করা। ২৫শে মার্চ, শুক্রবার, দেখা
করিতে আসিয়া স্বামিজী তিনজনকে সঙ্গে করিয়া মঠে (নীলাম্বরবাবুর
বাগানবাড়িতে) লইয়া গেলেন। ঐ দিনটি ছিল The Day of Annunciation
—যেদিন দেবদূত আসিয়া ঈশা-জননী মেরীকে তাঁহার গর্ভে ভগবান জন্ম
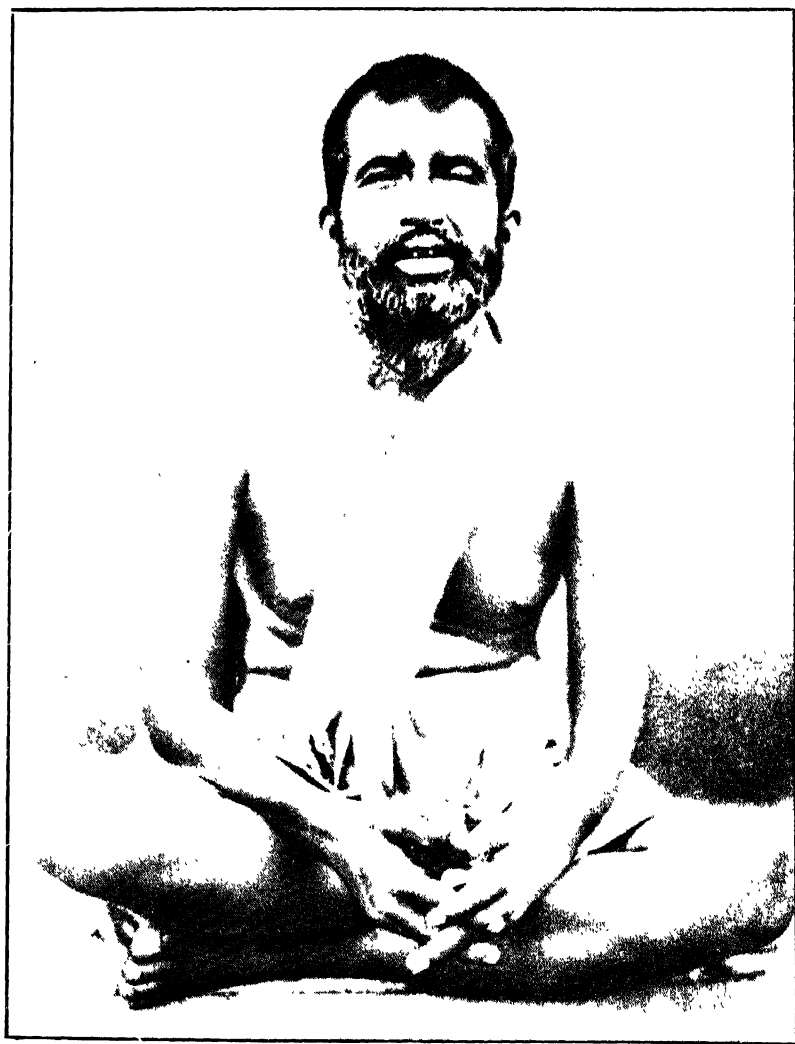
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয়নকক্ষ
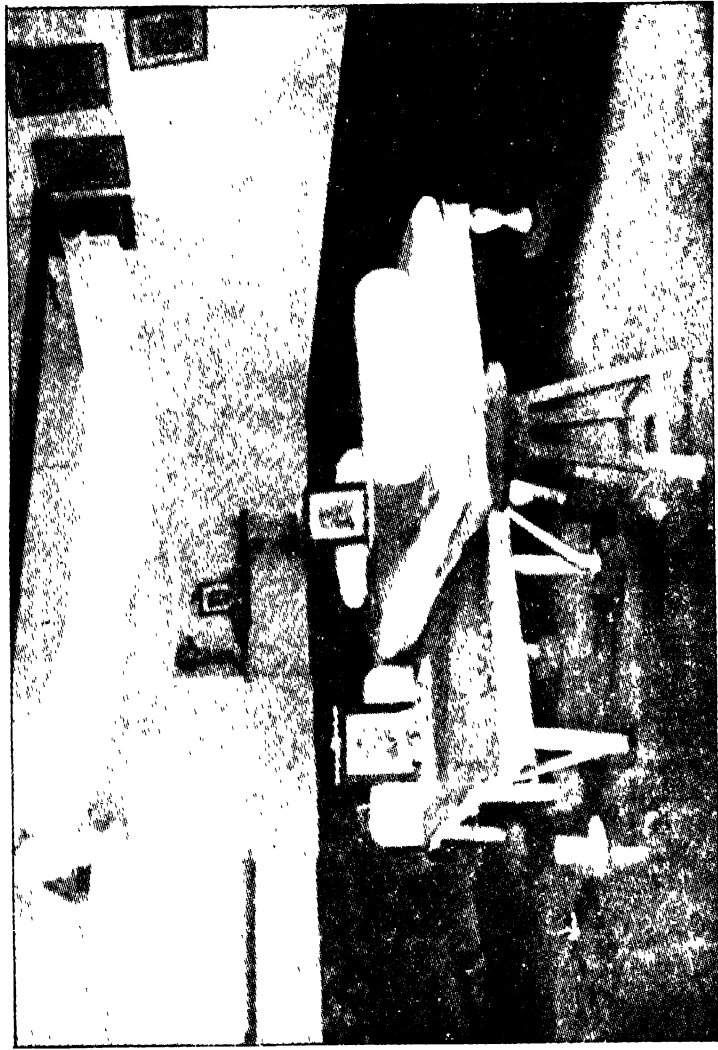
লইবেন, এই কথা জ্ঞাপন করেন। মঠে ঠাকুরঘরে পূজার আয়োজন ছিল। স্বামিজী প্রথমে মার্গারেটকে দিয়া সংক্ষেপে শিবপূজা করাইয়া পরে তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পূর্বক শুভ অনুষ্ঠান শেষ হইল।

স্বামিজী আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচ শত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।'

এ উপদেশ যেন মার্গারেটকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট যে কেহ উপদেশ লইতে আসিবে তাহাকেই দিলেন।

দীক্ষাকালে স্বামিজী মার্গারেটের নাম দিলেন নিবেদিতা। নবজন্ম লাভ করিলেন মার্গারেট। মার্গারেট ভগবচ্চরণে নিবেদিতা (dedicated) হইলেন। জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে যে নিবেদন ঘটিয়াছিল, আজ স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সে নিবেদন সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইল। চিরকালের জন্য তিনি ভগবৎ-পাদপদ্মে অর্পিতা হইলেন।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন. 'সেই প্রভাতটি জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত।'

পূজাশেষে সকলে উপরতলায় গেলেন। সম্ভবতঃ এই দিনটিকে বিশেষ-রূপে স্মরণীয় করিবার জন্যই স্বামিজী যোগী শিবের বেশ ধারণ করিলেন। জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল ধারণে তাঁহাকে মহাযোগী শিবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। অতঃপর এক ঘণ্টা ধরিয়া তিনি ভারতীয় সঙ্গীত আলাপন করিলেন।

উত্তরকালে নিবেদিতার উপর ভারতীয় ভাবের বিশেষ প্রভাব দেখা গিয়াছে। ভারতের সকল দেবদেবী ও সর্ববিধ পূজানুষ্ঠান তাঁহার নিকট যে গভীর অর্থ লইয়া দেখা দিত, তাহার মূলে ছিলেন স্বামিজী। বিশেষতঃ শিব ও বুদ্ধের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ, তাহাও সম্পূর্ণরূপে স্বামিজীর নিকট পাওয়া। সম্ভবতঃ তাঁহার দীক্ষাদিবসে শিবপূজা ও বুদ্ধের চরণে অঞ্জলি প্রদানের দ্বারা স্বামিজী নিবেদিতাকে বিশেষভাবে এই দুই মহাযোগীকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার প্রেরণা দিয়াছিলেন।

১৭ই ও ২৫শে মার্চ নিবেদিতার নিকট নবজীবনের যে বিশেষ অনু-প্রেরণা আনিয়াছিল, তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—

'ছয় বৎসর পূর্বে আজিকার দিনটিতে আমি শ্রীশ্রীমার প্রথম দর্শন লাভ করি এবং তোমার সঙ্গে বেলুড়ে গমন করি। সেদিনও বৃহস্পতিবার ছিল।

কালের প্রবাহে পুনরায় আমরা সেই দিনগুলিতে আসিয়াছি। পরের শুক্রবার, ২৫শে মার্চ, যেদিন আমি 'নিবেদিতা' নামে প্রথম অভিহিত হই, তাহার বার্ষিক দিবস। সুতরাং আমরা সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিতেছি' (মিস ম্যাকলাউডকে ১৭।৩।১৯০৪ তারিখে লিখিত)।

দীক্ষার দিনটি স্বামিজী সর্বতোভাবে প্রিয় শিষ্যার শিক্ষার জন্য পৃথক রাখিয়াছিলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বসিয়া তিনি নিবেদিতার সহিত কথাপ্রসঙ্গে অকপটভাবে তাঁহার জীবনের দায় সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। স্বীয় গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত যে মহৎ কার্যভার তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছিল, তাহার জন্য কী গভীর উদ্বেগ তাঁহার অন্তরে! এই কর্তব্য-ভারের কথা বহুপূর্বে তিনি এক পত্রে (২৬।৫।১৮৯০) লিখিয়াছিলেন, 'আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।' শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ-স্থাপনরূপ মহৎ দায়িত্ব তাঁহার উপর ছিল ; যে সংঘ দ্বারা কেবল সমগ্র ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে অনেক কথা মনে হয়। স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সর্বত্র 'প্রচারক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' বা 'মঠ' স্থাপন করা। কাশীপুরে যে মঠের সূত্রপাত, তাহা পরে বরাহনগর, আলমবাজার হইয়া বেলুড়ে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মঠের পরিচালনার ভার স্বামিজী স্বয়ং এবং তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ গ্রহণ করিয়া আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করেন। নারীজাতির উন্নতিকল্পে অনুরূপ একটি মঠ স্থাপনে স্বামিজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল ; কিন্তু তৎকালীন সমাজ তাহার অনুকূল ছিল না। স্বামিজী বুঝিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, অথচ বিলম্ব তিনি সহিতে পারিতেছিলেন না। নারীগণের জন্য যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহার পূর্ণ পরিণতি ভবিষ্যতে ঘটিবে, কিন্তু তাহার উদ্বোধনকার্য তাঁহাকেই সম্পন্ন করিতে হইবে। যেমন তিনি সন্ন্যাসি-সংঘ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার জীবনের আদর্শ ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তেমনই নারীজাতির সম্মুখেও ত্যাগ ও সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ জীবন স্থাপন করা তাঁহার অন্যতম কর্তব্য। ঐ আদর্শ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল এরূপ রমণীর, যিনি বর্তমান যুগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত অথচ প্রাচীন ভাবসম্পদের অধিকারিণী, আর সর্বোপরি, যিনি ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিতা। নিবেদিতার মধ্যে স্বামিজী

সেই জীবন-যাপনের যোগ্য অধিকারিণী দেখিতে পাইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও তাঁহার বিদ্যালয়টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, নানারূপ সমস্যায় নিজেকে বিজড়িত করিলেও আজীবন ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করিয়া ও স্বামিজী প্রবর্তিত কার্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিবেদিতা বরাবর মূল লক্ষ্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়া এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে ভগিনী সুধীরা অনুরূপ জীবন-যাপনে সমর্থা হন। তদানীন্তন পরিবেশ বিরুদ্ধ হইলেও আরও অনেকের হৃদয়ে ঐরূপ জীবন-যাপনের আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, যাহার ফলে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিদ্যালয়টিতে আদর্শের ধারা বজায় ছিল। নিবেদিতাকে দিয়া স্বামিজী যদি ঐ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিহাসে স্বামিজী-পরিকল্পিত ভাবী স্ত্রীমঠের যোগ-সূত্রটি থাকিত না। বস্তুতঃ এই দিক দিয়া ভাবিলে বুঝিতে পারা যায় নিবেদিতার ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান ও বিদ্যালয়-স্থাপন, এ দুটির তাৎপর্য কত দূর। যথাসময়ে, যথাবিধি বীজ বপন করা হইয়াছিল, অঙ্কুরোদ্‌গমও তাহাতে দেখা গিয়াছিল ; কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থা উহার দ্রুত বৃদ্ধির অনুকূল ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে ভগিনী নিবেদিতার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল তাহা জীবনদেবতা তাঁহাকে দিয়া যথাযথ অভিনয় করাইয়াছেন।

'নিবেদিতা' নামটি স্বামী বিবেকানন্দের এক অনবদ্য সৃষ্টি। জানিতে ইচ্ছা হয়, কিরূপে এই নামটি তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল! নিবেদিতাকে তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'Dedicated' শব্দের বাংলা করিতে গিয়াই কি ইহা তাঁহার মনে আসিয়াছিল? যে ভাবেই হউক, নামের এরূপ সার্থকতা কদাচিৎ দেখা যায়। নিজেকে সর্বপ্রকারে ভারতের কল্যাণে নিবেদন করিয়া তিনি গুরুদত্ত নাম সফল করিয়া গিয়াছেন। অথবা সেই মহাপুরুষ কর্তৃক তিনি নিবেদিত হইয়াছিলেন বলিয়াই সে অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইয়াছিল! যাহা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোন বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব—কিছুই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।'

নিবেদিতার ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষার চার দিন পরে ২৯শে মার্চ স্বামী স্বরূপানন্দের সন্ন্যাস হয়। ৩০শে মার্চ অসুস্থতাবশতঃ স্বামিজী দার্জিলিঙ যাত্রা করিলেন।

স্বামিজী চলিয়া গেলে অতিথিগণের দেখাশুনার ভার স্বামিজীর গুরু-ভ্রাতৃগণ গ্রহণ করিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'সারা মঠই আমাদের অতিথি মনে করিতেন, সেইজন্য এই অতিথি-সৎকারপরায়ণ সাধুগণ কখনও আমাদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ এবং কখনও সেবা-উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিতেন।...আমাদের ভারতীয় গৃহস্থালীর নিত্য নূতন সমস্যা-গুলির সমাধানের জন্য প্রত্যহ একজন করিয়া ব্রহ্মচারী মঠ হইতে প্রেরিত হইতেন। আর একজনের উপর বাংলা শিখাইবার ভার ছিল।...আর যখন স্বামিজী স্বয়ং কয়েক সপ্তাহের জন্য অন্যত্র গমন করিলেন, তখন সংঘের পুরাতন সাধুগণের মধ্যে কেহ না কেহ, অতিথিগণের সৎকার ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেদের দায়ী মনে করিয়া প্রতিদিন নিয়মিত প্রাতঃকালের চায়ের টেবিলে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতেন।'

এইরূপেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামিজীর অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের অনেকের সহিত ইঁহাদের একটি স্নেহমধুর সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। পরবর্তী কালে স্বামিজীর অদর্শনেও তাহা অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ নিবেদিতা সকলেরই স্নেহের পাত্রী ছিলেন। এই সময়েই, ইঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া এবং প্রধানতঃ স্বামী সদানন্দ-প্রদত্ত বিবরণ হইতে স্বামিজী মঠে কিরূপ জীবন যাপন করিতেন, নিবেদিতা তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেন। স্বামী সদানন্দ ও স্বামী স্বরূপানন্দ নিবেদিতার ভাব-পরিপুষ্ট-সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর দার্জিলিঙ অবস্থানকালে ২রা এপ্রিল নিবেদিতা মাতাজী তপস্বিনীর বিদ্যালয় মহাকালী পাঠশালায় পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করেন। স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দও উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান বেলুড় মঠের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলে ৭ই এপ্রিল শ্রীমাকে নৌকাযোগে নীলাম্বরবাবুর বাটীস্থ মঠে লইয়া আসা হয়। তিনি তথায় ঠাকুরঘরে পূজা ও ভোগনিবেদন করেন। বিকালে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে তিনি নৌকা করিয়াই বর্তমান মঠের জমিতে পদার্পণ করিলে নিবেদিতা, ধীরা মাতা ও জয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং সঙ্গে করিয়া সমস্ত জমি দেখাইয়া দেন।

দিনগুলি প্রকৃতই আনন্দে কাটিতে লাগিল। কোনদিন নৌকায় করিয়া

রাত্রির চন্দ্রালোকে তাঁহারা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গমন করিতেন ; কোন দিন সকালে তিনজনে একত্র মঠের ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান করিতেন। মিস ম্‌লার ইতিমধ্যে দার্জিলিঙ গমন করেন এবং নিবেদিতারও দার্জিলিঙ অবস্থানের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামিজী টেলিগ্রাম করিয়া নিবেদিতাকে যাইতে নিষেধ করেন। পূর্বেই তিনি ইঁহাদের লইয়া আলমোড়া প্রভৃতি যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে, কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে, এই সংবাদ পাইবা-মাত্র স্বামিজী ৩রা মে মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আতঙ্কিত জনসাধারণ কলিকাতা-ত্যাগের উদ্যোগ করিতেছিল। ভীত এবং পলায়নপর নাগরিকগণকে সাহস দিবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। স্বামিজীর আদেশে নিবেদিতা দুদিন ধরিয়া ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। উহার বাংলা এবং হিন্দী অনুবাদ করা হইল। মর্মার্থ, রামকৃষ্ণ মিশন পীড়িতের যথাসাধ্য সেবা করিবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামাও লাগিয়াছিল। মূর্তিমান অভয়দাতার মত স্বামিজীর আবির্ভাব ও ঘোষণা জনসাধারণকে বহু পরিমাণে আশ্বাস দান করিল। এই সেবা-কার্যের জন্য অর্থাভাব ঘটিলে স্বামিজী নূতন মঠের জমিজায়গা বিক্রয় করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। প্রয়োজন অবশ্য হয় নাই। তাঁহার আবেদনে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য উপস্থিত হইয়াছিল।

প্লেগকার্যের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা হইয়া গেলে ১১ই মে স্বামিজী আলমোড়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ, মিসেস বুল, মিসেস প্যাটারসন (আমেরিকান কনসাল জেনারেলের পত্নী), মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা।

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে

১১ই মে, ১৮৯৮, বুধবার বিকালে স্বামিজী দলবল সহ যাত্রা করিলেন। ৭-১৫ মিঃ হাওড়া হইতে ট্রেন ছাড়িল। এই ভ্রমণ প্রসঙ্গ বর্ণনার প্রারম্ভে নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা কী অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি! আর যেমন আমরা একটির পর একটি নূতন নূতন স্থানে আসিতে লাগিলাম, কী অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত স্বামিজী আমাদিগকে সেই সকল স্থানের প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন!'

বহু দিক দিয়া এই ভ্রমণ নিবেদিতার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এই ভ্রমণকালেই অন্যান্য সঙ্গিনীগণের সহিত তিনি নিরন্তর স্বামিজীর দুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। আর স্বামিজী বহু সময় এমন দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত থাকিতেন যে, যাঁহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলেন, তাঁহারাও এই দৃশ্যমান জগতের বাহিরে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আভাস পাইতেন। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়াই নিবেদিতা ভারতমাতাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতের একটি অখণ্ড রূপ তাঁহার স্বচ্ছ বুদ্ধিদীপ্ত মনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, এক অবর্ণনীয় মানসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া তিনি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আইরিশ হইলেও নিবেদিতা নিজেকে ইংরেজ বলিয়াই পরিচয় দিতেন এবং ইংলন্ডই তাঁহার স্বদেশ ছিল। এই ভ্রমণকালে তাঁহার ইংরেজ-প্রীতি বিরাগে পরিণত হইতে আরম্ভ করে।

বেলুড় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ভারত ভ্রমণ পর্যন্ত দিনগুলির স্মৃতি কেবল মধুর নহে, প্রেরণাদায়ক : কারণ সকল চিত্রই স্বামিজীর উপস্থিতির দ্বারা মহিমান্বিত। তিনিই ছিলেন এই অন্তরঙ্গ ভক্ত-পরিধির জ্যোতির্ময় মধ্যবিন্দুস্বরূপ।

এই দিনগুলির কথা উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'এ বৎসর দিনগুলি কী সুন্দরভাবেই না কাটিয়াছে! এই দিনেই যে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে! প্রথমে নদীতীরে বেলুড়ের জীর্ণগৃহে, পরে হিমালয়ের বক্ষে, নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নানাস্থানে পরিভ্রমণকালে —সর্বত্রই এমন সব মুহূর্ত আসিয়াছিল, যাহা কখনও ভুলিবার নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি, যাহা আমাদের সারাজীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে

থাকিবে। আর অন্ততঃ জাগরূক থাকিবে বারেকের লব্ধও সেই চকিত দিব্য দর্শন!

'সে সবই যেন একটা খেলা!

'এমন এক প্রেমের বিকাশ আমরা দেখিয়াছি, যাহা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রকে, অজ্ঞ হইতেও অজ্ঞকে আলিঙ্গন করিয়া এক হইয়া যায় এবং তাহারই দৃষ্টিতে তখন সমগ্র জগৎকে দেখে, যেন তাহাতে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই।

'বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি। এ সমস্ত দিব্যলীলায় মনে হয়, যেন বালরূপী ভগবান তাঁহার শিশুশয্যা হইতে জাগিতেছেন আর আমরা দাঁড়াইয়া সাক্ষিস্বরূপ নিরীক্ষণ করিতেছি!

'কিন্তু ইহাতে কোনরূপ মানসিক উগ্রতা বা কঠোর গাম্ভীর্যের ভাব ছিল না। দুঃখ আমাদের সকলেরই কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। অতীতের কত শোক-স্মৃতি আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দুঃখও ঊর্ধ্বশিখ হইয়া হেম-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইত, দীপ্তিতে মণ্ডিত হইত, তাহাতে কোনরূপ দাহ থাকিত না।

'মনের কিরূপ অবস্থায় নব নব ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং কোন্ মহা-পুরুষগণ এই ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা দেন—তাহার কতকটা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কারণ আমরা এমন এক দিব্যমানবের সঙ্গ লাভ করিয়াছি, যিনি সকল রকম লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, সকলের বক্তব্য শুনিতেন, প্রত্যেকের জন্যই সহানুভূতি বোধ করিতেন এবং কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন নাই। যে দীনতার নিকট সকল দৈন্য দূরীভূত হয়, যে ত্যাগ অত্যাচারীর প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কারে এবং উৎপীড়িতের প্রতি অসীম করুণায় আত্মবলিদানে উন্মুখ, যে প্রেম তীব্র উৎপীড়ন এবং মৃত্যুর আসন্ন পদসঞ্চারকেও আশিস-বচনে স্বাগত সম্ভাষণ করে—সে দীনতা, সে ত্যাগ, সে প্রেম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যিনি অশ্রুজলে শ্রীভগবানের চরণযুগল অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কেশ দ্বারা সেই অভিষিক্ত চরণ মুছাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্যবতীর পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান আমরাও করিয়াছি। এই অবসর আমরা পাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁহার সেই ভাববিহ্বল আত্মবিস্মৃতি আমাদের কোথায়?

'যাঁহারা এরূপ শুভমুহূর্তের আস্বাদ পাইয়াছেন, জীবন তাঁহাদের নিকট অধিকতর মূল্যবান, মধুময়। দীর্ঘ, নিরানন্দ নিশীথের তালবন-সঞ্চারী বায়ুও

উদ্বেগ ও আশঙ্কার পরিবর্তে' তাঁহাদের কর্ণে শান্তিময় বাণী ধ্বনিত করিয়া তোলে—মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব!'

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পাটলীপুত্র বা পাটনা হইতেই ভারত সম্বন্ধে শিক্ষা আরম্ভ হইল। স্বামিজী বহু সময় তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণের কামরায় অবস্থানকালে দৃষ্টিপথে যাহাই আসিত তাহারই ব্যাখ্যা করিতেন। কাশীর ঘাটগুলির প্রশংসা করিলেন, লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ শিল্পদ্রব্য ও বিলাস-উপকরণ-গুলির নাম ও যথেষ্ট গুণ বর্ণনা করিলেন। বিশ্রুত মহানগরীগুলির বিখ্যাত কীর্তিসমূহ ব্যাখ্যা করিতে যেমন তাঁহার ক্লান্তি ছিল না, তেমনি আবার সাধারণ দরিদ্র কৃষকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-বর্ণনায় তাঁহার অসীম উৎসাহ ছিল। বস্তুতঃ সমগ্র আর্যাবর্তের মহিমা কীর্তনের সময় স্বামিজীর স্বদেশ-প্রেম মূর্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার নিকট সমগ্র দেশ এক অখণ্ড সত্তার বহির্বিকাশ মাত্র।

১৩ই মে ভোর পাঁচটার সময় যাত্রিগণ কাঠগোদাম পেঁীছিলেন। প্রত্যূষের আলোকে কয়েক শত গজ দূরে সমুন্নতমস্তক পর্বতরাজ হিমালয়ের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর। কাঠগোদাম হইতে প্রথমে টাঙ্গা এবং পরে ঘোড়া ও ডান্ডী করিয়া তাঁহারা নৈনীতাল আগমন করেন। এখানে তাঁহারা খেতড়ীরাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন।

১৬ই মে নৈনীতাল হইতে সকলে অশ্বপৃষ্ঠে আলমোড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শীঘ্রই রাত্রি হইয়া গেল। উচ্চ-নীচ পার্বত্য পথ, কোথাও কোনা বাহির করা পাহাড় ঘুরিয়া গিয়াছে ; সর্বত্রই বিশালবৃক্ষচ্ছায়াবহুল। লোক-জন আগে আগে চলিয়াছে, তাহাদের হাতে মশাল ও লণ্ঠন। যতক্ষণ বেলা ছিল, গোলাপের বন, ঝরনার আশেপাশে ফার্ন এবং বন্য ডালিম গাছের ঝোপে রক্তবর্ণ কুঁড়িগুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল ; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে কেবল হানিসাকল ও অন্যান্য ফুলের সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। গন্তব্য স্থান কতদূরে, কাহারও জানা নাই। রজনীর নিস্তব্ধতা, অস্ফুট নক্ষত্রালোক এবং পর্বতমালার গাম্ভীর্য যাত্রিদলের মনে এক অননুভূত আনন্দের সৃষ্টি করিল। অবশেষে পর্বতের পার্শ্বে অবস্থিত ডাকবাংলায় সে রাত্রির মত সকলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী অপর সন্ন্যাসিগণের সহিত সকলের শেষে ছিলেন ; একটু পরেই তিনি আসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অতিথিগণের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। চারি-দিক অপার্থিব নৈশ-দৃশ্যাবলীর কবিত্বে ভরপুর,—প্রজ্বলিত অগ্নির পার্শ্বে উপবিষ্ট কুলিসমূহ, অশ্বগণের হ্রেষারব, নিকটস্থ পান্থশালা, বৃক্ষরাজির

সন্ সন্ শব্দ, অরণ্যানীর গভীর ভাবোদ্দীপক তমিস্রা এবং স্বামিজীর আনন্দময় উপস্থিতি।

পরদিন সকালে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া অবশেষে তাঁহারা আলমোড়া উপস্থিত হইলেন। আলমোড়ায় স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণের সহিত সেভিয়ার-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। নিবেদিতা এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা হইল কিছুদূরে একটি বাংলায়। এখানে তাঁহারা প্রায় এক মাস অবস্থান করেন।

আলমোড়ায় স্বামিজী পুরাতন অভ্যাস বজায় রাখিয়া প্রতিদিন সকালে শিষ্যগণের সহিত প্রাতরাশে যোগ দিতেন। এই সময়ে শিক্ষাদানও চলিত। বস্তুতঃ ট্রেনে যে শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, আলমোড়ায় আসিয়া এবং সারা গ্রীষ্মকাল ধরিয়া ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষা চলিয়াছিল। এই শিক্ষা-দানের পদ্ধতি ছিল সাধারণ। সকলেই বারান্দায় অথবা বাগানে বসিতেন। স্বামিজীর কথাবার্তা সকলেই মনোযোগসহকারে শুনিতেন ; যিনি যতটা পারেন গ্রহণ করিতেন, এবং পরে ইচ্ছামত আলোচনার স্বাধীনতা ছিল।

প্রতিদিন মূল আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাচ্য জীবনযাত্রা, উহার আদর্শ এবং প্রতীচ্যের সহিত উহার পার্থক্য। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য সভ্যতা, শাসন-প্রণালী, বিভিন্ন যুগের ইতিহাস প্রভৃতি বর্ণনাকালে আর্যজাতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন জাতির কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান আলো-চনা চলিত। অথবা যেদিন স্বামিজীর হৃদয় বিশ্বজনীনভাবে পূর্ণ থাকিত, সেদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে চীন এবং সুদূর ইটালী চলিয়া যাইতেন। চীনের প্রশংসায় তিনি মুখর হইয়া উঠিতেন। ইটালীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইত ; যে ইটালী য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয়—ধর্ম ও শিল্পের, সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাটসিনির জন্মদাত্রী ; উচ্চভাব, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার প্রসূতি। প্রাচ্য দেশগুলির বর্ণনাকালে সংকীর্ণ জ্ঞান লইয়া কোন পাশ্চাত্য শিষ্য কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বামিজীর নিকট হইতে তীব্র প্রতিবাদ আসিত।

বিভিন্ন যুগের স্বদেশপ্রেমিক, যোদ্ধা প্রভৃতির বর্ণনাকালে স্বামিজীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এবং যখন তিনি মহামানবগণের, বিশেষতঃ বুদ্ধের প্রসঙ্গ করিতেন, নিবেদিতার মনে হইত সে মুহূর্ত বাস্তবিকই ধন্য! বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে স্বামিজী যখন অম্বপালীর কাহিনী বলিলেন—বুদ্ধদেবকে আহার করাইয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন—তখন নিবেদিতার রসেটী-রচিত মেরী ম্যাজডলেনের আকুল ক্রন্দনাত্মক বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়িল।

স্বদেশপ্রেমই একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল না। একদিন সকালে দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনার বিষয় ছিল ভক্তি। ভক্তির শেষ পরিণতি প্রেমাস্পদের সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য।

একদিন শিব ও উমার উপাখ্যান বলিতে বলিতে ঊষালোকে রঞ্জিত তুষার-রাশির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায়, তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি উহাই শিব, আর উপরিস্থিত আলোকসম্পাতই জগজ্জননী।' ঈশ্বরই জগৎ হইয়াছেন, তিনি জগতের ভিতরে বা বাহিরে নহেন, এই চিন্তাই স্বামিজীর মনকে এই সময়ে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।

বস্তুতঃ সারা গ্রীষ্মকাল ধরিয়া স্বামিজী হিন্দুধর্মের উপাখ্যানসমূহ অক্লান্তভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন; কেননা এইগুলি চরিত্রগঠনের সহায়ক। ইহার মধ্যে শুকের কাহিনী নিবেদিতার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় আলমোড়ার দিগন্তপ্রসারী দৃশ্যাবলীর মধ্যে তুষার পর্বতরূপী শঙ্কর যখন তাঁহাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত, তখন তাঁহারা প্রথম শুকের কাহিনী শ্রবণ করেন। 'অহং বেদ্মি, শুকো বেত্তি, ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা' —শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ এই শিববাক্য আবৃত্তি করিতে করিতে স্বামিজীর মুখে যে অপূর্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছিল—যেন তিনি এক আনন্দ বারিধির অতল প্রদেশে অবগাহন করিয়াছেন—তাহা নিবেদিতা কখনই ভুলিতে পারেন নাই।

স্বামিজীর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির সহিত অনুপম ভাষায় বর্ণিত এই সকল কাহিনী সকলেই শুনিতেন, কিন্তু নিবেদিতা সেগুলি শুধু সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিতেন না, পরন্তু হৃদয়ের মর্মস্থলে সেগুলিকে এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া লইতেন যে, তাঁহার মানসপটে তাহারা সর্বদা সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। অজস্র কাহিনীর দ্বারা ভারতাত্মার পরিপূর্ণ রূপকে কে এমন করিয়া উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছেন, আর সেই সকল কাহিনী এবং তাহার বক্তাকে দিব্য লেখনীর স্পর্শে অমর করিয়া রাখিবার ক্ষমতাই বা আর কাহার ছিল নিবেদিতা ছাড়া? তাঁহার উত্তরকালের সমগ্র রচনার উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিবেদিতা এই সময়েই সংগ্রহ করিয়াছিলেন--কালের ব্যবধানে সেগুলি পরিণতি লাভ করিয়াছিল মাত্র।

নিবেদিতার সার্থক রচনা 'The Master as I Saw Him' ও 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' স্বামিজীর

অপূর্ব জীবনের আলেখ্য বলিয়াই এত উৎকৃষ্ট। তাঁহার 'শিব ও বুদ্ধ' পুস্তক স্বামিজীরই তদ্‌গতচিত্তের প্রতিধ্বনি মাত্র।

মনস্বিনী নিবেদিতার ধারণাশক্তির কথা ভাবিলে আশ্চর্য লাগে। কত অল্প সময়ের জন্য তিনি স্বামিজীর সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু স্বামিজী যাহা কিছু বলিয়াছেন, সমস্তই অন্তরে ধারণা করিয়া রাখা কি অপ্রাকৃত ক্ষমতা নহে? প্রাচীন ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া বর্তমান ভারত পর্যন্ত এক অখণ্ড ভারতবর্ষের চিত্র স্বামিজী নিবেদিতার চোখের সামনে ধরিয়াছিলেন। সে চিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু যে দর্পণে উহা প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাও অত্যন্ত স্বচ্ছ। 'বক্তাও আশ্চর্য, লব্ধাও কুশল।'

আত্মসমর্পণ

ভারতাত্মার সহিত ঐক্য অনুভবের পূর্বে নিবেদিতার এক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা ছিল, এবং আলমোড়ায় আগমনের পর হইতেই সে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহাকে দিয়া স্বামিজী যে কার্যের উদ্বোধন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল নিবেদিতার ভারতীয় ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অথচ তখন পর্যন্ত তিনি মনেপ্রাণে খাঁটী ইংরেজ ছিলেন।

দীক্ষার পরদিন স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি এখন নিজেকে কোন্ জাতি বলিয়া চিন্তা করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি জানিতে পারিলেন, ব্রিটিশ জাতীয় পতাকার উপর নিবেদিতার এমন প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা যে উহা ইষ্টদেবতার প্রতি হিন্দু রমণীর মনোভাবের অনুরূপ। স্বামিজী বিস্মিত হইলেন। ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষালাভের পরেও ইংরেজজাতির প্রতি তাঁহার প্রবল পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগ দর্শনে স্বামিজী বুঝিলেন, নিবেদিতা অত্যন্ত অগভীর-ভাবে তাঁহার নবজীবন স্বীকার করিয়াছেন। ঐ ধারায় সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন দিয়া চিন্তা ও চলন-বলনের পরিবর্তন সাধন এখনও প্রচুর শিক্ষাসাপেক্ষ। তিনি ভারতকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনেপ্রাণে ভারতীয় হইতে পারেন নাই।

আলমোড়ায় প্রতিদিন বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্য দিয়া যে শিক্ষা আরম্ভ হইল, তাহা নিবেদিতার নিকট নূতন ও অননুভূত। এ যেন নূতন করিয়া পাঠশালায় পাঠ লওয়া। পাঠশালার শিক্ষা ও শাসন শিক্ষার্থীর নিকট প্রায়ই অপ্রীতিকর। ইংলণ্ডের ক্লাসগুলিতে যোগদান করিবার সময় নিবেদিতা যেমন যুক্তিতর্ক করিতেন, এখানে তাহা কিছু কমিলেও বহু সময় তাঁহার মানসিক প্রতিক্রিয়া বাহিরে তর্কের আকারেই প্রকাশ পাইত। লণ্ডনে স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিবার পর নিবেদিতার ভাবজগতে প্রবল আলোড়ন ঘটিয়াছিল ; তাঁহার বহু দৃঢ়বদ্ধ মৌলিক ধারণাকে স্বামিজী প্রবল আঘাত দিয়াছিলেন। এই সময়ে আবার নিবেদিতার সেই সযত্নপোষিত সংস্কারগুলির উপর নিত্য আক্রমণ ও তিরস্কার-বর্ষণ চলিতে লাগিল। লণ্ডন ও আলমোড়ার মধ্যে বহু পার্থক্য ছিল। লণ্ডনে প্রচারকরূপে স্বামিজী তাঁহার আদর্শ ব্যাখ্যা করিতেন মাত্র, ব্যক্তিগত নিবিড় সম্বন্ধ ছিল না ; আর এখানে ছিল আত্মীয়তা-

বোধ। স্বামিজীর বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা ও আলোচনার লক্ষ্য ছিলেন নিবেদিতা। তিনজন পাশ্চাত্য মহিলার মধ্যে তিনিই ছিলেন ইংরেজ।[১] তাঁহার স্বদেশ-পক্ষপাতিত্ব এবং ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্বগুলিকে স্বামিজী নিদারুণ ভাষায় আক্রমণ করিতেন। প্রাচ্য এবং য়ুরোপীয় ইতিহাস ও উচ্চ আদর্শের দীর্ঘ তুলনা চলিত, বহু মূল্যবান প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও স্বামিজী করিতেন। তখন পর্যন্ত ইংরেজ নারীরূপে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তা-প্রণালী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক আলোচনাসমূহ নিবেদিতার দৃঢ়মূল পূর্বসংস্কারগুলির সহিত সংঘর্ষের আকার ধারণ করিত। আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামিজী যেদিন চীনদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, নিবেদিতা তখন সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু, স্বামিজী. চীনজাতির অসত্যপরায়ণতা একটা সর্বজন-বিদিত দোষ।'

স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'অসত্যপরায়ণতা! সামাজিক কঠোরতা! এগুলি অত্যন্ত আপেক্ষিক শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিশেষতঃ অসত্যপরায়ণতার কথা বলতে গেলে. মানুষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না করত, তা হলে বাণিজ্য, সমাজ অথবা যে কোন প্রকার সংহতি একদিনও টিকতে পারত কি? যদি বল, শিষ্টাচারের খাতিরে অসত্যপরায়ণ হতে হয়. তবে পাশ্চাত্যদের এ বিষয়ে যে ধারণা, তার সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? ইংরেজ কি সকল সময়েই যথাযথ স্থানে দুঃখ এবং সুখ বোধ করে থাকে? বলতে পার, মাত্রাগত তারতম্য আছে। হতে পারে, কিন্তু শুধু মাত্রাগত।'

কোন প্রকার বন্ধনের স্বামিজী সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন। একদিন ঐ প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলিলেন, 'হিন্দুরা এই জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন, আমি তা অনুভব করতে পারি না। আমার মনে হয়, নিজের মুক্তিসাধনের চেয়ে যে সকল মহৎ কাজ আমার প্রীতিকর, তাতে সহায়তা করবার জন্য ফের জন্মগ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।'

স্বামিজী তীব্রস্বরে উত্তর দিলেন. 'তার কারণ তুমি ক্রমোন্নতির ধারণাটা জয় করতে পার না। কিন্তু কোন বাইরের জিনিসই ভাল হয় না। তারা যেমন আছে তেমনি থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।'

অবশ্য 'তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই,' এই কথাটি

[১] নিবেদিতা আইরিশ হইলেও ভারতীয়দের দৃষ্টিতে তখনকার দিনে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের সকলকেই ইংরেজ মনে করা হইত, এবং তাঁহারাও সাধারণতঃ ঐরূপ পরিচয়ই দিতেন।

নিবেদিতার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপেই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আলাপ-আলোচনার মধ্যে স্বামিজীর সহিত সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিত। নিবেদিতার কথায় ও আচরণে প্রকাশ পাইত, ভারতকে বুঝার মূলে ইংরেজ-গণের কতদূর পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান, এবং নিজেদের কীর্তিকলাপ ও ইতিহাসকে তাঁহারা কিরূপ অন্ধগৌরবের চক্ষে দেখেন। নারীজাতি সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য-গণের আধুনিক ধারণাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেন।

পরে একদিন স্বামিজী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, 'বাস্তবিক, তোমার যে-রকম স্বজাতিপ্রেম, ও তো পাপ। আমি চাই তুমি এইটুকু ধারণা কর যে, অধিকাংশ লোকেই স্বার্থের প্ররোচনায় কাজ করে। কিন্তু তুমি ক্রমাগত এই সত্যটিকে উল্টে দিয়ে প্রমাণ করতে চাও, একটি জাতিবিশেষের সকলেই দেবতা। অজ্ঞতাকে এ-রকম আগ্রহের সঙ্গে ধরে থাকা মন্দবুদ্ধির পরিচয়।'

স্বামিজী ছিলেন প্রকৃত আচার্য। তাঁহার দৃষ্টিতে নিবেদিতার অন্ধ-বিশ্বাসকে দূর করিবার জন্য য়ুরোপীয় সমাজের তীব্র আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টার মধ্যে কোন মত বা ধারণাকে বলপূর্বক পরের উপর চাপাইয়া দেওয়ার প্রবৃত্তি ছিল না ; ছিল শুধু একদেশদর্শিতা হইতে সর্বদা দূরে রাখিবার ঐকান্তিক আগ্রহ। স্বাভাবিক ভাবাবেগ হইতে একটি মনের গতিকে ফিরাইতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন কঠোরভাবে সত্যের উদ্ঘাটন। মনস্তত্ত্বের গভীর রহস্য স্বামিজীর অজ্ঞাত ছিল না। প্রতিকারের জন্য আবশ্যক কোন প্রক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে কঠিন বা অপ্রীতিকর হইলেও স্বামিজী তাহাকে নরম করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেন না। এই পরীক্ষার অন্তে শিক্ষার্থীর নূতন বিশ্বাস ও মত কিরূপ দাঁড়াইল, স্বামিজী তাহা জানিতে চাহিতেন না ; এবং অপর কাহারও বেলায় তাহাদের জাতিপ্রেম ও দেশপ্রীতির সহিত বিজড়িত ধারণাগুলি সম্বন্ধে তিনি ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতেন না। নিবেদিতা পরে আক্ষেপ করিয়াছেন, 'শিখিবার বিষয় অনেক ছিল, কিন্তু সময় ছিল কত অল্প! শিক্ষার্থীর অহংনাশই ছিল এখানে শিক্ষার প্রথম সোপান। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর সাহস এবং অকপটতারও পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল।' বস্তুতঃ এই পরীক্ষা যে নিবেদিতার নিকট তখন ক্লেশকর মনে হইয়াছিল, তাহার কারণ তাঁহার নিজ মনের অনুদারতা। পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সত্যকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবার প্রেরণা দেয় মনের উদারতা ও স্বার্থশূন্যতা। ইহার পরিবর্তে নিজের সীমাবদ্ধ সহানু-ভূতি নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

চিন্তায় ও অনুভূতির ক্ষেত্রে স্বামিজীর দৃষ্টিভঙ্গী এত পরিপূর্ণ ও

সবল ছিল যে, নিবেদিতার মানসিক রাজ্যে উহা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিকে শিক্ষার এই কঠোরতা তো ছিলই, ইহারই সহিত আর একটি বিষয় তাঁহাকে প্রবলভাবে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার নিকট ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। স্বামিজীর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার ভারতে আগমন। তাঁহার মধ্যে নিবেদিতা এক অনুকূলভাবাপন্ন, প্রিয় আচার্যলাভের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে স্বামিজীর ব্যবহারে তাঁহাকে উদাসীন, হয়তো বা বিরূপ বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। এই চিন্তাও নিবেদিতার নিকট অসহনীয় ছিল। এক দিকে আশাভঙ্গের ফলে অবিশ্বাসের উদয়, অপর দিকে বিরক্তি এবং কতকটা শক্তি পরীক্ষার চেষ্টা—এই উভয়সংকটে পড়িয়া নিবেদিতা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

স্বামিজীর সহিত এইরূপ সংঘর্ষের কারণ ছিল। তাঁহার অনন্যসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা নিবেদিতা গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আদর্শ এবং যুক্তিগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করিবার মত মানসিক দীনতা নিবেদিতার ছিল না। তিনি নিজে যদি সাধারণ হইতেন, তাহা হইলে স্বামিজীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা কেবল আকৃষ্ট নহে, অভিভূত হইতেন এবং নিজ মতবাদ বা যুক্তি অনায়াসে বিসর্জন দিতেন। কিন্তু নিবেদিতার চরিত্রও অসাধারণ ; তাঁহার ব্যক্তিত্বও কিছু কম নহে। তাহার উপর ছিল প্রচন্ড তেজ ও অভিমান। অসহায়ভাবে নিজেকে বিলুপ্ত করিবেন, নিবেদিতার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার নিজের দিক দিয়া বিচার এবং ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য।

দ্বিতীয়তঃ, স্বামিজী যদি কোমলভাবে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ নিবেদিতার নিকট উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে হয়তো হৃদয়ের আবেগবশতঃ নিবেদিতা কতকটা নত হইতেন। ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্রের নিকট স্বেচ্ছায় পরাজয়-স্বীকার বহু সময়ে ঘটিয়া থাকে—কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে। কিন্তু স্বামিজী সে ধার দিয়াও যান নাই। তাঁহার অভিধানে আপস বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। বিশেষতঃ তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিবেদিতার যে দৃঢ় অনুরাগ, তাহা একান্ত তাঁহারই প্রতি। এই ব্যক্তিগত বন্ধন নির্মমভাবে ছিন্ন করিবার জন্য তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। ফলে নিবেদিতার সমগ্র অন্তর শূন্যতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

আলমোড়ায় আগমনের পূর্বে কত সুখের কল্পনা নিবেদিতার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল! 'আলমোড়া' নামটির সহিত তাঁহার পূর্ব হইতেই পরিচয়। মিঃ স্টার্ডি বহুদিন এখানেই বাস করিয়া তপস্যা ও অধ্যয়নে অতি-

বাহিত করেন। পূর্ব বৎসর স্বামিজীর পত্রগুলি এই আলমোড়া হইতেই নিবেদিতার নিকট গিয়াছে—বিশেষ করিয়া ২৯শে জুলাইএর পত্র, যাহাতে তিনি তাঁহাকে ভারতে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, আর আশ্বাস দিয়াছিলেন, আমরণ তাঁহাকে সাহায্য করিবেন! স্বামিজীর উপস্থিতিতে এই স্থানের মহিমা শতগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। বিশাল দেওদার বৃক্ষগুলি এখানকার ভাষাহীন গভীরতাকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। সামনে দিগন্ত-প্রসারী ধূসর বর্ণের পর্বতমালার উপর তুষারমণ্ডিত উত্তুঙ্গ শিখরের মহিমময় আবির্ভাব! যে বারান্দায় তাঁহারা উপবেশন করিতেন, তাহার চারিদিকে গোলাপের কুঞ্জ। কিন্তু নিবেদিতার অন্তর নিঃসঙ্গতায় পরিপূর্ণ।

নিবেদিতার পুস্তকে তাঁহার মানসিক দ্বন্দ্বের একটা আভাস মাত্র পাওয়া যায়। সেখানে গুরুর মহিমা কীর্তনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাহার বেশী তিনি উল্লেখ করেন নাই।

স্বামিজীর কথা লিখিতে গিয়া নিবেদিতা এক জায়গায় বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে পদার্পণের মুহূর্ত হইতে স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার এই জ্ঞান হয় যে, জালবন্ধ সিংহের ন্যায় উহা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে ও তজ্জন্য দুঃসহ ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু এই সংঘর্ষ বাস্তবিক কিসের জন্য? উহা কি যাহাকে তিনি 'মনোবুদ্ধির অগোচর' বলিতেন, তাহাকেই সাধারণ জীবনে লইয়া আসার প্রাণান্তকর চেষ্টার ফল? বস্তুতঃ স্বামিজীর সময় ছিল অল্প। যে মহান্ ভাবরাশি জগৎকে দিবার জন্য তাঁহার আগমন, তাহা সত্বর বিতরণ করিবার জন্য তিনি ছিলেন ব্যাকুল, কিন্তু সাধারণ নরনারীর উহা গ্রহণে অক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি হইতেছিল। বাহিরে, এই ব্যাকুলতা ও অসহিষ্ণুতার আঘাত বিশেষ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের উপরেই আসিয়া পড়িত। সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতেন। ধৈর্যচ্যুতি ও ক্রোধ তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর জানিয়া অনেক সময়ে গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁহারা কেহই স্বামিজীর এই ক্রোধ বা তিরস্কার এক মুহূর্তের জন্য হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতেন না। নিবেদিতাকে ইহার সহিত আরও একটি জিনিস বেশী সহ্য করিতে হইয়াছিল; তাহা উপেক্ষা। তিনি আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ, প্রতিষ্ঠা, সমস্ত বিসর্জন দিয়া শুধু স্বামিজীর মুখ চাহিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী এই সময়ে তাঁহার প্রতি একান্ত উদাসীন! তাঁহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত কঠোর সমালোচনায় তাঁহাকে ব্যথিত করিতেন। এই

উপেক্ষা সহ্য করিবার মত মনোবল বোধ করি কেবল নিবেদিতারই ছিল। তাই অন্যান্য শিষ্যগণের মত নিবেদিতাকেও বহুবার তাঁহার ক্রোধের সম্মুখীন হইতে হইলেও এবং সাময়িক ভাবে উহা তাঁহাকে আহত করিলেও হৃদয়ে বিন্ধ হইয়া থাকে নাই।

নিবেদিতার কথা বলিতে গিয়া রোম্যাঁ রলাঁ লিখিয়াছেন, 'সেণ্ট ক্লারার সহিত সেণ্ট ফ্রান্সিসের নাম যেমন জড়িত আছে, তেমনি তাঁহার দীক্ষাকালীন গৃহীত ভগিনী নিবেদিতা নামটি তাঁহার প্রিয় গুরুদেবের সহিত চিরদিন জড়িত থাকিবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, জবরদস্ত বিবেকানন্দের মধ্যে পভেরেলোর সেই দীনতা ছিল না। কাহাকেও গ্রহণ করিবার পূর্বে বিবেকানন্দ তাঁহাকে কঠিন অন্তঃ-পরীক্ষার সম্মুখীন করিতেন। কিন্তু নিবেদিতার ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, যে রূঢ়তা একদিন তাঁহাকে পীড়িত করিয়া ভয়াবহ নৈরাশ্যরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহার কোন স্মৃতিই তিনি রাখেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে গুরুর মধুর স্মৃতিই কেবল বিদ্যমান ছিল। মিস ম্যাকলাউড আমাদিগকে বলেন, "আমি নিবেদিতাকে বলিলাম, স্বামিজী ছিলেন মূর্তিমান শক্তি।" নিবেদিতা উত্তরে বলিলেন, "তিনি ছিলেন মূর্তিমান স্নেহ।" কিন্তু আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, "আমি কখনও তা অনুভব করিনি।" "তার কারণ, তোমার কাছে তিনি কখনও সেটি প্রকাশ করেননি।" প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি এবং যে পথে সে ঈশ্বরলাভের দিকে অগ্রসর হতে পারে, সেই অনুযায়ী স্বামিজী তার সঙ্গে ব্যবহার করতেন।' (The Life of Swami Vivekananda, Romain Rolland, pp. 101-2)

নিবেদিতা পরবর্তী কালে স্বামিজীর উদাসীনতা, উপেক্ষা, তিরস্কার, কিছুই স্মরণ করিয়া রাখেন নাই, তাহার কারণ কি ইহাই নহে যে, স্বামিজীর স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন?

মানসিক সংগ্রাম যতই কঠোর হউক, একটি বিষয়ে নিবেদিতা অটল ছিলেন। সেবাকার্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন বলিয়া তিনি যে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিবার কথা মুহূর্তের জন্যও তাঁহার মনে হয় নাই। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এই সেবাকার্য কোন ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্কের উপর নির্ভর করিবে না। কাহারও প্রীতির জন্য কর্মসম্পাদন আনন্দদায়ক, কিন্তু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তি বিশেষের প্রীতির অপেক্ষা না রাখিয়া শুধু কর্মের জন্য কর্ম করিয়া যাওয়া। কিন্তু তাহার সাধনা কি সহজ! তাই অব্যক্ত যন্ত্রণায় নিবেদিতার হৃদয় নিরন্তর পীড়িত হইলেও প্রবল আত্মগরিমা দীনভাবে গুরুর নিকট নত হইতে বাধা দিল।

আদর্শজগতে বিপর্যয় ও স্বামিজীর কঠোর ব্যবহার, এই দুইয়ের মাঝখানে পড়িয়া নিবেদিতার মনে হইল তিনি দিশাহারা হইয়াছেন। এই সংকটমুহূর্তে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। আলমোড়ায় অবস্থানকালে বাংলা শেখানো ব্যতীত স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহাকে মোটামুটি হিন্দুশাস্ত্রের ধারণা করাইয়া দিতেন এবং নিয়মিত গীতা পড়াইতেন। সম্ভবতঃ নিবেদিতাকে পড়াইতে গিয়াই গীতার ইংরেজী অনুবাদ রচনার কথা স্বরূপানন্দের মনে উদয় হইয়াছিল। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পরে গীতার স্বরূপানন্দ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ ও তাহার প্রুফ নিবেদিতাই দেখিয়া দেন।

স্বামিজীর উপস্থিতিতে চারিদিকে যে একটা জমাট ভাবের সৃষ্টি এবং চিন্তাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল, স্বরূপানন্দের সহায়তায় নিবেদিতা তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। স্বামিজীর ভাবাদর্শের সহিত তাঁহার সংযোগ সাধনে স্বরূপানন্দ যেন সেতুস্বরূপ। নিবেদিতার মানসিক অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি তাঁহাকে ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং নিবেদিতা সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া তাহা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ধ্যানের ফলে মনের উপর একটি প্রশান্তির ভাব আসে। আবেগ, উত্তেজনা পার হইয়া নিস্তরঙ্গ অবস্থায় মন যখন অবস্থান করে, তখন আপনিই বহু আপাত-বিরোধী সমস্যার সমাধান ঘটে। এই ধ্যানের সহায়তা না পাইলে সেই অমূল্য অবসর নিবেদিতার জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইত। ক্রমশঃ ধ্যানের ভাব তাঁহাকে গভীরভাবে পাইয়া বসিয়াছিল। চারিদিকে এক অদ্ভুত নীরবতা। মনে হয় স্তিমিত নক্ষত্রালোকে হিমালয়ের বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত এক প্রশান্তিতে ভরপুর হইয়া আছে। ভাষায় তাহার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় ; উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধিব গোচর।

পরে নিবেদিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, গুরুর নিকট আত্মোৎসর্গ করাই শিষ্যের একান্ত কাম্য। আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে শিষ্যের পশ্চাতে গুরুশক্তিই অলক্ষ্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাকে অস্বীকার করিয়া নিজের অহমিকাব উপর আত্মোপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে বহু পরে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

আপাততঃ ছিল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। ভারতকে একান্তভাবে গ্রহণ করিবার পথে তাঁহার যে বিদেশী সংস্কারগুলি অন্তরায় হইয়াছিল, স্বামিজী তাহা নির্মমভাবে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জন্মগত সংস্কাবগুলির সমূল উৎপাটন কি সহজ? ইহা ব্যতীত, কখন এবং কিভাবে তিনি স্বামিজীর বিরক্তির কারণ হইতেন, নিবেদিতা সব সময় বুঝিতেও পারিতেন না।

কী অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণায় তিনি নিষ্পেষিত হইতেছেন, তাহা তাঁহার সঙ্গিনীগণের অবিদিত ছিল না। অবশেষে এমন সময় আসিল যখন এই যন্ত্রণা যথার্থই অসহনীয় হইয়া উঠিল ; এবং মিস ম্যাকলাউড স্থির করিলেন স্বামিজীকে এ বিষয় জানানো কর্তব্য। ইতিমধ্যেই নিবেদিতার সহিত তাঁহার গভীর প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল ; অতএব তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র দর্শক হইয়া স্থির থাকা সম্ভব ছিল না। স্বামিজীর অভিপ্রেত কার্যে নিবেদিতার যোগদানের আকাঙ্ক্ষার মূল্য তিনি বুঝিতেন, কিন্তু তাহার জন্য এত পীড়ন কেন? সুতরাং প্রতিদিনের মত স্বামিজী যখন তাঁহাদের নিকট আগমন করিলেন, মিস ম্যাকলাউড তাঁহাকে নিবেদিতার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা জানাইলেন। নিদারুণ মর্মবেদনায় তাঁহার শরীর-মন অবসন্ন ; শীঘ্রই এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। স্বামিজী নীরবে সব শুনিলেন ও চলিয়া গেলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তিনি আবার আসিলেন। নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। ম্যাকলাউডের দিকে তাকাইয়া স্বামিজী বালকের ন্যায় বলিলেন, 'তোমার কথাই ঠিক, এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত দরকার। আমি একলা জঙ্গলে যাচ্ছি ; নির্জন বাসের ইচ্ছা। যখন ফিরে আসব, শান্তি নিয়ে আসব।'

তারপর স্বামিজী উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মাথার উপর বালচন্দ্রের শোভা। সহসা দিব্যভাবে তাঁহার কণ্ঠ আবিষ্ট হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'দেখ, মুসলমানেরা দ্বিতীয়ার চাঁদকে বিশেষ সমাদরের চোখে দেখে। এস, আমরাও এই নবীন চন্দ্রমার সঙ্গে নবজীবন আরম্ভ করি।'

কথাগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী হাত তুলিলেন : সেই মুহূর্তে বিদ্রোহী নিবেদিতা হৃদয়ের গভীর আবেগবশতঃ তাঁহার পদপ্রান্তে নতজানু হইয়াছেন। স্বামিজী নীরবে তাঁহার মানসকন্যার মাথায় হাত রাখিলেন এবং প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আশীর্বাদ করিলেন। মাথা পাতিয়া নিবেদিতা সে আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন : আর বোধ করি সেই মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করিলেন গুরুর মাহাত্ম্য। সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের অবসানে জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ মিলনের অপূর্ব মাধুর্যে নিশ্চিত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামিজী চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রে ধ্যান করিতে বসিয়া নিবেদিতা অনুভব করিলেন, তিনি এক অনন্ত সত্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। সে গভীর সত্তার স্বরূপ বিচারের দ্বারা বোধগম্য নহে। তিনি কেবল বুঝিয়াছিলেন, হিন্দু দর্শনোক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি প্রত্যক্ষানুভূত সত্য। সেই সঙ্গে নিবেদিতা

প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্‌বাণী 'নরেন্দ্রের স্পর্শমাত্রে জ্ঞানদান করিবার যে জন্মগত শক্তি আছে, তাহা বিকাশ লাভ করিবে।' আর এই সর্বপ্রথম তিনি একথাও হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, শ্রেষ্ঠ আচার্য এইরূপেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবসান করেন।

সাধনার কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন নিবেদিতা। হৃদয়ের তীব্র জ্বালা শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপে জুড়াইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, অতঃপর স্বামিজীর সর্ববিধ মতামত অকপটে গ্রহণ করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত রাখিবেন।

২৫শে মে, বুধবার, স্বামিজী একাকী চলিয়া গেলেন। ২৮শে শনিবার প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রতিবার অরণ্যবাস হইতে ফিরিবার পরেই সকলে তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য ঘিরিয়া বসিত। অপর সকলের সহিত নিবেদিতা সেভিয়ার-দম্পতির বাংলায় গিয়া স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। বাংলার উদ্যানে ইউক্যালিপ্‌টাস ও ক্ষুদ্র গোলাপ গাছগুলির নীচে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতীচ্যবাস তাঁহাকে কিছুমাত্র বিকৃত করিতে পারে নাই। এখনও তিনি তাঁহার অতি প্রিয় পরিব্রাজক জীবনযাপনে সক্ষম। স্বামিজীর মুখমন্ডলে অপরূপ প্রশান্তি, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। সত্যই তিনি শান্তি লইয়া আসিয়াছেন। নিবেদিতাও শান্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পরবর্তী সপ্তাহে, ৩০শে মে, সেভিয়ার-দম্পতির সহিত স্বামিজী যাত্রা করিলেন—উদ্দেশ্য হিমালয়-প্রদেশে মঠ স্থাপনের জন্য নির্জন স্থানের অনুসন্ধান। নিবেদিতা, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড আলমোড়ায় রহিয়া গেলেন। দিনগুলি অধ্যয়ন, অঙ্কন ও গাছপালা সংগ্রহপূর্বক উদ্ভিদ্‌-চর্চায় কাটিতে লাগিল।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের অবসানে নিবেদিতার শ্রান্ত মনপ্রাণ হিমালয়ের নির্জনতায় একান্তভাবে আত্মোপলব্ধির সাধনায় অবগাহন করিল। বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা ধর্মরাজ্যে প্রবেশ অথবা অধ্যাত্মজীবনের ধারণা অসম্ভব। উহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধির বিষয়, এবং তাহাও নির্ভর করে গুরুর কৃপার উপর। আধ্যাত্মিক জীবনের মূলকথা ভগবানের প্রতি গভীর প্রেম—এক অবর্ণনীয় প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত সেই অনন্তের অন্বেষণ। আর নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন তাঁহার গুরুর ইহাই বিশেষত্ব; যেখানে অপরে উপায়ের আলোচনাতেই ব্যস্ত, তিনি সেখানে রীতিমত আগুন জ্বালিতে

পারেন। অপরে যেখানে একটা নির্দেশ মাত্র দেন, তিনি সেখানে বস্তুটিকেই ধরাইয়া দেন। হিমালয়ের এই শান্ত, নির্জন পরিবেশ স্বভাবতঃই মনকে আত্মোন্নতির পথে লইয়া যায়। বাস্তবিক, অতীন্দ্রিয় সত্যোপলব্ধির দ্বার-স্বরূপ মৌন ও নির্জনবাসের সুবিধা দিবার জন্যই যেন স্বামিজী বারবার তাঁহাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতেন। ধীরে ধীরে নিবেদিতার সকল অভিমান চূর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে,—সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দিতে হইবে। যেখানে সকল অহমিকার বিনাশ, সেখানেই অন্তরের গভীরতম সত্তার বিকাশ। স্বামিজীর সহিত পরিচয়ের পর নিবেদিতার অন্তর্জগতে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কিন্তু বর্তমান পরিবর্তন তাহা অপেক্ষা অনেক গভীরতর।

আলমোড়ায় আগমন পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার মনোভাব ছিল একটি বিশিষ্ট চরিত্রের প্রতি অকপট, ব্যক্তিগত শ্রদ্ধানুরাগ। তাহা প্রতিদানেরও অপেক্ষা রাখিত। নিবেদিতা বীরত্বের উপাসিকা, অতিমাত্রায় আবেগপরায়ণ ও আদর্শবাদী। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে সাধারণ জীবনযাত্রা অসম্ভব। কোন মহৎ আদর্শের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখ বরণ করিতে তাঁহার চিত্ত সতত উন্মুখ থাকিত। স্বামিজীর সহিত পরিচয়ে নিবেদিতার মনে হইয়াছিল, তিনি এমন এক আদর্শ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন যাঁহার নিকট নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করা চলে। আর যাঁহাকে ভালবাসা যায় তাঁহার অভিলষিত কার্যে জীবন সমর্পণ কত আনন্দদায়ক! কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে প্রমাদ আছে, তাহা স্বামিজী অবগত ছিলেন। ব্যক্তির অন্তর্ধানে আদর্শের পরিণাম কী? প্রয়োজন আদর্শের প্রতি অনুরাগ। তাই সর্বতোভাবে ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিষ্যকে স্বতন্ত্রভাবে জীবনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক ছিল। নিবেদিতা যেন ব্যক্তিত্বেই আবদ্ধ না থাকেন—ব্যক্তির ঊর্ধ্বে যে অনন্ত সত্তা, সকল দৃষ্ট বস্তু যাহার অতি তুচ্ছ ও বিকৃত বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সেই অনির্বচনীয় সত্তার বিমল জ্যোতিতে নিবেদিতার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক—ইহাই ছিল স্বামিজীর অভিপ্রায়। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল না। কিন্তু যতই নিবেদিতার নিকট গুরুশিষ্যের প্রকৃত সম্পর্ক পরিস্ফুট হইতে থাকিল, ততই ঘাত-প্রতিঘাতের অবসান ঘটিয়া তাঁহার হৃদয় মধুর স্নিগ্ধ রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ধর্মরাজ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কন্যা। সর্বাংশে গুরুর পদানুসরণ ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনোমত হইয়া উঠাই তো শিষ্যের কাম্য! আধ্যাত্মিক রাজ্যের ক্রমাভিব্যক্তির সহিত নিবেদিতা অনুভব করিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক আদর্শ মানবত্বের

অভিনয় হইতেছে ; নিজের অহমিকা-প্রকাশের দ্বারা তাহাকে অন্তরাল করা কি নির্বুদ্ধিতা!

নিবেদিতা বুঝিলেন, ভারতের প্রকৃত সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইলে প্রথমে বিদেশী সংস্কারগুলিকে নির্বাসন দিতে হইবে। আর ইহা সম্ভব হইতে পারে শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনের ফলে। স্বামিজীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও গভীর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় নিবেদিতা ক্রমশঃ ভারতীয় ভাবগুলির মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন। এখন হইতে ভারতের প্রতি কার্য, প্রতি আচরণের পশ্চাতে যে গভীর তাৎপর্য আছে, তাহা তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইতে লাগিল। স্বামিজীর নিকট দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ভারতের অন্তরাত্মাকে তিনি চিনিলেন, ভালবাসিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি তো তাঁহার ছিলই ; এখন হইতে তাহার সহিত যুক্ত হইল হৃদয়ের গভীর অনুরাগ। সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া নিবেদিতা স্বামিজীর প্রতি কথা, প্রতি আচরণ অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিশেষত্ব এই, তিনি স্বীয় ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া স্বামিজীর অনুকরণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর স্বামিজী এক নূতন আলোকপাত করিয়াছিলেন ; সমগ্র চিন্তাধারার এক বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আর ভারতের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও একাত্মবোধ এমন করিয়া হইয়াছিল যে, 'আমাদের' শব্দটি তাঁহার মুখে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারিত হইত।

নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের উপযুক্ত শিষ্যা। যেমন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের প্রবল ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমন ভাবে নিবেদিতার প্রবল ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র খর্ব না করিয়া তাঁহাকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামিজীর সহিত সংঘর্ষের অবসানে নিবেদিতা আত্মস্থ হইলেন। স্বামিজী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া ক্ষোভে, অভিমানে যে নিবেদিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই নিবেদিতা যতই নিজেকে স্বামিজীর কন্যারূপে ধারণা করিয়া অহমিকা বিসর্জনপূর্বক সর্বতোভাবে তাঁহার অনুবর্তিনী হইতে চেষ্টা করিলেন, ততই অনুভব করিলেন তাঁহার উপর স্বামিজীর অগাধ বিশ্বাস ও স্নেহ।

এই ভ্রমণকালেই স্বামিজী একদিন বলিলেন, 'যদিও বহু সময় আমি তোমাদের মনের মত কথা বলি না, বা আমার কথার মধ্যে রাগ প্রকাশ পায়, তথাপি মনে রেখ, প্রেম ব্যতীত অন্য কিছু প্রচার করা আমার হৃদয়ের ভাব

নয়। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি, শুধু এইটুকুই হৃদয়ঙ্গম করলেই এসকল বিবাদের অবসান হবে।'

নিবেদিতার এই নবজীবনের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রে—

'অনেক কিছুই শিখিতেছি।...একটি নির্দিষ্ট অবস্থা আছে, তাহাকেই আখ্যা দেওয়া চলে আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা লাভ করা প্রয়োজন। মানুষের ভালবাসা লাভ করিবার জন্য হৃদয় যেমন আকুল হইয়া উঠে, ঠিক তেমন করিয়া অন্তরাত্মা হাহাকার করে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য। যাহা এতদিন ধরিয়া মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, প্রকৃত অহমিকাশূন্যতার অত্যুগ্র শুভ্র জ্যোতির তুলনায় তাহা নিতান্তই হালকা ও অত্যন্ত শুষ্ক অবস্থা ব্যতীত কিছুই নহে। এ সবই আমি উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আশ্চর্য! প্রাথমিক সত্যগুলি পরিষ্কাররূপে দেখিতে এত সময় লাগিল! আপাততঃ ইহার অধিক আর কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মানুষের জীবন ও সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার অতীত ধারণাগুলিকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই—অথচ দেখিতেছি, মহাপুরুষগণ সেগুলি উড়াইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আর তাঁহারা কি একেবারে ভ্রান্ত হইতে পারেন? বর্তমানে আমি কেবল অন্ধকারেই হাতড়াইতেছি, এখানে ওখানে জিজ্ঞাসা করিতেছি ও প্রমাণ খুঁজিতেছি। আশা করি একদিন প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিব, আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত তাহা অপরকে দান করিতেও পারিব।

'একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শরীর এবং আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।...নিজেকে এত সুখী মনে হইতেছে যে, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।' নিবেদিতা (৬।৬।৯৮-এর পত্র)।

৫ই জুন স্বামিজী প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিবেদিতা প্রভৃতি যে বাংলায় অবস্থান করিতেন, তাহার প্রাঙ্গণে বসিয়া কিছুক্ষণ কথা বলিলেন। গুড্-উইনের মৃত্যুসংবাদ তখনও স্বামিজীকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে পওহারী বাবার নিজদেহ দ্বারা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দানের সংবাদ তাঁহাকে বিষাদমগ্ন করিয়াছিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে স্বামিজী নিবেদিতাদের বাংলায় আসিলেন। গুড্উইনের মৃত্যুসংবাদ পূর্বরাত্রে পাইয়াছেন। প্রথম কয়েক ঘন্টা তিনি অটল রহিলেন এবং ক্রমাগত ত্যাগের প্রসঙ্গ করিলেন। ত্যাগ,

ত্যাগ, ত্যাগ—স্বামিজীর কথায় ত্যাগের মহান্ আদর্শ যেন জীবন্ত হইয়া নিবেদিতার হৃদয়ে চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া গেল।

বিশ্বস্ত শিষ্যের মৃত্যু যে স্বামিজীকে বিশেষ বিচলিত করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই বোঝা গেল। আলমোড়া পরিত্যাগের জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। নিবেদিতাও বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন। আশ্চর্য, গুড্‌উইন যে সময় মর্ত্য-লোক ত্যাগ করিয়া জ্যোতির্ময় ধামে প্রস্থান করিতেছিলেন, নিবেদিতা প্রভৃতি তখন একত্র বসিয়া টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' (In Memoriam) নামক শোক-গীতি কাব্য পড়িতেছিলেন—কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁহাদের হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল। ভারতে গুড্‌উইনের সহিত পাশ্চাত্য শিষ্যগণের মধ্যে নিবেদিতারই শেষ সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাতের দিনে গুড্‌উইনকে দেখিয়া তিনি কত আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন! তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিতা পদ্যে কয়েকটি ছত্র রচনা করেন। সেই ছত্রগুলিই স্বামিজী একটি ক্ষুদ্র কবিতায় পরিণত করেন এবং কবিতাটি 'তাহার শান্তিলাভ হউক' (Requiescat in Pace), এই নাম দিয়া গুড্‌উইন-জননীর নিকট পুত্রের স্মরণার্থে প্রেরিত হয়। নিবেদিতার কবিতাটির কিছুই রহিল না দেখিয়া যদি তিনি ক্ষুণ্ণ হন, এই আশঙ্কায় স্বামিজী বহুক্ষণ ধরিয়া আগ্রহ সহকারে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়া কবিতা রচনা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা অনেক বড় জিনিস।

১১ই জুন সকলের কাশ্মীর যাত্রা স্থির হইল। ইতিমধ্যে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-সম্পাদক রাজম্ আয়ারের মৃত্যু হওয়ায় মাসিক পত্রখানি উঠিয়া গিয়াছিল। স্বামিজীর তৃপ্তিসাধনে সদা তৎপর মিঃ সেভিয়ার উহা আলমোড়া হইতে প্রকাশের ভার লইলেন। সম্পাদনার জন্য স্বামী স্বরূপানন্দ রহিয়া গেলেন। যাত্রার পূর্বদিন শেষবারের মত নিবেদিতা তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়ন করিলেন, তাঁহার প্রিয় দেওদার বৃক্ষটির নীচে বসিয়া শেষবারের মত ধ্যান করিলেন। মিঃ সেভিয়ারের গৃহে সকলের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু তিনি গেলেন না। আলমোড়ার নীরব-গম্ভীর প্রাকৃতিক পরিবেশ তিনি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। এখানেই তাঁহার নবজীবন লাভ। প্রাচ্য সংস্কার ধীরে ধীরে জন্ম লইতে শুরু করিয়াছে।

আলমোড়াতেই এক মহাপুরুষের দিব্যস্পর্শ তাঁহাকে আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্যময় অনুভূতির সন্ধান দিয়াছে।

কাশ্মীর উপত্যকা ও অমরনাথ

১১ই জুন সকালবেলা সকলকে লইয়া স্বামিজী আলমোড়া পরিত্যাগ করিলেন। আবার কাঠগোদাম। পথের সৌন্দর্য অপরূপ। নিবিড় অরণ্যানী, গভীর নিস্তব্ধ রজনী, রাত্রিশেষে দীর্ঘ বৃক্ষগুলির ফাঁক দিয়া প্রভাতের আলোক আসিয়া পড়ে—সকলই সুন্দর। চলিতে চলিতে নিবেদিতা লক্ষ্য করেন, চারিদিকে অসংখ্যজাতীয় ফার্ন, প্রিমরোজ ও ভায়লেট জাতীয় পুষ্পের ছড়াছড়ি। গাছপালা নিরীক্ষণের প্রতি নিবেদিতার একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল, বোধ হয় সেজন্যই উত্তরকালে শ্রীযুক্ত বসুর কার্যে সহায়তা করা তাঁহার পক্ষে সহজ এবং প্রীতিকর হইয়াছিল।

১২ই জুন, রবিবার, অপরাহ্নে তাঁহারা ভীমতাল আসিয়া পেঁাছিলেন। একটি হ্রদ ও জলপ্রপাতের উপরিভাগে বিশ্রামের স্থান নির্দিষ্ট হইল। স্বামিজী এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাঝখানে বসিয়া রুদ্রস্তুতিটির আবৃত্তি ও অনুবাদ করিলেন, 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়, আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' 'আবিরাবির্ম এধি', এই অংশের অনুবাদ করিতে গিয়া স্বামিজী বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় এই গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বল্পাক্ষর বাক্যের প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া কঠিন। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ পরে নিবেদিতার নিকট যথার্থ তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছিল, 'হে রুদ্র, তুমি কেবল নিজের নিকটেই প্রকাশিত আছ, তুমি আমাদের নিকটেও আত্মপ্রকাশ কর।' ঐদিন স্বামিজী ত্রিসুপর্ণ-মন্ত্রটির কয়েক পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেন এবং পরিশেষে সুরদাসের যে সঙ্গীত[১] তিনি খেতড়ীর রাজার সভায় নর্তকীর নিকট শুনিয়াছিলেন, সেটিও গাহিয়াছিলেন।

বহু সময় তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠে চলিতেন। রাত্রিকালে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন ডাকবাংলায়। ক্রমে পাইন ও দেওদার বৃক্ষরাজি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। চারিদিকে কেবল নানা জাতীয় ফার্ন। রেলযোগে তরাই অঞ্চল অতিক্রমকালে স্বামিজী সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, ইহাই ভগবান বুদ্ধের পবিত্র জন্মভূমি।

১৪ই জুন তাঁহারা পাঞ্জাব প্রবেশ করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী

[১] 'প্রভু মেরো অবগুণ চিত না ধরো' ইত্যাদি।

শিখগুরুগণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওয়াহ্ গুরু কী ফতহ্।' প্রত্যেকটি স্থান স্বামিজীর অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গীর গুণে ঐতিহাসিক সত্যরূপে তাঁহার শিষ্যগণের নিকট সজীব হইয়া উঠিল। প্রাচীনকালে আর্য-গণ ভারতে এই সিন্ধুনদতীরে পাঞ্জাবেই প্রথম বাস করিয়াছিলেন।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে টাঙ্গা করিয়া সকলে ১৫ই জুন মরী পৌঁছিলেন। ১৮ই জুন পুনরায় রওনা হইয়া ডাকবাংলা ডুলাইএ বিশ্রাম করিলেন। এখানে স্রোতের বেগ ভীষণ। কোহালা হইতে বারমুল্লা পর্যন্ত সমগ্র পথটি এক গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া গিয়াছে। পালা করিয়া স্বামিজীর সহিত একত্র যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিবেদিতা যেদিন ঐ সুযোগ লাভ করিলেন, সেদিন স্বামিজী নিজের অতীত জীবনের প্রসঙ্গ ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যা—সেই 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' তত্ত্বের সাক্ষাৎকার—সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। সকল প্রসঙ্গের মধ্যে 'ঘৃণা অপেক্ষা প্রেম বলীয়ান' এই কথাটিই নিবেদিতার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল। পথে একদল পাদচারীর সহিত দেখা হইলে স্বামিজী প্রথমে তাহাদের কৃচ্ছ্রানুরাগ দর্শনে কঠোর তপস্যাকে বর্বরতা বলিয়া তীব্র সমালোচনা করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই ইহার অন্তরালে যে আদর্শ বিরাজ করিতেছে, যাহার জন্য এইরূপ ক্লেশের পর ক্লেশ তাহারা অতিবাহন করে, তাহা মনে পড়িবামাত্র তিনি বলিলেন, 'এই রকম বর্বরতা না থাকলে বিলাসিতা মানুষের সব মনুষ্যত্ব হরণ করত।'

বস্তুতঃ স্বামিজীর মুখে এইরূপ পরস্পরবিরোধী ভাব বা আদর্শের কথা বহু সময়েই অনেককে বিভ্রান্ত করিত। বিশেষতঃ তিনি যখন যে কথা বলিতেন, তাহার পশ্চাতে তাঁহার নিজ দৃঢ় ধারণা থাকায় কথাগুলি এত শক্তি-শালী হইত যে, অপরের পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিবেদিতা তাঁহার তীক্ষ্ণধী সহায়ে ঐ সব কথার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিতেন।

২০শে জুন বারমুল্লা হইতে নৌকা করিয়া তাঁহারা শ্রীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী যেখানে যাইতেন সেখানকার ভাব গ্রহণ এবং রীতিনীতির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার অন্তরের সর্বব্যাপী উদারতারই বহিঃপ্রকাশ।

শ্রীনগরে তাঁহাদের অবস্থানকাল ২২শে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত। এই সময়ে এবং ইহার পরেও স্বামিজীর সঙ্গ যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন বাস্তবিকই ধন্য। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'এই সকল মহান্ উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার ব্যতীত, যে সমুজ্জ্বল জীবনের সংস্পর্শে আমরা বাস

করিতাম, তাহার দিব্যচ্ছটা কিছুক্ষণের জন্য প্রায়ই আমাদের উপর আসিয়া পড়িত।'

শ্রীনগরে প্রথম দিন এক উদ্যানের পার্শ্বে বজরাগুলি রাখিবার ব্যবস্থা হইল। নিবেদিতা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ তীরে বেড়াইয়া আসিলেন, শিশুদের সহিত খেলা করিলেন, ফরগেট-মি-নট ফুল তুলিলেন। কোন কোন জায়গায় ফসল কাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। শূন্য ক্ষেতগুলিতে কৃষকদের প্রমোদানুষ্ঠান চলিতেছে। পরদিন তুষারমণ্ডিত পর্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম উপত্যকায় তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। 'কাশ্মীর উপত্যকা' নামে পরিচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে এটি 'শ্রীনগর উপত্যকা'। ইসলামাবাদ শহরের নিজস্ব একটি উপত্যকা আছে সেটি নদীর আরও উপরিভাগে। পর্বতগুলির মধ্য দিয়া পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। উপরে সুনীল গগন, জলপথ নীল, মধ্যে মধ্যে পত্রযুক্ত পদ্মের বড় বড় দল, উভয় তীরে ক্ষেতের পর ক্ষেত এবং উহাতে কৃষকগণ ফসল কাটিতেছে—সমগ্র দৃশ্যটি নীল, হরিৎ এবং শ্বেতবর্ণের সমন্বয়ে অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। বজরাতেই শ্রীনগরের চতুর্দিকে ভ্রমণ চলিতে লাগিল। পূর্ব রীতি অনুযায়ী স্বামিজী প্রতিদিন সকালে ইঁহাদের বজরায় আসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রসঙ্গ করিতেন।

কাশ্মীরে বহু ধর্মবিপর্যয় ঘটিয়াছে। অশোক হইতে কনিষ্কের আমল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের উন্নতি-অবনতি ও ক্রমবিস্তার, বৌদ্ধধর্মের নীতি, শিবোপাসনার ইতিহাস প্রভৃতি স্বামিজী দক্ষতার সহিত বিবৃত করিতেন। জীবনের প্রারম্ভে নিবেদিতা এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ও তখন হইতেই তিনি শ্রীবুদ্ধের অনুরাগিণী। আবার স্বামিজী বুদ্ধের একান্ত উপাসক। নিবেদিতা সাগ্রহে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে স্বামিজীর নিকট নানা প্রশ্ন করিয়া মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতেন।

কাশ্মীরে অবস্থানকালে যে কয়টি বিশেষ দর্শনীয় স্থানে তাঁহারা গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ক্ষীরভবানী, তখ্‌ত-ই-সুলেমান, নূরমহলের শালিমারবাগ এবং নিশাৎবাগ অর্থাৎ আনন্দ-উদ্যান উল্লেখযোগ্য।

২৬শে জুন তাঁহারা ক্ষীরভবানী দর্শন করেন। পাথরের রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র প্রস্রবণ। দুধ, চাউল ও ফুলে জলের রঙ গাঢ়। ছোটখাট একটি বাজার আছে। শত শত লোক মালা জপ করিতে করিতে কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিতেছে। বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম। এক পার্শ্বে ভস্মমাখা জটাধারী এক সন্ন্যাসী আসন করিয়া বসিয়া আছেন—পশ্চাতে হোমের প্রজ্বলিত অগ্নি। সন্ন্যাসী ও পুরোহিত তাঁহাদিগকে প্রসাদস্বরূপ খানিকটা

চিনি দিলেন। আশেপাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; তাহাদের সহিত কৌতুক করিয়া বেশ সময় কাটিল। স্বামিজীর ঐ স্থানে তপস্যা এবং অপূর্ব দর্শনের জন্য পরে ক্ষীরভবানী নামটিই তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

তখ্‌ত-ই-সুলেমান—অনুচ্চ পর্বতের উপর ক্ষুদ্র একটি মন্দির। এখান হইতে সমগ্র কাশ্মীরের সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে—ডাল হ্রদ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অপূর্ব শান্ত শ্রী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি হিন্দুগণের কতদূর অনুরাগ ছিল, মন্দির এবং স্মৃতিসৌধের স্থাননির্বাচনই তাহার নিদর্শন।

নিবেদিতা যেখানে যাইতেন, সেই স্থান অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেন। উহার রীতিনীতি লক্ষ্য করিতেন, সংক্ষিপ্ত বিবরণের সহিত মন্দির প্রভৃতির ক্ষুদ্র নকশা আঁকিয়া রাখিতেন। স্বামিজী নিকটে থাকায় স্থানটির ঐতিহাসিকতা অথবা তাহার অন্তর্গত ভাবটির বিশ্লেষণ তিনিই করিতেন। পরে ঐগুলির সহায়তায় তাঁহার অন্যতম পুস্তক 'Notes of Some Wanderings' লেখা সম্ভব হইয়াছিল।

বাস্তবিক কাশ্মীরের দিনগুলি যথার্থ আনন্দের ছিল। '৪ঠা জুলাই' আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে স্বামিজী নিবেদিতার সহিত গোপনে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য—আমেরিকান শিষ্যদের আনন্দ দান। খাবার নৌকার দরজার উপর ডোরাকাটা ও তারকা চিহ্নিত আমেরিকার একটি জাতীয় পতাকা স্থাপিত করিয়া চিরশ্যামল গাছের ডালপালা দিয়া দরজাটি সুন্দর করিয়া সাজানো হইল। নৌকায় চা-পানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামিজী স্বয়ং একটি অভিভাষণের সহিত স্বরচিত '৪ঠা জুলাই-এর প্রতি' কবিতাটি উপহার দিলেন।

স্বামিজীর বিখ্যাত চারটি কবিতা—Requiescat in Pace, To Prabuddha Bharata, To the Fourth of July ও Kali the Mother—এই ভ্রমণকালেই রচিত।

স্বামিজী সকল প্রসঙ্গের মধ্যে ত্যাগের মহিমার উপর বিশেষ জোর দিতেন। একদিন বলিলেন, 'জনক রাজা হওয়া কি এত সোজা? সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে সিংহাসনে বসা? ঐশ্বর্য বা যশ অথবা স্ত্রীপুত্রের জন্য কোন রকম আকাঙ্ক্ষা না রাখা?' নিবেদিতাকে লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, 'একথা মনে মনে বলতে এবং তোমার মেয়েদের শেখাতে কখনও ভুলে যেও না যে,

'মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

—মেরু ও সর্ষপে, সূর্য ও খদ্যোতে, সমুদ্র ও গোষ্পদে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী এবং গৃহীর মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ।'

'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥

—পৃথিবীর সকল বস্তুতেই ভয়, কেবল মানবের বৈরাগ্যই ভয়রহিত।' সর্বশেষে বলিলেন, 'নিবেদিতা, আমরা যেন কখনও আমাদের আদর্শ ভুলে না যাই।'

৬ই জুলাই কার্যোপলক্ষ্যে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সহিত স্বামিজী গুলমার্গ গমন করিলেন এবং সেখান হইতে অমরনাথের পথে যাত্রা করিলেন। বস্তুত স্বামিজীর নির্জনবাসের আকাঙ্ক্ষা এই সময়ে এত তীব্র হইয়াছিল যে, হঠাৎ তিনি একাকী চলিয়া যাইতেন, আবার কয়েকদিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরিয়া আসিতেন। নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক-জীবন যাপনের প্রবল আগ্রহ সর্বক্ষণ তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিত। বাস্তবিক, বিশেষ করিয়া এই কাশ্মীরে অবস্থানকালে তাঁহার শিষ্যগণ সর্বদা ভৃত্যদের নিকট এই কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন যে, স্বামিজীর নৌকা এক ঘণ্টা পূর্বে নঙ্গর তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সেদিন আর প্রত্যাবর্তন করিবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি একদিন কি বহুদিন অনুপস্থিত থাকিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না।

অমরনাথ-যাত্রার পথটি তুষারপাতে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্বামিজী সেখানে না গিয়া সোনমার্গের পথে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দেখা গেল, তাঁহার গাঢ় তন্ময়তা ও অন্তর্মুখীন ভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিন ধীরা মাতার নৌকায় বসিয়া ভক্তি প্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি এতদূর তন্ময় হইয়া যান যে, আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

স্বামিজীর প্রত্যাবর্তনের দু-চারদিন পরে সকলে ইসলামাবাদ গমন করেন। ভারী ভারী ধূসর চূনা পাথরে নির্মিত বহু প্রাচীন একটি ক্ষুদ্র দেউল 'পান্দ্রেস্থান' বাস্তবিক দর্শনীয়। মন্দিরটির স্থাপত্যশিল্প সাধারণ মন্দিরাদি হইতে পৃথক। মন্দিরের বাহিরে শিক্ষাদানরত বুদ্ধের এবং বৃক্ষতলে আসীনা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর দুটি মূর্তিই সুন্দর। দর্শন শেষে স্বামিজী ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা করিলেন। বুদ্ধমূর্তিটি তাঁহার চিত্তে গভীর ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল। ঐ দিনই সন্ধ্যায় ধীরা মাতার নৌকায় বসিয়া স্বামিজী নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রীষ্ট-

ধর্মের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সে বিষয়ে গভীর এবং বিস্তৃত আলোচনা করেন।

ইহার পর অবন্তীপুরের দুইটি বৃহৎ মন্দির, বিজবেহার মন্দির এবং মার্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও তাঁহারা দেখিয়া আসেন। নিবেদিতার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এত গভীর ছিল যে, ইহার ফলে পরে ঐ মন্দিরগুলির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

২৪শে জুলাই তাঁহারা বেরীনাগ গমন করেন। সরল বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জাহাঙ্গীরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ দর্শনে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নিবিড় অরণ্যে অন্ধকারময়ী এই রাত্রিটি নিবেদিতার নিকট আর এক কারণে বিশেষ স্মৃতি বহন করিত। ঐ রাত্রে স্বামিজী তাঁহার সহিত প্রস্তাবিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পরদিন ২৫শে জুলাই অচ্ছাবল আগমনের পর সহসা স্বামিজীর মনে অমরনাথ গমনের সংকল্প পুনরায় জাগিয়া উঠিল। তিনি জানাইলেন, অমরনাথ গুহায় মহাদেবের চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য নিবেদিতাকে সঙ্গে লইবেন।

একবার রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান আলোচনা করিতে করিতে স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠেন, 'কিন্তু, জগতে যারা বড় বড় কাজ সম্পন্ন করবে, তাদের আমি কখনও উমা ও মহেশ্বরের বিষয় ব্যতীত অন্য কথা বলি না। জগতের শ্রেষ্ঠ কর্মিগণের সৃষ্টি উমা ও মহেশ্বর থেকেই।'

নিবেদিতা ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ কর্মী হইবেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে মহাদেবের চরণে উৎসর্গের প্রয়োজন ছিল! দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যৎ কর্মের উপযুক্ত অধ্যাত্মভিত্তি সৃষ্টির জন্য বহুকাল পূজিত এই তীর্থটি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনও নিবেদিতার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। স্বামিজী জানিতেন, এতদিন ধরিয়া তিনি ভারতের যে অধ্যাত্মজীবনের সহিত নানাভাবে নিবেদিতার পরিচয় করাইতেছিলেন, এই তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে, এবং ফলে এই দেশের ভাবধারার সহিত তাঁহার হৃদয়ের নিগূঢ় সংযোগ-সাধনের অবকাশ ঘটিবে।

নিবেদিতার অমরনাথ-যাত্রার প্রস্তাবে মিসেস বুল সানন্দে সম্মতি দিলেন। স্থির হইল, স্বামিজীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাঁহারা পহলগামে অপেক্ষা করিবেন।

ইসলামাবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া সকলে বওয়ান রওনা হইলেন। কাশ্মীর তখন তীর্থযাত্রীতে পূর্ণ। প্রতিদিন নূতন নূতন

যাত্রিদল আসিতেছে। বওয়ানে কতকগুলি পুণ্য উৎস আছে। জায়গাটি পল্লীগ্রামের মেলার মত। সন্ধ্যাকালে দীর্ঘিকার পরিষ্কার কালো জলে অসংখ্য দীপের প্রতিচ্ছায়া, যাত্রিগণের এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে গমন—একটি সুন্দর ধর্মভাব চারিদিকে। মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন। এতদিন তাঁহারা শুধু ভ্রমণ করিয়াছেন, এই তাঁহাদের প্রথম তীর্থযাত্রা।

২৮শে জুলাই সকলে পহলগাম পৌঁছিলেন। পহলগাম পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর জায়গা। গ্রামটি মেষপালকগণের। চারিদিকে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী ; তাহারই প্রস্তর-সংঘর্ষে সৃষ্ট গর্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুদ্বীপ। দুই পার্শ্বে সরল গাছের সারি। সন্ধ্যার সময় চন্দ্র ঠিক মাথার উপর দেখা গেল। নিবেদিতা মুগ্ধ হইলেন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন সুইজারল্যান্ড অথবা নরওয়ের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য-গুলির অন্যতম।

স্বামিজী ও তাঁহার বিদেশী শিষ্যাদিগের জন্য তাঁবু ফেলা হইলে সন্ন্যাসী-দের মধ্যে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠিল। হিন্দু তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের তাঁবু! সংকীর্ণতা স্বামিজী সহিতে পারিতেন না ; সুতরাং তিনি প্রবলভাবে তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন নাগা সাধু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'স্বামিজী, মানি আপনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ঐ ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার উচিত নয়।' স্বামিজী তৎক্ষণাৎ সে কথা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের তাঁবু সরাইয়া লইতে আদেশ দিলেন। উপরন্তু তিনি বুঝিলেন, নিবেদিতাকে সঙ্গে লইতে হইলে ইহাদের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর একটি পন্থাও তিনি আবিষ্কার করিলেন। সেইদিনই বিকালে নিবেদিতা তাঁহার সহিত সন্ন্যাসিগণের তাঁবুর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দিয়া সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা দেওয়াইলেন এবং বিনিময়ে নিবেদিতা লাভ করিলেন তাঁহাদের আশীর্বাদ। আর কোন গোলমাল রহিল না। পরদিন হইতে তাঁহাদের তাঁবু ছাউনীর পুরোভাগেই স্থান পাইল। সামনেই খরস্রোতা লীদর নদী, অপর পারে সরল বৃক্ষরাজিবেষ্টিত পর্বতমালা। খুব উচ্চে একটি রন্ধ্রের মধ্য দিয়া তুষারবর্ত্ম দেখা যাইতেছে।

যাত্রিদল একদিন বিশ্রাম করিল ; একাদশী করিবে। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড পহলগামেই রহিয়া গেলেন।

শত শত যাত্রী চলিয়াছে অমরনাথে। এক অপরূপ দৃশ্য। যাত্রীদের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু। সাধুদের তাঁবুগুলির রঙ গৈরিক।

নিবেদিতা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করেন, এই যাত্রিগণের সকল কার্যের মধ্যেই তৎপরতা ও সংঘবদ্ধতার সহিত কী অপূর্ব কুশলতা! বিশ্রাম করিবার জন্য তাহারা যেখানে থামে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোটখাট শহর বসিয়া যায়। শত শত তাঁবু পড়ে, উহাদের এক অংশের মাঝখান দিয়া চওড়া রাস্তা। একটি বিশ্রামস্থান ত্যাগ করিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায়, পড়িয়া থাকে ভস্মাবৃত অগ্নিস্থানগুলি।

প্রথম হইতেই স্বামিজী শিবময় হইয়া আছেন। সাধুগণের সঙ্গই তাঁহার একমাত্র অভিলাষ। তাঁহার তাঁবুর চারিদিকে সর্বদা ভিড়। সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের উপর স্বামিজীর অসীম প্রভাব। মহাদেবের প্রসঙ্গে সন্ন্যাসিগণও তন্ময়। বস্তুতঃ স্বামিজী এই সময়ে বাহ্যজগৎ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন।

৩০শে জুলাই অন্ধকার থাকিতে যাত্রিদল প্রাতরাশ সমাপন করিয়া যাত্রা করিল। অপূর্ব সূর্যোদয়! পরবর্তী বিশ্রামস্থল চন্দনবাড়ি। একটি গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় ছাউনী পড়িল। সারা বিকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে নিবেদিতা তাঁহার অনুপম ব্যবহারগুণে যাত্রীদের প্রিয়-পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে মুসলমান তহশীলদারের উপর এই যাত্রিদলের দেখাশুনার ভার ছিল, তিনি এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ সর্বদাই স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, এবং নিবেদিতার প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। এক বিদেশিনী রমণী শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদেরই মত অমরনাথ দর্শনে চলিয়াছেন, সম্ভবতঃ এই ভাবটি নিবেদিতার প্রতি যাত্রিগণের অন্তর প্রীতিস্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর সকলের সহিত নিবেদিতার কী বিনম্র সৌজন্যপূর্ণ আচরণ! নানা ছোটখাট ব্যাপারে সকলের সহৃদয় ব্যবহার নিবেদিতারও অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল! তিনি বিদেশী বলিয়া কোনপ্রকার ব্যবধান আর নাই। তাহার উপর চারিদিকে এক অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। নিবেদিতার মনে হইত, বাস্তব জগৎ যেন বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে; তিনি এক নূতন লোকে বিচরণ করিতেছেন, অন্তর সেখানে সর্বদাই ভাবরসে পরিপূর্ণ।

পরদিন চন্দনবাড়ি ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রীরা পুনরায় যাত্রা করিল। নিকটেই একটি তুষারনদী। স্বামিজীর আদেশ, প্রথম তুষারনদীটি নিবেদিতাকে খালি পায়ে হাঁটিয়া পার হইতে হইবে। নিবেদিতা সে আদেশ পালন করিলেন। কয়েক হাজার ফুটের এক বিরাট চড়াইয়ের পর একটি বৃক্ষ গুল্মহীন পার্বত্য-পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। দীর্ঘ পথের প্রান্তে পুনরায় খাড়া চড়াই। একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসে পর্বতের উপরিভাগ আবৃত; যেন একখানি

জয়া, ধীরামাতা, স্বামিজী, নিবেদিতা
(কাশ্মীরে)

পাঠরতা নিবেদিতা

বিস্তৃত গালিচা। শেষনাগ হইতে পাঁচ শত ফুট উপর দিয়া আর একটি পথ গিয়াছে। অবশেষে তুষারমণ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে ১২,০০০ হাজার ফুট উচ্চে তাঁবু পড়িল। অসম্ভব ঠাণ্ডা, শীতে নিবেদিতার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল, সব পথটাই নিবেদিতা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করেন। কিন্তু শেষের দিকে তাঁহার অবস্থাদর্শনে ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন। ফারগাছগুলি বহু নীচে পড়িয়া রহিল। চতুর্দিক হইতে জুনিপার সংগ্রহ করিয়া কুলীরা আগুনের ব্যবস্থা করিল।

১২,০০০ হাজার ফুট উচ্চ শেষনাগ হইতে পরদিন তাঁহারা আর একটু নীচে নামিলেন। যেখানে তাঁবু ফেলা হইল তাহার সামনে দিয়া পাঁচটি স্রোতস্বিনী গিয়াছে, এবং সেইজন্য জায়গাটির নাম পঞ্চতরণী। বিধি অনুযায়ী সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া স্বামিজী আর্দ্রবস্ত্রে প্রত্যেক নদীতে স্নান করিলেন। এখানেও বেশ ঠাণ্ডা ; কিন্তু পূর্বদিনের তুলনায় কম বলিয়া উহা প্রীতিপ্রদ। এখানে চারিদিকে অজস্র সুন্দর ফুল তাঁবুর মধ্যে বিছানার নীচে সর্বত্র বড় বড় নীল ও সাদা Anemone ফুটিয়া আছে। নূতন রকমের ফরগেট-মি-নট। ঘন-সন্নিবিষ্ট পাতাগুলি যেন রাশীকৃত মখমল। তুষারাবৃত বিরাট পর্বতগুলি যেন ভস্মানুলিপ্ত ভগবান শঙ্কর। সমস্ত স্থানটি এক বিরাট ভাবের উদ্দীপক। মনে হয় সকল কষ্ট সার্থক।

অবশেষে ২রা আগস্ট মঙ্গলবারে অমরনাথের শেষ যাত্রা। শ্রাবণী বা রাখি পূর্ণিমার দিন অমরনাথে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বদিন রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে যাত্রিদল যাত্রা আরম্ভ করিল। ডাণ্ডী এবং ঘোড়া ত্যাগ করিয়া পদব্রজে প্রায় দুই হাজার ফুট চড়াই অতিক্রম করিতে হইল। রাস্তা বলিতে 'পাগ্‌দাণ্ডী'; খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া উঠিয়া গিয়াছে। প্রতি দু-চার পা অন্তর থামিয়া নিবেদিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ করেন—বিচিত্র পুষ্পের সমারোহ—কলাম্বাইন, মাইকেলমাস ডেজী এবং অজস্র বন্য গোলাপ। নিবেদিতা শিল্পী, পথের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ। চড়াইএর পর উৎরাই, এবং যেখানে উৎরাই শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে অমরনাথের গুহা পর্যন্ত তুষারবর্ত্মের উপর দিয়া পথ। গন্তব্য স্থানের প্রায় মাইলখানেক পূর্বে বরফ শেষ হইয়াছে। যাত্রীরা বরফগলা জলে স্নান করিতে লাগিল।

স্বামিজী ইতিমধ্যে ক্লান্ত হইয়া পিছনে পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতা কতকগুলি স্তূপের নীচে বসিয়া স্বামিজীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দলে দলে যাত্রিগণ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। স্বামিজীর আসিতে বিলম্ব হইল। 'আমি স্নান করে আসছি, তুমি এগোও',—এই বলিয়া

স্বামিজী চলিয়া গেলেন। তাঁহার নির্দেশানুসারে নিবেদিতা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি রহিল গুহার প্রবেশপথে—কখন স্বামিজী আসিবেন।

গুহাটি বিশাল, তুষারময় শিবলিঙ্গটি যেন মনে হয় নিজ সিংহাসনে অধিরূঢ়। কোন পাণ্ডা নাই। যাত্রিগণের কোলাহল আছে, কিন্তু আড়ম্বর নাই। চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব।

নিবেদিতা নিজে অমরনাথের পথে কী উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার কোন কষ্ট বা অসুবিধা হইয়াছিল কি না, ইত্যাদি ব্যক্তিগত কোন উল্লেখ তাঁহার 'The Master as I Saw Him' অথবা 'Notes of Some Wanderings' পুস্তকে নাই। এই অমরনাথের পথেই এক বৃদ্ধাকে শীতে কাতর দেখিয়া তিনি নিজের ডাণ্ডীতে তাহাকে বসাইয়া আনন্দচিত্তে পদব্রজে পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। স্বামিজীই পরে তাঁহার প্রশংসা করিতে গিয়া নিবেদিতার অসাক্ষাতে এক বন্ধুর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করেন। নিবেদিতার সমগ্র ভ্রমণ-কাহিনী স্বামিজীর প্রসঙ্গে পূর্ণ। নিজেকে এমন অবলুপ্ত রাখিবার অপূর্ব সংযম তিনি কোথা হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ভাবিয়া বিস্ময় জাগে।

স্বামিজী স্বয়ং নিবেদিতাকে তীর্থযাত্রায় আহ্বান করেন। সে আহ্বানে নিবেদিতার সমগ্র অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। শত শত তীর্থযাত্রীর অন্যতম হইয়া মহাদেবকে নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে তিনিও চলিয়াছিলেন। আশা ছিল, অমরনাথের গুহায় মহাদেবের দর্শনে তাঁহার অন্তর ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, অভীপ্সিত দেবতার দর্শন ঘটিবে। দেবতার নিকট সকলেই ছুটিয়া চলে আকুল আগ্রহে; কিন্তু সেই অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার কি এতই সুলভ? কে তাঁহার দর্শন পায়? তথাপি যাত্রীদের হৃদয়ে আনন্দের সীমা থাকে না। বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া, কঠোর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, দূর দূরান্তর হইতে তীর্থযাত্রী আসে তাহার অন্তরের ভক্তি-প্রণাম অর্ঘ্যস্বরূপ দেবতার পায়ে নিবেদন করিতে। এই নিবেদন করিতে পারাই তাহার অপরিসীম সৌভাগ্য। সরল বিশ্বাস লইয়া সে ফিরিয়া যায়—দেবতা সে প্রণাম, সে ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন! নিবেদিতার যুক্তিবাদী মনে সে সরল বিশ্বাসের অভাব, অন্ততঃ তখনও তাঁহার সে সংস্কার জন্মে নাই: সুতরাং একান্তভাবে তিনি আশা করিয়াছিলেন, তীর্থস্থানের মহিমায় নিশ্চিত তিনি কিছু উপলব্ধি করিবেন। বিশেষতঃ সঙ্গে চলিয়াছেন স্বামিজী। সকল সময় স্বামিজীর দুর্লভ সঙ্গ অথবা দর্শন পাওয়া সম্ভব হয় নাই। স্বামিজী চলিয়াছেন নিজভাবে বিভোর হইয়া, প্রত্যেকটি বিধি-নিষেধ পালন করিয়া

—মৌন, উপবাস, একাহার, মালাজপ, তীর্থযাত্রার আনুষঙ্গিক কোন ত্রুটি নাই। এ সকলের প্রয়োজন তাঁহার ছিল না, কিন্তু প্রচলিত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা না করিবার মন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে দিয়াছেন। আর এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠান কি প্রকৃতই অন্তরকে সুসংহত করিয়া গভীর ধ্যানের উপযোগী করে না? কাশ্মীরে আগমন পর্যন্ত চতুর্দিকে সমুন্নত তুষারমণ্ডিত পর্বত-রাজি নিরন্তর স্বামিজীকে শিবভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল,—অমরনাথের পথে প্রবল উদ্দীপনায় মহাদেব তাঁহার নিকট ক্রমশঃই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে-ছিলেন; অবশেষে অমরনাথের গুহায় সেই তুষারময় শিবলিঙ্গের মধ্যে জ্যোতির্ময় মহাদেবের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ!

নিবেদিতার বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টি কেবল স্বামিজীকেই অনুসরণ করিতেছিল। সর্বাঙ্গ ভস্মাবৃত স্বামিজী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সস্মিতবদনে দু-তিনবার ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার চোখের সামনে যেন স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। ভগবান শঙ্করের শ্রীপাদপদ্ম তিনি স্পর্শ করিলেন। ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল; সুতরাং অল্পক্ষণ অবস্থানের পর তিনি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তিনি অমরনাথের সাক্ষাৎকার এবং তাঁহার নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছিলেন।

জীবনের কয়েকটি পরম মুহূর্ত কাটিয়া গেল। নিবেদিতা গুহার বাহিরে আসিলেন। রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বহু যাত্রী তাঁহাদের হাতে রক্ত ও পীত-বর্ণের রাখি বাঁধিয়া দিয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া তাঁহারা জলযোগ করিতে লাগিলেন। পূর্বপরিচিত নাগা সন্ন্যাসী তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন।

স্বামিজী বলিলেন. 'আমি কী আনন্দই উপভোগ করেছি! আমার মনে হল. তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব: আর কোন তীর্থ ক্ষেত্রে আমি এত আনন্দ লাভ করিনি।'

এই সাক্ষাৎকার নিবেদিতার হয় নাই। অথচ তাঁহার মনে হইল, স্বামিজী ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকেও এই দর্শন করাইতে পারিতেন: সে ক্ষমতা তাঁহার আছে। কেন তিনি নিবেদিতাকে সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন? ব্যর্থতার ক্ষোভে, রুদ্ধ বেদনায় তাঁহার অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিল। তাঁহার কাতরতা স্বামিজী অনুভব করিলেন। সস্নেহে বলিলেন, 'তুমি এখন বুঝতে পারছ না, কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রা সম্পন্ন হয়েছে। এর ফল হবেই। কারণ

থাকলে কার্য নিশ্চিত। পরে তুমি আরও ভাল ক'রে বুঝতে পারবে। ফল অবশ্যম্ভাবী।'

স্বামিজীর এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। নিবেদিতা পরে অনুশোচনা করিয়াছিলেন, কেন তিনি তখন অন্তরকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন? নিজের কোন উপলব্ধি হইল না বলিয়া অভিযোগ কেন? দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শনে স্বামিজীর যে দিব্য ভাবান্তর, তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তবে কেন এই হতাশা! স্বামিজীর মধ্য দিয়াই কি তাঁহারা সেই অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই? না করিলে নিবেদিতা কেমন করিয়া লিখিয়াছিলেন—'এই দিনগুলিতে আমাদের নিকট মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরই অধিকতর সত্য হইয়া উঠিয়াছেন!

নিবেদিতার অমরনাথ-তীর্থযাত্রা ব্যর্থ হয় নাই।

পরদিন সকালে একটি সুন্দর রাস্তা দিয়া তাঁহারা পহলগামে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং সকলে ইসলামাবাদ, বওয়ান ও পাণ্ড্রেস্থান হইয়া ৮ই আগস্ট পুনরায় শ্রীনগরে ফিরিয়া গেলেন।

ক্ষীরভবানী

স্বামিজীর কাশ্মীর আগমনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উপযোগী একখণ্ড জমি মনোনীত করিবার জন্য কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। সৌন্দর্যের নিলয় কাশ্মীরে একটি মঠ স্থাপনে স্বামিজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। পূর্ব বৎসর কাশ্মীরে অবস্থানকালে এ বিষয়ে আলোচনা চলিয়াছিল; এ বৎসর তিনি স্থানটি নির্বাচন করেন। তিনটি বৃহৎ চিনার বৃক্ষ—নদীতীরে অবস্থিত ঐ স্থানের গাম্ভীর্য বর্ধন করিয়াছিল। স্বভাবতঃই ঐ সম্বন্ধে স্বামিজীর শিষ্যগণের মধ্যে নানা আলোচনা চলিত। ভারতবর্ষে একটি প্রথা আছে, গৃহনির্মাণের পূর্বে নারীগণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সুতরাং নিবেদিতা প্রভৃতি স্থির করিলেন, মহারাজা জমিটি স্বামিজীকে অর্পণ করিবার পূর্বে তাঁহারা সেখানে তাঁবু খাটাইয়া একটা স্ত্রীমঠগোছের পত্তন করিবেন। জায়গাটি য়ুরোপীয়গণের শিবির-সংস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট জায়গার অন্যতম, সুতরাং কোন অসুবিধার সম্ভাবনা রহিল না।

স্বামিজীর শিক্ষাধীনে মৌন অবলম্বনপূর্বক ধ্যানাভ্যাস করিতে নিবেদিতা প্রভৃতির বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল এবং তাঁহাদের অনুরোধে স্বামিজীও সম্মত হইয়াছিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর সকলে অচ্ছাবলের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। বনের প্রান্তে তাঁহাদের তাঁবু পড়িল। চারিদিকে বিশাল দেওদার বৃক্ষ। সন্ধ্যায় শিবিরের বাহিরে দেওদার বৃক্ষের নীচে তাঁহারা ধ্যানে বসিতেন। স্বামিজী পূর্বের ন্যায় প্রতিদিন আসিয়া নানা প্রসঙ্গ করিতেন। এই সময়েই তাঁহাদের একটি ফটো তোলা হইয়াছিল।

অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক দিন ধরিয়া স্বামিজী শিবভাবে তন্ময় ছিলেন, এবং তাঁহার মুখে নিরন্তর শিব-প্রসঙ্গ লাগিয়া থাকিত। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে এই সময়ে তাঁহার চিত্ত ধীরে ধীরে শক্তিভাবে পূর্ণ হয়। নৌকার মাঝির শিশুকন্যাকে তিনি প্রত্যহ উমারূপে পূজা করিতেন। রামপ্রসাদী গান সর্বদা তাঁহার কণ্ঠে শোনা যাইত। স্বামিজীর চিত্তের প্রভাব বিদেশী শিষ্যগণের উপরেও পড়িত। মহাপুরুষ-সঙ্গের ইহাই নিয়ম। এতদিন তাঁহারা শিবের মহিমা দেখিতেছিলেন, এখন জগজ্জননীর অস্তিত্ব ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

স্বামিজীর আগমনের গোড়ার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সংবাদ আসিল, স্বামিজীকে জমি দেওয়া সম্বন্ধে মহারাজার আগ্রহ এবং আলোচনাসকল ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহাকে মঠ বা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য জমি দেওয়ার প্রস্তাব কাউন্সিলে দুইবার উত্থাপিত করার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তদানীন্তন রেসিডেন্ট স্যার এডালবার্ট ট্যালবট দুইবার উহা কাউন্সিলের কার্যতালিকা হইতে বাদ দেন। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে আলোচনা পর্যন্ত হইতে পারে নাই।

এই সংবাদে স্বামিজীও প্রথমে একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি মন স্থির করিয়া লইলেন। পরন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার মনে হইল, কালী যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র ও সৌম্য উভয়রূপে বিরাজিতা, তখন তাঁহাকে ভয়ঙ্কর রূপেও পূজা করা সঙ্গত। জগতের অশুভের দিকটা ভুলিয়া শুধু শুভের স্বপ্নে মগ্ন থাকার কোন মূল্য নাই।

নিবেদিতা এই ব্যাপারে বিশেষ আহত হইলেন। তাঁহার স্বাধীন পাশ্চাত্য মনের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কল্পনার বাহিরে। মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস প্যাটারসন এবং নিবেদিতা সকলেই একান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে জমিটি স্বামিজীকে দেওয়া হয়; কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রূঢ় আঘাতের সহিত নিবেদিতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, পরাধীন ভারতের উপর শাসক জাতির কতদূর প্রবল আধিপত্য! তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীরও বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। আর ইহাতে বিশেষভাবে সাহায্য করিলেন স্বামিজী। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অপরাপর ইংরেজের মত নিবেদিতারও ধারণা ছিল, ইংরেজ শাসন ভারতের পক্ষে কল্যাণকর। ব্যাপারটি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা দেখিবার কথা মনে হয় নাই। একদিন স্বামিজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, 'লণ্ডন নগরীকে সৌন্দর্যশালিনী করা প্রয়োজন।' স্বামিজী তীব্র স্বরে উত্তর দিয়াছিলেন, 'আর, তোমরা অন্য নগরগুলিকে শ্মশান করে তুলেছ।' নিবেদিতার প্রশ্নটি স্বামিজী ভুল বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য কথাগুলি বহুদিন তাঁহার কানে বাজিত। কিন্তু স্বামিজীর এই ভুল বোঝা হইতেই নিবেদিতার মনে হইয়াছিল, ইহার আর একটি দিক আছে। তথাপি স্বদেশে থাকিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হয় নাই। ভারতে আসিবার পরেও ইংরেজগণ এ-দেশে ভারতবাসীর উন্নতি সাধন করিতেছে এ ধারণাই পোষণ করিতেন। তাহাদের শাসন ও শোষণের দিকটা তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। উত্তর ভারত ভ্রমণকালে তিনি প্রথম বেদনার সহিত অনুভব করিলেন, বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে বহু

পার্থক্য বিদ্যমান। শ্বেতাঙ্গ জাতির এবং দেশীয় লোকের প্রতি শ্বেতাঙ্গ কর্মচারিগণের আচরণের পার্থক্য স্বভাবতঃই তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল। তথাপি তখন পর্যন্ত তাঁহার চিরপোষিত ধারণা অক্ষুণ্ণ ছিল। আলমোড়ায় অবস্থানকালে তিনি প্রথম আঘাত পাইলেন। মর্মাহত হইয়া তিনি মিসেস হ্যামণ্ডকে লেখেন—

'জাতিবিদ্বেষ বলিতে কি বোঝায়, ইংলণ্ডে বসিয়া তুমি তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না।...আজ সকালে একজন সাধু সংবাদ পাইয়াছেন যে, স্বামিজীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্বামিজী সংবাদটি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমি ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া পারি না। স্বামিজীর কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলে বুঝিব গভর্নমেণ্ট উন্মাদ; কারণ গভর্নমেণ্টের এই কার্য সমগ্র দেশকে ক্ষেপাইয়া তুলিবে। আর যে আমি একজন সর্বাপেক্ষা রাজভক্ত মহিলা (এখানে আসিবার পূর্বে পর্যন্ত আমার আনুগত্যের গভীরতা সম্বন্ধে কখনও সংশয় ছিল না), সেই আমি সর্বপ্রথম ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। কিন্তু আশা করা যাক্ এই সকল সন্দেহের আমরা পরিবর্তন করিতে পারিব।'

বহুদিনের বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কার সহজে যাওয়া সম্ভব নহে। নিবেদিতার আন্তরিক আশা ছিল, আলাপ-আলোচনা ও কার্যের দ্বারা তিনি এদেশ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির মনোভাব পরিবর্তনে সমর্থ হইবেন, এবং তাঁহার ভারতসেবার একটা প্রধান অংশই হইবে এই পার্থক্য অপনোদনের প্রচেষ্টা। বিজেতা জাতির অনমনীয় ও দম্ভপূর্ণ মনোভাব তিনি তখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই। মিসেস হ্যামণ্ডকে লিখিত ৬ই জুনের পত্রে তাঁহার এ আগ্রহ পরিস্ফুট—

'ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ পরস্পরকে ভালবাসিবে, ইহা আমার জীবনের স্বপ্ন। ইংলণ্ডের প্রতি সুবিচারের দৃষ্টি লইয়া ভাবিতে গেলে আমার মনে হয়, ইংলণ্ডের সন্তানগণ নানা দিক দিয়াই সুচারুরূপে এবং বিশ্বস্ততার সহিত ভারতের সেবা করিতেছে; কিন্তু তাহাদের সেবার ধরন এরূপ নহে যাহা দ্বারা ভারতের নিকট হইতে প্রীতির সাড়া পাওয়া যাইতে পারে। অপর দিকে বলিতে গেলে প্রত্যেক দেশই স্বাধীনতার দাবী করিতেছে। ইটালী অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে, গ্রীস তুরস্কের নিকট হইতে, আর ভারত ইংলণ্ডের নিকট হইতে মুক্তি চাহে। ভারত মুক্তি লাভ করিলে হিন্দুগণই হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষ হইয়া রাষ্ট্র-পরিচালনা ও শান্তিস্থাপন করিতে পারিবে। আপাততঃ ভারতের সামাজিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য রাজনৈতিক শান্তিলাভের

একমাত্র সম্ভাবনা শক্তিশালী কোন তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব দ্বারা। এই তৃতীয় পক্ষের অবস্থান বহু দূরে এবং স্থানীয় সংস্কার হইতে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

কাশ্মীরের ব্যাপারের পর নিবেদিতা কতদূর নিরাশ ও মর্মাহত হইয়াছিলেন, তাঁহার এক বন্ধুকে পত্রে তাহা ব্যক্ত করেন। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিয়াছিলেন, 'এ দেশের লোকের প্রতি ইংরেজের আচরণ সম্পর্কে কথা এই যে, তাহা দেখিলে তোমার মুখ আমারই মত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত।'

যাহা হউক, এই সকল জাগতিক ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও কিংবা উহারই মাধ্যমে জগজ্জননীর অনুভূতি স্বামিজীর নিকট ক্রমেই নিবিড়তর হইতে লাগিল। শিষ্যদের বলিলেন, 'যে দিকে ফিরছি; কেবল মার রূপ দেখছি। তিনি আমাকে ছোট শিশুর মত হাত ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

সাক্ষাৎ শিবের দর্শন যেমন শিবময় অনুভূতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, এখানেও সেই জগজ্জননীর সাক্ষাৎকার এই সকল দিব্যানুভূতির চরম পরিণতি ছিল। স্বামিজী তাঁহার নৌকা আরও নির্জন স্থানে লইয়া গেলেন। শিষ্যদের বলিলেন, 'কালী, কালী, কালী। তিনি কাল, তিনি পরিবর্তন, অনন্ত শক্তি। যে হৃদয়ে ভয় নেই, সেখানেই তিনি আছেন। যেখানে ত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, মরণকে আলিঙ্গনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, সেখানেই মা। এই মায়ের কী রূপ!'

অবশেষে সেইদিন আসিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাকে বলিতেন চিৎশক্তি, জগৎ-প্রপঞ্চ যে চিৎশক্তির বিকাশ, সেই দুর্জ্ঞেয় চিৎশক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। মনের দ্বারা অচিন্তনীয় সেই উচ্চ তত্ত্বের তীব্র উন্মাদনায তাঁহার সমগ্র অন্তর এরূপ আলোড়িত হইয়া উঠিল যে, কোনরূপে সেই তীব্র আবেগকে লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিয়া লেখা সমাপ্ত হইবামাত্র তিনি মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। তাঁহার 'Kali the Mother' (মৃত্যুরূপা কালী) কবিতাটি সেই দিব্য উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ। সান্ধ্য ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্তন করিয়া নিবেদিতা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ দেখিলেন, স্বামিজী স্বহস্তে লিখিত কবিতাটি তাঁহাদের জন্য বজরায় রাখিয়া গিয়াছেন।

এই উপলব্ধির পর স্বামিজী ক্ষীরভবানী যাত্রা করিলেন—একাকী। দেবীর সম্মুখে তিনি প্রত্যহ হোম করিতেন এবং উপবাসপূর্বক কুণ্ডে পায়স ও বাদাম ভোগ নিবেদন করিতেন। প্রতিদিন প্রাতে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিশুকন্যাকে উমারূপে পূজা করা তাঁহার অন্যতম সাধনা ছিল। কয় দিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন কঠোর তপস্যা ও সাধনার দ্বারা তিনি যে অলৌকিক দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার চকিত প্রকাশ মধ্যে মধ্যে তাঁহার কথা ও আচরণের মধ্যে ঘটিত। নিবেদিতা প্রভৃতি পূর্বেই ক্ষীরভবানী দর্শন করিয়াছিলেন,

সুতরাং তাঁহাদের মানসনেত্রে সেই কুণ্ডের নিকট অবস্থিত স্বামিজীর তপস্যারত চিত্র ভাসিয়া উঠিত।

নিবেদিতা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কবে স্বামিজী ক্ষীরভবানী হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী যাত্রা করিয়াছিলেন; ৬ই অক্টোবর অপরাহ্নে তাঁহার নৌকা দেখা গেল। স্বামিজীর হাতে একছড়া গাঁদাফুলের মালা। অপূর্ব জ্যোতিঃ ও পবিত্রতায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। বজরায় প্রবেশ করিয়া নীরবে তিনি মালাছড়াটি সকলের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। অবশেষে মালাটি একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এটি আমি মাকে নিবেদন করেছিলাম।'

স্বামিজী উপবেশন করিলেন, তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আর হরি ওঁ নয়, এবার মা, মা।' সকলে নিস্তব্ধ। কী অপার্থিব দিব্যভাবে যেন সমস্ত স্থানটি ভরপুর হইয়া গিয়াছে! জগজ্জননীকে আর অপ্রত্যক্ষ মনে হইতেছে না। স্বামিজীর আনন কী প্রশান্ত! তাঁহার আকৃতিই যেন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করিযাও কেহ কথা কহিতে পারিতেছেন না। এই মুহূর্তে তাঁহারা যেন বাস্তব জগতের পারে চলিয়া গিয়াছেন। স্বামিজীই আবার বলিলেন, 'আমার সব স্বদেশপ্রেম ভেসে গেছে। আমার সব গেছে, এখন কেবল মা, মা!'

ক্ষণকাল নীরবতা, আবার বলিলেন, 'আমার খুব অন্যায় হয়েছে। মা আমাকে বললেন, "যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কী! তুই আমাকে রক্ষা করিস, না, আমি তোকে রক্ষা করি!" সুতরাং আমার আর স্বদেশপ্রেম বলে কিছুই নেই। আমি তো ক্ষুদ্র শিশু মাত্র!' বিদায় লইবার পূর্বে তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'এখন আমি এর চেয়ে বেশী বলতে পারব না; বলতে নিষেধ আছে।'

জগজ্জননীর সত্তায় অনুপ্রাণিত স্বামিজীর এই আত্মবিস্মৃতি, এই পরিবর্তন তাঁহার শিষ্যগণকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল। এই অপার্থিব ভাবরাজ্যের প্রকাশ বিশেষ করিয়া নিবেদিতার হৃদয়ে এক দিব্য অনুভূতির সঞ্চার করে। নীরব উপাসনায় তাঁহার সমগ্র অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামিজীর এই দিব্যদর্শন তিনি ১৩ই অক্টোবরের পত্রে তাঁহার এক বান্ধবীকে লেখেন—

স্বামিজীর সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিবার জন্যই বসিয়াছি; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না কী ভাবে আরম্ভ করিব। গতকাল তিনি এখান হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আবার লাহোরে সাক্ষাৎ হইতে পারে; অথবা কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত নাও হইতে পারে।

'এক পক্ষকাল পূর্বে তিনি একাকী চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় আট দিন পূর্বে যখন ফিরিলেন, তখন তিনি যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ ও ঐশীভাবে অনুপ্রাণিত। এ বিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব নহে; কারণ উহা বাক্যাতীত! তাহা বলিতে গেলে আমার লেখনীকে চুপে চুপে কথা বলা শিখিতে হইবে।

'জগন্মাতার ক্রোড়স্থিত শিশুর মত তাঁহার কথা, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বর দেবোপম।

'তাঁহার এই আনন্দময় ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সান্নিধ্য আমাকে নির্জনতম কোণে বসিয়া সর্বক্ষণ নীরব পূজায় অতিবাহিত করিতে প্রেরণা দিয়াছে।

'"আমরা দেখিয়াছি তারকাসমূহের অভ্যুদয়; জানিয়াছি তাহার অন্যতম তত্ত্ব।"

'ভগবৎ সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার সমগ্র আচরণ, তাঁহার চক্ষে এখনও সেই দিব্যদর্শনের ভাববিহ্বলতা।

'এক্ষণে "লোককল্যাণ"-চিন্তা তাঁহার নিকট ভয়াবহ। একমাত্র "জগজ্জননীই" সকল কর্মের কর্ত্রী। "স্বদেশপ্রেম ভ্রম মাত্র, সমস্তই ভ্রম।"

'প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বলিলেন, "যা কিছু দেখছ সবই মা...সকলেই ভাল, আমাদেরই কেবল সকলকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই। আর কখনও আমি শিক্ষা দিতে যাচ্ছি না। অন্যকে শিক্ষা দেবার আমি কে?"

'মৌন, তপস্যা ও উপরতি এই মুহূর্তে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। জ্ঞাতসারে প্রত্যেক মুহূর্ত জগন্মাতার সহিত অতিবাহিত না করিতে পারিলে তাহা চরম অপব্যয়।

'এই মধুর গ্রীষ্মকালের দিকে যখন ফিরিয়া তাকাই, আশ্চর্য হইয়া ভাবি, কী করিয়া আমি সেই দুর্লভ শীর্ষরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম! এই কয় মাস আমরা বিরাট ধর্মাদর্শের ভাস্বরালোকে বাস করিয়াছি, নিঃশ্বাস লইয়াছি। এই সকল দিনে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরই ছিলেন আমাদের নিকট অধিকতর প্রত্যক্ষ। আর গতকাল প্রভাতে শেষ কয় ঘণ্টা যখন তিনি জগন্মাতার উদ্দেশ্যে গান করিতেছিলেন, আমরা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম।

'এখন তাঁহার সবটাই প্রেমপূর্ণ।..."স্বামিজী আর নেই, চিরদিনের মত চলে গেছেন"—এই কথাগুলিই তাঁহার মুখে শেষ শুনিয়াছি।'

স্বামিজী প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ১১ই অক্টোবর সকলে একত্র বারমুল্লা যাত্রা করিলেন। স্থির হইল, পরদিন বারমুল্লা হইতে স্বামিজী লাহোর রওনা হইবেন। শিষ্যগণ স্বামী সারদানন্দের সহিত দিল্লী,

আগ্রা প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলি দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। অবশ্য লাহোরে স্বামিজীর সহিত তাঁহাদের আর একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেখান হইতে স্বামিজী একাকী কলিকাতায় চলিয়া যান।

১২ই অক্টোবরের প্রভাত শিষ্যগণের জীবনের আর একটি চিরপোষণীয় স্মৃতি। স্বামিজীর কথা শুনিতে শুনিতে সকলে যেন এক অন্তরতম পবিত্র-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মাঝে মাঝে তিনি যে গানগুলি গাহিতেছিলেন, সে সকলই জগন্মাতার।

'শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার-বাজার মাঝে)
ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।'

তাঁহার গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তজনহৃদ্বিহারিণী শ্যামা মায়ের মূর্তি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নিজের কবিতা হইতে আবৃত্তি করিলেন—

'দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি, করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।'

মাঝখানে তিনি থামিয়া বলিলেন, 'দেখেছি সব বর্ণে বর্ণে সত্য!'

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

'মা সত্য সত্যই তার কাছে আসেন। আমি নিজ জীবনে এটি প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ, আমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গন করেছি।' স্বামিজী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কাহিনী বলিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পরমশত্রুতা সাধন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শতপুত্রের নিধন, নিজের অপমান, ক্লেশ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া বশিষ্ঠ তাঁহার শত্রু বিশ্বামিত্রের প্রতিভার প্রশংসায় তন্ময়।

'আমাদের প্রেমও ঐ রকম হওয়া চাই, বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের যেমন ছিল—তাতে ব্যক্তিগত ভালমন্দের স্মৃতির লেশমাত্র থাকবে না।'

সেদিন নিবেদিতা প্রভৃতি স্বামিজীর সহিত যে কয় ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার দীপ্তি সত্যই তাঁহাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিয়াছিল।

শিষ্যগণের নিকট বিদায় লইয়া স্বামিজী চলিয়া গেলেন।

বাগবাজার পল্লী

লাহোর হইয়া ১৮ই অক্টোবর স্বামিজী মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিবেদিতা, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে সঙ্গে লইয়া স্বামী সারদানন্দ দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নগরগুলি ভ্রমণ করিতে গেলেন। কিন্তু পরিকল্পিত শিক্ষাকার্য আরম্ভ করিবার আর কোন বাধা না থাকায় নিবেদিতা অনর্থক সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং তিনি একাকী কাশী হইয়া ১লা নভেম্বর কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। স্বামিজী এই সময় বাগবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। হাওড়া স্টেশন হইতে নিবেদিতা একেবারে উত্তর কলিকাতায় সেই বাড়িতে উঠিলেন।

হিন্দু নারীগণের মধ্যে কার্য করিবার জন্য হিন্দু জীবনযাত্রা প্রয়োজন, স্বামিজীর এই অভিমত নিবেদিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর বুঝিয়াছিলেন যে, কোন হিন্দু পরিবারে বাস করিলে ঐ জীবনযাত্রার সহিত পরিচয় লাভ করিবার সর্বাধিক সুযোগ মিলিবে। শ্রীমা তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। নিবেদিতা তাঁহার নিকট বাস করিবার একান্ত অভিলাষ স্বামিজীকে জানাইলেন। স্বামিজী কথাবার্তা বলিয়া শ্রীমার নিকট তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীমা ১০।২ নং বোসপাড়া লেনে যে বাড়িতে ছিলেন, তাহার প্রবেশপথে দুই দিকে দুটি ঘর ছিল। একটি ঘরে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী যোগানন্দ বাস করিতেন। অপরটিতে নিবেদিতার থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

শ্রীমা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। নিবেদিতা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, তাঁহাকে এইরূপে আশ্রয় দিবার জন্য শ্রীমাকে সামাজিক গোলযোগের সম্মুখীন হইতে হইবে। পরে এজন্য তাঁহার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, জাতিভেদ অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কার মাত্র। বিদেশী মাত্রেই আচারের ধার ধারে না, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসই ইহার কারণ। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার মূলগত কারণগুলি সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান তখনও হয় নাই। এদিকে শ্রীমার আচরণ বিস্ময়কর। রক্ষণশীলা হইয়াও কত সহজে পারি-পার্শ্বিকতার গণ্ডি অতিক্রম করিবার মত বিপুল মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল! হিন্দু ব্রাহ্মণকন্যা হইয়াও তিনি অনায়াসে নিবেদিতাকে স্বগৃহে স্থান দিলেন।

বর্তমান যুগে এ ব্যাপারটির মধ্যে অসাধারণত্ব নাই ; কিন্তু সে যুগে ইহা অভাবনীয়।

নিবেদিতা শ্রীমার বাড়িতে আট-দশ দিন ছিলেন। পরে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া শ্রীমা বস্তুতঃ সমাজবিরোধী কার্য করিয়াছেন, যাহার ফল সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মীয়-স্বজনের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র গৃহের প্রয়োজন ছিল। শ্রীমা কলিকাতায় আগমন করিলে বাগবাজার পল্লীতেই অবস্থান করিতেন ; সুতরাং স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল, নিবেদিতার কর্মকেন্দ্র তাঁহার বাসস্থানের সন্নিকটে স্থাপিত হয়। অতএব আশেপাশে বাড়ির সন্ধান চলিল। তখনকার দিনে বাগবাজারের মত রক্ষণশীল পল্লীতে বিদেশীর জন্য বাড়ি ভাড়া পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু স্বামিজীর প্রভাবে তাহা সম্ভব হইল। বোসপাড়া লেনেই শ্রীমার বাড়ির অপর দিকে, অতি নিকটে ১৬নম্বর বাড়িটি পাওয়া গেল। হিন্দু সমাজ নিবেদিতাকে গ্রহণ করিল। অবশ্য 'হিন্দু সমাজ' ব্যাপকার্থে নহে। শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসমাজ, সেই সমাজে নিবেদিতার স্থান হইয়াছিল। পরবর্তী কালে উদার ও শিক্ষিত হিন্দুগণেরও তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। আহারাদি ব্যাপারে তখনকার সমাজ, বিশেষ করিয়া নারীগণ নিশ্চিতই অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, এবং কোন বিদেশীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। কিন্তু নিবেদিতা তাঁহার পরিচিত কাহার না প্রিয় ছিলেন? বাগবাজার পল্লীর ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষীয়সী মহিলা পর্যন্ত প্রতি গৃহের অধিবাসীদের মধ্যে কে না তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন? এ কথা সত্য, তাঁহারা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করেন নাই। নিবেদিতা নিজেই একান্ত আপনার জন জ্ঞানে তাঁহাদের নিকট গিয়াছেন ; তাঁহারাও তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, অন্তরেই স্থান দিয়াছেন। নিবেদিতা তাঁহাদের পরমাত্মীয়া ছিলেন। আজ আহার এবং স্পর্শ-ব্যাপারে বিশেষতঃ কলিকাতার হিন্দু সমাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কোন বিদেশী হয়তো আজ শিক্ষিত হিন্দু সমাজ বা পরিবারে অপাঙ্‌ক্তেয় নহে, কিন্তু নিবেদিতার ন্যায় তিনি হৃদয়ের সেই গভীর প্রীতি কি লাভ করিতে পারিবেন? অবশ্য যে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান লইয়া হিন্দু সমাজ গঠিত তাহার সেই দৈনন্দিন জীবনে নিবেদিতা হয়তো এক হইয়া যাইতে পারেন নাই ; কিন্তু সামাজিক মানুষগুলির সহিত তাঁহার ঐক্য ঘটিয়াছিল।

স্বতন্ত্র বাড়িতে উঠিয়া গেলেও প্রতি অপরাহ্ণ নিবেদিতা শ্রীমার নিকট

কাটাইতেন, এবং গ্রীষ্মকালে শ্রীমা নিজের কক্ষেই তাঁহাকে বিশ্রামের আদেশ দিয়াছিলেন। ঘরটি ছিল ঠাণ্ডা, আসবাবপত্রশূন্য। পালিশ করা লাল মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছানো, তাহার উপর এক-একটি বালিশ ও মশারি। উপরতলা হইতে গঙ্গাদর্শন হইত। এই সময়ে শ্রীমার নিকট গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মী দিদি প্রায় সর্বদাই থাকিতেন। ইঁহারা সকলেই বিধবা। গোপালের মা নিবেদিতা ও স্বামিজীর অন্যান্য পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে প্রথম দর্শনেই অতি স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিদেশী খৃীষ্টানের সহিত এক গৃহে অবস্থান! তাঁহার আশী বৎসরের সংস্কারে বিশেষ আঘাত লাগা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু একবার ঐ ভাবটিকে অতিক্রম করিবার পর নিবেদিতার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও বাৎসল্যের অন্ত রহিল না। আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা বৃদ্ধির সহিত ঐক্যানুভূতি যত প্রবল হয়, ততই মানুষ সর্ববিধ সংস্কারের পারে চলিয়া যায় ; শত শত বক্তৃতায় তাহা সম্ভব হয় না। গোপালের মার জীবন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামী বিবেকানন্দ বা নরেনের প্রতি গোপালের মার বিশেষ স্নেহ ভালবাসা ছিল ; তাই 'নরেনের মেয়ে' বলিয়া এবং নিজের ব্যবহার-গুণেও নিবেদিতা তাঁহার স্নেহপাত্রী ছিলেন। শেষজীবন নিবেদিতার নিকটেই তিনি অতিবাহিত করেন।

এই বিচিত্র পরিবারটির সহিত অবস্থানকালে নিবেদিতা গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনুসরণের সহিত উহার মর্মার্থ উপলব্ধির চেষ্টা করিতেন। শ্রীমার গৃহখানি যেন শান্তি ও মাধুর্যের নিলয়! সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই সকলে শয্যাত্যাগ করিয়া জপের মালা হস্তে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া জপে মগ্ন হইতেন। নিবেদিতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেন, কী ধীরস্থিরভাবে ইঁহারা দীর্ঘ কাল বসিয়া আছেন! সূর্যোদয়ের পর গৃহকর্ম আরম্ভ হইত। একটু বেলা হইলে শ্রীমা যখন নিজের ঘরে শ্রীঠাকুরের পূজায় বসিতেন, তখন সকলেই নানাভাবে পূজার আয়োজনে সাহায্য করিতেন। নিবেদিতা দেখিতেন, দীপ জ্বালা, ধূপধুনা দেওয়া, পুষ্প-নৈবেদ্য সাজানো প্রভৃতি কাজগুলিতে সকলেরই কী গভীর নিষ্ঠা! মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম এবং তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া গল্প-গুজব। লক্ষ্মী দিদি তাঁহার স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার সহিত বিভিন্ন দেব-মূর্তির নকল এবং নানা প্রকার পালার অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র গল্প-গুজব হাস্য-পরিহাস সব থামিয়া যাইত। ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখানো হইতেই সকলে একান্ত ভক্তিভরে ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া শ্রীমা ও গোপালের মার

পাদবন্দনা করিতেন। তারপর সকলেই জপে বসিতেন ; আর নিবেদিতা শ্রীমার পার্শ্বে বসিবার সৌভাগ্যলাভে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

এই পরিবারটির নিবেদিতাকে অকপটে গ্রহণ করিবার মূলে ছিলেন শ্রীমা স্বয়ং। নিবেদিতা কি হিন্দু জীবনযাত্রার সকল ছোটখাট ব্যাপার, দৈহিক শুচিতার আধিক্য, স্পর্শ সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা প্রভৃতির মর্ম যথাযথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন? সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কৌতূহলী হইয়া হয়তো বহু প্রশ্নও করিতেন। কিন্তু শ্রীমার সান্নিধ্যের মূল্য তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম আশ্চর্য নয়।

নিবেদিতার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে প্রথম সাক্ষাতের দিনেই শ্রীমা ও অন্যান্য মহিলাগণের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ধরা পড়িয়াছিল। তাঁহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে যেন এক আড়ম্বরহীন অপার্থিব ভাব বিরাজ করিত, যাহার সান্নিধ্যে সমস্ত ক্লান্তি ও দুঃখের উপশম হইত। আলমোড়ায় অবস্থানকালে শ্রীমার কথা নিবেদিতার প্রায় মনে পড়িত, এবং এই সময়েই পত্রে তাঁহার এক বন্ধুকে শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের বিবরণ দিয়াছিলেন—

'অনেকবার ভাবিয়াছি, তোমাকে সেই মহিলার কথা বলিব। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। নাম সারদা। একজন হিন্দু বিধবার মতই তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র। এই শুভ্র শাড়ীটি তাঁহার সারা দেহ পরিবেষ্টন করিয়া মাথা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। যেন পাশ্চাত্য দেশের সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন। তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিলে বোঝা যায়, তাঁহার মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি এবং তৎপরতার কী চমৎকার প্রকাশ! তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি—এত শান্ত, নম্র, স্নেহপ্রবণ, আবার ছোট বালিকার মতই সদা উৎফুল্ল। বরাবরই তিনি ছিলেন রক্ষণশীলা, কিন্তু আশ্চর্য, পাশ্চাত্যবাসিনীগণকে দেখিবার পরমুহূর্তে তাঁহার রক্ষণশীলতার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তিনি আমাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করায় সকলেই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই আচরণ আমাদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছে, আর আমার ভবিষ্যৎ কার্যের সম্ভাবনাকে যতখানি সফল করিয়া তুলিয়াছে, আর কিছুই তেমন পারিত না।...

'তাঁহার কলিকাতায় অবস্থানকালে চৌদ্দ, পনেরো জন উচ্চবর্ণের মহিলা তাঁহার পরিচর্যা করেন ; এবং তিনি অপূর্ব কৌশল ও ভালবাসা দ্বারা তাঁহাদিগকে সদা শান্তির মধ্যে রাখেন। সত্যিই, শক্তিরূপিণী এবং মহানুভবা রমণীগণের তিনি অন্যতমা, যদিও বাহিরে নিতান্ত সরল ও অকপট।'

স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল, নিবেদিতা যেন শ্রীমার আশ্রয়ে তাঁহারই স্নেহলাভে ধন্য হইয়া আত্মোন্নতির পথে ও কর্মজীবনে অগ্রসর হইতে পারেন। সেইজন্যই

বাগবাজারে তাঁহার কর্মকেন্দ্র নির্বাচনে স্বামিজীর আগ্রহ। স্বামিজীর মহৎ অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিয়া শ্রীমা ও নিবেদিতার মধ্যে যে নিবিড় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রকাশ পরবর্তী কালে আমরা বহুবার দেখিতে পাইব।

১৬ নম্বরের যে বাড়িটিতে নিবেদিতা বাস করিতেন, তাহা অত্যন্ত সেকেলে ধরনের। নিবেদিতার পুস্তকে এই বাড়ি এবং বাগবাজার পল্লীর বর্ণনায় ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য আছে। থাকাই স্বাভাবিক, কারণ পল্লীটিকে ভালবাসিবার জন্য তিনি উন্মুখ ছিলেন। তাঁহার চক্ষে নবানুরাগের অঞ্জন ছিল ; তাই প্রতি তুচ্ছ বস্তুও তাঁহার নিকট মাধুর্যময় হইয়া দেখা দিত। ১৮৯৮এর নভেম্বর হইতে ১৮৯৯এর জুন পর্যন্ত এই কয় মাস নিবেদিতা এক বিচিত্র জগতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'স্বামিজীর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার নিকট যাঁহারা অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের সকলকে তিনি বড় করিয়া তুলিতেন। তাঁহার সান্নিধ্যে মানুষ তাহার জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য যেন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত, এবং দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে শিখিত। আর দোষত্রুটিগুলির কালিমা যেন অনেকটা মুছিয়া যাইত—মনে হইত, জীবনের সম্যক্‌ বিকাশের জন্য ইহাদের সংঘটন যেন ঠিকই হইয়াছে। স্বামিজীর শিষ্যারূপে আমি যে জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার সম্বন্ধে আমার ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা কতকটা পূর্বোক্ত ধরনের। এইরূপে প্রতিপদে তাঁহারই ভাবরাজি দ্বারা পরিবৃত ও তাঁহারই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি যেন কোন দেবলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, যেখানে প্রত্যেক নরনারী তাহাদের স্বভাবের অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিত।'

নিবেদিতার সকল অনুভূতি ও ভালো লাগার মূলে ছিল উপরি-উক্ত কারণ।

কলিকাতার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত বাগবাজার একটি পুরাতন পল্লী ; তাহারই মধ্যে বোসপাড়া লেন। উহা রামকান্ত বসু স্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া উত্তর দিকে কিছুদূর গিয়া তিন দিকে বিভক্ত হইয়াছে। একটি রাস্তা গিয়াছে পশ্চিম দিকে, একটি পূর্ব দিকে কাঁটাপুকুর লেনে, এবং প্রধান রাস্তাটি সোজা গিয়া বাগবাজার স্ট্রীটে পড়িয়াছে। যে রাস্তাটি পশ্চিম দিকে ঘুরিয়াছে, তাহার ঠিক মোড়ে এক টুকরা খালি জমি। এই জমির এক পার্শ্বে ১৭ নম্বর বাড়িতে নিবেদিতা দ্বিতীয়বার এদেশে আগমনের পর শেষ পর্যন্ত বাস করেন। পশ্চিম দিকে গিয়া জমির অপর পার্শ্বে বাম দিকে ১৬ নম্বর বাড়ি। ইহার

খান কয়েক বাড়ির পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাস করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার এই বোসপাড়া লেন দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন। ১৬ নম্বর বাড়ির অপর দিকে নিকটেই শ্রীমা অবস্থান করিতেন। এই বাড়িটি এখনো বর্তমান।

এই পল্লীর জীবনযাত্রায় একটি ধীর, শান্ত, সুষম ছন্দ ছিল ; আর ধর্মের প্রতি এক সহজাত নিষ্ঠাই ছিল ইহার মূল সুর। পল্লীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ভাগীরথীর সহিত পরিবারগুলির এক ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিয়াছিল। ভারতবাসী গঙ্গার মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ; গঙ্গাতীরে বাস করিতে পারিলে জীবন ধন্য বলিয়া মনে করে। দিনের আরম্ভ হইত গঙ্গাস্নানের দ্বারা। সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে অন্তঃপুরিকাগণ স্নান করিতে যাইতেন। ফিরিবার সময়ে পথি-পার্শ্বে প্রত্যেকটি দেবমূর্তির সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহারা করজোড়ে প্রণাম করিতেন, অথবা কোন প্রাচীন বৃক্ষমূলে ভূমিষ্ঠ হইতেন। ক্রমে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় দিনের কর্ম। সমগ্র পল্লীটি যেন ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে ; চারিদিকে কর্মের চাঞ্চল্য দেখা যায়, কিন্তু তাহার গতি তেমন দ্রুত নয়। গৃহের অধিবাসিগণ দরজার নিকট অথবা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। বেশভূষায় কোন পারিপাট্য নাই, কিন্তু তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সেকস্‌পীয়র, শেলী কিছুই বাদ নাই। এক এক করিয়া ভিখারীরা আসিতে থাকে। তাহারা উঠানে দাঁড়াইয়া গান ধরে, অথবা মুখে কেবল হরিনাম। এক মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে তাহারা গৃহস্থকে ভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মধ্যাহ্ন-আহারের সহিত অন্তঃপুরচারিণীগণের প্রধান কার্য সমাপ্ত ; অপরাহ্নের দিকে বিশ্রামের সময়। জানালায় অথবা ছাদে দাঁড়াইয়া পাশাপাশি বাড়িগুলির মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা চলে। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসে। দোয়াত-কলম, বই-খাতা হাতে গৃহাভিমুখী স্কুল-বালকগণের কলরবে সমগ্র রাস্তা মুখরিত হইয়া উঠে। ধীরে ধীরে অস্তগামী সূর্যের আভায় পশ্চিম দিগন্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিল ; গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার প্রতিবিম্ব—এক অপূর্ব দৃশ্য! তারপর চারিদিকে নামিয়া আসিল সন্ধ্যার ধূসর-ছায়া। সমগ্র পল্লী সচকিত করিয়া প্রতি গৃহে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। অন্তঃপুরিকাগণ সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাইয়া গৃহদেবতার পটের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বহু গৃহে আরতি আরম্ভ হইল ; কাঁসর-ঘন্টার সম্মিলিত মধুর শব্দ শোনা যাইতেছে। চারি-দিকে একটা ধীর, স্থির, শান্তভাব ; শ্রীমার বাড়িতে আবার এই সময়ে সকলে নিঃশব্দে ধ্যান করিতে বসিয়াছেন। নিবেদিতা বলিতেন, সন্ধ্যাকাল যেন 'শান্তির লগ্ন'। এই সন্ধ্যাকাল বরাবর তাঁহার মনে একটি প্রশান্তির ভাব

সঞ্চার করিত। ছাদের উপর একাকী বসিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। ক্রমে চারিদিক নিস্তব্ধ। শুক্লপক্ষে সমগ্র পল্লী শুভ্র চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; কৃষ্ণপক্ষ হইলে নিঃশব্দে নক্ষত্রগুলি মাথার উপর ঝক্‌ঝক্‌ করিবে। মেটারলিঙ্ক যাহাকে বলিয়াছেন, 'মহৎ সৃষ্টিগর্ভ নীরবতা', এই সব মুহূর্তে নিবেদিতা তাহাই অনুভব করিতেন।

বাড়ি কষ্টেসৃষ্টে জুটিলেও পরিচারিকা পাওয়া সহজ ছিল না। একজন বিদেশী মহিলার নিকট কোন্‌ হিন্দু পরিচারিকা কাজ করিতে আসিবে? নিবেদিতা কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন, 'অবশেষে একজন পরিচারিকা পাওয়া গেল। স্ত্রীলোকটি বেশ বৃদ্ধা। সে আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত, আর আমার বয়স তাহার অর্ধেক হইলেও আমি তাহাকে 'ঝি' বলিয়া ডাকিতাম, অর্থাৎ সে আমার 'মেয়ে'।[১]

এই বৃদ্ধার যে কার্যে দক্ষতা ছিল, শীঘ্রই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল; কারণ সে প্রথমেই জল ঢালিয়া ঘরগুলি ধুইয়া ফেলিল। তারপর গরম জল ঢালিয়া টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি ধৌত করিল। নিবেদিতা নিশ্চয় বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপে ধৌত হইয়া ঘরগুলির সহিত তাঁহার আসবাবপত্রও বিশুদ্ধি লাভ করিল। নিবেদিতার এই সকল কাজ করিবার জন্য ঝি-এর একটি শর্ত ছিল। শর্তটি এই যে, নিবেদিতা কখনও তাহার রন্ধনকক্ষে প্রবেশ করিবেন না, অথবা তাহার উনুন ও জল স্পর্শ করিবেন না। রন্ধন করিবার উনুন ছিল না। ঝি মাত্র ছটি পয়সা লইয়া বাজার হইতে খানকয়েক টালি, একতাল মাটি ও কতকগুলি লোহার শিক কিনিয়া আনিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত উনুন প্রস্তুত করিল। সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেলে নিবেদিতা একদিন অপরাহ্ণে নিজের বাড়িতেই চা-এর ব্যবস্থা করিলেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধা 'কন্যা' অর্থাৎ ঝি বারান্দায় আসিয়া বসিল, কী অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে দেখিবার জন্য। নিবেদিতা চা ঢালিয়া লইয়া পাত্রটি তাহার দিকে আগাইয়া ধরিয়া আরও গরম জল চাহিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন, যখন ঝি একটা গভীর অসন্তোষসূচক শব্দের সহিত ভিতরের উঠানে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটু পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার আপাদমস্তক ভিজা। নিবেদিতার চায়ের পাত্রটি স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহার স্নান করিবার প্রয়োজন ছিল বৈকি! অবশ্য পরে নিবেদিতার স্পৃষ্ট পাত্রগুলি ঝি ধুইয়া দিত; কিন্তু অন্য মেমসাহেব আসিলে এসব কাজ তাঁহাকেই করিতে হইত।

[১] 'ঝি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কন্যা, যদিও বর্তমানে পরিচারিকাকে 'ঝি' বলিয়া সম্বোধনের মধ্যে সেই অর্থটি লুপ্ত, নিবেদিতা ইহার মূল অর্থ গ্রহণে বিশেষ আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

নিবেদিতা এ সকল কিছুই মনে রাখিতেন না। আহার এবং স্পর্শ ব্যাপারে তাঁহাকে বহু সহ্য করিতে হইয়াছে, হয়তো তাঁহার মনে বেদনাও লাগিয়াছে, কিন্তু উহা ক্ষত সৃষ্টি করে নাই। কারণ তিনি জানিতেন, সমগ্র ব্যাপারটা আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বোসপাড়া লেনের এই বাড়িতে নিবেদিতা পরমানন্দে দিন কাটাইয়াছিলেন। শৈশবে ইহুদি ধর্মযাজকগণের ও হিন্দুগণের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে যে কাহিনীগুলি তিনি শুনিতেন, তাহার মধ্যে কী বীভৎস চিত্রের কল্পনা ছিল! তাহার সহিত বাস্তব চিত্রের কী বিরাট পার্থক্য!

কয়েকখানি আধুনিক চিত্র এবং পুস্তক দ্বারা সজ্জিত ক্ষুদ্র পাঠকক্ষে বসিয়া নিবেদিতা তাঁহার প্রতিবেশীগণকে পর্যবেক্ষণ করিতে ভালবাসিতেন। পথের ধারে অবস্থিত ঐ কক্ষটির প্রতি প্রতিবেশী সকলেরই কৌতূহল ছিল। রাস্তা দিয়া কতরকম লোকের আনাগোনা! নিবেদিতা লেখাপড়ার ফাঁকে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখেন। কখনও হয়তো একটি শিশু মা অথবা ঝি-এর কোলে চড়িয়া চলিয়াছে—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোমরে সোনার গোট, চোখে কাজল দেওয়া—কী সুন্দর! কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা হয়তো স্নান করিতে যাইতেছেন—নিবেদিতার ঘরের দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া গেলেন; সে দৃষ্টির মধ্যে কী মাধুর্য! কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, শান্ত, ধীর পদক্ষেপে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি চলিয়াছেন—তাঁহার প্রশান্ত মুখে বুদ্ধির আভা। নিবেদিতার দৃষ্টিতে সবই সুন্দর। অদূরে পুষ্করিণীর পরিষ্কার জলে দীর্ঘ নারিকেল গাছগুলির ছায়া পড়িয়াছে; বিচিত্র রকমের পাখী জানালার পাশ দিয়া দ্রুত উড়িয়া যাই-তেছে, পলকের জন্য তাহাদের ছায়া নিবেদিতার লেখার কাগজের উপর আসিয়া পড়িতেছে। নূতন অনুভূতির আনন্দ, আবেগ—এ যেন এক নূতন ধরণীতে তিনি জন্ম লইয়াছেন।

সূচনা

উত্তর ভারত ভ্রমণকালে নিবেদিতার চিন্তারাজ্যে যখন একটা ভারসাম্য ঘটিল এবং তিনি অনেকখানি মানসিক স্থৈর্য লাভ করিলেন, তখন স্বামিজী বুঝিলেন এইবার নিবেদিতার কার্যে অবতীর্ণ হইবার সময় আসিয়াছে। নিবেদিতা বুঝিতে পারেন নাই কতখানি প্রস্তুতি আবশ্যক ছিল। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়া তাঁহার সমগ্র সত্তার রূপান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি বিবেকানন্দের কন্যা ও শিষ্যা—এই চিন্তা, এবং একান্তভাবে তাঁহারই আদর্শে জীবনযাপনের নিরন্তর প্রয়াস তাঁহাকে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে এক জীবন হইতে অন্য জীবনে লইয়া গেল।

কর্ম সম্বন্ধেও স্বামিজী নিবেদিতাকে নূতন ধারণা দিয়াছিলেন। কাহারও ভাল করিতে যাওয়া বা অন্য যে কোন কার্যের গূঢ় উদ্দেশ্য আত্মকল্যাণ-সাধন। প্রকৃতপক্ষে কর্ম একটি উপায়, লক্ষ্য নহে। নিবেদিতা বহুবার তাঁহার ভাবী বিদ্যালয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে আলোচনার সুযোগ হয় নাই। একদিন স্বামিজী নিজেই এই প্রসঙ্গ তুলিলেন। সেদিন ২৪শে জুলাই, কাশ্মীরে বেরীনাগ বনের মধ্যে তাঁহাদের তাঁবু পড়িয়াছিল। অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে গভীর অরণ্য। একটি বৃক্ষতলে প্রজ্বলিত বৃহৎ কুণ্ডের চারিপার্শ্বে স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্যগণ উপবিষ্ট। সহসা নিবেদিতাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী বলিলেন, 'কই, তুমি তো আজকাল তোমার স্কুলের সম্বন্ধে কোন কথা বল না? তুমি কি মাঝে মাঝে সে কথা ভুলে যাও?'

নিবেদিতা বিস্মিত হইলেন। নারীজাতির শিক্ষাকল্পে বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে তিনি এ পর্যন্ত স্বামিজীর নিকট কোন উৎসাহ পান নাই। কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না করিলেও স্বামিজী এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, কারণ মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, '...কলিকাতায় নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়টি যেমন করে হোক খাড়া করে দিতে হবে।'

ক্ষণকাল নীরবতার পর স্বামিজী বলিলেন, 'দেখ, আমার চিন্তা করবার বহু জিনিস আছে। একদিন আমি মাদ্রাজের দিকে মন দিই আর সেখানকার কাজের কথা ভাবি, আবার আর একদিন আমার সব মনটা আমেরিকা, ইংলণ্ড বা সিংহল অথবা কলকাতায় থাকে। বর্তমানে আমি তোমার বিদ্যালয়ের কথা ভাবছি।'

অবশ্য নিবেদিতা মনে মনে নিজ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়াছিলেন। পরে স্বামিজীর সহিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইল। শিক্ষাবিদ হিসাবে নিবেদিতার জানা ছিল, শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপন হইবে শিক্ষার্থীর বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর। শিক্ষাপ্রণালী যেন ভারতীয় নারী-সমাজের উপযোগী এবং সর্বাবস্থায় কার্যকরী হয়। বিদ্যা-লয়ের পরিচালনার ব্যাপারে প্রথম প্রয়োজন তাঁহার নিজের শিক্ষার্জন, অর্থাৎ ভারতীয় নারী-সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ-জ্ঞান-আহরণ।

সুতরাং স্বামিজী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যালয় সম্বন্ধে এখন তুমি কী করবে ভাবছ?' নিবেদিতা সাগ্রহে উত্তর দিলেন, 'আমি চাই আমার কোন সহকারী না থাকেন। অতি সামান্যভাবে কাজের আরম্ভ হবে, এবং ছোট ছেলে মেয়ে যেমন বানান করে পড়তে শেখে, আমিও তেমনি ক্রমে ক্রমে নিজের প্রণালী ঠিক করে নেব। তা ছাড়া, আমার ইচ্ছা, এই শিক্ষার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধর্মভাব থাকে। আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িক ভাব বিশেষ উপকারী।'

স্বামিজী প্রত্যেক কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। নিবেদিতা শিক্ষা-দানের প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্মভাব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাকে প্রাধান্য দিবার সংকল্প করিয়াছেন, এই কথার উত্তরে তিনি কেবল বলিলেন, 'উৎসাহ বজায় রাখবার জন্যই কি তুমি সাম্প্রদায়িক ভাব রাখতে চাও? অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের বাইরে যাবার জন্যই তুমি একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চাও। আমার মনে হয়, তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি।'

একজন মহিলা নিবেদিতার কার্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবামাত্র স্বামিজী সে নাম প্রত্যাহার করিলেন। কেবল একটি বিষয়ে স্বামিজী দৃঢ় রহিলেন। নিবেদিতার পরিচিত কয়েকজন ব্রাহ্মমহিলা তাঁহার কার্যে সাহায্য করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু স্বামিজী সম্মতি দিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা, নিবেদিতা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্তা হইয়া উহার কল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। সে কার্যে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের সহযোগিতায় সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। ইহা ব্যতীত, ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতার তখনও বিশেষ জ্ঞান হয় নাই; সুতরাং কাহারও সাহায্য লইয়া প্রথমেই ভুল করার সম্ভাবনা ছিল।

আলোচনার পর তিনি বলিলেন, 'স্বামিজী, আমার ইচ্ছা, আপনি সমগ্র বিষয়টি চিন্তা করিয়া সমালোচনা করুন।'

কিন্তু স্বামিজী রাজী হইলেন না। বলিলেন, 'তুমি আমাকে সমালোচনা করতে বলছ; কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ আমার ধারণা, তুমিও

আমার মত ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণের বিশ্বাস যে, তাঁদের ধর্মের সংস্থাপকগণ সকলেই ঐশীশক্তি দ্বারা পরিচালিত। আমাদেরও তাই বিশ্বাস। তুমিও আমারই মত অনুপ্রাণিত। আর তোমার পরে তোমার মেয়েরা এবং তাদের মেয়েরাও সেইরকম হবে। সুতরাং তুমি যা সবচেয়ে ভাল বলে বিবেচনা করেছ, সেই কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ও বেদান্ত-কার্যের পুনঃপ্রচারের জন্য স্বামিজীর শীঘ্রই পাশ্চাত্যগমনের কথা চলিতেছিল। নিবেদিতা তাঁহার কার্যের জন্য ভারতেই অবস্থান করিবেন। ভারতীয় নারীগণের উন্নতিকল্পে এই কার্য কত মহান্, তাহা ধারণা করাইবার জন্য স্বামিজী ধীরা মাতা ও জয়াকে বলিতে লাগিলেন যে, নিবেদিতার উপর তিনি যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাইবেন, তাহার গুরুত্ব পুরুষগণের উপর অর্পিত দায়িত্ব অপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

তারপর নিবেদিতার দিকে ফিরিয়া স্বামিজী বলিলেন, 'তোমার বিশ্বাস আছে, মার্গট, কিন্তু তার সঙ্গে যে জ্বলন্ত উৎসাহ দরকার, তা নেই। তোমাকে "দগ্ধেন্ধনমিবানলম্" হতে হবে। শিব! শিব!' স্বামিজী যেন নিবেদিতার জন্য মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১০ই আগস্ট সান্ধ্যভ্রমণান্তে ফিরিবার পথে স্বামিজী নিবেদিতার সহিত ভাবী স্ত্রীশিক্ষা-কার্য ও সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় কী, তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করেন। ঐ প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য কথার সহিত স্বামিজী নিবেদিতাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম হইতেছে—'স্বদেশ এবং ধর্মের মধ্যে যেন সমন্বয় ঘটে। হিন্দু-ধর্ম নিষ্ক্রিয় না থেকে সক্রিয় এবং অপরের উপর প্রভাবশালী হোক, ছুঁৎমার্গকে সর্বরকমে দূর করতে হবে। ভারতের অভাব কর্মকুশলতা, কিন্তু সেজন্য প্রাচীন চিন্তাশীল জীবন সে যেন কখনও ত্যাগ না করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সমুদ্রের মত গভীর ও আকাশের মত উদার হওয়াই আদর্শ।'

নিবেদিতার বিদ্যালয়টিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ সম্বন্ধে স্বামিজী বলিলেন, 'আমার নিজের জীবন সেই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের দ্বারা পরিচালিত সত্য, কিন্তু এটি অপরের পক্ষে কতদূর প্রযোজ্য হতে পারে, সে তারা নিজেরাই বুঝবে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি একজনের মধ্য দিয়েই জগতে প্রচারিত হয় না।'

নিবেদিতার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। স্বামিজীর নির্দেশে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরামর্শ

ও সাহায্য গ্রহণ করেন। ১২ই নভেম্বর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐদিন সকালে শ্রীমা মঠের নূতন জমিতে স্বহস্তে শ্রীঠাকুরের পূজা করেন। স্বামিজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ এই উপলক্ষ্যে বলরাম মন্দির হইতে মঠে আসেন। বিকালে স্বামিজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আহূত সভায় যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

নিবেদিতা ঐ অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন। মিশনের সাধারণ অধিবেশনগুলি ঐ সময় ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর বাসভবনেই হইত। 'উদ্বোধনে' (৪২ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৫৯ পৃঃ) প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে অনুমান হয়, এই অধিবেশনটিও উক্ত বাসভবনে উহার সামনের দ্বিতলের বড় হলঘরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

'...নিবেদিতার সেই প্রথম উদ্যম। বাগবাজার পল্লীতে বালিকা বিদ্যালয় খুলবেন, সংকল্প। একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে সব গৃহস্থভক্তদের একটি সভাগোছের, ঘরোয়া জলসা হলঘরে হলো। যাতে গৃহস্থেরা মেয়ে দেন ঐ স্কুলে,—এই আবেদন। সকলে বসে আছেন। এমন সময় অতর্কিত ভাবে স্বামিজী সবার পেছনে আসন গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। মাষ্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, হরমোহনবাবু প্রভৃতি ছিলেন। স্বামিজী কয়েকজনকে হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে গুঁতো দিচ্ছেন আর বলছেন, "ওঠ্, ওঠ্। ওঠনা। শুধু মেয়ের বাপ হলেই তো হবে না। জাতীয়ভাবে তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাতে সহযোগিতা তোদের সবাইকে করতে হবে। উঠে বল্; আবেদনের প্রত্যুত্তর দে। বল্—হ্যাঁ। আমরা রাজী আছি। আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব।" কেউ ওরূপ বলতে সাহস করছিলেন না। শেষে স্বামিজী হরমোহনবাবুকে জিদ করে চাপা গলায় বললেন,—তোকে দিতেই হবে। তাঁর হয়ে স্বামিজী নিজে তখন বললেন,—Well, Miss Noble, this gentleman offers his girl to you. নিবেদিতা প্রথমে দেখতে পাননি যে ভিড়ের মধ্যে স্বয়ং স্বামিজী আছেন। তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর উৎসাহবাণী শুনে নিবেদিতা খুব বেশী রকমের খুশী হলেন। হাততালি দিতে লাগলেন। এবং শেষে আনন্দে বিভোর হয়ে নাচতে লাগলেন। ঠিক যেন একটি ছোট বালিকা!'

এই বিবরণ হইতে সদাহাস্যময়ী উৎসাহরূপিণী নিবেদিতার একটি মধুর চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে।

পরদিন রবিবার, শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন, শ্রীমা স্বয়ং ১৬ নম্বর বোস-পাড়া লেনে আগমন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন।

সেই শুভদিনটির কথা কল্পনা করিয়া মনে আনন্দ জাগে। সেদিন দ্বারে নিশ্চয় মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হইয়াছিল। নিবেদিতা অধীর হৃদয়ে শ্রীমার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। শ্রীমা গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সহিত আগমন করেন। তিনি তখন অতি নিকটেই অবস্থান করিতেন। বলরাম বসুর ভবন হইতে স্বামিজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমা প্রতিষ্ঠাকালীন পূজাদি সম্পন্ন করিলেন। পূজান্তে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশে আশীর্বাণী করিলেন, 'আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।' গোলাপ-মা স্পষ্ট করিয়া সমবেত সকলকে আশীর্বাণীটি শুনাইয়া দিলেন। এইরূপে স্বামিজীর সংকল্পিত একটি মহৎ কার্যের উদ্বোধন হইল। 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না,' ইহাই নিবেদিতার অভিমত। শ্রীমার উচ্চ মন ও হৃদয়ে এই অনুষ্ঠানের স্মৃতি বর্তমান আছে, এবং তিনি ইহার কল্যাণকামনা করিতেছেন, এইটুকু জানিয়াই নিবেদিতার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। ইহার ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে স্বামিজীর ন্যায় তাঁহারও কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৪ই নভেম্বর, সোমবার, বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল। ঐদিনও স্বামিজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দকে লইয়া বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেন। পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে লইয়া নিবেদিতার শিক্ষাকার্য শুরু হইল। ঝি প্রতি বাড়ি হইতে মেয়েগুলিকে লইয়া আসিত। স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই প্রথম তাঁহাদের কন্যাদের এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড দিন কয়েক বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতার সহিত অবস্থান করেন। মিসেস বুল এই সময়ে শ্রীমার ফটো তুলিবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীমা অত্যন্ত লজ্জাশীলা, তাহার উপর স্বামী যোগানন্দের অসুস্থতাহেতু তাঁহার মনও ভাল ছিল না; সুতরাং ফটো তোলায় তিনি একেবারেই রাজী ছিলেন না। কিন্তু মিসেস বুল অনুনয় করিয়া বলেন, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।' তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীমাকে সম্মতি দিতে হইল। একজন ইংরেজ

ফটোগ্রাফার ফটো তুলিয়াছিলেন। মিসেস বুল শ্রীমাকে বসাইয়া মাথার কাপড়, চুল প্রভৃতি ঠিক করিয়া দেন। এক সঙ্গে পরপর তিনখানি ফটো তোলা হইয়াছিল। ফটো তুলিবার সময় শ্রীমা ভাবস্থা হইয়া যান; সেজন্য প্রথম ছবিতে তাঁহার দৃষ্টি নীচের দিকে। দ্বিতীয় ছবিখানি খুব সুন্দর হইয়াছিল, এবং এইখানিই সর্বত্র পূজিত হয়। তৃতীয় ছবি নিবেদিতার সহিত একত্র;[১] উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছেন। নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীমার প্রতি অপার ভালবাসা ও তাঁহার সান্নিধ্যে আনন্দিত ভাবটি কী সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে!

৯ই ডিসেম্বর (১৮৯৮) যথারীতি পূজাদির পর নূতন মঠ (বর্তমান বেলুড় মঠ) প্রতিষ্ঠিত হয়। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বামিজী ১৯শে ডিসেম্বর বৈদ্যনাথ যাত্রা করেন এবং জানুয়ারীর শেষে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৯৯এর ২রা জানুয়ারী মঠ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি হইতে নূতন মঠে স্থানান্তরিত হয়। নূতন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে আদর্শ-নিষ্ঠ করিবার জন্য সর্ববিধ শিক্ষাদানের প্রয়োজন ছিল। যাঁহাদিগকে স্বামিজী কেবল 'আত্মনো মোক্ষার্থং' নহে 'জগদ্ধিতায় চ' ত্যাগ-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহারা যখন শুধু গুহায় বসিয়া ধ্যানধারণার পরিবর্তে 'শিব জ্ঞানে জীব-সেবায়' আত্মনিয়োগ করিবেন, তখন সকল বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান-আহরণ বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং সাধনভজন ও শাস্ত্রপাঠাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার সহিত সকলে যাহাতে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারেন ও তাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন, শরীর-চর্চা এবং সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম প্রভৃতির উপর স্বামিজীর সর্বদাই তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিত। যাহার যে বিষয়ে পারদর্শিতা আছে, তাহার দ্বারা সেই বিষয়ে কার্য করাইয়া লওয়ার সহিত তাহাকে উৎসাহদান স্বামিজীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিবেদিতা কেবল শিক্ষয়িত্রী নহেন, শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞা ও উৎসাহী; অতএব স্বামিজী তাঁহাকে মঠের নবদীক্ষিতগণের ঐহিক শিক্ষকতায় নিযুক্ত করেন। মঠে নিবেদিতার শিক্ষাদানের কার্যতালিকা ছিল এইরূপ—প্রতি বুধবার উদ্ভিদ্-বিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা এবং প্রতি শুক্রবার শারীরবৃত্ত ও সূচীশিল্প। পাঠ-দানের পর তিনি স্বামিজীর কক্ষে বসিয়া চা-পান করিতেন।

[১] এই ছবিটির অস্তিত্ব বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ইহা মঠ কর্তৃপক্ষের হাতে আসে এবং উদ্বোধন পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়।

তাঁহার অধ্যাপনার কার্য মিশনের বাহিরেও বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজে 'শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। এই সকল বক্তৃতায় শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলাগণ উপস্থিত থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যাদ্বয়—সুনীতি দেবী ও সুচারু দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, 'ভারতী'-সম্পাদিকা সরলা ঘোষাল ও জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। প্রতি শনিবার সকালে 'শিক্ষক-শিক্ষণ' ক্লাস আরম্ভ করেন। উহাও শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলাগণের জন্য। পরে এক আমেরিকান মিশনরী স্কুলে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা করিয়া ইতিহাসের ক্লাস লইতেন।

অধ্যাপনার সহিত অধ্যয়নও চলিতেছিল। ইতিমধ্যে তিনি বাংলা ভাষা মোটামুটি পড়িতে ও কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলেন—অবশ্য শুদ্ধ লেখ্য ভাষায়।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলি বসিত বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে, এবং মধ্যে মধ্যে জনসাধারণের জন্য বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন হইত সাধারণ কোন জায়গায়। ঐ সকল সভায় স্বামিজী নিবেদিতার বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অ্যালবার্ট হলে 'কালী ও কালীপূজা' সম্বন্ধে নিবেদিতার বক্তৃতা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। পরে ২৮শে মে তিনি পুনরায় 'কালীপূজা' সম্বন্ধে কালীঘাটে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে জনসাধারণের জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশনে নিবেদিতা এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়—'Young India movement' (নব্য ভারত আন্দোলন)। স্বামিজী মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ সহ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৎসর ১৯শে মার্চ, ১৮৯৯, বর্তমান বেলুড় মঠে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে বক্তৃতা-সভায় স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, এবং নিবেদিতা বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

১৮৯৮এর ১লা নভেম্বর হইতে ১৮৯৯এর ১৯শে জুন—মাত্র এই কয়েক-মাস কলিকাতায় নিবেদিতার অবস্থিতিকাল। কিন্তু বক্তৃতা ও কার্যের গুণে এই অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার সমাজ-জীবনে তাঁহার পরিচয় বিস্ময়কর। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা যাইত। ভারতের নবজাগরণের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ; তাঁহার শিষ্যা 'সিস্টার নিবেদিতা', এবং তিনি এদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতের

ধর্ম ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতাগুলি কী গভীর চিন্তাপূর্ণ! প্রত্যেক উক্তির পশ্চাতে কী অপূর্ব বিশ্বাস ও ভালবাসা! ভারতের অন্তরাত্মাকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন; তাহার জাতীয় জীবনের মর্মকথা তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে; তাই তাঁহার কথায় এত শক্তি, উৎসাহ ও আন্তরিকতা। উহা শ্রোতাদের হৃদয়েও আশা এবং উৎসাহের সঞ্চার করে—তাহারা ভারতবাসী বলিয়া গর্ব অনুভব করে।

বক্তৃতার মাধ্যমে কলিকাতার শিক্ষিত মহল জানিয়াছে, সিস্টার নিবেদিতা প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না, তেজস্বিনী, বাগ্মী এবং ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পূর্ণ—তাহার জাতীয় জীবনের উদ্বোধিকা।

বাগবাজার পল্লীর সকলের নিকট সিস্টার নিবেদিতার পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ। পাড়ার ছোট ছোট মেয়েগুলি প্রতিদিন ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে সিস্টারের চারি পার্শ্বে সমবেত হয়। হাসিমুখে সিস্টার তাহাদের লইয়া খেলা করেন, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কয়েকটি বাংলা কথায় গল্প বলিতে চেষ্টা করেন। তাহাদিগকে রং ও তুলি দিয়াছেন—যাহা খুশী কাগজের উপর আঁকিবার জন্য, আরও কত বিভিন্ন উপকরণ। নানা রকমের মাটির পুতুল গড়া হইতেছে, ছোট ছোট কাপড়ের টুকরার উপর সেলাই-শিক্ষা চলিতেছে—সিস্টার সকলকেই উৎসাহ দেন, আদর করেন, হাত ধরিয়া শিখাইয়া দেন—আনন্দ, উৎসাহ ও ভালবাসার সজীব মূর্তি। সুতরাং গৃহে প্রত্যাগমনের পরেও বাড়ির সকলের সঙ্গে সিস্টার-প্রসঙ্গ চলিতে থাকে।

মেয়েদের অভিভাবক ও পাড়ার অন্যান্য প্রতিবেশিগণের নিকটেও সিস্টার বিশেষ পরিচিত। তিনি তাঁহাদেরও আপনার লোক। পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সিস্টার তাহাকেই হাসিয়া অভ্যর্থনা করেন। যে কয়েকটি বাংলা শব্দ শিখিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে আলাপ জমাইতে চেষ্টা করেন। সুখদুঃখের কত গল্প হয়। সিস্টারের গৃহে কেহ আসিলে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা ও আহারের ব্যবস্থা করা প্রতিবেশিগণের কর্তব্য হইয়া উঠে। সিস্টার যে তাহাদের সহিত বাস করিবার জন্যই ইংরেজপল্লী চৌরঙ্গী ত্যাগ করিয়া এই সংকীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন গলিতে আশ্রয় লইয়াছেন। দিবারাত্র তিনি এক সাধনায় মগ্ন। সে সাধনার লক্ষ্য তাঁহার আত্মোন্নতি, অথবা দেশমাতৃকার উন্নতি—কিংবা উভয়ই তাঁহার নিকট এক—প্রতিবেশীদের তাহা অজ্ঞাত। কিন্তু সর্বতোভাবে তাঁহাদেরই হইয়া যাওয়া যাঁহার একান্ত কাম্য, তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখা সম্ভব নয়। প্রতিবেশিগণের এই সহৃদয়তা ও আতিথেয়তা নিবেদিতার পুস্তকে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত আছে। স্বামিজীর জন্য তিনি যেদিন

তাঁহার বাড়িতে চায়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেদিন দুধ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিনি যখন অত্যন্ত বিব্রত ও উদ্বিগ্ন, তখন সংবাদ পাইয়া এক প্রতি-বেশিনী অযাচিতভাবে আসিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। এই পল্লীর লোকগুলির প্রতি নিবেদিতার যথার্থ ভালবাসা জন্মিয়াছিল। কাহারও অসুখে বা বিপদে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার কী আগ্রহ! তাঁহার বাড়ির অপর দিকে একটি ছোট মাটির বাড়ি ছিল। একরাত্রে তিনি যখন আহারে বসিয়াছেন, হঠাৎ সেই বাড়ি হইতে কান্নার শব্দ আসিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেলেন। তাঁহার চোখের সামনেই একটি ছোট মেয়ে মারা গেল। নিবেদিতা যেন পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিলেন। বেশী কথা বলিতে পারেন না। শোকাতুরা জননীর মাথাটি নিজের ক্রোড়ে রাখিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ ক্রন্দনের পর অবসন্ন হইয়া এক সময়ে মেয়েটির মা একটু শান্ত হইল; তারপর সহসা বলিয়া উঠিল, 'আমার মেয়ে কোথায় গেল?' নিবেদিতা বলিলেন, 'চুপ, তোমার মেয়ে এখন মা কালীর কাছে।' মনে হইল, এই আশ্বাস যেন তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দান করিয়াছে। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে শান্ত হইল। নিবেদিতা অনুভব করিলেন, এই মুহূর্তে ইহাদের সহিত তাঁহার আর কোন ব্যবধান নাই; তিনি তাহাদেরই একজন।

কিন্তু 'সিস্টার' যে তাহাদের পরমাত্মীয়া, প্রতিবেশীরা তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ পাইলেন যখন সেই বৎসর পুনরায় প্লেগের আবির্ভাব হইল মহামারীরূপে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগের আক্রমণের জন্য স্বামিজী যেন প্রথম হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। এই রোগের প্রতিরোধের সর্বপ্রকার ব্যবস্থার ভার তিনি নিবেদিতার উপরেই অর্পণ করিলেন। প্লেগের ন্যায় একটি মারাত্মক রোগ, আর তাহার প্রতিরোধকল্পে নিযুক্ত সদ্য আগত একজন শ্বেতাঙ্গী। এইরূপ এক অচিন্তনীয় ব্যবস্থায় সকলেই বিস্মিত। স্বামিজীর পক্ষেই এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। রামকৃষ্ণ মিশন একটি কমিটি গঠন করিল। সিস্টার নিবেদিতা উহার সম্পাদিকা, স্বামী সদানন্দ প্রধান কার্যাধ্যক্ষ এবং স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ অন্যান্য কর্মী। ৩১শে মার্চ কার্য শুরু হইল। বস্তীগুলি পরিষ্কার রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কারণ অপরিচ্ছন্ন বস্তী হইতেই প্লেগের বিস্তৃতি। স্বামী সদানন্দ ধাঙ্গড় লইয়া বাগবাজার, শ্যামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের বস্তীগুলি সাফ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫ই এপ্রিল অর্থের জন্য ইংরেজী সংবাদপত্রে নিবেদিতার আবেদন

বাহির হইলে কিছু সাহায্য পাওয়া গেল। ২১শে এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে মিশন কর্তৃক আহূত এক সভায় স্বামিজীর সভাপতিত্বে নিবেদিতা 'প্লেগ ও ছাত্রগণের কর্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও স্বামিজীর উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেল, এবং পনেরো জন ছাত্র স্বেচ্ছায় নিবেদিতার কার্যে যোগদান করিয়াছিল। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে সকলে একত্র হইয়া কাজের বিবৃতি দিতেন এবং নিবেদিতার নিকট কাজ বুঝিয়া লইতেন। এই প্লেগ-নিবারণ-কার্য এত সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছিল যে, জেলা মেডিকেল অফিসার ও চেয়ারম্যান বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। অসীম সাহসের সহিত নিবেদিতার এই ঐকান্তিক সেবাকার্য তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে সাহায্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর লিখিয়াছেন, 'এই সঙ্কট-সময়ে বাগবাজার পল্লীর প্রতি বস্তীতে ভগিনী নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্তি লক্ষিত হইত। আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি অপরকে সাহায্য দান করিতেন। একবার একজন রোগীর ঔষধপথ্যাদির ব্যয়-নির্বাহার্থে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য দুগ্ধ-পান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন দুগ্ধ ও ফলমূলই ছিল তাঁহার আহার।'

যদিও স্বামী সদানন্দ ছিলেন এই কার্যে সর্বাপেক্ষা উদ্যোগী, এবং ধাঙড় লইয়া বস্তীগুলি পরিষ্কার রাখিবার ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি নিবেদিতা প্রত্যেক কার্য পরিদর্শন করিতেন ও ব্যবস্থা দিতেন। একদিন তিনি স্বয়ং ঝাড়ু লইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইলে পাড়ার যুবকগণ লজ্জিত হইয়া রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধের নির্দেশযুক্ত হ্যান্ডবিল ছাপাইয়া প্রতি পল্লীতে বিতরণ করা হইয়াছিল। মারাত্মক রোগের ভয় উপেক্ষা করিয়া নিবেদিতা কিরূপ আন্তরিকতার সহিত রোগীর শুশ্রূষা করিতেন, তাহার বিবরণ প্রত্যক্ষ-দর্শী ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর দিয়াছেন—

'১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্লেগ সংহারকরূপে দেখা দেয়। পূর্ববৎসর তাহার আবির্ভাব-সূচনায়, বিধিব্যবস্থা-বিভীষিকা ভয়ে ভীত জনগণ শহর হইতে পলায়ন করে।...এই বৎসর ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ আশ্বাস দেন, কোন রোগীকে বলপূর্বক গৃহান্তরিত করা হইবে না।...সেই সময়ে একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগি-পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধূলি-ধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা ; একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন-প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন।

'সেইদিন প্রাতে বাগবাজারে কোন বস্তীতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রোগীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন। আমি বলিলাম, "রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন।" বাগদীবস্তীতে কিরূপে বিজ্ঞান-সম্মত পরিচর্যা সম্ভব, তাহার আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্ণে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র-জীর্ণ কুটীরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া সেই কুটীরে রোগীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন। গৃহ পরিশোধিত করা প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র মই লইয়া গৃহে চুনকাম করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুইদিন পরে শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহ-তপ্ত অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।'

মৃত্যুর পূর্বে শিশুটি তাঁহাকেই জননী মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া 'মা', 'মা' করিয়াছিল। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা বিফল করিয়া এই শিশুটির মৃত্যু তাঁহাকে বিশেষ বিচলিত করে। নিবেদিতার 'Studies from an Eastern Home' নামক পুস্তকে 'প্লেগ' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে প্লেগের আবির্ভাবে পল্লীর তদানীন্তন অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া এই শিশুটির মৃত্যুর বর্ণনা আছে; নাই শুধু তিনি নিজে মূর্তিমতী করুণার ন্যায় কিরূপে এই সেবাকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ।

বস্তুতঃ এই কার্যের দ্বারাই নিবেদিতা কেবল সুপরিচিত নহে, সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার নিরলস উদ্যম ও ঐকান্তিক সেবা-শুশ্রূষা কে উপেক্ষা করিতে পারে!

বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। তথাপি নিবেদিতার পরিচিত যে সকল ব্যক্তি এখনও বর্তমান তাঁহারা সেই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে আতঙ্কিত কলিকাতা শহর এবং করুণার প্রতিমূর্তি নিবেদিতার প্রতি পল্লীতে আবির্ভাব স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়েন।

কালী ও কালীপূজা

নিবেদিতা প্রথমবার কলিকাতায় অবস্থানকালে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'কালী ও কালীপূজা' সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। ভারতের ধর্মজীবন তাঁহাকে প্রথমে বিস্মিত, পরে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। একদিকে নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নিষ্ঠার সহিত বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা, অন্যদিকে সর্বদ্বন্দ্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয়স্বরূপ। উপলব্ধি ব্যতীত যুক্তি দ্বারা এই দুই ভাবের ধারণা সম্ভবপর নয়। নিবেদিতাকে বুঝাইবার জন্য স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 'ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্য দিয়ে দেখলে নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণরূপে প্রতিভাত হন।' তথাপি নিবেদিতার নিকট ইহা সহজবোধ্য ছিল না। কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট স্বামিজী স্বয়ং এই সকল বিপরীত-লক্ষণ-বিশিষ্ট ধর্মের সমন্বয়স্থল, এবং তাহাদের প্রত্যেকটিই যে সত্য, তাহার সাক্ষিস্বরূপ ছিলেন।

বস্তুতঃ স্বামিজীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, অদ্বৈত-দর্শন সর্বোত্তম মতবাদ, এবং বেদ ও উপনিষদ একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। আবার জগন্মাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার অনুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঠে যথারীতি দুর্গাপূজা ও শ্যামাপূজা বিধিপূর্বক সম্পন্ন করেন। আবার শ্যামাপূজার দিনেই নিবেদিতার বিদ্যালয়ের উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। লণ্ডনে থাকিতে স্বামিজী-প্রচারিত বেদান্ত-তত্ত্ব ধারণা করিবার জন্য নিবেদিতা যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভারতে আগমনের পর নানাবিধ উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্যও তেমনই তাঁহার অসীম ঔৎসুক্য ছিল। বিশেষতঃ, কাশ্মীরে ক্ষীর-ভবানীর অলৌকিক দর্শনের পর হইতে স্বামিজী জগন্মাতার চিন্তায় তন্ময় হইয়াছিলেন, আর এই তন্ময়তা যে নিবেদিতার চিত্তেও প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহাতে আশ্চর্য কী!

কলিকাতায় প্রথম আগমনের পরেই নিবেদিতা কালীঘাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য মনে মূর্তি-উপাসনার অন্তর্নিহিত ভাবটি পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হওয়া সময়সাপেক্ষ ছিল। মনে নানারূপ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। মূর্তির সম্মুখে সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণামের বিরুদ্ধে তিনি স্বামিজীর নিকট অভিযোগ

করিয়াছিলেন। মন্দিরে পশুবলি সম্বন্ধেও তাঁহার অভিযোগ ছিল। পূজার মধ্যে জীবহিংসার স্থান কেন? তাঁহার বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির উত্তরে স্বামিজী স্পষ্টভাবে বলিলেন, 'চিত্রটি নিখুঁত করবার জন্য হ'লই বা একটু রক্তপাত।' স্বামিজী যেমন তাঁহার ধারণাগুলিকে কখন কাহারো উপর জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করিতেন না, তেমনই আবার ঐগুলিকে অপরের মনের মত করিয়া উপস্থাপিত করা তাঁহার স্বভাব-বহির্ভূত ছিল। উপরন্তু, পাশ্চাত্য মনের নিকট প্রায় বিজাতীয় রূপে প্রতীত ভারতীয় ভাবগুলিকে শিক্ষার প্রারম্ভেই তিনি ব্যাখ্যা করিতেন। 'কিন্তু ভারতীয় ভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাস করিতে হইবে'—ইহাই ছিল নিবেদিতার সংকল্প। সুতরাং ঐ ভাবধারা আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে খুব কঠিন হয় নাই।

১৩ই ফেব্রুয়ারী অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার 'কালী ও কালীপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার পূর্বে কালীপূজার প্রকৃত রহস্য অনুধাবনের জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তিনি জানিতেন, ঐ বক্তৃতায় পরিচিত ব্রাহ্ম বন্ধুগণও উপস্থিত থাকিবেন। তাই তাঁহার আগ্রহ ছিল, কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ যেন সহানুভূতির সহিত কালীপূজার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে। বক্তৃতার বিষয় লিখিয়া নিবেদিতা স্বামিজীর দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইলেন।

যথাসময়ে বক্তৃতা হইয়া গেল। একজন ইংরেজ মহিলা কালীপূজার উপর বক্তৃতা দিবেন; সুতরাং শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। বক্তৃতার দিন অ্যালবার্ট হল লোকে পরিপূর্ণ। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত কিছু কিছু বলেন। মিসেস সালজার, শ্রীমতী সরলা ঘোষাল প্রভৃতি দুই চারিজন মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, 'আমরা এই সকল কুসংস্কার দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, আর তোমরা বিদেশীরা আবার সেই সব প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগেছ!' নিবেদিতার প্রতি এই আক্রমণে দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজন উত্তেজিত হইয়া ডাঃ সরকারকে তীব্র ভাষায় কটূক্তি করেন। বেশ গোলমালের সৃষ্টি হইল। যাহা হউক, এই বক্তৃতার দ্বারা নিবেদিতা জনসাধারণের নিকট সুপরিচিতা হইয়া উঠেন, এবং ইহার দুই একদিন পরেই কালীঘাটে 'কালীপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ আসে। নিবেদিতার বক্তৃতায় স্বামিজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কালীঘাটের বক্তৃতার কথায় তিনি খুব উৎসাহ দিলেন।

২৮শে মে কালীঘাটে বক্তৃতার দিন ধার্য হইয়াছিল। যথেষ্ট সময় লইয়া

নিবেদিতা এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। অ্যালবার্ট হলে তাঁহার বক্তৃতার যে সকল প্রতিবাদ উঠিয়াছিল, তাহার খণ্ডন আবশ্যক। বিশেষতঃ কালীপূজার সকল অনুষ্ঠান, এমন কি, বলিদান সম্বন্ধেও তাঁহার নিজের ধারণা দৃঢ় ও শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তিনি স্বামিজী এবং তাঁহার এক গুরুভ্রাতার নিকট শক্তিপূজার সকল তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে তাঁহার মনে হইয়াছিল, বলিদান-প্রথার প্রকৃত অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্ত নিজেকে নিবেদন করিবার মত দৃঢ় না হয়, ততক্ষণই সে মার উদ্দেশে বলি প্রদান করে। কিন্তু পরে এমন সময় আসে, যখন সে নিজ হৃদয়ের রক্তে পুষ্পাঞ্জলি রঞ্জিত করিয়া জগন্মাতার পাদপদ্ম ভূষিত করে। কালীর ভয়ঙ্করা মূর্তি সম্বন্ধে স্বামিজীর অভিমত ছিল যে, ভয়, দুঃখ ও বিনাশের মধ্যেও জগজ্জননীর প্রকাশ ধারণা করিতে শেখা চাই। মঙ্গলের মধ্যে তাঁহার যেরূপ প্রকাশ, অমঙ্গলের মধ্যেও সেইরূপ। একদিকে তিনি বরাভয়করা, অপর দিকে আবার—খড়্গমুণ্ডধারিণী। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার উপর চিন্তা করিতে করিতে স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিতেন, 'তাঁর শাপই বর।' অথবা ভাবাবেগে কখনও কবির ভাষায় বলিতেন, 'অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিভৃত হৃদয়-কন্দরে মায়ের রুধির-রঞ্জিত অসি ঝক্‌মক্ করে। এঁরা আজন্ম মায়ের অসি-মুণ্ড-বরাভয়করা মূর্তির উপাসক।'

কালীপূজা ব্যাপারটি পাশ্চাত্য মনের নিকট এক প্রহেলিকা। দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজার মধ্যে যে অশিবনাশিনী, কল্যাণময়ী শক্তির প্রকাশ, আপাত-দৃষ্টিতে কালীমূর্তি এবং কালীপূজার মধ্যে তাহা নাই। নিজের চেষ্টায় ও স্বামিজীর সাহায্যে নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, সৃষ্টির অন্তরালে যে দুর্জ্ঞেয় চিৎশক্তি, তাহারই ভয়ঙ্করা মূর্তি কালী। শক্তি-উপাসনা ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তকে প্রবলভাবে অধিকার করিয়াছিল। গভীর চিন্তা দ্বারা তিনি ভাবটির সম্পূর্ণ মর্ম গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

একবার কালীপ্রতিমার মধ্যে কোন একটি ভাব চকিতের মত লক্ষ্য করিয়া নিবেদিতা সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামিজী, হয়তো মা কালী সদাশিবেরই ধ্যানযোগে উপলব্ধ মূর্তিবিশেষ। তাই কি?'

স্বামিজী মুহূর্তের জন্য তাঁহার দিকে চাহিলেন। কাহারও স্বাধীন চিন্তায় তিনি বাধা দিতেন না। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, নিবেদিতা এই তথ্যের উপর চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'বেশ, তাই হোক, তোমার নিজের ভাবেই ওটি প্রকাশ কর।'

অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতার পর অনেকেই নিবেদিতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। উদ্দেশ্য, বক্তৃতার বিষয় লইয়া আলোচনা করা। ঐ সব সময়ে স্বামিজী উপস্থিত থাকিলে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া শক্তিপূজার রহস্য ব্যাখ্যা করিতেন। প্রতীকোপাসনার ঐতিহাসিক তথ্য সবিশেষ না জানিলে এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির শক্তিপূজার বিরোধিতার ইহাই প্রকৃত কারণ। অবশেষে এমন একদিন আসিল, যখন স্বামিজী শক্তিপূজা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। ঐ দিনই কথাপ্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং কিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সেই মহাশক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অভিভূত হইয়া ছিলেন, তাহার উল্লেখ করেন। নিবেদিতাকে তিনি জানাইলেন, তাঁহার কালীঘাটের বক্তৃতায় বিদেশীয় বন্ধুগণ যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলে অন্য শ্রোতাদের মত তাঁহাদিগকেও জুতা খুলিয়া যাইতে হইবে এবং মেঝের উপর বসিতে হইবে। নিবেদিতার উপরেই দেখিবার ভার রহিল। সেই পবিত্র মহাপীঠে কাহারও জন্য যেন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে।

কালীঘাটের হালদার মহাশয়রা এই বক্তৃতার আয়োজনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ২৮শে মে, রবিবার, বিকাল পাঁচটার সময় নিবেদিতা নগ্নপদে কালীঘাট গমন করিলেন। অসুস্থতাবশতঃ স্বামিজী ইচ্ছা সত্ত্বেও উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কালীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বক্তৃতা হয়। যথেষ্ট ভিড় হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় নিবেদিতা কেবল পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন নাই, পরন্তু সমগ্রভাবে হিন্দুজীবন, এবং তাহার মূলে অবিচ্ছেদ্যরূপে যে ধর্ম বিদ্যমান, তাহার নিপুণ ব্যাখ্যা দ্বারা তদানীন্তন শিক্ষিতসমাজকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

মহাপীঠের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া নিবেদিতা তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুর পারিবারিক জীবনে মায়ের প্রভাব সর্বাধিক—মাতাপুত্রের সম্পর্কই সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও নিবিড়। জীবনের সর্ব-স্তরে পরিব্যাপ্ত জননীর সুগভীর স্নেহ। সেইজন্যই বোধ হয় অনাদিকাল হইতে সৃষ্টির যিনি মূল কারণ, সেই পরমেশ্বরকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'মা'। হিন্দুর নিকট ইহা অপেক্ষা পবিত্রতর ও মধুরতম নাম আর কিছুই নাই।

'দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। একই মহাশক্তির বিভিন্ন নাম। নানাভাবে তাঁহার প্রকাশ। দশপ্রহরণধারিণী, অসুরবিনাশিনী, বিশ্বজননী দুর্গা সেই মহাশক্তির অপূর্ব প্রতীক ; চরাচর বিশ্বপ্রকৃতি তিনিই।

জগদ্ধাত্রীরূপে সেই মহাশক্তিই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। আর মহাকালী, যিনি ভয়ঙ্করা ও লোলরসনা, মৃত্যু ও ধ্বংস যাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে—সেই অগ্নিরূপা মহাকালীর নিকটেই সাধকের সমগ্র অন্তর স্তব্ধ হইয়া যায়। তাহার আকুল হৃদয় মথিত করিয়া একটি মাত্র শব্দ বাহির হইয়া আসে—'মা'।

'শিশুর নিকট তিনি কেবল মা। শিশু কেবল জননীকেই চায়, আর কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই। মাও তাহাকে আশ্রয় দেন। মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অধিক জানার প্রয়োজন নাই—কেবল তাঁহাকে ভালবাস।

'কাপুরুষ যে, সেই মায়ের ভয়ঙ্করা রূপে ভীত। সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,...মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

অ্যালবার্ট হলে কালীপূজা সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবাদ উঠিয়াছিল, নিবেদিতা তাহা খণ্ডন করেন। প্রথম আপত্তি ছিল মূর্তিপূজা সম্বন্ধেই—অর্থাৎ অনন্ত ঈশ্বরকে মূর্তিরূপে পূজা করা অসম্ভব। এই মূর্তিপূজাকেই পৌত্তলিকতা আখ্যা দিয়া হিন্দুধর্মের ঘোরতর বিরোধিতা করা হইত, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু হিন্দুর নিকটেও ইহার অযৌক্তিকতা অতিশয় দৃঢ় ছিল। কিন্তু মূর্তিপূজার অন্তর্নিহিত অর্থ নিবেদিতার নিকট কী সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছিল! নিবেদিতা বলিলেন, 'হিন্দুগণ বস্তুতঃ মূর্তিকে পূজা করেন না। কোন প্রতীক অবলম্বনে মনকে তন্ময় করিবার ইহা একটি উপায় মাত্র। প্রকৃত পূজা প্রতিমার সম্মুখে অবস্থিত জলপূর্ণ কুম্ভের উপর অনুষ্ঠিত হয়; এবং ঐ পূর্ণ কুম্ভটিকে সেই অনন্ত শক্তির প্রতীকরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে।'

এই প্রসঙ্গে কালীমূর্তির কল্পনা দ্বারা ভাস্কর্য ও শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে, এইরূপ অভিযোগও ছিল। নিবেদিতা বলিলেন, 'অভিযোগকারী য়ুরোপীয় হইলে য়ুরোপীয় ভাস্কর্য এবং শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতেন যে য়ুরোপীয় শিল্প-সমালোচকের দৃষ্টিতেও কালীমূর্তির বিশিষ্ট নাটকীয় ভঙ্গী অপূর্ব বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাবতীয় প্রাচীন শিল্প ভাব ও কল্পনা সহায়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছে; এখনও উহা সার্থকতা লাভ করে নাই। কালীমূর্তির মধ্যে শিল্পের গভীর তাৎপর্য সন্ধানী দৃষ্টির নিকটেও সুস্পষ্ট এবং বিস্ময়কর।'

নিবেদিতা বলেন, ভারতবাসীকে তাহার নিজের শিল্প ও পুরাণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যাভিমুখী দৃষ্টি এবং তুলনামূলক মনোভাব পরিহার করিতে হইবে। মাতৃভাবের চরম বিকাশের জন্য আরও উচ্চভাব এবং শ্রদ্ধার আরোপ প্রয়োজন;

তবেই ভারতবাসীর পক্ষে যাহা যথার্থ জাতীয় ও মহান্ এমন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। নতুবা বিদেশীয় শিল্পের গভীর ভাবব্যঞ্জনা না বুঝিয়া তাহারা কেবল উহার কৃত্রিম বহিঃসৌন্দর্যে বিভ্রান্ত হইবে, এবং য়ুরোপীয় ভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া নিজস্ব ভাবকে স্থূল ও বিকৃত করিয়া তুলিবে।

বলিদান-প্রথার উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে কালী-পূজায় অন্যকে উৎসর্গ করার পরিবর্তে আত্মোৎসর্গের বিধান আছে। এই আত্মোৎসর্গই পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, এবং ইহার মধ্যেই সাধকের শক্তিলাভের সমগ্র রহস্য নিহিত। শক্তির উদ্ভব ত্যাগে। ত্যাগের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ব্যতীত শক্তিপূজার অনুষ্ঠান যথাযথ সম্পন্ন হয় না।

নিবেদিতার ঐ বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় তিনি নিজে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতের জাতীয়তার উদ্বোধন-রাগিণী নিবেদিতার কণ্ঠে সেদিন এই বক্তৃতার মধ্য দিয়াই ধ্বনিত হইয়াছিল। এ দেশে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়া পাশ্চাত্যের নিকৃষ্ট অনুকরণ তাঁহাকে গভীর মর্মপীড়া দিয়াছিল। তাই পরবর্তী কালে তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে বারে বারে ভারতবাসীকে আত্মসমাহিত হইবার আকুল আবেদন চিত্ত স্পর্শ করে। ভারতীয় ভাব ও আদর্শের এই যে পরম সমন্বয় তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল আধ্যাত্মিক জাগরণ। নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, বেদান্তের দ্বন্দ্বাতীত চৈতন্যসত্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তিই সৃষ্টি। নিত্য এবং লীলা। সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া প্রতিনিয়ত এক মহাশক্তির লীলা চলিতেছে। শবরূপী মহাকালের বক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপিণী মহাকালীর আবির্ভাব।

নিবেদিতার 'Kali the Mother' নামক পুস্তকে এই মহাকালীর, বিশ্ব-জননীর অপূর্ব সৌন্দর্যের ভাবব্যঞ্জনা বিস্ময়কর ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পুস্তকের অন্তর্গত 'The Story of Kali' (মা-কালীর কাহিনী) এই সময়ে, ডিসেম্বরে (১৮৯৮) বড়দিনের পর্বে রচিত হয়। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তখন বেলুড় মঠের অদূরে বালী নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন। নিবেদিতা তাঁহাদের সহিত কয়েকদিন অবস্থানকালে মিসেস লেগেটের শিশু-কন্যার উদ্দেশ্যে মা-কালী সম্বন্ধে এই গল্পটি রচনা করেন।

'খুকুমণি, ছেলেবেলার সবচেয়ে আগেকার কোন্ কথাটি তোমার মনে পড়ে বলত? মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে—সেই কথাটি নয় কি?

'মায়ের সঙ্গে খুকুর লুকোচুরি খেলা। মা যেই চোখ বন্ধ করেন, খুকু

তাঁর চোখের আড়ালে ; আবার তিনি যখন চোখ খোলেন, অমনি দেখতে পান তাঁর খুকুকে।...ঈশ্বর এই জননীর মত। তিনিই মা, মহামায়া। তিনি এত বিরাট যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ক্ষুদ্র সন্তান। জগন্মাতা চোখ বন্ধ রেখে তাঁর সন্তানের সঙ্গে খেলা করেন। আর সারাজীবন ধরে আমরা এই বিশ্ব-জননীর চোখ খুলে দেবার চেষ্টা করি। যদি কেউ তাঁর চোখ খুলে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে পারে, তবে সেই মুহূর্তে সে সকল রহস্য অবগত হয়, শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।

.. 'এই বিশ্বজননীর চোখ যখন বন্ধ থাকে, তখনই আমরা তাঁকে বলি মা-কালী।

'কিন্তু সত্যই মায়ের চোখ বন্ধ থাকে না। আমাদের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, তাই মনে হয় তিনি চোখ ঢেকে আছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি কেঁদে উঠবে, মা তখনই তাঁর সুন্দর, করুণাভরা দৃষ্টি তোমার দিকে মেলে ধরবেন। আর সেই মুহূর্তে তুমি যদি খেলা বন্ধ করে 'কালী' 'কালী' বলে তাঁর বক্ষে তোমার ক্ষুদ্র মুখখানি ঢেকে রাখতে পার, তবে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাবে।

'তুমি কি ক্ষণেকের জন্য খেলা বন্ধ করে, ক্ষুদ্র কর দুটি জুড়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলবে না—মা-কালী, একবার আমার দিকে তাকাও!

'মা যখন লুকিয়ে থাকেন, তখনও খুকুর প্রতি তাঁর অপার স্নেহ। কালী-মা ঠিক এই রকম। তাঁর চোখ যদি দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ থাকে, তবু আমাদের ভয় নেই। তাঁর মুখে সব সময়ে হাসি লেগে আছে। একদিন তাঁর অবকাশ-মত যখন এই খেলা সাঙ্গ করবেন, তখন তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির মিলন ঘটবে, আর তখনই আমরা ইহজগৎ থেকে দূরে, দূরে, চলে যাব—অসীমের আর এক প্রান্তে।'

কত বিভিন্ন রূপ এই মহাকালীর! শিশুর কাছে তিনি স্নেহময়ী মা—কী কোমল, কী মধুর তাঁহার ভঙ্গী! কিন্তু তিনিই আবার ভীষণ হইতেও ভীষণতর। সেই করাল-রূপিণী, ভয়ঙ্করা কালীমূর্তি, নিবেদিতার মনে হইত, একমাত্র পরম শিব গভীর ধ্যানে উপলব্ধি করিয়াছেন। নিবেদিতা নিজের ভাবে তাহার এক অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন—'দীর্ঘ আলুলায়িত-কুন্তলা মহা-কালীর ঘনকৃষ্ণ কেশদাম পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িয়াছে, প্রচণ্ড ধাবমান বায়ুর, কালের বা ঘটনার স্রোতের মত। ত্রিনয়নার দৃষ্টিতে কালই মহাকাল; সেই মহাকালই ঈশ্বর। এক বিপুল ছায়ার মত কৃষ্ণায়িত তাঁহার অঙ্গের নীলিমা। জীবন-মৃত্যুরূপ রূঢ় সত্যের প্রতীক তিনি। তাই মা নগ্না, দিগ্বসনা। এই

ভীষণাদপি ভীষণার হৃদয়ের অতলে নিমজ্জিত হইয়া শিব অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, এবং ধ্যানে মহাকালীর তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করেন' (The Vision of Siva—শিবের ধ্যান)।

শক্তি-উপাসনার গভীর সৌন্দর্য নিবেদিতাকে কেবল মুগ্ধ করে নাই, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় এই মহাকালী অথবা চিৎশক্তি অবিচ্ছেদ্য হইয়া গিয়াছিল।

'হিন্দু রিভিউ' এর সম্পাদক লিখিয়াছেন, 'একদিন আমি বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার গৃহে বসিয়া তাঁহার অদ্ভুত স্বদেশী পেয়ালায় চা খাইতেছিলাম। সহসা আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া গেল। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রায়ই এরূপ কালবৈশাখীর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর মধ্যেও পরিবর্তন দেখা গেল। প্রকৃতির এই রুদ্র-করাল মূর্তি তাঁহার মুখে চোখে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখে এক নূতন আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাহা একাধারে ভীষণ ও মধুর। নিস্তব্ধভাবে নিবেদিতা বসিয়া রহিলেন; আমার উপস্থিতি যেন সাময়িকভাবে তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। গভীর দৃষ্টিতে জানালার মধ্য দিয়া দেখিতে লাগিলেন কেমন করিয়া আকাশ ও পৃথিবী কালো হইয়া আসিতেছে। আচ্ছন্নের মত বসিয়া তিনি শুনিতে লাগিলেন উদ্যত ঝটিকার গর্জন শব্দ। সহসা অন্ধকার আকাশের বক্ষে বিদ্যুৎ চমকিল—তাহার পরেই বজ্রপাতের শব্দ। নিবেদিতা রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন –কালী।'

ব্রতধারিণী

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ। আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির সহিত একান্তভাবে স্বামিজীর প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য নিবেদিতা তাঁহাকে জানাইলেন, তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ আজীবন সংঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন, পূর্ব-দিন সকালে তিনি দুইজন ব্রহ্মচারীকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষা দিয়াছেন; তাঁহাকেও তিনি ঐ ব্রতে দীক্ষিত করিবেন।

গঙ্গাবক্ষে নৌকার ছাদে বসিয়া কথাবার্তা হইতেছিল। নিবেদিতা গিয়াছিলেন 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কোন নারীর পক্ষে ঐ সময় মঠে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করা অনুচিত ভাবিয়া নিবেদিতা নৌকা হইতে নামেন নাই। স্বামিজী এক গাছতলায় ধুনির পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি নৌকায় আসিলেন। প্লেগ-কার্য সম্বন্ধে কথা হইল। নিবেদিতার কার্যে তিনি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিলেন, 'প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্বরূপ আমরা এখনও জানি না। যখন সেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদয় হবে, তখন আর দেখবার প্রয়োজন থাকবে না, কোন্ পথে সবচেয়ে কম বাধা আসবে। তখন প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকবে মহৎ কাজ করবার। আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্তও নয়, আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।'

সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব-জাগরণের জন্য স্বামিজীর এই ব্যাকুলতা নিবেদিতার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামিজী, আমি আপনাকে এই কাজে সাহায্য করব।' স্বামিজী বলিলেন, 'আমি জানি।'

এই প্রতিশ্রুতি নিবেদিতা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও জাতীয়তা-বোধ আনয়ন—ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

২৫শে মার্চ, শনিবার, 'নিবেদিতা' নাম দিবার পূর্ণ এক বৎসর পরে স্বামিজী তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষিত করেন। ম্যাক্‌লাউডকে লিখিত এক পত্রে নিবেদিতা এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়াছেন। বেলুড় মঠেই উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, কারণ ইহার পূর্বেই ২রা জানুয়ারী মঠ সম্পূর্ণভাবে বেলুড়ে স্থানান্তরিত হয়। সকাল ৮টার সময় নিবেদিতা মঠে পৌঁছিয়া ঠাকুরঘরে গিয়া বসেন। স্বামিজীও উপবিষ্ট ছিলেন। পূজার আয়োজন

সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বামিজী বুদ্ধ-প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার নির্দেশমত নিবেদিতা পূজা করেন, এবং এইদিনও বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করেন। পূজা শেষ হইবার পর নীচে অন্য কোন স্থানে হোম অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামিজীর অভিপ্রায় ছিল, নিবেদিতা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু বিধবার ন্যায় পবিত্র ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করেন। তিনি যে জীবন এবং কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, উভয়ের জন্যই এটি অপরিহার্য ছিল। ইহা ব্যতীত বাগবাজার পল্লীর অধিবাসিগণের আস্থাভাজন হওয়া নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মেমসাহেবের স্কুলে পড়িয়া কন্যাগণ মেমসাহেব বনিয়া যাইবে, অভিভাবকদের এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণপূর্বক নিবেদিতা যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে জীবন পুরুষদিগের পক্ষে যেরূপ, তাঁহার পক্ষেও সেইরূপ। আর সেই জীবন-যাপনের জন্য নিবেদিতা কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করিতেন! তাঁহার আহার ছিল ফল ও দুধ : বহু সময়ে শুধু খাটের উপর তিনি শয়ন করিতেন। অসহ্য গরমেও তাঁহার কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা দূরে থাক, একখানি টানা পাখাও ছিল না। পাশ্চাত্য দেশের মঠগুলিতে সন্ন্যাসিনীগণ যে কঠোর জীবন যাপন করেন, নিবেদিতার কঠোরতা তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। স্বামিজী তাঁহাকে জোর করিয়া কোন আদেশ দিতেন না, কিন্তু সর্বদাই আদর্শটি সামনে রাখিতেন। পাশ্চাত্য জীবন ভোগসর্বস্ব ; আবার নিবেদিতার মধ্যে ছিল আবেগপরায়ণতা। সুতরাং সময় সময় স্বামিজী দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর সংযমের আদর্শ বর্ণনা করিয়া বলিতেন, 'ভাবোচ্ছ্বাসের নামগন্ধ না রেখে আত্মানুভূতির চেষ্টা কর।'

স্বামিজীর আরও অভিপ্রায় ছিল, নিবেদিতার গৃহ যেন রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের ন্যায় হয়; তাহাতে পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। কিন্তু নিবেদিতার পক্ষে তখনকার হিন্দু নারীর ন্যায় বহির্জগতের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যে ধ্যান-ধারণার জীবন-যাপন অসম্ভব। তাঁহার চরিত্রে ছিল অদ্ভুত কর্মশক্তি ও প্রচণ্ড উৎসাহ। নানা কর্মের মধ্যে সে শক্তির বিকিরণ করিয়া চলাই ছিল তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় সকল ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, এবং এই ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহিত তিনি সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহাদের বাড়ি যাইতেন। য়ুরোপীয় মহলেও তাঁহার গতিবিধি ছিল। এ সকল স্বামিজীর সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও তিনি নিষেধ

করেন নাই। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, '১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাস আমি মধ্যে মধ্যে কলিকাতার নানা শ্রেণীর দেশীয় ও য়ুরোপীয় ব্যক্তিগণের গৃহে আহারাদি করিতাম। স্বামিজী ইহাতে চিন্তিত হইতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, ইহা দ্বারা নিষ্ঠাবান হিন্দু জীবনের অত্যধিক সরলতার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে। এ-কথাও তিনি নিঃসন্দেহে ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাতে আজন্ম সঞ্চিত সংস্কারসমূহের দ্বারা আমার পুনরায় আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা।...তথাপি তিনি এ বিষয়ে আমাকে বিন্দুমাত্র বাধা দেন নাই। যদিও তাঁহার মুখনিঃসৃত একটি আদেশ-বাক্যই যে কোন সময় উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। ইহা যে তাঁহার মনঃপূত নয়, এ-কথাও কখনো প্রকাশ করেন নাই।'

উপরন্তু, নিবেদিতা এই বন্ধুগণের সহিত আলোচনার ফলে কোনরূপ অভিজ্ঞতা বা ভারত সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য লাভ করিলে স্বামিজীর নিকট উৎসাহপূর্বক উহা বর্ণনা করিতেন, এবং তিনিও মনোযোগসহকারে তাহা শ্রবণ করিতেন। শিষ্যদিগকে স্বামিজী কতদূর স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন, এই ঘটনা তাহার বিশেষ প্রমাণ।

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-যাত্রাকালে জাহাজে তিনি নিজের মনোভাব অভিব্যক্ত করেন। নিবেদিতার কার্যের ভবিষ্যৎ আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'তোমাকে লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে ছাড়তে হবে এবং রীতিমত নির্জনে বাস করতে হবে। তোমার চিন্তা, প্রয়োজন, ধারণা, অভ্যাস এসব হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া চাই। তোমার জীবন হবে ভেতরে বাইরে যথার্থ নিষ্ঠা-বতী হিন্দু ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর মত। আর এর সাধনের উপায় তুমি নিজে থেকেই জানতে পারবে, যদি যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। কিন্তু অতীত জীবন তোমাকে একেবারে ভুলতে হবে। তার স্মৃতি পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।'

অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ! এ নির্দেশ-পালনে নিবেদিতা কতদূর সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী জীবন আলোচনা-কালে আমরা দেখিতে পাইব।

নিবেদিতাকে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে স্বামিজীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'কী গভীর চিন্তা ও অনুকম্পার সহিত তিনি (স্বামিজী) এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া স্বয়ং শ্রীমাও সর্বদা আমাকে হিন্দু-সমাজে (আমি তো একজন বিদেশী) আশ্রয় দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহা অনুধাবন করিতে আমার অনেক মাস লাগিয়াছিল।'

ব্রাহ্মসমাজে আহার-বিহারে গোঁড়ামি ছিল না; কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু-

সমাজেও যথেষ্ট ছিল। আহার ও স্পর্শ ব্যাপারে গোঁড়ামির প্রতি স্বামিজীর ঘৃণা সর্বজন-বিদিত। আবার বলপূর্বক কোন প্রথা দূর করিবারও তিনি একান্ত বিরোধী। নিবেদিতার মতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মকেও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় করিয়া তোলা, যাহাতে উহা ধীরে ধীরে অপর জাতির সহিত আহার এবং স্পর্শ ব্যাপারে অগ্রসর হইয়া তাহাকে স্বমতে আনিতে পারে। নিবেদিতাকে প্রায়ই তিনি আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ এবং অন্যান্য ব্যক্তিও আহার করিতেন।

প্রথম দিকে স্বামিজীর উদ্দেশ্য নিবেদিতা বুঝিতে পারিতেন না। স্বামিজীর আদেশে তিনি একদিন একান্ত যত্নের সহিত একটি পথ্য প্রস্তুত করিয়া স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি যখন জানিতে পারিলেন, স্বামিজী ঐ পথ্যের সামান্য অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বাকীটা ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। স্বামিজীর উদ্দেশ্য পরে তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহার দ্বারা রন্ধন করাইয়া স্বামিজী অপরকে আহার করাইতেন এবং নিজের লোকজনের মধ্যে আচারের গণ্ডি ভাঙিগয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। নিবেদিতার গৃহে তিনি স্বয়ং আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, চা-পানের জন্য বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিতে অনুরোধ করিতেন এবং সকল সময়েই কেহ না কেহ তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। একদিন স্বামিজী স্বামী যোগানন্দ ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া পশুশালায় গমন করেন। সেদিন তাঁহাদের সহিত নিবেদিতাও ছিলেন। পশুশালা পরি-দর্শনান্তে কর্মাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া জলযোগের ব্যবস্থা করেন। নিবেদিতার সহিত এক টেবিলে বসিয়া চা ও মিষ্টান্ন গ্রহণে নিষ্ঠা-বান শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর অনিচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামিজী বারবার বলিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন, এবং জলপানে তাঁহার প্রবল আপত্তি জানিয়া নিজে একটু জল খাইয়া শিষ্যকে দিলেন। এখানেই শেষ হইল না। পশুশালা হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে সন্ধ্যার পর স্বামিজী সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত ডারউইন-মতবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঐ সকল প্রসঙ্গের পর তিনি রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন, 'আর এক কথা শুনেছেন? আজ এই ভট্‌চাজ বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?' স্বামিজীর কথায় উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

অপর দিকে, কেহ যাহাতে মনে করিবার অবকাশ না পায় যে, তিনি স্তুতি

ও মনোরঞ্জন দ্বারা শ্বেতাঙ্গদিগকে শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার প্রতি স্বামিজীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। শ্রীযুক্তা সরলা ঘোষাল প্রভৃতি একদিন মঠে আগমন করিলে তাঁহাদের সামনেই তিনি নিবেদিতাকে তামাক সাজিতে আদেশ দেন। নিবেদিতাও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আনন্দের সহিত তামাক সাজিয়া আনেন। তাঁহার আচরণে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছিল যে, এইটুকু সেবার অধিকার লাভ করিয়া তিনি ধন্য। ব্রাহ্মমহিলাদের নিকট ইহা ধারণার অতীত।

ইতিমধ্যে ১৭ই মার্চ স্বামী অভয়ানন্দ মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইয়া কলিকাতা আগমন করেন। তাঁহার পূর্ব নাম মারী লুইজ। স্বামিজী ইঁহাকে আমেরিকায় সন্ন্যাস দান করিয়া ঐ নামে অভিহিত করেন। সর্বত্রই তিনি বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন এবং যথোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত ব্রহ্মচর্য-ব্রতের দিন নিবেদিতা তাঁহার সহিত প্রাতরাশে যোগদান করেন। তাঁহার মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত পত্রে অভয়ানন্দের বহু উল্লেখ থাকিত। সম্ভবতঃ ইঁহাকে দেখিয়া নিবেদিতার মনে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণের অভিলাষ জাগে। স্বামিজী অনেক সময় জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগের মহিমা বর্ণনা করিতেন। শারীরিক অসুস্থতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। বলিতেন, 'আমরা সৈনিক, আমরা কিসের পরোয়া করি? সন্ন্যাসী জীবন অথবা মৃত্যু কোনটাই চাইবে না।'

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে স্বামিজী অসুস্থ হইয়া মঠে রহিয়াছেন। নিবেদিতা গিয়াছেন দেখা করিতে—একান্ত ইচ্ছা, তিনিও স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। কথাপ্রসঙ্গে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামিজী, সন্ন্যাসজীবনের যোগ্যতা-লাভের জন্য আমাকে কী করতে হবে?'

স্বামিজীর নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, 'তুমি যেমন আছ তেমনি থাক।' নিবেদিতা স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিরদিনের মত রুদ্ধ। স্বামিজী একবার যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহার পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু কী কারণ? যিনি নিজ হইতে তাঁহাকে ত্যাগ-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, বলিবামাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী করিয়া লইয়াছেন, সন্ন্যাস দানে তাঁহার অসম্মতির কারণ কী? অতি সন্তর্পণে নিবেদিতা জানিতে চাহিলেন, তাঁহার বিভিন্ন লোকের সহিত মেলামেশা কি স্বামিজী দূষণীয় মনে করেন? তাঁহার অসম্মতির ইহাই কি কারণ? তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে নানা প্রকৃতির লোকের সহিত সংস্রব তাঁহার নিজেরই শোভনীয় মনে হইতেছিল না। প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী তাঁহার উপর কোন দোষারোপ করিলেন না, কিন্তু ঐ প্রসঙ্গের পরিবর্তন করিলেন।

নিবেদিতাকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত না করিবার কারণ স্বামিজী নিজেই জানিতেন। শিষ্যার ভবিষ্যৎ জীবনের সমগ্র চিত্র কি তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছিল? নিবেদিতার পরবর্তী জীবনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সন্ন্যাস-জীবনের সহিত সঙ্গত হইবে না, স্বামিজী কি ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন? তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাস দেন নাই, তবে একখানি গৈরিক উত্তরীয় দিয়াছিলেন। ধ্যান করিবার সময় নিবেদিতা উহা দ্বারা মাথা ঢাকিয়া বসিতেন। অন্তরে তিনি যে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ কী? কিন্তু ভারতবর্ষে সন্ন্যাস-জীবনের অবশ্যপালনীয় বিধিগুলির অনুবর্তন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনে হয়, ঐ সকল চিন্তা করিয়াই স্বামিজী নিবেদিতার সন্ন্যাস গ্রহণ সঙ্গত মনে করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নিবেদিতার পরিচ্ছদ লইয়া নানারূপ আলোচনা হইয়াছে। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পুস্তকে স্পষ্ট-ভাবে তাঁহাকে 'মহাশ্বেতা' বলিয়া উল্লেখপূর্বক লিখিয়াছেন, তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র ছিল। ইহা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে লেখেন, 'গৈরিক পরিচ্ছদে ভূষিতা।' আরও অনেকে পুস্তকে এবং প্রবন্ধে তাঁহার গৈরিক পরিচ্ছদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে, নিবেদিতা বহু সময় কমলালেবু রঙের পোশাক পরিতেন। তাঁহার প্রকৃত সন্ন্যাসজীবনের সহিত ঐ বর্ণ এত খাপ খাইয়াছিল যে, সকলের অজ্ঞাতসারেই উহা গৈরিকে পরিণত হইয়াছিল। ডাঃ কর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগের সময় ভগিনী নিবেদিতাকে গৈরিক-পরিহিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (উহাই তাঁহার প্রথম দর্শন)। ইহা অসম্ভব, কারণ তখন পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে যে পরিচ্ছদে পরবর্তী কালে সর্বদা দেখা যাইত, তাহা গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমার সামনে বসা তাঁহার ঐ সময়কার যে ফটো আছে, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার পরিচ্ছদ অপর য়ুরোপীয়গণের ন্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ব্রত ছিল নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধন। ইহা ব্যতীত ভারতের জাতীয় জীবনের পুনরুত্থান অসম্ভব। 'কখনও ভুলো না, নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতিসাধনই আমাদের মূলমন্ত্র'—বিদেশে স্বামিজী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে নিবেদিতা এই কথাটিই তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন।

এই উন্নতিসাধনের উপায় সম্বন্ধে অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকগণের সহিত স্বামিজীর মূলগত পার্থক্য ছিল। নানা সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত সমাজ-সংস্কারের উপায়গুলি গ্রহণ, অথবা উহা লইয়া আন্দোলনের পক্ষপাতী তিনি একেবারেই ছিলেন না। নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষাদান পর্যন্তই অপরের অধিকার ; তাহাদের ভবিষ্যৎ-সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসার ভার তাহাদের নিজেদের উপর। নারীগণ কিরূপ জীবনযাপন করিবে—বাল্য-বিবাহ থাকিবে কি না, বিধবাবিবাহের প্রয়োজন আছে কি না, অথবা যথাযথ শিক্ষালাভের পর কেহ কৌমার্যব্রত অবলম্বনপূর্বক নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে কি না—এ সকল সমস্যার সমাধানের ভার নারীগণের উপর।

অবশ্য নারীজাতির শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে স্বামিজী বহু সময় গভীর-ভাবে চিন্তা করিতেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন গৌরবময় ভারতকে অতিক্রম করিবে। নারীগণ সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা অনুরূপ ছিল। অতীত ভারতে যে সকল মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের অনন্যসাধারণ চরিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিকে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, আগামী কালের নারী নিশ্চিত তাঁহাদের কীর্তিসমূহ অতিক্রম করিয়া যাইবে—ইহাই তিনি মনে করিতেন। রাণী অহল্যাবাঈ ভারতের আধুনিক ইতিহাসে নারীসমাজের শীর্ষস্থানীয়া হইলেও ভাবী নারীগণের মহত্ত্ব উহার প্রতিরূপ মাত্র হইবে না। তাহাদের জীবনে নব নব ভাববিকাশের অবকাশ থাকিবে। কিন্তু ভবিষ্যতের হিন্দুনারী যেন প্রাচীন কালের ধ্যানপরায়ণতা-বর্জিত না হয়। প্রাচীন কালের যে মৌন, মাধুর্য ও নিষ্ঠা, তাহাই আদর্শ। আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু প্রাচীন ধর্মভাব বিসর্জন দিয়া নহে। যে শিক্ষা কালে প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীত কালের সকল নারীর শ্রেষ্ঠত্ব-বিকাশে সহায়তা করিতে সমর্থ, তাহাই আদর্শ শিক্ষা।

আগামী যুগের নারীর মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সংকল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ ঘটিবে। যে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পবিত্রতা, শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক সাবিত্রীর আবির্ভাব, উহাই আদর্শ অবস্থা, কিন্তু ভবিষ্যৎ নারীর মধ্যে মলয়-সমীরণের কোমলতা এবং মাধুর্যেরও বিকাশ ঘটিবে।

এইরূপ এক আদর্শ নারীরূপে অনন্ত করুণা ও প্রেমের সহিত হৃদয়ের সমগ্র শক্তি দ্বারা ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার প্রেরণা দিয়া স্বামিজী এক সময়ে নিবেদিতাকে নিম্নলিখিত আশীর্বাণী উপহার দেন[১]—

মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা,
মলয়-সমীরে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র-কান্তি, বীর্য, আর্য-বেদীতলে,
নিত্য রাজে, বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে ;
এ সব তোমার হোক—আরও হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত ;
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।

তাঁহার এই আশীর্বাদ নিবেদিতার জীবনে কতখানি সার্থক হইয়াছিল, নিবেদিতার পরবর্তী জীবন তাহার প্রমাণ।

স্বামিজী প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন, ভারতে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের কতদূর প্রয়োজন। তাঁহার জীবনে দুটি সংকল্প ছিল—একটি রামকৃষ্ণ-সংঘের জন্য মঠস্থাপন এবং অপরটি নারীগণের জন্য অনুরূপ কিছু সম্ভব না হইলে, অন্ততঃ একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন।

সুতরাং যে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি তাঁহার শুভ সংকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বামিজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া নিবেদিতার সহিত তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কোনদিন হয়তো বলিলেন, 'তোমার ছাত্রীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম কর, এবং ঐ নিয়ম সম্বন্ধে তোমার মতামতও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দাও। সুবিধা হলে একটু উদারভাবের প্রশ্রয় দিও।' স্বামিজীর মতে, সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা থাকিবে, আবার সেইসঙ্গে সম্প্রদায়ের গণ্ডির বাহিরে যাইবার ব্যবস্থারও অভাব হইবে না। নিবেদিতাকে নিজের সহকারিণী নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। নিয়ম

[১] কবিতাটি রচনার তারিখ ২২.৯.১৯০০।

করা প্রয়োজন, কিন্তু নিয়মগুলি এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, যাহাদের প্রয়োজন নাই, তাহারা যেন অযথা নিয়মশৃঙ্খলের দ্বারা পীড়িত না হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পূর্ণ শাসন—ইহাই আমাদের মৌলিকত্ব।'

কখনও শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া স্বামিজী বলিতেন, 'পঞ্চযজ্ঞের ব্যাপার নিয়েই কত কী করা যায়। কত বড় বড় কাজেই এগুলিকে লাগানো যেতে পারে।' তারপর প্রবল উৎসাহের সহিত তিনি বিস্তৃতভাবে ঐ বিষয়ের আলোচনা ও সেইসঙ্গে নিজের মন হইতে নূতন নূতন ভাব উহাতে যুক্ত করিতেন।

কোনদিন আবেগভরে বলিয়া উঠিতেন, 'আমাদের বিদ্যালয় থেকে এমন সব মেয়ে শিক্ষিতা হবে, যারা ভারতের সকল মেয়েপুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।'

স্বামিজী নিবেদিতাকে কেবল উৎসাহ দিতেন না, পরন্তু ভারতীয় নারীর আদর্শ চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করাইয়া দিতেন। নিবেদিতার ভারতের নারী ও তাহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় রচনাবলীর মধ্যে স্বামিজীর চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ও উক্তির প্রতিধ্বনি সর্বত্র বিদ্যমান।

বিদ্যালয়ের কার্যে নিবেদিতার অদম্য উৎসাহ এবং তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন দর্শনে স্বামিজী উহার ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। নিবেদিতার প্রশংসা করিয়া শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'দেখছিস্ না, নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হ'য়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে! আর তোরা তোদের নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবিনি?'

এই শিক্ষাকার্যকে স্থায়ী এবং যথার্থ হিতকর করিয়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন অর্থের, আর প্রয়োজন একদল নারীর, যাহারা ইহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তখনকার হিন্দুসমাজে কোন কুমারী কন্যার আজীবন শিক্ষাব্রতিরূপে জীবনযাপনের প্রশ্নই উঠে না। অতএব যাহারা বালবিধবা, বিশেষতঃ পিতৃমাতৃহীন, এইরূপ বালিকাগণকে যথাযথ শিক্ষা দিয়া এক মহৎ উদ্দেশ্যে গঠিত করিতে হইবে। ব্রতধারিণীরূপে তাহারাই সর্বত্র শিক্ষা-প্রচারের ও নারীগণের সকল সমস্যার সমাধানের ভার গ্রহণ করিবে। এই সকল ব্রতধারিণীর নিকট কর্মক্ষেত্রই গৃহ এবং ধর্মই একমাত্র বন্ধন হইবে, এবং তাহাদের ভালবাসা থাকিবে কেবল গুরু, স্বদেশ ও জনসাধারণের প্রতি—ইহাই ছিল স্বামিজীর কল্পনা।

ঐরূপ একদল শিক্ষয়িত্রী গঠনের জন্য প্রয়োজন একটি আশ্রম-স্থাপন, যেখানে বালবিধবা এবং সম্ভব হইলে কুমারীও অবস্থান করিতে পারে। নিবেদিতার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, যদি তিনি এইরূপ একদল শিক্ষয়িত্রী গঠন করিতে না পারেন।

এইভাবে আশ্রম স্থাপন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদান প্রচুর অর্থসাপেক্ষ। অসুস্থতার জন্য স্বামিজীর পুনরায় বিদেশযাত্রার কথা চলিতেছিল। এতদিন স্থির ছিল, নিবেদিতা ভারতেই রহিয়া যাইবেন। কিন্তু এখন স্বামিজীর মনে হইল, নিবেদিতাও যদি আমেরিকায় গিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, তবে তাঁহার কার্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। কাশ্মীরের মহারাজা কর্তৃক স্বামিজীকে প্রদত্ত অর্থ এবং নিবেদিতার নিজস্ব কিছু অর্থ লইয়াই প্রধানতঃ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সঞ্চিত অর্থ-হ্রাসের সহিত শীঘ্রই আর্থিক সংকট দেখা দিবে। ১৬ই ডিসেম্বর স্বামিজী তাঁহার বিদেশযাত্রার কথা ঘোষণা করিলেন। নিবেদিতাকে অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া সংগত নহে ; সুতরাং ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই তিনি তাঁহাকেও সঙ্গে যাইবার আদেশ দিলেন।

নিবেদিতার তখন প্রথম উদ্যম। তিনি একটি পরীক্ষামূলক কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। প্রথমেই অর্থ-চিন্তা করিয়া উহা ত্যাগ করিতে মন চাহিল না। এক এক করিয়া অনেকগুলি মেয়ে তাঁহার স্কুলে ভর্তি হইয়াছিল। তখনকার দিনে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ত্রিশ নিতান্ত কম নয় ; যদিও কখন যে সংখ্যা কমিয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা ছিল না। প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে নিবেদিতা ইংলণ্ডে তাঁহার এক বান্ধবীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ভারতে আসিবার জন্য। উভয়ে একযোগে কাজ করিবেন; ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের যে বিদ্যালয়গুলিতে তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের বহু পার্থক্য। কিন্তু এই ছোট ছোট মেয়েগুলির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তাহাদের স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ায় তাঁহার আনন্দ ছিল। ইহাদের স্বাভাবিক শিল্প ও সৌন্দর্য-বোধ তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। রঙ ও তুলির কাজে ইহাদের একান্ত উৎসাহ, সেলাই ও গৃহকর্মের প্রতি অনুরাগ যথেষ্ট। আর এই সকল শিক্ষার সাহায্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ কেমন আপনিই গড়িয়া উঠিতেছে! সুতরাং স্বামিজীর সহিত তাঁহার পাশ্চাত্য-গমনের প্রস্তাবে নিবেদিতা বিচলিত বোধ করিলেন। স্বামিজীর অভিপ্রায় হইলে তিনি অবশ্যই যাইবেন, কিন্তু তিনি কি অকৃতকার্য হইয়াছেন

বলিয়া স্বামিজীর ধারণা? স্বামিজী বলিলেন, 'তুমি খুব যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছ।'

তখন পর্যন্ত ছয় শত টাকা জমা ছিল। নিবেদিতা অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'স্বামিজী, আমাকে ঐ টাকা খরচ করবার অনুমতি দিন, যাতে আমি শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ চালাতে পারি; পরিণামে যদি ব্যর্থ হই, তাও স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকব।' স্বামিজী তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছেন বুঝিয়া নিবেদিতা অনুরোধ করিলেন, স্বামিজী যেন তাঁহার জন্য চিন্তা না করেন। অন্ততঃ আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি দেখিবেন। তাঁহার স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, এইরূপ ভাবেই তিনি চলিতে চাহেন। স্বামিজী সম্মত হইলেন। এমন কি, একটি ছাত্রীর মাসিক খরচ বহন করিবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। নিবেদিতার মনে হইল, কাজটি বরাবর স্থায়ী হইবে, এইরূপ ধারণা লইয়াই অগ্রসর হওয়া উচিত। কিছু ঝুঁকি তো লইতেই হইবে। বছরে দেড় শত পাউন্ড সংগ্রহ করিতে পারিলে তিনি পাঁচজন বালিকাকে বোর্ডিংয়ে রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারেন। ইহা কি কম কথা! এত অল্প অর্থের বিনিময়ে পাঁচটি জীবন লাভ! অসুবিধা এবং বাধা যাহাই আসুক, প্রত্যেকটিই কি দুরতিক্রমণীয় হইবে?

কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিবেদিতা হতাশ হইয়া পড়িলেন। এ দেশে অর্থ-সাহায্যের কোন সম্ভাবনা নাই। গরম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্লেগের কার্য আরম্ভ হইল। নানাবিধ লেখার কার্য তো ছিলই। বাগবাজার পল্লীর সংকীর্ণ গলির মধ্যে অসহ্য গ্রীষ্মে খুবই কষ্ট হইতে লাগিল। বৈশাখ মাস পড়িলে সকাল এবং বিকালে বিদ্যালয়ের কার্য চলিত। দ্বিপ্রহরে তিনি শ্রীমার নিকট গিয়া তাঁহার ঘরে বিশ্রাম করিতেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাঁহার এই প্রথম বাস। অসংখ্য কাজ তাঁহার, কিন্তু এই নিদারুণ গরমের মধ্যে কিছুই করা সম্ভব নয়। দুঃখ করিয়া লিখিলেন, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি যে, ভারতবর্ষের নৈরাশ্যমূলক মনোভাবের জন্য তার জলবায়ু অনেকাংশে দায়ী। গতকাল শুধু প্রচণ্ড গরম ও শারীরিক অবসন্নতার জন্যই আমার যেন মরে যেতে ইচ্ছা করছিল।'

কিন্তু ইহাও সহ্য করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সর্বাপেক্ষা অসহনীয় —যে মুহূর্তে একজন ছাত্রী হয়তো তাঁহার যত্নে ও পরিশ্রমে লেখাপড়ায় বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্তে তাহার বিবাহ হইয়া যায়। ক্ষোভে ও দুঃখে নিবেদিতা কাঁদ কাঁদ হইতেন। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে স্বামিজীর যুক্তি-গুলি তখন আর কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিত না। তাঁহার কাজ একেবারে

ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু নারীগণকে শিক্ষা দিবার অন্য পন্থা আবিষ্কার করা চাই। বহু দুঃখে তিনি মিসেস বুলকে লিখিয়াছিলেন, '...আর একটি শিক্ষা-লাভ করিয়াছি, গ্রীষ্মকালে অবশ্যই একটি পাখার প্রয়োজন। নতুবা কাজ এবং স্বাস্থ্য উভয়ের ক্ষতি হয়। সদানন্দ বলিতেছেন, এইভাবে সাধারণের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের বন্ধুত্ব ও আস্থা লাভ না করিলে আমার ভবিষ্যৎ আশ্রম-স্থাপনের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, যদিও সকল মেয়েরই বিবাহ হইয়া যাইতেছে।'

অবশেষে নিবেদিতা স্বামিজীর পরামর্শের সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। ব্যাপকভাবে এদেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁহার কাজ হইবে একদল শিক্ষয়িত্রী গঠন করা, কেবল বিদ্যালয়ে অতি অল্প সময়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা নয়। যাহাদের তিনি শিক্ষা দিবেন, তাহাদের সমগ্র জীবন তাঁহার হাতে থাকা চাই। স্বামিজীরও তাহাই অভিমত। নিবেদিতাকে পাশ্চাত্যে গিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে, যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিদ্যালয়ের সহিত বিধবা এবং কুমারীদের জন্য একটি আশ্রম বা বোর্ডিং স্থাপন করিতে পারেন।

এই বিদ্যালয় এবং ঐ ভবিষ্যৎ আশ্রম সম্বন্ধে নিবেদিতা তখন হইতেই কত উৎসাহী! আর স্বামিজীও কত আগ্রহের সহিত দিনের পর দিন ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতেন! বিধবাশ্রম বা বালিকা-বিদ্যালয় সংক্রান্ত তাঁহার সকল পরিকল্পনায় বড় বড় সবুজ ঘাসে ঢাকা জমির ব্যবস্থা থাকিত। যাহারা এই সকল স্থানে বাস করিবে, শারীরিক ব্যায়াম, উদ্যান-সংরক্ষণ এবং পশু-পালন প্রভৃতি তাহাদের নিত্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া প্রয়োজন। এই কয় মাসের কাজ সত্যই পরীক্ষামূলক ছিল, এবং পরীক্ষান্তে ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে উভয়েরই কোন সন্দেহ ছিল না। এখন লক্ষ্য অর্থসংগ্রহ। নিবেদিতা ছিলেন বাগ্মী, লেখিকা এবং কর্মী ; সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার মন বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিত। কিন্তু কত সময় তিনি আগ্রহভরে কল্পনা করিতেন যে, তাঁহার সমগ্র উৎসাহ বিদ্যালয়ের কার্যেই নিবদ্ধ রাখিবেন। কয়েকটি মেয়ে লইয়া তিনি যে আশ্রম খুলিবেন, উহাই হইবে তাঁহার কর্মকেন্দ্র। তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই ; তিনি অনেক শিখিয়াছেন, আশ্বাস পাইয়াছেন। বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া যাইতে হইবে, দুঃখের কথা ; কিন্তু এই পরীক্ষা ব্যতীত স্থায়ী কার্যের সম্ভাবনা ছিল না।

নিবেদিতাকে বিষণ্ণ ও হতাশ দেখিয়া স্বামিজী ক্রমাগত উৎসাহ দিতেন, নানারকম জল্পনা-কল্পনা করিতেন। নিবেদিতাকে তিনি আমেরিকায় লইয়া

গিয়া এক বক্তৃতা-পরিচালক সমিতির অধীনে রাখিবেন, যাহাতে বক্তৃতা দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। স্বামিজীর পরিকল্পনা শুনিতে শুনিতে উৎসাহিত হইয়া নিবেদিতা ভাবিতেন, তিনি একটি বড় সমিতি গঠন করিবেন, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতের সর্বত্র ঐ সমিতির সদস্য থাকিবে, এবং প্রত্যেক সদস্য প্রতি বৎসরে মাত্র একটি পেনী, দুটি সেণ্ট, অথবা এক আনা করিয়া দান করিলেই তাঁহার বিদ্যালয় চলিয়া যাইবে। অর্থের অভাব আর হইবে না। আর এইরূপে জনসাধারণ-প্রদত্ত নিম্নতম মাসিক সাহায্য দ্বারা জনসাধারণের কার্য সম্পন্ন হইলে কী আনন্দের ব্যাপার! স্বামিজীর মাথায় বড় বড় পরিকল্পনা খেলিত। কোনদিন হয়তো বলিলেন, মঠে একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুলিতে হইবে, আর নিবেদিতার মেয়েরাই উহাতে আমের মোরব্বা সরবরাহ করিবার ভার লইবে। নিবেদিতা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বন্ধুকে লিখিলেন, 'কাঁচা আমের মোরব্বা যে কী উপাদেয়, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই। আমি নিশ্চিত জানি, এ কাজ আমরা বেশ চালাতে পারব। আর এর দ্বারা শিক্ষার পরিসরও বৃদ্ধি পাবে। একবার ভেবে দেখ, কাজটা সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। অবশ্য কাজের গোড়াপত্তন হবে অতি সামান্যভাবে। যে ভাবে হোক, প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করা চাই।'

গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ ১৬ই মে বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রীগণকে নিবেদিতা একদিন মিউজিয়াম বেড়াইতে লইয়া গেলেন। শ্রীমার বাড়িতে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে মেয়েদের বিভিন্ন পুস্তক, খাতা, মাদুর, সেলাই-এর কাজ, তাহাদের গড়া বিভিন্ন পুতুল, হাতে আঁকা ছবি প্রভৃতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিলেন—ছোটখাট একটি প্রদর্শনী। পাড়ার মেয়েরা কৌতূহলের সহিত দেখিয়া যাইতে লাগিল। যে কয়জন ছাত্রী তাঁহাকে বড় আপনার বলিয়া জানিয়াছিল, তাহাদের মুখ ম্লান—সিস্টার চলিয়া যাইবেন। নিবেদিতা সকলকে আদর করিলেন, আশ্বাস দিলেন, আবার তিনি তাহাদের কাছে ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার নিজের মনও বেদনা-ভারাক্রান্ত।

যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। স্বামিজী স্থির করিয়াছিলেন, স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইবেন। বেদান্ত সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছে পাশ্চাত্যের নরনারী। এখন বৈদান্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্বলন্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবন কাহাকে বলে, তাহাই দেখা আবশ্যক। ২০শে জুন যাত্রার দিন স্থির হইল। ১৮ই জুন নিবেদিতা সারা দিন শ্রীমায়ের নিকট কাটাইলেন।

এই এক বৎসরে ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। আবার কবে শ্রীমার নীরব সান্নিধ্য, অপার করুণা ও স্নেহ লাভ করিবেন! বিকালে মঠে গেলেন। তাঁহার বিদায় উপলক্ষ্যে ছোটখাট চায়ের মজলিসের ব্যবস্থা ছিল। মঠের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি অভিনন্দন-পত্র ও গোলাপ-ফুলের তোড়া সমাদরের সহিত অর্পিত হইল। মঠ হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অন্তরের অন্তস্তলে সেই মহাপুরুষের কৃপা উপলব্ধি করিবার জন্যই নির্জন অন্ধকারে নিবেদিতা ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেলেন। ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। উত্তপ্ত ধরণীকে শীতল করিবার জন্যই যেন প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইল। এই নিবিড় বর্ষা কী অপরূপ! নিবেদিতা যুক্তকরে, কাতরহৃদয়ে প্রার্থনা করেন, তাঁহার যাত্রার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়।

১৯শে জুন রাত্রে মঠে স্বামিজী বিদায়কালীন সভায় জ্বলন্ত ভাষায় সন্ন্যাসজীবনের ত্যাগ ও আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বলিলেন, 'সংক্ষেপে সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা। তবে কি আত্মহত্যা করতে হবে? একে-বারেই নয়, মৃত্যু অনিবার্য জেনে নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে।'

সকলের মন বিষাদগ্রস্ত। ২০শে জুন শ্রীমা স্বামিজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণকে ভোজন করাইলেন। বিকালের দিকে সকলে প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতাকে বিদায় দিবার জন্য মঠের সন্ন্যাসিগণ ছাড়াও বহু লোকজনের সমাবেশ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজ তীর ছাড়িল। নিবেদিতার অন্তরে বেদনার সহিত দৃঢ় আশ্বাস—আবাব তিনি ভারতভূমিতে ফিরিয়া আসিবেন।

পশ্চিম অভিমুখে

'গুরুর সহিত যদি ভূ-প্রদক্ষিণও করা যায়, তবে উহাই তীর্থযাত্রায় পরিণত হয়।' সুতরাং ২০শে জুন হইতে ৩১শে জুলাই ইংলণ্ডে অবতরণের পূর্ব পর্যন্ত জাহাজে স্বামিজীর সহিত অবস্থানের সুযোগ পাইয়া নিবেদিতা নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। তাঁহার নিজের নিকট এই সমুদ্রযাত্রা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া মনে হইত। কেহই জানিত না, কখন সহসা স্বামিজীর উপলব্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, এবং তাহার ফলে তাঁহার অনন্ত ভাবধারার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ঘটিবে। জাহাজে নিবেদিতা অপর কোন লোকের সঙ্গে প্রায় মিশিতেন না। লেখা এবং সূচীকর্মে অবশিষ্ট সময় কাটিত।

২৪শে জুন জাহাজ মাদ্রাজ পেঁৗছিল। দূর হইতে দেখা গেল সমুদ্র-তীরে অপেক্ষমান বিরাট জনতা। প্লেগ সংক্রামণের আশঙ্কায় সরকার কর্তৃক কোন ভারতীয় যাত্রীর অবতরণ নিষিদ্ধ ছিল। বহু লোক নৌকায় নানা উপহার সহ জাহাজের নিকট আসিয়া স্বামিজীকে দর্শন করিয়া গেল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও আসিয়াছিলেন। রেলিং-এর নিকট দাঁড়াইয়া স্বামিজী প্রসন্ন-হাস্যে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। কলম্বোতে নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এখানেও বিরাট জনতা স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিল। কলম্বোতে তাঁহারা মিসেস হিগিনের বৌদ্ধ বালিকা বিদ্যালয় এবং কাউণ্টেস ক্যানোভারার কনভেণ্ট ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে মিসেস হিগিনের সহিত নিবেদিতার বহু আলোচনা হইল। তাঁহার সাহায্য পাইলে মিসেস হিগিন একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন। নিবেদিতা প্রস্তাবটি ভাবিয়া দেখিবেন জানাইলেন। তাঁহার কল্পনা ছিল, প্রত্যাবর্তনান্তে অন্ততঃ কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং পুণায় একটি করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন ; এখন কলম্বোতেও একটি বিদ্যালয় খুলিবার সম্ভাবনা দেখা গেল।

পাশ্চাত্য-যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিবেদিতাকে সর্বদা সচেতন রাখিবার জন্য স্বামিজী সুবিধা হইলে অন্যান্য প্রসঙ্গের সহিত নিবেদিতার জীবনের আদর্শ এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষাকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। যাত্রার প্রারম্ভে জাহাজ সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলে স্বামিজী আবেগভরে বলিয়াছিলেন, 'নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়! ত্যাগবৈরাগ্যভূমি পরিত্যাগ করে ভোগৈশ্বর্য-ভূমিতে পদার্পণ করতে চললাম।'

নিবেদিতাকেও সতর্ক করিয়া তিনি বলিলেন, 'সাবধান, উত্তম আহার, পরিচ্ছদ, এ সকলের প্রতি মনোযোগ দিও না। সংসারে বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হলে চলবে না। ও সব একেবারে পরিত্যাগ করা চাই। মূলসমেত উপড়ে ফেলতে হবে। এ কেবল ভাবুকতা; ইন্দ্রিয়ের অসংযম থেকেই এর উৎপত্তি। বিচিত্র বর্ণ, সুন্দর দৃশ্য ও শব্দ এবং অন্যান্য সংস্কার অনুযায়ী এই সব উচ্ছ্বাস মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। এ সব দূর কর। ঘৃণা করতে শেখ।'

এইরূপেই তিনি নিবেদিতার প্রাণ হইতে ভোগের আকাঙ্ক্ষা একেবারে দূর করিয়া দরিদ্রজীবন বরণ করিয়া লইবার প্রেরণা ও শক্তি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

২৮শে জুন জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মৌসুম পুরাপুরি আরম্ভ হইয়া গেল। প্রবল বাতাসে জাহাজ দুলিতে লাগিল; কিন্তু সমুদ্রের হাওয়ায় স্বামিজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় তিনি কখনও স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতার সহিত, কখনও বা শুধু নিবেদিতার সহিত নানা প্রসঙ্গে অধিকাংশ সময় কাটাইতেন।

জাহাজে স্বামিজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'আমি নিয়মিত ব্যায়াম করব স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। যদি ভূলে যাই বা অনিয়ম করি, তুমি আমায় মনে করিয়ে দিও।'

হরি মহারাজ রাজী হইলেন। প্রথম দুই-চারিদিন স্বামিজী কথামত ব্যায়াম করিলেন। তারপর দেখা গেল, নিবেদিতার সহিত নানা প্রসঙ্গে তিনি একেবারে তন্ময়। ব্যাযামের কথা আর মনে নাই। নিবেদিতা কিছু বলিতে সাহস করেন না। অবশেষে হরি মহারাজ স্বামিজীকে ব্যায়ামের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে স্বামিজী বলিতেন, 'হরি ভাই, আজ থাক। জাহাজে বেশ ভালই আছি। আর দেখ, নিবেদিতার সঙ্গে একটু কথা বলছি। ও বিদেশী মেয়ে, সব ছেড়ে ছুড়ে আমাব কাছে এসেছে এই সব কথা শুনবার জন্য। বেশ ভাল মেয়ে, খুব সমঝদার। এর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই।'

একদিন হরি মহারাজ নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেখানে কি রকম চলতে হবে?' উত্তরে নিবেদিতা একটি ছুরীর অগ্রভাগ নিজ হাতে ধরিয়া হাতটা হরি মহারাজের দিকে বাড়াইয়া বলিলেন, 'লোককে কিছু দিতে হলে এই ভাবে দেওয়া চাই। অর্থাৎ, সব বিষয়ে অসুবিধা ও বিপদের ভাগটা নিজে নিয়ে সুবিধার ভাগটা অপরকে দিতে হবে।'

নিবেদিতা নিজ জীবনে ইহা চমৎকার পালন করিয়াছিলেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের অনুরোধে স্বামিজী 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য এই যাত্রার বর্ণনা লিখিয়াছেন। উহাই পরে 'পরিব্রাজক' নামে বাহির হইয়াছে। ইহাতে যে নানা প্রকার কৌতুককর বর্ণনা ও সরস মন্তব্য আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, সমুদ্রযাত্রাটি তিনি কিরূপ উপভোগ করিয়াছিলেন।

এই 'পরিব্রাজকে' স্বামিজীর একটি কথায় নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জাহাজে যাইতেছিল এক সস্ত্রীক আমেরিকান পাদ্রী, নাম বোগেশ। পাদ্রীর অনেকগুলি সন্তান, কিন্তু পাদ্রী-গৃহিণীর তাহাদের দেখিবার অবসর নাই। টুটুল নামে আর একটি ছোট মেয়ে চলিয়াছে তাহার পিতার সহিত। স্বামিজী লিখিয়াছেন, 'আমাদের নিবেদিতা টুটুলের ও বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে।'

এই যাত্রাকালেই জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে নিবেদিতার তীব্র অভিজ্ঞতা হয়। 'নেটিভ'দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদিগের ব্যবহার অসহ্য। য়ুরোপীয় যাত্রিগণের অনেকেই আগ্রহসহকারে তাঁহার সহিত কথা বলিতে আসিত, কিন্তু কোন ভারতীয়কে তাঁহার নিকট দেখিবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যাইত। পাশ্চাত্য যুবকগণকে দেখিয়া নিবেদিতা ভাবিতেন, ইঁহারা যদি এই সুযোগে স্বামিজীর পদতলে বসিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিত! কিন্তু জাতিগত সংস্কার একটি প্রচণ্ড বাধা। উহার ফলে জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সুযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল।

বরাবরের মত স্বামিজীর বিভিন্ন প্রসঙ্গের বিষয় ছিল যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনী, ভারত ও য়ুরোপের ইতিহাস, হিন্দুসমাজের বর্তমান অবনতি ও ভবিষ্যতে ইহার অবশ্যম্ভাবী উন্নতি, বিভিন্ন দর্শন এবং ধর্ম। 'Cradle Tales of Hinduism' (হিন্দু শিশুদের জন্য উপকথা) নামক পুস্তকের উপাদান নিবেদিতা প্রধানতঃ এই সময়েই সংগ্রহ করেন। বিশেষতঃ জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত স্বামিজী যখন তাঁহার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেন, নিবেদিতা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পূর্ণ মনো-যোগের সহিত তাহা ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামিজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার কী আগ্রহ তাঁহার! তিনি জানিতেন, ভবিষ্যতে অসংখ্য ভক্ত ও জিজ্ঞাসু জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহারা স্বামিজীর স্বপ্নগুলি বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইবেন, এবং তাঁহাদের ও স্বামিজীর মধ্যে তিনি কেবল সেতুস্বরূপ। অনাগত কালের জন্য তাঁহার কাজ স্বামিজীর আলোচিত মহান্ তত্ত্বগুলি লেখনীর সাহায্যে ধরিয়া রাখা। আর এই কাজ নিবেদিতা কী বিচক্ষণতা, নিরভিমানতা

ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য লাগে। ভবিষ্যৎ ভারত এজন্য তাঁহার নিকট ঋণী।

সুবিধা পাইলেই নিবেদিতা নিজের নানারূপ সমস্যা স্বামিজীর নিকট উত্থাপিত করিতেন। বলা বাহুল্য, তাহাদের সমাধানও হইত। কোন ব্রত লইয়া যাহারা সিদ্ধিলাভ না করিতে পারে তাহাদের কী গতি? স্বামিজী উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, 'হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে তাহাদের কদাপি বিনাশ নাই। হে তাত, যে ব্যক্তি কোন লোক-কল্যাণকর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার কোন কালে দুর্গতি হয় না।' নিবেদিতা কতই না আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন এই উত্তরে!

স্বামিজীর কথা শুনিতে শুনিতে তিনি নিজের মধ্যে এক প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করিতেন। সে শক্তিকে যথাযথ কাজে লাগাইবার উপায় কী, তাহাই চিন্তার বিষয়। ইংলণ্ডের উপর ভরসা কম। আমেরিকাতেই অর্থসংগ্রহের সম্ভাবনা। সেখানকার কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা নাই। তবে ভরসা, সেখানে মিসেস বুল আছেন, মিস ম্যাকলাউড আছেন, আরও অনেকে আছেন যাঁহারা স্বামিজীর শিষ্য, বন্ধু ও অনুরাগী—তাঁহার কার্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

মৌসুমের জন্য অনেক দেরী করিয়া জাহাজ ৩১শে জুলাই ইংলণ্ডের টিলবেরী ডকে পৌঁছিল। অপেক্ষারত বন্ধু ও শিষ্যগণের মধ্যে ছিলেন মিসেস ফাঙ্কি ও মিস গ্রীনস্টাইডেল। সুদূর ডেট্রয়েট হইতে স্বামিজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের ইংলণ্ডে আগমন।

ইংলণ্ডের অধিকাংশ বন্ধুই তখন বাহিরে। স্বামিজী স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত উইম্বলডনে ২১ নং হাই স্ট্রীটে, নিবেদিতার মাতার গৃহে অবস্থান করেন। এই সময়ে সমগ্র নোবল পরিবারের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। নিবেদিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রিচমণ্ড নোবল স্বামিজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। বহু দিন পরে ভগ্নীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার ভগিনী যে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই; কারণ আমি নিজে স্বামিজীকে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম। যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই স্বামিজীকে কেবল দেখার এবং তাঁহার কথা শুনিবার অপেক্ষা মাত্র ছিল, এবং তাহার পরেই সে বলিতে পারিত, 'Behold the man' ('এই দেখ সেই লোক')। সকলেই জানিত স্বামিজী সত্য প্রচার করিতেন, কারণ তিনি

ছিলেন অধিকারী পুরুষ; তিনি সাধারণ পণ্ডিত অথবা পুরোহিতের মত কথা কহিতেন না। স্বামিজীর মধ্যে নিশ্চয়তা ছিল। জিজ্ঞাসুকে তিনি আশ্বাস দিতে ও বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারিতেন। আমার মনে হয়, আমার ভগিনীকে তিনি এই আশ্বাসই দিয়াছিলেন, এবং এই পরম নিশ্চয়তাই তাঁহাকে নির্ভয়ে স্বামিজীর অনুসরণে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। আর একবার দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহাকে মানিয়া লওয়ার পরে তাঁহার অনুতাপ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই।'

স্বামিজীর উপস্থিতিতে নোব্‌ল পরিবারে আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। যে দুইজন শিষ্যা সুদূর আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রায় মেরী নোব্‌লের গৃহে আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে আসিতেন, এবং এই সময়েই ধীর, স্থির, মিষ্টভাষিণী ক্রস্টীন গ্রীনস্টাইডেলের সহিত নিবেদিতার পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়; যাহা পরবর্তী কালে উভয়কে এক কর্ম-সূত্রে আবন্ধ করে।

১৬ই আগস্ট স্বামিজী স্বামী তুরীয়ানন্দ সহ নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। নিউইয়র্কে পেঁৗছিবামাত্র মিঃ ও মিসেস লেগেট স্বামিজীকে লইয়া তাঁহাদের বৃহৎ পল্লীভবন 'রিজলি ম্যানর' গমন করেন। নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরে হাডসন নদীর তীরে পাহাড়ের উপর জায়গাটি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

নিবেদিতা ইংলণ্ডে রহিয়া গেলেন। কয়েকটি পারিবারিক কারণ ছিল। যেমন, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী মে-র বিবাহ। ইতিমধ্যে এক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। স্বামিজীর বেদান্ত-প্রচার কার্যের সহায়ক মিঃ স্টার্ডি ও মিসেস জনসনের এই সময়ে ইংলণ্ডে অনুপস্থিতি নিবেদিতার মনে বিশেষ উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বামিজীর আগমনের সংবাদ তাঁহারা অবগত ছিলেন, অথচ বাহিরে চলিয়া গেলেন, ইহার কারণ কী?

শীঘ্রই জানা গেল, মিঃ স্টার্ডি স্বামিজীর প্রতি বিরূপ। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ হইতে আগত সন্ন্যাসিগণের মধ্যে সন্ন্যাসের প্রকৃত আদর্শের অভাব। তাঁহার সহিত নিবেদিতার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। স্বামিজীর কার্যে উভয়ে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ স্টার্ডির এক পত্রে স্বামিজীর বিরুদ্ধে সমালোচনা নিবেদিতাকে বিশেষ আহত করিল। ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিলেন। স্টার্ডিও তাহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলেন। ইহার পর কঠোর ভাষায় কয়েকখানি পত্র-বিনিময়ের পর উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল।

মিসেস জনসন ও মিস মুলারও পরে স্বামিজীর অসুস্থতা হেতু তাঁহাকে

পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের যুক্তি অদ্ভুত—সন্ন্যাসী কেন রোগে পীড়িত হইবে! তাঁহাদের এই বিশ্বাসহীনতায় নিবেদিতা মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিলেন। সান্ত্বনা দিয়া স্বামিজী লিখিলেন, 'জীবন হইতেছে কতকগুলি ঘাত-প্রতিঘাত ও ভুলভাঙার সমষ্টি মাত্র। জীবনের রহস্য ভোগ নয়, পরন্তু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ।'

যথাসময়ে কনিষ্ঠা ভগ্নী মে-র বিবাহ হইয়া গেল। মিস ম্যাকলাউড এই উপলক্ষ্যে নিবেদিতাকে একটি সুন্দর পোশাক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নিবেদিতার এ-সবের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। আমেরিকায় যাত্রার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে পারিবারিক কর্তব্য যথাযথ সম্পন্ন হইলে তিনি নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। এখানে স্বামী অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বক্তৃতা উপলক্ষ্যে তিনি নিউইয়র্কে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতিপূর্বেই 'হিন্দুসমাজে নারী' নামক বক্তৃতায় তিনি ভারতে নিবেদিতার বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। সুতরাং স্থানীয় বহু ব্যক্তি নিবেদিতা ও তাঁহার কার্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। প্রধানতঃ স্বামী অভেদানন্দের উদ্যোগেই নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে নিবেদিতার বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল।

২০শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা 'রিজলি ম্যানর' পৌঁছিলেন। মিঃ লেগেট ছিলেন ধনী ব্যক্তি। স্বামিজীর প্রতি তাঁহার ও মিসেস লেগেটের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। মিসেস লেগেটকে স্বামিজী সাধাবণতঃ 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আবার কখনও লেডি বেটি বলিয়া উল্লেখ করিতেন। স্বামিজীকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য ইঁহাদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামিজীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও কয়েকদিন কাটাইয়া গেলেন। মিঃ লেগেটের গৃহদ্বার স্বামিজীর দর্শনপ্রার্থী সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। মিসেস স্যারা বুল আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার কন্যা ওলিয়া। মিসেস লেগেটের ভগ্নী মিস ম্যাকলাউড পূর্ব হইতেই অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং 'রিজলি ম্যানর' আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সমুদ্রযাত্রায় অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ করিলেও স্বামিজীর শরীর যে দ্রুত খারাপ হইয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ ও অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ উপলব্ধি করিতেছিলেন। একজন বিখ্যাত অষ্টিওপ্যাথের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল। বাহিরে কিন্তু তিনি সর্বদাই উৎফুল্ল। আর তাঁহার উপস্থিতিই অপর সকলের নিকট আনন্দদায়ক। মিসেস স্যারা বুল, মিস ম্যাকলাউড এবং নিবেদিতা আবার একত্র অবস্থানের সুযোগ পাইয়া আনন্দিত।

প্রেরণা

নিবেদিতার আমেরিকায় আগমনের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ। কাজে নামিবার পূর্বে স্বামিজীর সঙ্গ ও বিশেষ অনুপ্রেরণালাভের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে। তিনি ইতিপূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, প্রথম হইতেই আদর্শে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। তাঁহার জীবন ত্যাগের, ভোগের নহে। লেগেটের বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ গৃহে বাস করিলেও তাঁহার জীবন যে একটি বিশেষ আদর্শবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা স্থির রাখিবার জন্য চালচলন, বেশভূষায় পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁহাকে অপরের সহিত পার্থক্য বজায় রাখিতে হইবে।

রিজলি ম্যানর আগমনের পর নিবেদিতা সংকল্প স্থির করিলেন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী; যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উদ্‌যাপনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। পরদিন (২১শে সেপ্টেম্বর) তিনি তদুপযোগী পরিচ্ছদ গ্রহণের অভিপ্রায় স্বামিজীর নিকট ব্যক্ত করেন। আদর্শের প্রতি তাঁহার দৃঢ়তা ও অনুরাগ দর্শনে স্বামিজী প্রীত হন। ঐদিনই বিকালবেলা ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র স্বামিজী তাঁহাকে একটি কবিতা উপহার দেন। কবিতাটির নাম 'শান্তি'—

হের, ঐ আসে মহাবেগে,
শক্তি, তবু সে শক্তি নয়,
যে আলোক আঁধারের মাঝে,
ছায়া সম উজ্জ্বল আলোকে।

যে আনন্দ চির ভাষাহীন,
গভীর বেদনা সে নহে অনুভূত,
অমৃত জীবন যাহা হয়নি যাপিত,
অশোচিত শাশ্বত মরণ।

আনন্দ বা দুঃখ এ যে নয়,
উভয়ের মাঝখানে রাজে,
নহে রাত্রি, নহে উষালোক—
মিলনের সেতু এ দুয়ের।

সঙ্গীতের মধুর বিরতি ;
পবিত্র শিল্পের ছন্দ, যতি,
নীরবতা ভাষার অন্তরে ;
কামনার দ্বন্দ্ব মাঝে—
হৃদয়ের অপূর্ব প্রশান্তি।

সৌন্দর্য সে চির অবিদিত,
প্রেম যাহা একাকী বিরাজে,
অগীত যে মহান্ সঙ্গীত,
পূর্ণজ্ঞান চির-অজানিত।

মৃত্যু দুই জীবনের মাঝে,
ঝটিকাদ্বয়ের মাঝে ক্ষণিক স্তব্ধতা,
মহাশূন্য, যাহা হতে সৃষ্টির বিকাশ
পুনর্বার যাহাতে বিলয়।

যার লাগি অশ্রুজল ঝরে,
স্মিত হাসি বিলাবার তরে,
জীবনের লক্ষ্য সুনিশ্চিত—
শান্তি এর একান্ত আশ্রয়।

শান্তিলাভের জন্য নিবেদিতার আকুল প্রার্থনার উত্তর স্বামিজী এই কবিতার মাধ্যমেই দিয়াছিলেন।

নিবেদিতার স্বভাবে ছিল রজোগুণের আধিক্য। কর্মে তিনি ছিলেন অনলস। ইংলণ্ডের অন্যান্য অনুগামিগণ হঠাৎ পশ্চাদপসরণ করায় তাঁহার আগ্রহ আরও বর্ধিত হইল। তিনি একাই সমগ্র ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে স্বামিজীর কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন। সেভিয়ার দম্পতির সংকল্প মহৎ। হিমালয়ের শান্ত ক্রোড়ে তপশ্চর্যায় জীবনযাপনের সঙ্গে স্বামিজীর কল্পনা ও আদর্শকে জনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন পত্রিকার মাধ্যমে। নিবেদিতার উপর দায়িত্ব অন্যরূপ—ভারতবর্ষের নারীগণের শিক্ষাবিধান। এই দায়িত্ব-পালনের দুরন্ত আগ্রহ সর্বক্ষণ তাঁহার মনপ্রাণ অধিকার করিয়া থাকিত। আর তাঁহার নিকট স্বামিজীর অহরহঃ মন্ত্র ছিল 'কর্ম'। জ্বলন্ত ভাষায় ঘণ্টার পর

ঘণ্টা ধরিয়া তিনি উৎসাহ দিতেন। কর্ম, জ্ঞান ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণাগুলি বারবার উল্লেখ করিতেন। তিতিক্ষা অভ্যাস করা প্রয়োজন। মনের উপর বহির্জগতের প্রভাব সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। কার্যে অবতরণের পূর্বে ধ্যানের দ্বারা অন্তর্মুখ ভাবটিকে আয়ত্ত করা চাই। সর্বাগ্রে আবশ্যক সন্ন্যাসের আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া।

এই সময়ে নিবেদিতা 'Kali the Mother' পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করেন। নির্জন পরিবেশের মধ্যে ধ্যান-ধারণা এবং অবকাশমত লেখার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু দূরে একটি নির্জন কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৭ই অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এই কুটিরে অবস্থান করিয়া পুস্তকখানি শেষ করেন। এই পুস্তকের অন্তর্গত 'The Story of Kali' ও 'The Vision of Siva' প্রবন্ধ দুটি পূর্বেই লেখা ছিল। জগন্মাতা কালী সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে স্বামিজীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, নিজের মনোগ্রাহ্য অনুভূতির দ্বারা অপূর্ব ভাষায় 'Voice of Mother' নাম দিয়া তাহাও পূর্বেই লিখিয়াছিলেন।

কুটীরে বাস করিলেও নিবেদিতা প্রত্যহ স্বামিজীর দর্শন লাভ করিতেন। স্বামিজী ঐ কুটীরে পদার্পণ করিয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিতেন, অথবা তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া পাঠাইতেন। নিবেদিতার নির্জনবাসে স্বামিজী আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এই সময়েই কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, একবার হৃষীকেশে তিনি একাদিক্রমে ষাট ঘণ্টা মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন। মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতার উপর স্বামিজী অনেক আশা পোষণ করিতেন। অর্থ দ্বারা সাহায্য ব্যতীত আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের এবং মঠস্থাপনে মিসেস বুলের অকৃপণ সহায়তা স্বামিজীকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছিল। মিসেস বুলের মাতৃবৎ স্নেহের তিনি যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে সর্বদাই তাঁহার পরামর্শ লইতেন। স্বামিজীর সহিত একত্রবাসের স্থানগুলি কোন না কোন বিশেষ ঘটনার সহিত যুক্ত থাকায় নিবেদিতার ভাবী জীবনে বিশেষ স্মৃতি বহন করিত। রিজলি ম্যানরেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সকলের সহিত আলাপ-আলোচনা-কালে এখানেও স্বামিজীর লক্ষ্য ছিলেন নিবেদিতা। এখানেই একদিন ভাবাবেগে তিনি মিসেস বুল ও নিবেদিতাকে গৈরিক উত্তরীয় প্রদান করিয়া অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইঁহাদের মধ্যে তিনি যে দিব্যশক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে বহু কল্যাণকর কার্য সংসাধিত হইবে।

দেখিতে দেখিতে রিজলি ম্যানরের আনন্দের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল।

সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া স্বামিজী শেষবারের মত বেদান্তপ্রচার কার্যে অবতীর্ণ হইতে চাহিতেছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মঠের জন্য অর্থের প্রয়োজন। শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে সংকল্পগুলি কার্যে পরিণত করিতে বাধা পাইলে স্বামিজী ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেন। তাঁহার সময় যে শেষ হইয়া আসিতেছে! অকস্মাৎ একদিন তিনি নিবেদিতাকে কর্ম-বিমুখতার জন্য প্রচণ্ড ধমক দিলেন। কবে তিনি কাজ আরম্ভ করিবেন? তাঁহাকে বীর ক্ষত্রিয় হইতে হইবে, কঠিন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। গুরুর সমীপে অবস্থানকালে শিষ্যের কর্তব্য সংযতভাবে গুরুর আদেশ-পালন ; কিন্তু গুরু অন্যত্র গমন করিলে শিষ্যের যথাশক্তি উদ্যম ও তৎপরতা দেখানো প্রয়োজন। আর সময় নষ্ট করা নয়, কর্মসাগরে ঝাঁপ দিবার সময় আসিয়াছে। নিবেদিতা প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। স্থির হইল, ৫ই নভেম্বর স্বামিজীর নিউইয়র্ক যাত্রার অব্যবহিত পরে নিবেদিতাও শিকাগো যাত্রা করিবেন। স্বামিজী জ্বলন্ত ভাষায় শিব ও শুকের উপাখ্যান বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শুকের নিকট সমগ্র জগৎ যেন একটা খেলা মাত্র। জগতের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী নৈরাশ্য দূর করে। ইহা ব্যতীত স্বামিজী বারবার মহাশক্তির অপূর্ব লীলার উল্লেখ করিয়া নিবেদিতার মনে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করিলেন। কাজে নামিবার পূর্বে নিবেদিতার শক্তিভাবে পূর্ণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যাত্রার দিন সকালে স্বামিজী বলিলেন, 'দেখ, রামকৃষ্ণ প্রতিদিন সকালে বহুক্ষণ ধরে শিব-গুরু, মহাকালী, অথবা সচ্চিদানন্দ, এই সকল নাম করতেন। সব সময় বলবে দুর্গা, দুর্গা। এই নাম তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে।' তারপর সহসা উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'আর দেখ, শুধু প্রার্থনা করা নয়, তাঁকে জোর করে ওটা পূরণ করাতে হবে। মার কাছে ওসব দীন-হীন ভাব চলবে না।'

এই মাতৃপ্রার্থনা নিবেদিতার জীবনে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিয়াছিল। যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত, অথবা তিনি কাতর হইতেন, অন্তর হইতে তিনি জপ করিতেন—দুর্গা, দুর্গা!

৫ই নভেম্বর স্বামিজী রিজলি ম্যানর ত্যাগ করিলেন। ৭ই নভেম্বর নিবেদিতাও শিকাগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়া। মনে মনে জপ করিতে লাগিলেন, তিনি সন্ন্যাসিনী, সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবেন ; সেবা ও ত্যাগ তাঁহার আদর্শ।

শিকাগো শহরে প্রথম পরিচয় হইল হেল পরিবারের সহিত। মিস মেরী হেল, যাঁহাকে স্বামিজী অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহার সহিত নিবেদিতার এক

মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইল। মেরী হেলকে স্বামিজী 'ভগ্নী' সম্বোধন করিতেন। নিবেদিতা স্বামিজীর কন্যা, সুতরাং মেরী তাঁহার 'aunt' অর্থাৎ পিসী হইলেন।

শিকাগো আগমনের পর নিবেদিতা প্রথমে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিয়াছিলেন। রিজলি ম্যানর জায়গাটি শহর হইতে দূরে এক পল্লীগ্রামে। অধিকাংশ সময় নিবেদিতা সেখানে নির্জনতা উপভোগ করিতেন। সর্বোপরি স্বামিজীর উপস্থিতি সেখানকার আবহাওয়াকে একটা বিশেষ বিশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতা দান করিত। আমেরিকার বড় বড় শহরগুলির সর্বত্র অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা, উগ্র বিদ্যুতালোক এবং গতানুগতিক জীবনযাত্রা। ইহ-লোকে নিবদ্ধদৃষ্টি ব্যক্তির নিকট এই জীবনই একমাত্র সত্য, সুতরাং সেই জীবনকে একান্তরূপে ভোগ করিবার বিচিত্র আয়োজন, অসংখ্য উপকরণ। এই উৎকট স্থূলতা নিবেদিতাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিত।

মিস জেন অ্যাডামস্ শিকাগো শহরের একজন বড় কর্মী। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'হাল্ হাউসে' নিবেদিতা অবস্থান করেন। বাড়ীটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। উহাতে যেমন ধনীর জন্য বহু মূল্যবান দ্রব্যবিশিষ্ট সুসজ্জিত-কক্ষ এবং ভোগের নানাবিধ আয়োজন ছিল, সেই সঙ্গে সাধারণ নরনারী অথবা দরিদ্রগণের বাসোপযোগী ব্যবস্থারও অভাব ছিল না। ফলে এখানে নিবেদিতা একটা সাধারণ আবহাওয়া উপভোগ করিতেন। এখানে বিদেশীদের একটি বিশেষ সুবিধা ছিল--তাঁহারা সকল দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর সংস্রবে আসিয়া বক্তৃতাদি সহায়ে নিজ মতামত প্রকাশের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইতেন। নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতাদি দ্বারা অর্থসংগ্রহ। তিনি ভারত-প্রত্যাগত ; সুতরাং শীঘ্রই ভারত সম্বন্ধে কৌতূহলী লোকের ভিড় জমিয়া উঠিল। সর্ব-প্রথম ১৬ই নভেম্বর তিনি মিস ম্যাথিউর প্রাথমিক স্কুলের বালকবালিকা-গণের নিকট ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। স্বামিজীর নিকট ইতিপূর্বে তিনি যে সকল উপাখ্যান শুনিয়া কিছু কিছু টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, সেগুলি কাজে লাগিল। বক্তৃতা দিবার কৌশল তাঁহার আয়ত্ত ছিল। 'শিশু খৃষ্ট' দ্বারা আরম্ভ করিয়া তিনি 'ভারতীয় শিশু খৃষ্টে'র উপাখ্যান বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং গোপাল সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক কাহিনী ব্যাখ্যা করেন। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রীগণের নিকট তিনি ভারতের গঙ্গা নদী, আগ্রার তাজমহল ও ফোর্ট প্রভৃতির চমৎকার বর্ণনা দেন।

পরদিন, শুক্রবার, এক মিশনারী বোর্ড কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া ফ্রাইডে ক্লাবে 'ভারতীয় নারীগণের অবস্থা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২০শে

নভেম্বর মিস অ্যাডামসের উদ্যোগে হাল্ হাউসে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল ; বিষয় —'ভারতে ধর্মজীবন'। পহলগামে অমরনাথ-তীর্থযাত্রিগণের সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ দ্বারা বক্তৃতা শেষ করেন।

ক্যালিফর্নিয়া যাইবার পথে স্বামিজী ২৩শে নভেম্বর শিকাগোয় উপনীত হইয়া কয়েকদিনের জন্য হেল পরিবারে অবস্থান করেন। সুতরাং নিবেদিতা পুনরায় তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। ১লা ডিসেম্বর হাল্ হাউসে আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট্ অ্যাসোসিয়েশনে তাঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল, বিষয়—'ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা'। এই বক্তৃতায় অর্থ সংগৃহীত হইবার কথা ছিল। ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে তখনও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ না করায় নিবেদিতা বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় স্বামিজী শিকাগো আসিয়া পড়ায় নিবেদিতা তাঁহার সহিত আলোচনা দ্বারা বক্তৃতার সারাংশ লিখিয়া লন। ঐ বক্তৃতায় সর্বপ্রথম কয়েক ডলার লাভ করিয়া তিনি উৎফুল্ল হন।

বহুদিন পরে স্বামিজীর আগমনে শিকাগোর বন্ধুগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। নিবেদিতার সহিত একে একে সকলের পরিচয় ঘটিল। মেরী হেল ও মিস জেন অ্যাডামসের সাহায্যে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইল। বহু লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাতে তাঁহার সময় প্রায় চলিয়া যাইত। তথাপি হেল পরিবারে স্বামিজীর অবস্থানকালে নিবেদিতা সর্বপ্রকার সুযোগ অন্বেষণ করিতেন তাঁহার নিকট আসিবার জন্য। কেবল নিজে নয়, যে কেহ স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া দর্শনের অভিলাষ জানাইতেন, তাঁহাকেই লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার কী আগ্রহ! হয়তো কেহ স্বামিজীর সহিত আলোচনায় তাঁহার কোন মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন ; নিবেদিতা প্রাণপণে তাঁহাকে বুঝাইতেন, স্বামিজীর লক্ষ্য সত্য-প্রচার—জগতের মতামত সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। তাঁহার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহার সহিত ব্যবহারকালে সকলকে ভুলিয়া যাইতে হয় যে, তাহারা সত্যান্বেষী আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু। যে সকল মহিলাকে তিনি স্বামিজীর নিকট লইয়া আসিতে চাহিতেন, তাঁহাদের জন্য পাশ্চাত্য আদব-কায়দা বজায় রাখিয়া এবং কতকটা মেরীকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কত অনুনয়পূর্বক তাঁহার অনুমতি চাহিতেন! দর্শন এবং উপদেশ-প্রার্থী সকলেই যেন স্বামিজীর নিকট যাইতে পারে ; তাহাতে তাহাদের জীবন ধন্য হইবে।

শিকাগো পরিত্যাগের পূর্বে স্বামিজী নিবেদিতাকে বলিলেন, 'মনে রেখো,

ভারত চিরকালই ঘোষণা করছে, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়, প্রকৃতিই আত্মার জন্য।'

আমেরিকা এক আশ্চর্য দেশ। সর্বপ্রকারের লোক এবং সর্ববিধ মত-বাদের এক বৃহৎ সম্মিলন-ক্ষেত্র। হাল্ হাউসেও বিভিন্ন দেশের লোক সমবেত। ক্রমে নিবেদিতার চারিপার্শ্বে ভারত সম্বন্ধে কৌতূহলী শ্রোতৃবর্গের ভিড় জমা হইতে লাগিল। অসংখ্য তাহাদের প্রশ্ন। ড্রইংরুমে বসিয়া ছোট ছোট দলের সহিত প্রায় তাঁহার আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর চলিত। এক সন্ধ্যায় অনেকের অনুরোধে তিনি 'কালীপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া প্রশংসা অর্জন করিলেন। উইমেনস্ ক্লাবের সদস্যাগণের নিকটও প্রায়ই নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া তাহাদের সহায়তা লাভ করেন।

নানারূপ সমস্যার মধ্যে পোশাকের অসুবিধা ছিল অন্যতম। তাঁহার জীবন ত্যাগের, এবং এক মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁহার অর্থভিক্ষা। নিজের এবং অপরের নিকট যাহাতে ইহা সর্বদা পরিস্ফুট থাকে, সেইজন্যই তাঁহার বিশেষ ধরনের পরিচ্ছদ গ্রহণের সংকল্প। কিন্তু বহু বান্ধবীর নিকট হইতে অনুরোধ আসিত, তিনি যেন ঐ অদ্ভুত পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সাধারণ পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন, নতুবা উহাই তাঁহার কার্যের অন্তরায় হইবে। ইঁহাদের যুক্তিগুলি উপেক্ষা করা সহজ ছিল না, কিন্তু তাঁহার পক্ষে যে ঐ পরিচ্ছদ ত্যাগ করা অসম্ভব, এ কথাও তিনি বুঝাইতে পারিতেন না। ফলে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিত। তাঁহার ভয় হইত, হয়তো অন্যত্রও এইরূপ সমস্যা দেখা দিবে। কিন্তু উপায় কী? ব্যর্থতার জন্যও প্রস্তুত থাকা চাই। আবার কেহ কেহ চাহিতেন, বক্তৃতার সময় তিনি যেন সাদা পোশাক পরেন। তাঁহার ভারতীয় নামের প্রতি কাহারও কাহারও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইত। বিভিন্ন লোকের বিচিত্র মত, এবং সবগুলিই জোরালো—নিবেদিতা নিজেকে অসহায় বোধ করিতেন।

মাদাম কালভে স্বামিজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার সহিত নিবেদিতার এখানেই পরিচয় ঘটে। বহু হিন্দু ও সিংহলী বৌদ্ধ নিবেদিতার নিকট আসিতেন। ইঁহাদের নিকট স্বামিজীর প্রসঙ্গ করিবার সময় তিনি নিজেকে অনুপ্রাণিত মনে করিতেন এবং আবেগপূর্ণ কণ্ঠে স্বামিজীর কথা বলিয়া যাইতেন। বিশেষতঃ, কেহ যদি ত্যাগ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিত, নিবেদিতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আত্মহারা হইয়া তিনি ঐ সম্বন্ধে স্বামিজীর কথাগুলি বর্ণনা করিতেন।

প্রাণপাতী পরিশ্রমে অবশেষে নিবেদিতা একদল হিতৈষী বন্ধু লাভ করিলেন। মিস লক নামে জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা প্রশ্নবাণে তাঁহাকে জর্জরিত

করিয়া তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সাহায্য এবং সহানুভূতি যথেষ্ট পাওয়া গেল। যাঁহারা আর্থিক সাহায্যে প্রতিশ্রুত হন, তাঁহাদের মধ্যে মিসেস কোহান, মিসেস ফাইফ, মিসেস কংগার, মিসেস কিং এবং মিসেস ইয়ারো বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। শিকাগোয় কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে নিবেদিতা অন্যান্য শহরগুলিতে অনুরূপ কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ১০ই জানুয়ারী শিকাগো ত্যাগ করিলেন।

সংগ্রাম

নিবেদিতার স্বভাবে অধীরতা বরাবর ছিল। সাফল্যের আনন্দে তিনি যত অভিভূত হইতেন, ব্যর্থ হইলে সেই পরিমাণে হতাশ বোধ করিতেন। কিছু অর্থ সাহায্য পাইলে যেমন তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, ঠিক তেমনই যখন দেখিতেন যে, দিনের পর দিন কৌতূহলী শ্রোতার দল অজস্র প্রশ্নের দ্বারা ভারত সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার কার্যের জন্য একটি ডলারও দান করে না, তখন ক্ষোভে তিনি ভাঙিয়া পড়িতেন। 'দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ মানুষকে অধিকতর দুর্বল করিয়া ফেলে', স্বামিজীর এই উপদেশ স্মরণ করিয়া তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন দুর্বলতার নিকট আত্মসমর্পণ না করিতে। স্বীয় অসহায় অবস্থা চিন্তা করিয়া যখন বেদনা বোধ করিতেন, তখন নিজেই নিজেকে নানাভাবে প্রবোধ দিতেন। কর্ম যত মহৎ, হতাশাও তত বেশী, অথচ এ জীবনে কর্মই সত্য। তাঁহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে, যতদিন না উপযুক্ত লোকের সন্ধান পান। তাঁহার মানসনেত্রে কতকগুলি বালিকার কচি মুখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করিত, যাহাদের শিক্ষাভার স্বামিজী তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। যদি প্রয়োজনীয় অর্থ না জোটে? নিবেদিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেন, সেই শিশুগুলির শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে না, ইহার অধিক আর কী হইতে পারে?

স্বামিজী ইতিমধ্যে লস এঞ্জেলিস্‌ গমন করিয়াছিলেন। তিনিও সর্বত্র বক্তৃতা দ্বারা ভারতীয় কার্যের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। স্বামিজী ছিলেন বীর, যোদ্ধা, আবার সেই সঙ্গে অত্যন্ত কোমলহৃদয় এবং ভাবপ্রবণ। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমাগত খারাপ হইতেছিল। ইহার উপর ছিল নানারূপ মানসিক ক্লেশ। মিঃ স্টার্ডি এবং মিস মুলারের আচরণ যথেষ্ট মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারীর পত্রে তিনি মেরীকে লেখেন, 'দারিদ্র্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও আমার নিজের নির্বুদ্ধিতা জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে।' রিজলি ম্যানর ত্যাগ করিবার পূর্বদিন নিবেদিতাকে ঠিক এই কথাগুলিই বলিয়াছিলেন। তাঁহার লস্‌ এঞ্জেলিস্‌ আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কার্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ। সে আশা পূর্ণ হয় নাই। নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দের সহিত স্বামিজীর

পুরাতন বন্ধুবর্গের বনিবনাও হয় নাই, এবং মিঃ লেগেট বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্বামিজী মিসেস বুলকে এক পত্রে লেখেন, 'দৈবের সহায়তা আমি সত্যই হয়তো পেয়েছি, কিন্তু উঃ, তার প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য আমাকে কী পরিমাণেই না রক্ত মোক্ষণ করতে হয়েছে!'

তাঁহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সদা-সচেতন নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড নানাভাবে তাঁহার কার্যের ভবিষ্যৎ সাফল্যের বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করিতেন। স্নেহের সহিত উহা গ্রহণ করিলেও স্বামিজী জানিতেন, ইঁহাদের কল্পনা সফল হইবার আশা কম। ৬ই ডিসেম্বরের (১৮৯৯) পত্রে তিনি নিবেদিতাকে লিখিলেন—

'কাহারও কাহারও প্রকৃতিই এরূপ যে, তাহারা যন্ত্রণা পাইতেই ভালবাসে। '...আমরা সকলেই সুখের পিছনে ছুটিতেছি সত্য; কিন্তু কেহ কেহ যে দুঃখের মধ্যেই আনন্দ পায়, ইহা কি বিশেষ অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না? ক্ষতি নাই; শুধু ভাবিবার বিষয় এই যে, সুখ এবং দুঃখ উভয়েই সংক্রামক।... আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখে জগতের কিছুই আসে যায় না; কেবল দেখিতে হইবে, যেন অপরে উহা সংক্রামিত না হয়। এইখানেই কর্মকৌশল!

'...যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত হইয়া থাক, তবে সর্বতোভাবে তাহা গ্রহণ কর; কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনিতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দ্বারা আমাদের এরূপ ভীত করিয়া তুলিও না যে, শেষে আমাদের মনে করিতে হয়, তোমার কাছে না আসিয়া আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা লইয়া থাকাই বরং ছিল ভাল। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে লয়, সে জগৎকে আশীর্বাদ করিতে করিতে আপন পথে চলিতে থাকে। তাহার মুখে একটিও নিন্দার কথা, সমালোচনার কথা থাকে না। অবশ্য তাহার কারণ ইহা নয় যে, জগতে পাপ নাই; প্রত্যুত তাহার কারণ এই যে, সে উহা নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে—স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। যিনি উদ্ধার করিবেন, তাঁহাকেই সানন্দে আপন পথে চলিতে হইবে; যাহারা উদ্ধার হইতে আসিবে, তাহাদের উহা করিবার বাধ্যবাধকতা নাই।

'আজ প্রাতে এই তত্ত্বটিই আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যদি ইহা আমার মনে স্থায়িভাবে আসিয়া থাকে এবং আমার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখে, তাহাই যথেষ্ট।

'দুঃখভার-জর্জরিত যে যেখানে আছ, সকলেই এস, তোমাদের সকল বোঝা আমার উপর ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিতে থাক, আর তোমরা

সুখী হও, ও ভুলিয়া যাও যে, আমি একজন কোন কালে ছিলাম। অনন্ত ভালবাসা জানিবে। ইতি—

'তোমার বাবা

'বিবেকানন্দ'

এই পত্র নিবেদিতাকে নূতন করিয়া অনুপ্রাণিত করিল। স্বামিজী কখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন, পারিপার্শ্বিক সহায়তা কতখানি পাইতেছেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ নিবেদিতা এবং ম্যাকলাউড রাখিতেন। নিবেদিতা সহজে তাঁহার ব্যর্থতা অথবা নৈরাশ্য স্বামিজীর গোচরে আনিতেন না। কিন্তু স্বামিজীও উদাসীন ছিলেন না। তিনি নিবেদিতাকে উৎসাহ দিতেন—তাঁহার সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিবেদিতা যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে বহু ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। পরের কল্যাণ করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে ; নিবেদিতাকেও তাহা করিতে হইবে। প্রাণপাত করিয়া যাহাদের জন্য কিছু করিবেন, বিনিময়ে তাহাদের অভিশাপ কুড়াইবেন—তাঁহার আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ ও বিদ্রূপ অনিবার্য। সুতরাং মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। স্বামিজীর চিঠি পড়িয়া নিবেদিতার মনে নূতন বল আসিল। কেন তিনি হতাশ হইবেন, দুঃখের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন? তিনি কি স্বেচ্ছায়, সানন্দে স্বামিজী-প্রদত্ত কার্যভার গ্রহণ করেন নাই? তবে অনু-যোগ কিসের? কিন্তু মন সকল সময় যুক্তি মানিতে চায় না। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবার তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিত। তবে যে দেশের কল্যাণকল্পে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই দেশ অথবা তাহার অধিবাসিগণের বিরুদ্ধে একদিনের জন্য তাঁহার মুখে নিন্দা বা বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যায় নাই। স্বামিজীর আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। হাসিমুখে তিনি তাহাদের ভার লইয়া পথ চলিয়াছেন। নিজের দুঃখ দ্বারা অপরকে কখনও পীড়িত করেন নাই।

শিকাগো হইতে রওনা হইয়া নিবেদিতা প্রথমে জ্যাকসন এবং পরে অ্যান আরবর গমন করেন। এই সময়ে স্বামিজীকে লিখিত নিম্নলিখিত পত্রে তাঁহার মানসিক অবস্থা কতকটা অনুমান করা যায়—

অ্যান আরবর
৩রা জানুয়ারী, ১৯০০

স্বামী বিবেকানন্দ সমীপেষু,

গতরাত্রে আপনার প্রেরিত আমার জন্মদিনের কবিতাটি[১] পেয়েছি। এ বিষয়ে আমি যাই বলি না কেন, সবই কেমন গতানুগতিক শোনাবে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, যদি আপনার সুন্দর ইচ্ছাটি ফলবতী হয় তবে আমার হৃদয় ভেঙে যাবে।

এখানে আমি রামপ্রসাদের সঙ্গে একমত—'চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' এমন কি, ভগবানকেও কোনভাবে জানতে চাই না, যে চিন্তা আমার পিতাকে পাওয়ার বহু ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবে না, তেমন কোন বিষয় চিন্তা করাও আমার পক্ষে হাস্যকর।

আমি জানি, গুরুকে চিন্তা করবার তত প্রয়োজন নেই—বিশেষ ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পর গুরু লীন হয়ে যান। কিন্তু গুরু সান্নিধ্যের আনন্দ মহত্তর এই আশ্বাস ব্যতীত তেমন মুহূর্তেও আমি পরমানন্দ অনুভবের কথা ভাবতে পারি না।

আমি যেন অসম্ভব কথা বলবার ও যা চিন্তার বিষয় হতে পারে না, এমন কোন চিন্তা করবার চেষ্টা করছি—তবে আপনি ভাল করেই জানেন, আমি কী বলতে বা কোন্ ভাব প্রকাশ করতে চাইছি।

আগে ভাবতাম, আমি ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য কাজ করতে চাই—আরও সব সুন্দর সুন্দর নৈর্ব্যক্তিক ধারণা পোষণ করতাম—এখন ঐ সব আদর্শের উচ্চ শিখর থেকে নিশ্চিতভাবে অবতরণ করেছি এবং বর্তমানে আমি যে সব কাজ করতে চাই সে কেবল পিতার অভিপ্রায় বলে।

এমন কি, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও যেন একটা প্রতিদান চাওয়া। আচার্যদেব, আমি চিরকাল শুধু সেবার জন্যই সেবা করতে ব্যাকুল—একটা তুচ্ছ দীনহীন জীবনের জন্য নয়।

আর একটি বিষয় আমি নিশ্চিতভাবে জানি এবং ঠিক সময়ে জানা প্রয়োজনও, তা হল অচিরেই আপনি সহস্র সহস্র সন্তান লাভ করবেন যারা

[১] নিবেদিতার উদ্দেশ্যে স্বামিজীর রচিত দুইটি কবিতা 'শান্তি' (পৃঃ ১৫৯) ও 'আশীর্বাণী' (পৃঃ ১৪৬)এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে। উভয়ের রচনাকাল সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ ও ১৯০০। নিবেদিতার এই পত্রে অপর একটি কবিতার উল্লেখ দেখা যায়।

আরো মহৎ, আরো যোগ্য এবং তারা আপনাকে আমার চেয়ে অনন্তগুণ বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে। ইতি—

আপনার কন্যা
মার্গট

অ্যান আরবর হইতে নিবেদিতা ডেট্রয়েটে পৌঁছিলেন। কোথাও সাহায্য মিলিয়াছে, কোথাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। জ্যাকসনে তাঁহার বক্তৃতার পর মহিলারা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন—কী সাহায্য তাঁহারা করিতে পারেন? নিবেদিতা বলিলেন, 'বিশেষ কিছু নয়, বছরে একটি করিয়া ডলার।' ঐ সামান্য প্রতিশ্রুতি পাওয়া যে কত কঠিন! সর্বত্রই তাঁহাকে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল। ভারত সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং নারীগণের হীন অবস্থা সম্বন্ধে ক্রমাগত প্রশ্ন ও সমালোচনা চলিত। নানারূপ অদ্ভুত ধারণা এবং কঠোর সমালোচনা নিবেদিতাকে কেবল ব্যথিত নহে, ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিত। প্রতিদিন তিনি উপলব্ধি করিতেন, এদেশে প্রচার করিতে আসিয়া স্বামিজীকে কত সহ্য করিতে হইয়াছে! নিদারুণ অভিজ্ঞতা।

ডেট্রয়েটে একদিন এক মহিলা-ক্লাবে ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ হইল। নিবেদিতার মনে হইল, যেন দীর্ঘ নিদ্রার পর সেদিন ক্লাবটি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে ভারত সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের উৎকট মনোভাবসূচক বিভিন্ন প্রশ্নে নিবেদিতা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার সেদিনকার বক্তৃতায় এমন কিছু ছিল, যাহা ঐ ক্লাবের সদস্যাগণের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। বক্তৃতার পর আরম্ভ হইল আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। একজন মহিলা তাঁহাকে মিশনরীদের দলে ফেলিবার চেষ্টা করিবামাত্র নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ উহা অস্বীকার করিলেন। অপর একজন বক্তৃতাটিকে উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, উহার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা পূর্বে মিশনরীগণের নিকট শোনা যায় নাই, এবং অমুক অমুক ব্যক্তি পূর্বে এই ধরনের কথা বলিয়াছেন। নিবেদিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, 'এ পর্যন্ত একজন লোকই এ সম্বন্ধে চিন্তা করবার প্রতিভা রাখেন।' ব্যাপার ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সভানেত্রী তাড়াতাড়ি অন্য প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। ভারতের বহুবিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে কথা উঠিল। নিবেদিতা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলেন যে, উহা পাশ্চাত্যদেশের বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম প্রণালীমাত্র।

উত্তরে তীক্ষ্ন বিদ্রূপধ্বনি শোনা গেল, 'ঠিক আমাদের দেশের মর্মন[১] আর কি! তারাও তো ঐ সব কথাই বলে।'

বহু কষ্টে উত্তেজনা চাপিয়া নিবেদিতা বলিলেন, 'আমার মনে হয়, মর্মনদের মত নয়; অন্ততঃ খ্রীষ্টানদের মত অত খারাপ নয়।' তখন কোলাহলের সহিত প্রতিবাদ উত্থিত হইল, 'মর্মনই বটে'। নিবেদিতার মনে হইল, নীরব থাকাই সঙ্গত।

তখন আর একজন মহিলা মন্তব্য করিলেন, 'ভারতবর্ষে স্বামী-স্ত্রীতে যে একসঙ্গে আহার করে না, অন্ততঃ এজন্য আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত।' নিবেদিতা ধৈর্যের সহিত উত্তর দিলেন, 'এ ব্যাপারটি দম্পতির উপর ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তারাই স্থির করুক, কোন্‌টি ভাল, কারণ এটা নিতান্ত তাদেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার; অপরের সঙ্গে এর কোন সংস্রব নেই।' প্রশ্নকর্ত্রী অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আপনার খুবই ভুল হচ্ছে। সবাই ঐ কথা বলে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ব্যক্তিগত নয়, সকলের।' নিবেদিতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বলিলেন, 'তা হতে পারে, তবে আমার সঙ্গে এর কোন সংস্রব নেই, এবং আমি এই ধরনের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাই না। আমি যদি কোন ইংরেজ-দম্পতির উদাহরণ দিই, আমেরিকান দম্পতি কি সেটা নেবেন?'

সামাজিক প্রথার উপর আরও নানা কটাক্ষের পর কুমীরকে শিশুসন্তান দেওয়ার উল্লেখ নিবেদিতার নিকট আর খাপছাড়া ঠেকিল না। অবশেষে কথার মোড় ফিরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে একজন ভারতে জাতিভেদের প্রসঙ্গ তুলিলেন। নিবেদিতার মনে হইল, এটা পাগলা গারদ নাকি? মহিলাগুলির মাথা সুস্থ আছে তো? অন্ততঃ ইহাদের মধ্যে আর কিছুক্ষণ অবস্থান তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিবে নিশ্চিত। জাতিভেদ সম্বন্ধে জানিবার কাহারও বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। সর্বত্রই অসন্তোষের গুঞ্জন। পত্নীদের হীন অবস্থা, কন্যা অপেক্ষা পুত্রের প্রাধান্য, নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বহু অভিযোগ। নিবেদিতার মনে হইল, যে কোন মুহূর্তে এই সকল বিষয় লইয়া তুমুল গোলযোগ আরম্ভ হইতে পারে।

কিন্তু এই সকল অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আর একটি ব্যাপারে নিবেদিতা অধিক মর্মপীড়া অনুভব করিতেছিলেন। কেহ যদি স্বামিজী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া আসিত, তিনি আনন্দে তদ্‌গতচিত্তে তাঁহার কথা বলিতেন।

[১] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক ধর্মসম্প্রদায়। ইঁহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথা রহিত হয়।

কিন্তু ইহার বিপরীত অবস্থাও ঘটিত। কোথাও বক্তৃতা করিতে গেলে স্বামিজীর সম্বন্ধে কোনরূপ অপ্রিয় মন্তব্য, বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আলোচনা, নিবেদিতাকে কেবল মর্মাহত নহে, ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিত। বক্তৃতা অথবা আলোচনা-কালে তিনি অজ্ঞাতসারে স্বামিজীর কথার প্রতিধ্বনি করিতেন, কারণ তিনি নিজেকে তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ কথা যখন তিনি প্রথম আবিষ্কার করিলেন, তখন নিজের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিলেন—যাহাতে তিনি নিজের কথাই বলিতে পারেন। কিন্তু পরে তাঁহার মনে হইল, কেন তিনি ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন! সন্তান কি পিতার বাণী প্রচার করিয়া আনন্দ অনুভব করিবে না?

মিস ম্যাকলাউডের সহিত নিবেদিতার আন্তরিক সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে 'য়ম্' (yum) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহাকে প্রত্যেক পত্রে নিজ মানসিক অবস্থার কথা সবিস্তারে লেখা তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। য়ম্ ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না, যিনি নিবেদিতার ভাল-মন্দ সকল ব্যাপারে একান্ত সহানুভূতির সহিত যোগদান করিতে পারেন। বুদ্ধিমতী ম্যাকলাউড বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নিবেদিতা স্বামিজীরই বাণী প্রচার করিতেছেন, এবং কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলে উহাকে স্বামিজীর কথারই প্রতিবাদ মনে করিয়া তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন। এইজন্য তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'তুমি নিজের ভাবে চল, এবং তোমার নিজের বক্তব্য বল।'

ম্যাকলাউড কি বুঝিয়াছিলেন, অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী নিবেদিতার পক্ষে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া স্বামিজীর পথ অনুসরণ করা সম্ভব নয়? এ কথা বোধ করি স্বামিজী আরও পূর্বে উপলব্ধি করিয়া নিবেদিতাকে স্বাধীনভাবে চলিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

কিন্তু আপাততঃ স্বামিজীর প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চিন্তাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা হইতে কাহারও কথায় নিবৃত্ত হওয়া তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সুতরাং ম্যাকলাউডের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা থাকিলেও তাঁহার উপদেশ মনে ধরিত না। তাঁহার নিজের বাণী, নিজের চিন্তা, নিজের মিশন—এইগুলি কি এতদিন তাঁহার দুঃখের কারণ হয় নাই? ইহাই স্বার্থপরতা। য়ম্ যাহা মনে করিতেছেন নিবেদিতার কথা, নিবেদিতা তাহাকেই স্বামিজীর কথা মনে করেন।

স্বামিজীর প্রতি প্রবল আনুগত্য ও শ্রদ্ধার জন্যও নিবেদিতাকে বহু আঘাত সহ্য করিতে হইত। ভারত-প্রসঙ্গ করিতে গেলে স্বভাবতঃই স্বামিজীর

প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত ; কারণ তখন পর্যন্ত তাঁহার ভারত সম্বন্ধে ধারণা ও অভিজ্ঞতার সবটাই স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা প্রভাবিত ও অতিরঞ্জিত। বহু সময়ে ইহা অপরের বিরক্তির উদ্রেক করিত। স্বামিজীকে সমর্থনের যুক্তিগুলি সর্বদা অপরের মনোমত হইত না। আবার স্বামিজীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার অতি আগ্রহপূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমতে অনেকে অধৈর্য হইয়া উঠিত। ফলে নিবেদিতার সহিত তাহাদের বিরোধ স্পষ্টভাবে দেখা দিত, এবং তাহাদের চিত্ত তাঁহার প্রতি বিমুখ হইত।

স্বামিজীর যাঁহারা নিকট বন্ধু, তাঁহাদের নিকট নিবেদিতার প্রত্যাশা ছিল অনেক। যখন সে প্রত্যাশা পূর্ণ হইত না, ক্ষোভে, অভিমানে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইত। প্রতিদিন তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কাহারও নিকট প্রত্যাশা করা চলিবে না। নিজেকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেন। স্বামিজীর অবস্থা কি আরও প্রতিকূল ছিল না? অথচ তিনি নিজেকে কত উচ্চে রাখিয়াছিলেন! জনমত তিনি গ্রাহ্য করেন নাই।

নিবেদিতা আশা করিয়াছিলেন, স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ সকলেই মিস ম্যাকলাউড অথবা মিসেস স্যারা বুলের মত উন্নত চরিত্রের। দুঃখের সহিত তিনি উপলব্ধি করিলেন, তাহা নয়। তিনি স্বামিজীর যে কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের সহানুভূতির অভাব। ইহাও তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহার পর চরম আঘাত আসিল মেরী হেলের নিকট হইতে। কয়েকজন মহিলাকে লইয়া নিবেদিতা একটি সাহায্য-সমিতি গঠনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ঐ সমিতির শিকাগো কেন্দ্রের সম্পাদিকা-রূপে কার্য করিবার জন্য মেরী হেলকে অনুরোধ করিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন ; উপরন্তু জানাইলেন যে, তাঁহাব পক্ষে অতঃপর নিবেদিতাকে সাহায্য করা সম্ভব নহে, এবং তাঁহাদের পরিবারের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব থাকিবে না। নিবেদিতার নিকট ইহা কল্পনাতীত। স্বামিজীর নিকটতম বন্ধুর যদি এই ব্যবহার, তবে কাহার নিকট তিনি আর সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারেন?

তাঁহার মনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ম্যাকলাউড এক দীর্ঘ পত্রে তাঁহাকে সান্ত্বনা এবং উপদেশ দেন। উহাতে নিবেদিতার সমস্যা এবং তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে ম্যাকলাউড যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যথার্থই মূল্যবান। 'জো জো' নামে স্বাক্ষরিত ঐ পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে—

'তোমার দীর্ঘ পত্রে জানিতে পারিলাম যে, মেরী হেল তোমার সেক্রেটারী-

রূপে কার্য করিতে অনিচ্ছুক, এবং তোমার কার্যেও তাহার সমর্থন নাই।... তুমি যে আঘাত পাইয়াছ তাহা ভয়ঙ্কর। তবে যখন উহা কাটিয়া গিয়াছে, এখন উহা তোমার সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করিবে এবং স্বামিজীর সাহায্য ছাড়াই তোমাকে সফলতা প্রদান করিবে।...

'...তুমি জান, এবং স্বামিজীও জানেন যে, আমার সর্বদাই মনে হইয়াছে, এই কার্যের জন্য তোমার নিজস্ব বাণী, নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে ; আর স্বামিজী যেখানে অপরিচিত, সেখানেই তোমার পক্ষে অধিক কার্য করিবার সম্ভাবনা। স্বামিজীকে যে চেনে এবং ভালবাসে তাহার পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে অপর কাহারও অভিমত গ্রহণ করা সম্ভব নয় ; এমন কি, তোমার অভিমতও নয়। সারদানন্দের নিকট শুনিয়াছি, রামকৃষ্ণের জীবৎকালে তাঁহারা স্বামিজীর কথা শুনিতেন না। সুতরাং তোমাকে নূতন লোকের মধ্যে কার্য করিতে হইবে ; নিজের শ্রোতা এবং অনুগামী তৈয়ারী করিতে হইবে। আমেরিকায় দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা খুব বেশী নয়। নারীজাতির সমস্যার ভার তোমার উপর, এবং ঐ বিষয়ে কার্য করিবার সময় স্বামিজীর অস্তিত্ব তোমাকে বিস্মৃত হইতে হইবে। বস্তুতঃ স্বামিজী তোমার এবং আমাদের অনেকেরই জীবনের উৎসস্বরূপ। আমরা তাঁহাকে যেভাবে জানিয়াছি, তাহা জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ এবং উহাই তোমার, স্যারার এবং আমার মধ্যে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছে—কিন্তু ঐখানেই উহার শেষ।

'হেল পরিবার স্বামিজীকে শ্রদ্ধা করে তাহাদের নিজস্ব ভাবে, আমাদের ভাবে নয়। তাহাদের যতদূর সাধ্য, তাঁহাকে সাহায্য করে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় জীবন তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগকে যে অনুভূতি দান করিয়াছে, তাহা ধারণা করিবার শক্তি তাহাদের এবং স্বামিজীর অন্য কোন বন্ধুরই নাই। সুতরাং তোমাকে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে যাইতে হইবে, যেখানে তাঁহাকে জানিবার সম্ভাবনা নাই।

'...লণ্ডনে যেমন, এখানেও তেমন—সাধারণ লোক কৌতূহলী। যখন জগতে তোমার নিজস্ব বার্তা ছিল, তখনই তুমি যথার্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ করিয়াছ। কালী সম্বন্ধে তোমার যাহা বক্তব্য, তাহা তোমার নিজস্ব ; উহার সহিত স্বামিজীর কোন সংস্রব নাই।

'তুমি যে লিখিয়াছ, সেজন্য আমি বিশেষ আনন্দিত। মিসেস হ-এর মত যাহারা স্বামিজীর প্রতি উদাসীন, তাহাদিগকে তুমি প্রভাবিত করিতে পার—ইহা অদ্ভুত নয় কি?...' (১৪.১.১৯০০)

পত্রখানি নিবেদিতাকে বহু পরিমাণে সান্ত্বনা দিয়াছিল। ম্যাকলাউডের

বিচক্ষণতা ও ব্যাবহারিক বুদ্ধি তাঁহাকে অনেকবার সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করিয়াছে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষভাগে নিবেদিতা পুনরায় শিকাগো প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভ্রমণকালে আমেরিকার কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ঐ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপদ্ধতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ মিঃ পার্কারের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। মিঃ পার্কারের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রে বিভিন্ন জাতির বালিকাকে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে যোগ্য শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবেন। নিবেদিতা একজন হিন্দু বালিকাকে ঐ কেন্দ্রে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিলে তিনি সহজেই সম্মতি দেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে নিবেদিতা সন্তোষিণী নামে একটি মেয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামী সারদানন্দ তখন পর্যন্ত মেয়েটির শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছিলেন। নিবেদিতার আশা ছিল, সন্তোষিণী ভবিষ্যতে একজন কর্মী হইবে। তাহাকে আমেরিকায় আনিয়া মিঃ পার্কারের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ কার্যে পরিণত হয় নাই। পরে স্বামী সারদানন্দের পত্রে তাহার বিবাহের সংবাদ পাইয়া তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলেন।

শিকাগোকে কেন্দ্র করিয়া নিবেদিতা বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদি দ্বারা ছোট ছোট হিতৈষী দল গঠনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে যে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে, স্বামিজী তাহা জানিতেন এবং সেজন্য উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেন। ২৪শে জানুয়ারীর (১৯০০) পত্রে লেখেন, 'আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলিয়াছে—একটা বিরাট বলি ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে ইহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহারা স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া দেয়, তাহারা অনেক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায়। আর যাহারা বাধা দেয়, তাহাদের দুর্ভোগ অধিক।

'তোমার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ আসিবেই, আসিতেই হইবে। আর যদি না আসে, তাহাতেই বা কী আসে যায়? মা জানেন, কোন্ পথ দিয়া কাহাকে লইয়া যাইবেন। তিনি যে পথ দিয়া লইয়া যান, সব পথই সমান।

'...ধৈর্য অবলম্বন কর। যাহারা কঠিন এবং যাহারা কোমল, সকলেই ঠিক পথে আসিবে। এই যে তোমার নানারূপ অভিজ্ঞতা হইতেছে, ইহাই আমি চাই। আমারও শিক্ষা হইতেছে। যে মুহূর্তে আমরা উপযুক্ত হইব, অর্থ এবং লোক আমাদের কাছে উড়িয়া আসিবে। এখন আমার স্নায়ুপ্রধান ধাত

ও তোমার ভাবুকতা মিলিয়া সব গোলমাল হইয়া যাইতে পারে। সেই কারণেই মা আমার স্নায়ুগুলিকে একটু একটু করিয়া আরোগ্য করিয়া দিতেছেন, আর তোমার ভাবুকতাকেও শান্ত করিয়া আনিতেছেন।'

ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যানসাস সিটি ও মিনিয়াপলিস হইয়া নিবেদিতা বস্টনের অন্তর্গত কেম্ব্রিজে মিসেস বুলের নিকট কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে নিবেদিতা কয়েকজন বন্ধু লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই হিতৈষীদলকে লইয়া তিনি একটি 'রামকৃষ্ণ সাহায্য-মণ্ডলী' গঠন করিলেন, এবং 'রামকৃষ্ণ বালিকা-বিদ্যালয় পরিকল্পনা' নাম দিয়া ভারতবর্ষে তাঁহার কার্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা পুস্তিকাকারে ছাপা হইল। উপরি-উক্ত মণ্ডলীর মিসেস এইচ. লেগেট সাধারণ অধ্যক্ষা ও মিসেস ওলি বুল সম্পাদিকা হইলেন। শিকাগো, নিউইয়র্ক, বস্টন, কেম্ব্রিজ ও ডেট্রয়েট কেন্দ্রের উপাধ্যক্ষা পদে যথাক্রমে হেনরী ডি. লয়েড, মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড, মিস এমা থার্সবি, এডুইন ডি. মীড, মিস অক্টেভিয়া উইলিয়াম বেট্‌স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতি কেন্দ্রের জন্য একজন করিয়া সম্পাদিকা নিযুক্ত হইলেন। কৃস্টীন গ্রীন-স্টাইডেল হইলেন ডেট্রয়েট কেন্দ্রের সম্পাদিকা।

স্থির হইল, সংগৃহীত অর্থ নিউইয়র্কের এক প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে, এবং যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের নাম মিস নোব্‌লের নিকট পাঠাইলে তিনি রসিদ এবং কার্য-বিবরণী পাঠাইবেন। স্থানীয় সম্পাদিকার কার্য হইবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া এবং সাহায্যকারীর নাম ও ঠিকানা রামকৃষ্ণ স্কুল, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যালয় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, মিস নোব্‌লের নিকট নিউইয়র্কে মিঃ ফ্রান্সিস এইচ. লেগেটের ঠিকানায় প্রেরণ করা।

পরিকল্পনাটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিতে মিঃ লেগেট বিশেষ সাহায্য করেন, এবং মিসেস লেগেট প্রারম্ভেই এক হাজার ডলার দান করিয়া নিবেদিতাকে বিশেষ আশ্বস্ত করেন।

ঐ পরিকল্পনায় ভারতের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে ভারতীয় নারীগণের জীবনযাত্রার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষার পদ্ধতি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে নিবেদিতা তাঁহার অভিমত অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে শুধু পরিকল্পনাটি উদ্ধৃত করা হইল :

'যদি অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে আমরা সফল হই, তাহা হইলে আমাদের ইচ্ছা,

কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে একটি বাড়ি ও একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া কুড়িজন বিধবা ও কুড়িজন অনাথ বালিকা লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া। সম্প্রতি অধ্যাপক ম্যাকস্‌মূলার তাঁহার 'রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশাবলী' নামক পুস্তকে যাঁহাকে বিশ্বের নিকট স্থাপিত করিয়াছেন, সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি সেই সারদাদেবীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে।

অধিকন্তু উহার সহিত বিদ্যালয়োপযোগী আর একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে, যেখানে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প-শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি হইবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের ভিত্তি ; ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহার সহিত প্রাথমিক গণিত ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকিবে। শেষোক্ত বিষয়ের বর্তমান সার্থকতা ইহাই হইবে যে, প্রত্যেক ছাত্রী গৃহে অবস্থান করিয়াই এমন একটি পন্থায় জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে, যাহা সর্বতোভাবে মর্যাদাকর।

কিন্তু বিদ্যালয়ের আরও একটি কার্য থাকিবে। ১৮ হইতে ২০ বৎসর বয়সের বিধবাগণ কেবল যে প্রকৃত হিন্দু পরিবেশ এবং আদর্শ পারিবারিক জীবন দেখাইতে পারেন, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদের সাহায্যে আমরা দুই তিনটি শিল্পব্যবসায় সংগঠন করারও আশা রাখি। উহার দ্বারা ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

ধরা যাক, আমাদের প্রচেষ্টা সকল দিক দিয়া সার্থক হইয়াছে ; সর্বোপরি, কোন প্রকারেই জাতীয়তার পরিপন্থী নহে বলিয়া হিন্দুসমাজ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। তাহা হইলে সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতেই আমরা প্রত্যেক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিব, সে বিবাহিত জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক, অথবা জাতীয় কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়। যাহারা প্রথমটি মনোনয়ন করিবে, তাহাদের জন্য সম্পূর্ণ সম্মানজনক ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। আর যাহারা স্বদেশ এবং নারীজাতির উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে চায়, তাহাদের দ্বারা বিস্তারিত শিক্ষালাভের পর বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাগণের কর্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণে অন্যান্য স্থানে নূতন নূতন রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারিবে।

পরিশেষে নিবেদন, আমার বিশ্বাস, আমি কাহারও উদ্যম অথবা প্রতিভাকে নিকটবর্তী কর্তব্য ছাড়িয়া দূরবর্তী কর্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাহিতেছি না। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও আর্থিক পরিস্থিতির দিনে

আমরা নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে, বিশ্বসেবাই প্রকৃত স্বদেশসেবা। মনে হইতেছে, আমরা ইতিপূর্বেই ওয়াল্ট হুইটম্যানের "সকল জাতি কি সম্মিলিত হইতেছে? সমগ্র বিশ্বের একাত্মবোধ কি জাগ্রত হইতেছে?"—এই মহৎ প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছি।'

পরিকল্পনাটি পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, স্বামিজীর সহিত বিস্তৃত আলোচনার পর এবং তাঁহার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উহা রচিত। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে নারীজাতির শিক্ষার জন্য স্বামিজী গভীর চিন্তা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিবেদিতার সহায়তায় তিনি কার্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জাগতিক সকল ব্যাপারেই সময়ের অপেক্ষা থাকে। মহাপুরুষগণ ভাবী কালের উপযোগী চিন্তার বীজ বপন করিয়া যান; যথাসময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া পত্র পুষ্পে শোভিত হয়।

অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় বক্তৃতাকালে সর্বত্র নিবেদিতাকে কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইত—ভারতবর্ষে তাঁহার বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? কোন্ শ্রেণীর নারীগণকে শিক্ষা দেওয়া হইবে? তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় কী কী? তিনি কি তাঁহার দেশ, জাতি এবং ধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন? ইত্যাদি। সেইজন্য পূর্বোক্ত পুস্তিকায় ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ছিল। ২রা এপ্রিল পুস্তিকা ছাপা হইয়া আসিল। সুতরাং অনুমান করা যায়, নিবেদিতা ইতিমধ্যে আমেরিকায় অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন। 'Kali the Mother' ছাপাইবার আয়োজনও চলিতে লাগিল।

আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিবেদিতা কৃষ্ণ, গোপাল, ধ্রুব প্রভৃতি চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন নাই বলিয়া কাজটি তাঁহার কঠিন মনে হইল। স্বামিজীও ঐ সময়ে স্ব-লিখিত কয়েকটি কাহিনী নিবেদিতাকে ইচ্ছামত পরিবর্তনাদি করিয়া ছাপাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে এক পত্রে তিনি পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা, কৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনাও করিয়াছিলেন। জনৈক পুস্তক-প্রকাশক মিঃ ওয়াটারম্যান নিবেদিতাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, পুস্তকখানি উপযুক্ত হইলে 'পাব্লিক' বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু নিবেদিতার রচনা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নিবেদিতা শিকাগো পরিত্যাগ করিয়া

জ্যামাইকা শহরে গমন করেন। এখানে মহিলাগণের অনুরোধে 'ফ্রি রিলিজাস অ্যাসোসিয়েশনে' 'প্রাচ্যের নিকট আমাদের ঋণ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় তিনি অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন যে, একমাত্র ভারতই বিশ্ব-বাসীকে যথার্থ সত্যের সন্ধান দিতে পারে।

অর্থসংগ্রহ-ব্যাপারে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রাংশ হইতে বুঝা যায়, তাঁহার দুর্ভোগের তখনো অন্ত হয় নাই।

'জনৈক নেতা বলিযাছেন, "যে কোন নূতন সত্য সাধারণের দ্বারা গৃহীত হইবার পূর্বে তাহাকে উপহাস, যুক্তিতর্ক এবং বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয় ; যখন এই তিনটি বিষয় সমুপস্থিত, তখন জানিবে, জয় অতি নিকটে।" হায়! তোমরা তিনজনেই একসঙ্গে এস, এবং সঙ্গে আন যতদূর সম্ভব কঠোরতা। কঠোরতার পরিমাণ যতই হউক না কেন, আমি ভ্রূক্ষেপ করি না, যদি কেবল তোমাদের উপস্থিতি চিরস্থায়ী না হয়।'

যখনই তিনি বিশেষ কাতর হইতেন, স্বামিজীর নিকট হইতে আশ্বাস আসিত। ২৬শে মের পত্রে স্বামিজী লিখিলেন, 'আমার অনন্ত আশীর্বাদ জানিও এবং কিছুমাত্র নিরাশ হইও না।...ক্ষত্রিয়শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিকবাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়।...দৃঢ় হও, মা! কাঞ্চন কিংবা অন্য কিছুর দাস হইও না। তাহা হইলেই সিদ্ধি আমাদের সুনিশ্চিত।'

স্বামিজীর এই সকল পত্রই নিবেদিতাকে সর্বপ্রকার বাধা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আদর্শের জন্য বীরাঙ্গনার মত যুদ্ধ করিবার প্রেরণা দান করিত।

আমেরিকার কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় জুন মাসের প্রথমেই নিবেদিতা নিউইয়র্ক চলিয়া আসিলেন। স্বামিজীও ক্যালিফর্নিয়া হইতে শিকাগো হইয়া নিউইয়র্ক আগমন করিলেন। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বামিজীর বক্তৃতা এবং ক্লাস আরম্ভ হইতেছে। বহুদিন পর নিবেদিতা স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিবেন। লণ্ডনে যেমন তিনি দ্বিতীয় সারির বাঁ দিকে শেষের আসনটিতে বসিতেন, ঠিক সেইভাবে বসিয়া সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কখন স্বামিজীর বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। যথাসময়ে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বিষয়—বেদান্ত দর্শন ; মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য কি?

দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও ব্যর্থতায় নিবেদিতার হৃদয়-মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রত-সাধনের জন্য জীবনযাত্রার পথে যে আবেগের প্রয়োজন,

তাহার অভাব প্রাণে শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে তাঁহার অন্তর আবার নূতন উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নিউইয়র্কে নিবেদিতা দিন কয়েক স্বামিজীর সহিত অবস্থানের সুযোগ পাইলেন। স্বামিজীর সকল বক্তৃতাতেই তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং নোট রাখিয়াছিলেন। মিস ম্যাকলাউডকে প্রত্যেকটি বক্তৃতার বিবরণী পাঠাইতেন। তাঁহার নিজেরও কয়েকটি বক্তৃতা দিবার সুযোগ হইল।

১৭ই জুন, শনিবার, সকালে স্বামিজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—'ধর্ম কি'? ঐ দিন সন্ধ্যায় নিবেদিতা বক্তৃতা দেন। বিষয়—'হিন্দু নারীর আদর্শ'। হিন্দু নারীর সরল জীবনযাত্রা এবং চিন্তার পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার প্রাঞ্জল বক্তৃতা বিশেষ করিয়া ছাত্রীগণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু ভগিনীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং চিন্তাধারা সম্বন্ধে আগ্রহ পোষণ করিতেন, তাঁহাদের নানা প্রশ্নের তিনি আনন্দের সহিত উত্তর দেন।

২৩শে জুন স্বামিজী 'গীতা' সম্বন্ধে ক্লাস করেন। পরদিন তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শক্তিপূজা' (Mother Worship)। ঐ দিন সন্ধ্যায় নিবেদিতা পুনরায় 'ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ইতিপূর্বেই নিউইয়র্কে স্থায়ী বেদান্ত-সমিতি গঠিত হওয়ায় এবং স্বামিজীর বহু অনুরাগী বন্ধু-বান্ধব তথায় অবস্থান করায় নিবেদিতার কার্যের প্রচার আমেরিকার অন্যান্য স্থানগুলি অপেক্ষা এখানে অধিক সফল হইয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দও তাঁহার বক্তৃতায় নিবেদিতা এবং তাঁহার ভারতবর্ষের কার্য সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করেন। তাঁহার ন্যায় একজন প্রখর-বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বশালিনী নারী ভারতের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এই ভাবটি অনেককেই চমৎকৃত করিয়াছিল। অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও কথাবার্তা বলিতে আসিতেন, এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন যে, উহা প্রকৃতই শিক্ষাপ্রদ। ২৮শে জুন নিবেদিতা প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে নিউইয়র্কবাসিগণ সত্যই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, তিনি আরও কয়েকদিন নিউইয়র্কে থাকিয়া যান।

স্বামিজীর সহিত অবস্থানকালে একদিন কাহাকেও পত্র লেখার বিষয়ে নিবেদিতা তাঁহাকে অযাচিতভাবে কিছু উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মনে রেখ, আমি মুক্ত, সর্বদা মুক্ত'। পরক্ষণেই তিনি যেন দিব্যভাবে জগজ্জননীর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, 'আমার ইচ্ছা করে, কর্ম ও পৃথিবী যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, আর

আমি যেন হিমালয়ের নিভৃত, শান্ত কোলে বসে ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতে পারি। মতলব! কেবল মতলব ভাঁজা। এই জন্যেই পাশ্চাত্যের লোক তোমরা কোন কালে ধর্মপ্রচার করতে পারনি। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো ধর্মপ্রচার করে থাকে, তো সে জন কয়েক ক্যাথলিক সাধু, যাঁরা মতলব করে কাজ করতে জানতেন না। যারা মতলব এঁটে কাজ করে, তাদের দ্বারা কোন কালে ধর্মপ্রচার হয়নি, হতে পারে না।'

নিবেদিতা অবনত মস্তকে তিরস্কার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, সত্যই স্বামিজীকে কোন বিষয়ে পরামর্শ দিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয়!

কিন্তু যাইবার পূর্বে স্বামিজী সমস্ত রূঢ়তা বিস্মৃত হইয়া নিবেদিতাকে সস্নেহ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'মনে রেখো, তুমি মায়ের সন্তান।'

য়ুরোপে

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ঐ উপলক্ষ্যে একটি ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলন হইবার কথা ছিল। সম্মেলনে বৈদেশিক প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতি স্বামিজীকেও আহ্বান জানাইয়াছিলেন। স্বামিজীও যোগদানের সম্মতি দিয়াছিলেন।

মিঃ ও মিসেস লেগেট এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্যারিস গমন করেন, এবং যাত্রার পূর্বে স্বামিজীকে প্যারিসে তাঁহাদেরই অতিথি হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডও প্রদর্শনীর আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহারাও প্যারিস যাত্রা করিলেন। পূর্বেই সংবাদ আসিয়াছিল, প্যারিসে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুও আসিতেছেন। নানা দিক দিয়া প্যারিস নিবেদিতাকেও টানিতেছিল। কিন্তু স্বামিজীর অবস্থানকালে নিউইয়র্ক পরিত্যাগে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। তথাপি অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজের আহ্বানে তাঁহাকে পূর্বেই চলিয়া যাইতে হইল। ইতিপূর্বে মার্চ মাসে নিউইয়র্কে অধ্যাপক গেডিজের সহিত নিবেদিতার পরিচয় হয়। প্যারিস প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সে বৎসর আন্তর্জাতিক সংসদের (International Association) বৈঠক বহুদিক হইতে স্মরণীয় ঘটনা ছিল। এই সংসদের বহু বিভাগের কার্য-পরিচালনার ভার ছিল অধ্যাপক গেডিজের উপর। রতনেই রতন চেনে। নিবেদিতার কর্মশক্তি এবং প্রতিভা সামান্য পরিচয়েই গেডিজের নিকট প্রকাশ পাইয়াছিল। নিবেদিতা যে তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতে সক্ষম, সে বিষয়ে অধ্যাপকের সন্দেহ ছিল না। তাঁহার আহ্বানে ২৮শে জুন নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করিয়া কনকর্ড হইয়া নিবেদিতা প্যারিস যাত্রা করিলেন।

নিউইয়র্কে আরও কিছুদিন অবস্থানের পর আগস্টের প্রথমে স্বামিজীও প্যারিস গমন করেন।

প্যারিসে নিবেদিতার কাজ হইল অধ্যাপক গেডিজকে সাহায্য করা। এই কার্যে পারিশ্রমিকের আশা ছিল, কিন্তু নিবেদিতার নিকট তাহা অপেক্ষা বড় কথা—গেডিজের বিস্ময়কর কর্মকুশলতা। সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত তাঁহার 'রূপান্তরবাদ' থিওরীর দ্বারা নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ

একজন অসাধারণ কর্মীর নিকট কর্মকৌশল আয়ত্ত করিবার আগ্রহবোধ নিবেদিতার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যে নামিয়া দেখা গেল, বাধা অনেক। প্রথমতঃ নিবেদিতার প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ অপরের নির্দেশে কার্য করিবার একান্ত অন্তরায়। তাঁহার কাজ ছিল সাধারণতঃ তালিকা-নির্মাণ, সূচীপত্র প্রণয়ন, বক্তৃতার রিপোর্ট লওয়া ও রিপোর্ট তৈরী করা ইত্যাদি। তিন মাসের মধ্যে একটি গ্রন্থাগার গড়িয়া তোলাও অন্যতম কাজ ছিল। গেডিজ চাহিতেন, নিবেদিতা তাঁহার চিন্তাকে তাঁহারই ঢঙে ভাষায় প্রকাশ করেন। আর তিনিই তাঁহাকে কার্যে নিযুক্ত করিলেও সর্বদা বিন্দুমাত্র অধিকার প্রদর্শনের পরিবর্তে অনুনয় করিয়া বলিতেন, 'আপনি নিশ্চয়ই পারবেন।' কিন্তু নিবেদিতার পক্ষে তাঁহার অনুনয় রক্ষা করার সম্ভাবনা ছিল না। কেবলমাত্র রিপোর্টারের কাজ তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁহার মন সৃষ্টিধর্মী। কাহারও ভাবকে তাঁহারই মনের মত করিয়া প্রকাশ করা নিবেদিতার পক্ষে অসম্ভব। দুঃখ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমি রিপোর্টার হইতে পারি না। আমার ইচ্ছা নাই তাহা নয়—রিপোর্টারের কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চেষ্টা করিয়া অধ্যাপকের উজ্জ্বল ভাষণের টুকরাগুলি ব্যাকরণের সিমেণ্ট দিয়া জুড়িয়া যাহা গড়িয়া তুলিতেন, তাহাকে বলা চলে 'মোজেয়িক', অর্থাৎ ঝকঝকে কিন্তু পঙ্গু। নিবেদিতাকে একটা ধারণা দিয়া পুরাপুরি স্বাধীনতা দিলে গেডিজ অনেক বেশী কাজ পাইতেন ; কিন্তু নিবেদিতা জানিতেন, তাহা সম্পূর্ণ তাঁহারই কথা এবং চিন্তা হইত, অধ্যাপকের চিন্তার প্রতিধ্বনি হইত না। দুজনের চরিত্রগত পার্থক্য ক্রমে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করিতে লাগিল। আমেরিকায় মিঃ ওয়াটারম্যানের নির্দেশমত ভারতীয় গল্পগুলি লিখিতে গিয়া নিবেদিতার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। অপরের মনের মত করিয়া লিখিতে গিয়া তাঁহার নিজের আনন্দ নষ্ট হইয়াছিল, আবার যাঁহার নির্দেশে এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারও মনঃপূত হয় নাই। এখানেও সেই ব্যাপারেরই পুনরভিনয়। স্বামিজীর কথা নিবেদিতা বলিতেন নিজের মত করিয়া, আর তাঁহার সেই ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বামিজী কখনো খর্ব করেন নাই। অপরকে স্বাধীনতা দিবার ঔদার্য স্বামিজীর কতদূর ছিল, অধ্যাপক গেডিজের সহিত কাজ করিতে গিয়া নিবেদিতা আর একবার উপলব্ধি করিলেন।

তথাপি উভয়েই পরস্পরের নিকট উপকৃত হইয়াছেন এবং তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। গেডিজের সহিত আলোচনার মধ্য দিয়া নিবেদিতা য়ুরোপকে বহু পরিমাণে জানিয়াছিলেন, এবং এই জানা ভারতকে জানিবার

পক্ষেও তাঁহার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। গেডিজের সহিত কথাবার্তাতেই তাঁহার চিন্তাধারা স্বচ্ছতা ও পরিণতি লাভ করে। অধ্যাপকের নিকট হইতে লব্ধ রচনাশৈলী তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহার 'The Web of Indian Life' পুস্তকে। বহু পরে গেডিজের 'Sociological Method in History' নামক পুস্তকের সুচিন্তিত সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি অকপটে বলিয়া-ছিলেন, গেডিজ এক নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তক।

পক্ষান্তরে, নিবেদিতার ক্ষিপ্রতা ও কর্মকুশলতা গেডিজের কার্য-পরি-চালনার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। নিবেদিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়া গেডিজ বলিয়াছেন, 'এই ক্রম-বিকাশের প্রণালীগুলি আয়ত্ত করিতে এবং তিনি স্বয়ং যে বিষয়ে অনুশীলন করিতেছিলেন—সেই ভারতীয় সমস্যায় উহাদের প্রয়োগ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের গৃহে ছাদের উপর চিলকোঠায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার উদার ও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি অনুরাগ ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সহিত ঐ পরিবেশ সহজেই খাপ খাইয়াছিল। এইখানে তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন।'

মতান্তর ঘটিলেও গেডিজের 'রূপান্তরবাদ' আয়ত্ত করিবার আগ্রহে নিবেদিতা কাজ ছাড়িলেন না।

আগস্ট মাসে সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু আসিয়া পৌঁছিলেন। অধ্যাপক গেডিজের সহিত আলাপ-আলোচনা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। প্যারিস বিজ্ঞান-কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিচয়-প্রদানে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। 'প্রতি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত' —এ আবিষ্কার অভিনব, বিস্ময়কর। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নীর প্রশংসায় স্বামিজী কখনও ক্লান্ত হইতেন না, কারণ তাঁহার মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এই বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব প্রতিভা।

প্যারিসে স্বামিজী প্রথমে লেগেটদের বন্ধু জেরাল্ড নোবেলের বাড়ি কয়েকদিন কাটাইয়া পরে লেগেট দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও দার্শনিক মসিয়ে জুল বোয়ার সহিত অবস্থান করেন। প্রভূত অর্থব্যয়ে লেগেট দম্পতির প্রাসাদোপম বাসভবন নিত্য গুণিগণের সমাবেশে মুখরিত থাকিত। বিদ্বৎসমাজের সহিত পরিচয় ও আলোচনায় স্বামিজী আনন্দিত হইতেন।

ঐ গৃহে স্বামিজীর সহিত নিবেদিতার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। বিদ্বৎসমাজের সংস্রব তাঁহারও আনন্দের বিষয় ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বামিজীর যে মানসিক

পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা নিবেদিতার মনে নূতন অশান্তির সৃষ্টি করে। স্বামিজী ধীরে ধীরে কার্য হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া লইতেছিলেন। ম্যাকলাউডকে লিখিত নিম্নোক্ত পত্রে তাঁহার তদানীন্তন মানসিক অবস্থা সুপরিস্ফুট—

'কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের জন্য আমার কাজ করা ঘুচিয়া যায় ; আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিশিয়া যায়। তাঁহার কার্য তিনিই জানেন। লড়াইয়ে হারজিত দুইই হইয়াছে—এখন তল্পিতল্পা গুটাইয়া সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করিয়া বসিয়া আছি। "অব শিব পার করো মেরী নেইয়া"— হে শিব, আমার তরী পারে লইয়া চল (১৮।৪।০০)।'

তাঁহার দেহমন শ্রান্ত, বিশ্রামের প্রয়োজন। অন্তরে মুক্তির আনন্দ। কর্ম আপনিই খসিয়া পড়িতেছে। প্যারিস ধর্ম ইতিহাস-সম্মেলনে স্বামিজী বক্তৃতা দিয়াছিলেন ; উহাতে তিনি ভারতবর্ষের ধর্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভ্রান্তধারণাসমূহ প্রবল যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন। বিদ্বৎসমাজে পূর্ববৎ চলাফেরা করিয়া তিনি সকল বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং নবোদ্যমে ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্রগুলি প্রমাণ করে, তিনি এ সকল হইতে মনে মনে বিদায় লইয়াছেন। ভারত প্রত্যাবর্তনের ব্যগ্রতা তাঁহার ক্রমশঃই বাড়িতেছিল, এবং তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রদর্শনী শেষ হইলে য়ুরোপ ভ্রমণান্তে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন।

স্বামিজীর এই উদাসীনতা নিবেদিতার নিকট অপ্রত্যাশিত। তাঁহার কার্যক্রম সম্বন্ধে স্বামিজীর অনুৎসাহ বেদনাকর। স্বামিজীকেই পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতে চাহিয়াছিলেন। সেখানে প্রতিপদে তাঁহার সাহায্য বা সহযোগিতার আশা নিবেদিতা তখনো ত্যাগ করেন নাই। নৈর্ব্যক্তিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজ নহে। তাই একবার তিনি ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, 'তোমরা কাহাকে নৈর্ব্যক্তিক বল, আমি বুঝিতে পারি না। বস্তুতঃ আমার মনে হয় "নৈর্ব্যক্তিক" ও "ব্যক্তিমূলক" কথা দুইটি আপেক্ষিক। যখন কেহ নৈর্ব্যক্তিকের কথা বলে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে যাহা তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যক্তিগত তাহাই বলিয়া যায়।' সুতরাং স্বামিজীর ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা অন্তরের সহিত স্বীকার করিয়া লওয়া নিবেদিতার পক্ষে কঠিন। ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল, যাঁহার অভিপ্রায়কে সফল করিবার জন্য তিনি প্রাণপাত করিতেছেন, তাঁহার নিকট সকল সময় সহানুভূতির আশা করাও কি সঙ্গত নয়?

দ্বিতীয়তঃ, বসুদম্পতির সহিত নিবেদিতার বন্ধুত্ব ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠ হইতেছিল। বীরত্ব এবং প্রতিভার প্রতি সহজাত আকর্ষণ তাঁহাকে অধ্যাপক বসুর প্রতিও আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতে অবস্থানকালেই তদানীন্তন ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত অবাধ মেলামেশা তাঁহার হিন্দুভাবধারা গ্রহণের এবং যথার্থরূপে ভারতকে দেখিবার অন্তরায় হইবে মনে করিয়াই স্বামিজী তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার প্রবল আগ্রহকে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার দ্বারা দমন করাও তাঁহার যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল সত্যকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া—কে, কিভাবে এবং কতখানি গ্রহণ করিবে, তাহা শিক্ষার্থীর উপর ছাড়িয়া দেওয়াই তাঁহার মতে সমীচীন।

বৈদেশিক শাসন ডক্টর বসুর বিজ্ঞান-গবেষণায় সর্বাঙ্গীণ সহায়তা করা দূরে থাকুক, উহার প্রবল অন্তরায়, ইহা উপলব্ধির পর ডক্টর বসুকে বিজ্ঞান-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা তাঁহার অন্যতম কর্তব্য বলিয়া নিবেদিতা মনে করিতেন। আর এই কর্তব্য তিনি আজীবন পালন করিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত অধিক মেলামেশা স্বামিজীর অনভিপ্রেত; সুতরাং তাঁহার ঔদাসীন্য সম্ভবতঃ ইহারই ফল বলিয়া নিবেদিতার মনে হইল। এদিকে অধ্যাপক গেডিজের সহিত মতান্তর ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। অতঃপর তিনি কি করিবেন? নিবেদিতার মনে হইল, স্বামিজীকে তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয় জানানো উচিত। স্বামিজীর সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হইলেও যে কারণেই হউক নিবেদিতা ঐ বিষয় খুলিয়া বলিতে না পারিয়া এক পত্র লেখেন। ঐ পত্রে তাঁহার মানসিক দ্বন্দ্বের আভাস ছিল, অনুযোগ ছিল, আবার আদেশ প্রার্থনাও ছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি চাহিতেন, স্বামিজী সর্বতোভাবে তাঁহাকে পরিচালনা করুন, আদেশ দিন, সহানুভূতি দেখান, এবং এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহার অন্তর মধ্যে মধ্যে ক্ষোভে, দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

পত্রের উত্তর আসিল। স্বামিজী লিখিয়াছেন—

প্রিয় নিবেদিতা,

'এইমাত্র তোমার পত্র পাইলাম। আমার প্রতি সহৃদয় বাক্যের জন্য বহু ধন্যবাদ।...এখন আমি স্বাধীন, যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যে আমার কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ আমি রাখি নাই। উহার সভাপতির পদও আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।

'এখন মঠ প্রভৃতি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ অধ্যক্ষ হইয়াছেন, পরে উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর

পড়িবে। সমস্ত বোঝা মাথা হইতে নামিয়া যাওয়ায় আনন্দ বোধ করিতেছি। এখন আমি সত্যই সুখী।

'আর আমি কাহারও প্রতিনিধি নহি বা কাহারও নিকট দায়ী নহি। এতদিন বন্ধুবর্গের নিকট আমার যে বাধ্যবাধকতা-বোধ ছিল, উহা যেন এক দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্থতা। এখন বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কাহারও নিকট আমার কোন ঋণ নাই। প্রত্যুতঃ প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া আমার সমুদয় শক্তি সকলকে দান করিয়াছি ; এবং প্রতিদানস্বরূপ পাইয়াছি আস্ফালন, অনিষ্ট-চেষ্টা, বিরক্তি ও জ্বালাতন। এখানে অথবা ভারতে সকলের সহিত আমার সম্পর্ক শেষ হইয়া গিয়াছে।

'তোমার পত্র পড়িয়া মনে হইল, তোমার ধারণা—তোমার নূতন বন্ধুদের প্রতি আমি ঈর্ষান্বিত। কিন্তু চিরদিনের মত জানিয়া রাখ, অন্য যে কোন দোষ আমার থাকুক, কিন্তু জন্ম হইতেই আমার ভিতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্তৃত্বের ভাব নাই।

'পূর্বেও আমি কখনো তোমাকে আদেশ করি নাই ; এখন কোন কার্যের সহিত যখন আমার সম্পর্ক নাই, তখন তোমাকে নির্দেশ দিবারও কিছুই নাই। আমি কেবল এই পর্যন্ত জানি যে, যতদিন তুমি সর্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা করিবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে পরিচালনা করিবেন।

'তুমি যাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছ, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে আমার কখনও ঈর্ষা হয় নাই। কোন বিষয়ে নিজেদের জড়িত করার জন্য আমার গুরুভ্রাতৃগণকে আমি কখনো সমালোচনা করি নাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাশ্চাত্য জাতিদের এই এক অদ্ভুত স্বভাব যে, তাহারা নিজেরা যাহা ভাল মনে করে, অপরের উপর তাহা বলপূর্বক চাপাইবার চেষ্টা করে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের নিজের পক্ষে যাহা ভাল, তাহা অপরের পক্ষে ভাল নাও হইতে পারে। আমার ভয় ছিল, নূতন বন্ধুগণের সংস্পর্শে আসার ফলে তোমার মন যে দিকে ঝুঁকিবে, তুমি অপরের ভিতর জোর করিয়া সেই ভাব দিবার চেষ্টা করিবে। কেবল এই কারণেই আমি কখনো কখনো তোমাকে বিশেষ বিশেষ প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম মাত্র, অন্য কোন কারণ নাই। তুমি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামত চল, নিজের কর্ম বাছিয়া লও...মিত্রই হউক আর শত্রুই হউক, সকলেই মায়ের হাতের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া সুখদুঃখের ভিতর দিয়া আমাদের কর্মক্ষয় করিবার সাহায্য করে। সুতরাং মা সকলকে আশীর্বাদ করুন।

'আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে (২৫।৮।০০)।'

এ পত্রে নিবেদিতার অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন লাঘব হইল না, বরং বাড়িয়া গেল। স্বামিজীকে কোন অপ্রিয় বাক্য বলিতে তিনি চাহেন নাই। তাঁহার নিজের জীবন তো স্বামিজীর নিকট সমর্পিত! কেন তিনি আদেশ করিলেন না? যে সকল কথা কল্পনা করিয়া নিবেদিতা দুঃখ পাইতেছিলেন, লিখিতে বসিয়া যেন তাঁহার অগোচরেই কোন্ ফাঁক দিয়া সেই সব বাহির হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল এ তাঁহার নিজের অহংকারের অভিব্যক্তি। সাধনার এখনো অনেক বাকী। অহংকারই তাঁহার সর্বকার্যে সফলতার প্রতিবন্ধক। আর অতীতে যেমন ইহাই গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়াছিল, তেমনি এবারও ইহা তাঁহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা যেন তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। স্বামিজী কি বারবার বলেন নাই, কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তের বিশুদ্ধি-সম্পাদন? যে কর্ম তিনি মায়ের কর্ম, স্বামিজীর কর্ম, বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সাধনের দায় তাঁহার নিজের। সেখানে অন্তর্দাহ ঘটিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। স্বামিজীর পর পত্রের (২৮।৮।০০) সুরও প্রায় অনুরূপ।

নিবেদিতার অন্তরের দ্বন্দ্ব, কাতরতা ও দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর অবসন্নতা মিসেস বুলের অগোচর ছিল না। নিবেদিতাকে তিনি ভালবাসিতেন। স্বামিজী এক সময় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'মার্গারেটের সাফল্যের সংবাদে আনন্দিত। তাহার ভার আমি আপনার উপর অর্পণ করিয়াছি, এবং নিশ্চিত জানি, আপনি তাহাকে দেখিবেন।' নিবেদিতার অশেষ গুণের জন্য মিসেস বুল ও ম্যাকলাউড উভয়েই তাঁহার যথার্থ অনুরাগী ও দরদী ছিলেন। নিবেদিতাকে তিনি ব্রিটানীতে তাঁহার গৃহে কয়েকদিন কাটাইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সেপ্টেম্বরের কত তারিখে নিবেদিতা ব্রিটানীতে গমন করেন তাহা সঠিক জানা যায় না। ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯০০) 'খেয়ালীদের কংগ্রেস' এর বিবরণ সহ স্বামিজী মিসেস লেগেটকে একখানি কৌতুকপূর্ণ পত্র লেখেন। পত্রখানি স্বামিজীর অপূর্ব রসবোধের পরিচয় বহন করে। ৬ প্লাস দে-জেতাৎ এই ঠিকানায় লেগেটদের গৃহে উক্ত 'কংগ্রেস' নামক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বামিজী স্বয়ং, স্যারা বুল, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও প্যাট্রিক গেডিজ। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিস কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। নিবেদিতার উহাতে উপস্থিত থাকিবারই কথা। আবার মিসেস বুলের আহ্বানে স্বামিজীও ১৭ই সেপ্টেম্বর ব্রিটানী গমন করেন। সুতরাং অনুমান করা যায় ৮ই সেপ্টেম্বরের পরে কোন তারিখে নিবেদিতা প্যারিস ত্যাগ করেন।

ব্রিটানীর অন্তর্গত লানিয়' হইতে ছয় মাইল দূরে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত পেরো গাইরেক একটি মনোরম ক্ষুদ্র গ্রাম। প্রকৃতির উদার, উন্মুক্ত পরিবেশ নিবেদিতার শ্রান্ত দেহ ও মনের অবসাদ দূর করিল। এখানে কেবল আহার, ভ্রমণ ও নিদ্রা। চারিদিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবেষ্টনী, শহরের কোন আড়ম্বর নাই। লোকজনের মধ্যে কৃষককুল। দীর্ঘদিনের নিয়মানুবর্তিতার ছাপ তাহাদের মুখে। বৃদ্ধাদের মুখে কী কোমলতা ও মাধুর্য! কাঁধে ঝুলি, হাতে লাঠি, তাহারা দল বাঁধিয়া চলিয়াছে ভিক্ষা করিতে। করুণ দৃশ্য! কিন্তু অন্তরের শান্তি তাহাদের মুখে প্রতিফলিত। এইরূপ কঠোর জীবনেই তাহারা অভ্যস্ত। সাগর এবং উন্মুক্ত আকাশই তাহাদের সঙ্গী। ভিক্ষায় তাহাদের লজ্জা নাই। নিবেদিতার মনে হয়, ইহাদের জীবনযাত্রা কত সহজ, সরল ও স্বচ্ছ! শহরের চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের পর এই নিভৃত কোণটিতে বসিয়া তাঁহার সমগ্র চিত্ত শান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিসেস বুলের একান্ত অনুরোধে স্বামিজীও ভ্রমণের পূর্বে সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকদিনের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। নিবেদিতা পরম সুযোগ লাভ করিলেন। গুরুর সন্নিধানে তাঁহার মন কি মেঘমুক্ত হইয়াছিল? অন্ততঃ তিনি উপলব্ধি করিলেন, তাঁহার উপর স্বামিজীর অবিচল স্নেহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই, আর এই উপলব্ধিই তাঁহাকে নূতন করিয়া সান্ত্বনা দিল। উল্লেখযোগ্য, নিবেদিতার উদ্দেশ্যে 'আশীর্বাণী' কবিতাটি স্বামিজী এখানেই রচনা করেন ২২শে সেপ্টেম্বর।

স্বামিজী স্থির করিয়াছিলেন, য়ুরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। নিবেদিতাকেও নিজ কর্মপন্থা স্থির করিতে হইল। আমেরিকার কার্য শেষ, অতঃপর ইংলণ্ডে যাইবেন অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেখানকার কার্যপ্রণালী তখনও অনিশ্চিত। এবার তাঁহাকে ইংলণ্ডে একাকীই যাইতে হইবে। স্বামিজীর সহিত পুনরায় শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনাও কম। বিশেষতঃ তাঁহার কিছু পরিবর্তন স্বামিজী নিশ্চিত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এবং তজ্জন্য তাঁহার উদ্বিগ্ন হইবারই কথা। বাস্তবিকই দুইটি কারণে স্বামিজী নিবেদিতার জন্য উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। প্রথমতঃ দীর্ঘদিন স্বদেশে অবস্থান নিবেদিতার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিবে, তাহা অনিশ্চিত, কারণ পুরানো সম্পর্কগুলি বহু সময় নূতন সম্পর্ক-স্থাপনের অন্তরায় হয়। দ্বিতীয়তঃ বহু লোক স্বামিজীকে কথা দিয়া শেষ মুহূর্তে রাখে নাই। ভারত সম্পর্কে ইতিমধ্যে নিবেদিতার যে মানসিক বিপ্লব শুরু হইয়া গিয়াছিল, স্বামিজী কি তাহা অবগত ছিলেন?

ইংলণ্ড-যাত্রার দিন স্থির। নিবেদিতাই আগে চলিয়া যাইবেন। যাত্রার পূর্বদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার লতাপাদপমণ্ডিত ক্ষুদ্র পাঠাগারের দ্বারপ্রান্তে নিবেদিতা সহসা স্বামিজীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। রাত্রির আহার সমাপনান্তে নিজ কুটীরে যাইবার পথে স্বামিজী আসিয়াছেন নিবেদিতাকে আশীর্বাদ জানাইতে। তিনি বাহিরে উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, 'এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে। শোনা যায়, তারা এত গোঁড়া যে প্রত্যেক নবজাত শিশুকে ঘরের বাইরে ফেলে রেখে বলে, "যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তোমার মৃত্যু হোক, আর যদি আলি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, দীর্ঘজীবী হও।" শিশুকে তারা যা বলে থাকে, আজ রাত্রে আমিও তোমাকে তাই বলছি, কিন্তু কথাটাকে উল্টে দিয়ে—যাও, কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি, বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, সার্থক হও।'

অবনতমস্তকে নিবেদিতা সে আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। সর্বপ্রকারে স্বামিজী তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার করুণা তিলমাত্র কমে নাই।

পরদিন সকালে তিনি যাত্রা করিলেন। সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। স্বামিজী পুনরায় আসিলেন তাঁহাকে বিদায় দিতে। স্বামিজীর সহিত য়ুরোপের ভূখণ্ডে তাঁহার এই শেষ সাক্ষাৎ। ব্রিটানীতে অন্য যানবাহনের অভাব। নিবেদিতা কৃষকের পণ্যবাহী এক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। স্বামিজী কুটীরের বাহিরে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছেন এবং ঊর্ধ্বে হাত তুলিয়া অভিনন্দন জানাইতেছেন। প্রভাতের আলোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল। নিবেদিতা গাড়িতে বসিয়া পিছন ফিরিয়া বারবার দেখিতে লাগিলেন। স্বামিজী তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। প্রাচ্যদেশের অধিবাসিগণের নিকট ইহা কেবল অভিবাদন নহে, আশীর্বাদও।

স্বামিজীর এই আশীর্বাদরত-মূর্তি নিবেদিতার হৃদয়ে চিরদিন উজ্জ্বল-ভাবে বিরাজ করিত।

ভারত-উপাসিকা

ব্রিটানী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ২৪শে অক্টোবর স্বামিজী প্যারিস ত্যাগ করেন। মঁসিয়ে ও মাদাম লেয়জে, মঁসিয়ে জ্যুল বোয়া, মাদাম কালভে এবং মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। ভিয়েনা, হাঙ্গারী, সার্ভিয়া প্রভৃতি দর্শন করিয়া এবং সঙ্গিগণের নিকট বিদায় লইয়া স্বামিজী কায়রো হইয়া ভারত যাত্রা করিলেন।

স্বামিজীর আশীর্বাদ অন্তরে জপ করিতে করিতে নিবেদিতা আসিলেন ইংলণ্ডে। নিজেকে মনে হইতে লাগিল ক্ষুদ্র শিশুর মত সুখী। ভবিষ্যৎ জীবন যতই কঠোর ও ভয়াবহ হউক, তাঁহার কি আসে যায়? তিনি স্বামিজীর সন্তান, মায়ের সন্তান। 'জগতে আমার একটিমাত্র বাসনা আছে, সর্বতোভাবে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি, প্রতিদিন আমার বহু-বাঞ্ছিত স্বর্ণ আপেল হাতে আসিয়াও আসিতেছে না। ইচ্ছা করে, স্বামিজী আমায় আশীর্বাদ করিয়া এই সন্ন্যাসিনীর জীবন অন্বেষণেই অনুজ্ঞা দেন।'

সম্পূর্ণ ধ্যান-ধারণা এবং তপস্যার জীবন নিবেদিতার নহে, স্বামিজীর তাহা জানা ছিল। নিবেদিতা কর্মী, তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন জগন্মাতার উপাসনা। এই জগৎ কি সেই জগজ্জননীর শক্তির প্রকাশ নহে? যদি কেহ কর্ম করিতে চায়, সে শক্তির উপাসনা করুক। নিবেদিতার বিদ্যালয় তাই শক্তিপূজার দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহাকে স্বামিজী মাতৃভাবের উপাসনা শিখাইয়াছিলেন। প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কার্যের পশ্চাতে সেই শক্তিরূপিণী মহামায়া বিরাজ করিতেছেন। নিবেদিতাকে তিনিই পরিচালনা করিবেন। স্বামিজীর অভিপ্রায় সংসিদ্ধির জন্য জননীর উপাসনা চাই। কিন্তু নিবেদিতা ভাবিতেন, যদি কখনো এমন দিন আসে যে স্বামিজীর কার্য সম্পূর্ণ হইল, তখন তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া কেবল শিবের আরাধনাই করিবেন। মহাদেবই একমাত্র মুক্ত—চির উদাসীন, সদামুক্ত। মুক্তির স্বরূপ যদি আস্বাদন করিতে হয় তো চিরকালের জন্য সদাশিবের চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে। আপাততঃ বিরামহীন সংগ্রাম, আর সে সংগ্রাম নিবেদিতা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন। কর্মমাত্রেই বন্ধন সৃষ্টি করে। কিন্ত এ জীবনে কর্মই প্রকৃত সত্য, কারণ একমাত্র কর্মীই অপরের বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভাবিতেন, কর্মবিমুক্ত সন্ন্যাসিনীর জীবন তাঁহার নহে।

ইংলণ্ডে আসিয়াই নিবেদিতা কর্ম-প্রবাহে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম কাজ হইল শ্রীযুক্ত বসুর তত্ত্বাবধান করা। শ্রীযুক্ত বসুও সস্ত্রীক প্যারিস হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁহার একটি অস্ত্রোপচার হইল। নিবেদিতা তাঁহাকে উইম্বল্‌ডনের বাড়িতে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। মিসেস বুলও সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদেশে এই দুইজন নারীর অযাচিত সাহায্য শ্রীযুক্তা অবলা বসুকে যথেষ্ট শক্তি দিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বসুর আরোগ্যলাভের পর নিবেদিতা তাঁহার কার্য আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ডের বিদ্বৎ-সমাজে তিনি পূর্ব হইতেই সুপরিচিত। বক্তৃতা ইতিপূর্বে তিনি বহুবার দিয়াছেন ; তবে এবারের বক্তৃতার বিষয়বস্তু পৃথক, উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন—পরিকল্পিত কার্যটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ। এই উদ্যমে ইংলণ্ডের বন্ধুগণ কতখানি সাহায্য করিবেন, সে বিষয়ে নিবেদিতার সন্দেহ ছিল। ইংলণ্ডের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তাঁহার ভারতীয় কার্যধারা সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হইল। লণ্ডন 'ডেলী নিউজে' তাঁহার বক্তৃতার ঘোষণা থাকিত। নিবেদিতার কার্যক্রম সম্বন্ধে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার নিম্নোক্ত উক্তি উল্লেখযোগ্য।

'পুরাকালের ন্যায় অপ্রত্যাশিত অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষের পক্ষ লইয়া একজন শূরবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য এই নূতন শূরবীরের আবির্ভাব কোন দূর দেশ, অপরিচিত জাতি, অথবা পুরুষশ্রেণীর মধ্য হইতে নহে। তিনি একজন মহিলা এবং ভারতের শাসকশ্রেণী-সম্প্রদায়ভুক্ত। এই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলা ভারতের নারীজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নাম মিস মার্গারেট নোব্‌ল। তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের সদস্যারূপে গৃহীত হইয়াছেন এবং অধুনা ভগিনী নিবেদিতা নামে ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা সুদৃশ্য ছাঁটের, অথচ নিতান্ত সাদাসিধা, সাদা ফ্লানেলের গাউন পরিহিতা এই মহিলাটি ইংরেজ জাতির নিকট বিস্ময়কর। তাঁহার গলার মালাটি জপের মালা বলিয়াই মনে হয়। আমি জানি না, ভগিনী নিবেদিতার নিকট ইহা অনুতাপের প্রতীক কি না। তাঁহার বাগ্মীতা অসামান্য।'

ইংলণ্ডে সাধারণতঃ তিনি টার্নব্রিজ ওয়েলস, হাইয়ার থট সেণ্টার (Higher Thought Centre) ও সেসেমি ক্লাবে বক্তৃতা দিতেন। 'নারী-জাতির আদর্শ', 'ভারতীয় সমস্যা', 'ভারতীয় নারী', 'একাগ্রতা', 'ধর্মশিক্ষায় কিণ্ডার-গার্টেন পদ্ধতি', 'ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ব্যর্থতা', 'রামকৃষ্ণ সংঘ এবং

ভারতীয় নারী', 'আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে চিন্তার প্রয়োগ', 'সামাজিক জীবন' প্রভৃতি বক্তৃতাগুলি সুচিন্তিত এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের জনসাধারণ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নারীজাতির সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ সকলকে আকৃষ্ট করিত। একটি বক্তৃতায় বাংলার ভূতপূর্ব ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল্ সভাপতিত্ব করেন। ভারতে নিবেদিতার শিক্ষাপ্রদানের প্রচেষ্টাকে তিনি সমর্থন ও প্রশংসা করিয়াছিলেন।

নিবেদিতা বক্তৃতা দিতে গিয়া বলেন, শিক্ষা বোতলে ভরিয়া ঔষধ গেলানোর মত নিয়মিত মাত্রা হিসাবে দেওয়া যায় না। হিন্দুরমণীগণের পক্ষে শিক্ষার প্রধান উপকরণ তাহাদের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রভাব। কোন জাতির শিক্ষার প্রণালী নির্দেশ করিতে গেলে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহার অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ জীবনের পর্যালোচনা আবশ্যক। তিনি বলেন, 'আমি যে কেবল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলির প্রতি অনুরক্ত তাহা নয়, আমি উহার ভালমন্দ সকল অংশের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন। অতএব হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন সমালোচনা আমার অভিপ্রায় নয়। সমুদয় লইয়া হিন্দু সর্বোচ্চ সভ্য জাতি ; আর জগতের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজেই সুন্দর শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগী অবস্থা বর্তমান।...পৃথিবীতে হিন্দু গার্হস্থ্যজীবনের ন্যায় সুন্দর বস্তু বোধ হয় আর কিছুই নাই। ভারতীয় রমণীর আদর্শ প্রেম নহে, ত্যাগ। এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমি হিন্দুরমণীকে আধুনিক পাশ্চাত্য কার্যকরী শিক্ষা দিতে চাই।'

স্কটল্যাণ্ড হইতে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পাইয়া নিবেদিতা ১৫ই ফেব্রুয়ারী তথায় যাত্রা করিলেন। পরদিন এডিনবরায় ভিক্টোরিয়া ক্লাবে 'ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় হিন্দুনারীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বিষয় স্বভাবতঃই শ্রোতৃবর্গের নিকট সম্পূর্ণ নূতন এবং ঐ বিষয়ে তাহাদের পূর্ব ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। বক্তৃতার শেষে আলোচনাকালে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় নিবেদিতাকে শীঘ্রই বক্তৃতা শেষ করিতে হইল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী 'ভারতবর্ষে তাঁহার কার্যপ্রণালী' এবং ২৫শে 'ভারত' সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের পর তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারতে ফিরিবার জন্য তিনি অধীর হইয়াছিলেন। স্বামিজী ডিসেম্বর মাসে ভারতে চলিয়া গিয়াছেন। মিস ম্যাকলাউডও রওনা হইয়া গিয়াছেন ; জাপান হইয়া ভারতে যাইবেন। নিবেদিতার মনে হয়, ইংলণ্ডে বসিয়া তিনি

কেবল সময় নষ্ট করিতেছেন। সত্যই কি তাঁহার এখানে কোন প্রয়োজন আছে, অথবা মনের খেয়ালকেই তিনি প্রশ্রয় দিতেছেন? প্রতিদিন তাঁহার ধারণা দৃঢ়তর হইতেছিল যে, ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। 'ভারতবর্ষের আশা ভারতবর্ষেই, ইংলণ্ডে নয়।' ম্যাকলাউডকে অনুনয় করিয়া লেখেন, তিনি যেন তাঁহার ভারত-প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ সমর্থন করেন। শুধু নিজ ইচ্ছার বশে ইংলণ্ডে কিছু করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া নিতান্ত স্বার্থপরতা বোধ হইতেছিল। শ্রীমার জন্যও তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠা ছিল। কবে আবার তাঁহার নীরব, পবিত্র সান্নিধ্য উপলব্ধি করিবেন? ভারত হইতে স্বামী সারদানন্দের পত্রে শ্রীমার অসুস্থতার সংবাদে উৎকণ্ঠা বাড়িয়াই চলে। শ্রীমা যদি তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন তাহা হইলে সব সমস্যার সমাধান হয়। ম্যাকলাউড পত্রোত্তরে জানাইলেন, শ্রীমার ইচ্ছা নিবেদিতা ভারতবর্ষে ফিরিয়া যান। নিবেদিতা বুঝিলেন, এই অনুমতি তাঁহারই একান্ত অভিলাষের পরিপূরণ; তথাপি বালিকার মত তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। হঠাৎ কতকগুলি কাজ আসিয়া পড়িল। মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, এবং তিনি স্থির করিয়াছিলেন, অতঃপর আর বক্তৃতা দিবেন না, বা অপর কোন কার্যের ভার লইবেন না। কিন্তু কতকগুলি অনিবার্য কারণে তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

মিঃ হাউইএর সহিত ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার বহু আলোচনা হয়, এবং তিনি নিবেদিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ঐ বিষয়ে একটি জোরালো প্রবন্ধ লিখিয়া দিবার জন্য। শ্রীযুক্ত বসুও উৎসাহ দিয়াছিলেন। 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ উইলিয়াম স্টেড ইতিপূর্বেই তাঁহার পত্রিকায় লেখা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এখন আবার বিশেষ অনুরোধ করেন, শ্রীযুক্ত বসুর চরিত্র অঙ্কন করিয়া তিনি যেন একটি প্রবন্ধ লেখেন। লেখা ভাল হইলে সত্যিই উহা ভারতবর্ষের দিক হইতে মূল্যবান উপহার হইবে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ইতিমধ্যে প্রস্তাব করেন, ভারত সম্বন্ধে নিবেদিতার যে পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা, তিনি তাহা ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন। 'The Web of Indian Life' পুস্তক রচনার প্রাথমিক উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল। 'Kali the Mother' ছাপা হইয়া গিয়াছিল; সমালোচনাও বাহির হইতেছিল। পুস্তকখানি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁহাকে ক্রমাগত আশ্বাস দিতেছিলেন যে, তাঁহার লেখনী দ্বারাই বিদ্যালয়ের অর্থাগম হইবে।

অধ্যাপক গেডিজের সহিত স্কটল্যাণ্ডে দেখা হইলে তিনি তাঁহাকে জন মাসে ডাণ্ডী নামক স্থানে তাঁহার সহিত অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং প্লাসগো প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে বক্তৃতা দিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। শ্রীমার অনুমতি লাভ করিয়া নিবেদিতা এ সকল উপেক্ষা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হইয়া উঠিল না। স্কটল্যাণ্ডে এডিনবরায় বক্তৃতা দিবার সময় মিশনরীগণ তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। ভারত এবং ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহারা যে ভয়ানক বিবরণ দেয়, তাহার প্রতিবাদে তিনি একবার মাত্র বলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরেই তাঁহাকে এডিনবরা ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার ঐ বক্তৃতায় ক্রুদ্ধ হইয়া মিশনরীগণ একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান যুবককে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করে। যুবকটি মাদ্রাজী ; সে মঞ্চে উঠিয়াই নিবেদিতাকে সমর্থন করিয়া বলিল, য়ুরোপ আসার পর হইতে তাহার নিজেকে আর খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না। যুবকটির দাস-মনোভাব অপনোদনের চেষ্টা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিল। তাঁহার মনে হইল, ইহা অসম্ভব বীরত্বের কাজ। যে ক্লাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার সদস্যগণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না, এবং নিবেদিতা যাহাতে পুনরায় বক্তৃতা দিবার সুযোগ না পান, সেজন্য তাঁহাকে ক্লাবে বক্তৃতা দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিবেদিতাকেও এডিনবরা ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং মিশনরীদল নিজেদের মনের মত অপপ্রচারের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিল। নিবেদিতা তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভারত প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ইহাদের এই হীন অপপ্রচারের উত্তর তিনি যেরূপে হউক দিবেন।

অধ্যাপক গেডিজ পুনঃ পুনঃ ডাণ্ডীতে যাইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং মিশনরীদের সম্বন্ধে নিবেদিতা যাহা লিখিবেন, তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নিবেদিতার পক্ষে এ সুযোগ ত্যাগ করা অসম্ভব। তিনি য়মকে লিখিলেন, 'আহা, যদি ভারতে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম! ফিরিয়া যাইবার জন্য আমি ব্যগ্র, যদিও জানি যে, যে পুস্তক লিখিতে চাই, তাহার আরম্ভও করিয়া উঠিতে পারিব না। কলিকাতায় এতদিনে নিশ্চিত প্লেগের আক্রমণ শুরু হইয়া গিয়াছে। এ সময় দূরে বসিয়া থাকা আমার নিকট কষ্টকর।...আমি সত্যই আনন্দিত যে, তোমার নিকট ভারত প্রতিদিনই মধুরতর হইয়া উঠিতেছে।'

নিবেদিতা জন্মগত শিল্পী, লেখিকা। নব নব রূপে ভাষাসৃষ্টির মধ্যে

তিনি আনন্দ পাইতেন। ভারত এবং ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তিনি ইতিমধ্যে যে ধারণা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সার্থক রচনার মধ্যে তাহাকে রূপদানের আগ্রহ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহা ব্যতীত পুস্তক-রচনার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল।

অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই তখন অবসন্ন। সর্বোপরি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নবলব্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ তাঁহার মনের উপর ভীষণ প্রতিক্রিয়া করিয়াছিল। তাই একটি নির্জন স্থানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, যেখানে বসিয়া তিনি নির্বিঘ্নে লেখার কাজগুলি সম্পন্ন করিতে এবং সংগে সংগে সমগ্র চিন্তাধারাকে ধীরে সুস্থে একত্র গ্রথিত করিতে পারেন।

মিসেস বুলের বাড়ি নরওয়ে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে নরওয়ের বার্গেন শহরে তাঁহার পরলোকগত স্বামী ওলি বুলের মর্মর-মূর্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে মিসেস বুল নরওয়ে যাইতেছিলেন, নিবেদিতাকেও আহ্বান করিলেন যাইবার জন্য।

২১শে মে নিবেদিতা নরওয়ের অন্তর্গত লাইসোঁ পৌঁছিলেন। পুরা তিন মাস তিনি ঐ দেশে অবস্থান করেন। বার্গেন হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের এক খাড়ির ধারে গুহার মত একটি জায়গায় তাঁবু খাটাইয়া কুটীর প্রস্তুত হইল। মিসেস বুল যে কয়দিন ছিলেন, মাঝে মাঝে বার্গেনে তাঁহার নিকট যাইতেন। জায়গাটির সহিত কাশ্মীরের অচ্ছাবলের সাদৃশ্য ছিল। নীল সমুদ্রের তীরে সবুজ বনভূমি ; পাথরের ছোট ছোট স্তূপ, সরল বৃক্ষের সারি, আর মাঝে মাঝে পায়ে চলা ক্ষুদ্র পথের রেখা। বন হইতে সুমিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসে। নিবেদিতা স্থির করিলেন, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে তিনি ভারতে ফিরিবেন না।

নিবেদিতার এই অরণ্য-বাসভূমিতে অনেকেই আসিতেন। মিসেস বুলের সাদর আমন্ত্রণে যাঁহারা নরওয়ে আসিতেন, তাঁহারাই নিবেদিতার সঙ্গলাভ করিবার জন্য কয়েকদিন থাকিয়া যাইতেন। সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু কিছুদিন কাটাইয়া গেলেন। মিসেস সেভিয়ার বিষয়সংক্রান্ত কার্যে ইংলণ্ড আসিয়াছিলেন ; তিনিও নরওয়ে হইয়া নিবেদিতার সহিত দেখা করিয়া গেলেন। ইংলণ্ডের উদারনীতিক দলের মিঃ জন ল্যাণ্ডের সহিত নিবেদিতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তিনি এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বেশ কয়েক-দিন অবস্থান করেন। নিবেদিতা 'The Web of Indian Life' নামক পুস্তকের কয়েকটি পরিচ্ছেদ এখানেই লেখেন এবং শ্রীযুক্ত দত্তকে পড়িয়া

শোনান। তাঁহার নিকট সাহায্যও লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্তও এই সময়েই তাঁহার বিখ্যাত ইংরেজী পুস্তক 'অর্থনীতির ইতিহাস' লেখেন।

মিঃ স্টেডের অনুরোধে নিবেদিতা বিশেষ পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত বসুর চরিত্র অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ স্টেড তাহা অনুমোদন করেন নাই; কারণ ঐ রচনায় শ্রীযুক্ত বসু অপেক্ষা ভারতের মর্মকথাই অধিক ব্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসুর চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে তিনি ভারতকে চিত্রিত করিয়াছিলেন; সুতরাং আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইল। মিশনরীদের আক্রমণের উত্তর 'Lambs among Wolves' নাম দিয়া ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেটে বাহির হইল।[১]

এই দীর্ঘ অবকাশে নিবেদিতা একান্তভাবে আত্মবিশ্লেষণ করেন। তাঁহার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এই নির্জন স্থানে বসিয়া তাহা তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইলেন। উত্তরকালে যে নিবেদিতাকে সকলে চিনিয়াছিল, তাহার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল এই সময়ে ইংলণ্ডে এবং নরওয়েতে অবস্থানকালে।

যে নিবেদিতা ১৮৯৮ সালে লিখিয়াছিলেন 'ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন আমার চিরদিনের স্বপ্ন,' সে নিবেদিতা তিনি ছিলেন না।

প্রথম ভারত গমনের সময় প্রকৃতপক্ষে ভারত সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। চিন্তারও প্রয়োজন ছিল না। আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের উপায় তিনি স্বামিজীর বেদান্তবাদের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সেবাকেই তাঁহার জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করার মূলে ছিল স্বামিজীর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা। ভারতে অবস্থানকালে ইংলণ্ড ও ভারতের প্রকৃত অবস্থা ও ব্যবধান তিনি বেদনার সহিত হৃদয়ঙ্গম করেন। তথাপি আশা ছিল, প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন এই ব্যবধান দূর করিয়া ভারতকে তাহার স্বজীবন-যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করিতে। পরে বুঝিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনে তখন স্বামিজীর প্রভাব এত বেশী যে, স্বামিজী যে ভাবে চিন্তা করিতেন, নিবেদিতা সেই ভাবে চিন্তা ও কার্য করিয়া ধন্য হইতেন।

তাঁহার ভারতের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-প্রীতি ও তাহার সহিত একাত্ম-বোধের মূলেও ছিলেন স্বামিজী। ভারতের স্বরূপ স্বামিজীর মধ্য দিয়াই তাঁহার নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছিল। আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে গিয়া ভারত

[১] ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মিস মেয়ো যখন তাঁহার 'Mother India' নামক পুস্তকে ভারত সম্বন্ধে নানাবিধ মিথ্যাকথা এবং কুৎসা লিপিবদ্ধ করেন তখন উদ্বোধন কার্যালয় হইতে নিবেদিতার এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়।

সম্বন্ধে সেখানকার বহু ভ্রান্ত ও অদ্ভুত ধারণা এবং হীন মনোভাব তাঁহাকে প্রথম আঘাত দেয়। বিজেতা জাতির প্রভুসুলভ মনোভাব সহজেই অনুমেয়। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলির ভারত সম্বন্ধে অবজ্ঞার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন, উহা কেবল ভারতের পরাধীনতা। যে দেশ পরাধীন, স্বাধীন দেশগুলির নিকট তাহার মূল্য কোথায়? শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যখন আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন, তখন একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আগে তোমরা স্বাধীন হও, তারপর এদেশে এসে তোমাদের ধর্ম, দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিও। তখন আমরা শুনব।' নিবেদিতাকে ঐরূপ মন্তব্য শুনিতে হইয়াছিল কি না কে জানে? স্বামিজী তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে সর্বত্রই নিজেকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু মিশনরীরা কি চেষ্টার ত্রুটি করিয়াছিল তাঁহাকে অবনত করিতে? ভারতের পরাধীনতা সম্বন্ধে উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা-লাভের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নিবেদিতার অবচেতন মনে রূপান্তর ঘটিতে লাগিল।

স্বামিজীর অনুপস্থিতিতে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে নিবেদিতার ব্যক্তিসত্তা ক্রমশঃই অভিব্যক্ত হইয়া উঠে এবং ঐ সঙ্গে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ভারত সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে সচেতন হন। পরাধীন দেশের বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান-প্রতিভা-বিকাশে সুযোগের পরিবর্তে পদে পদে নানা বাধাদান তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তোলে, এবং বৈদেশিক শাসনের ভয়াবহ রূপ তাঁহার নিকট ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গভীর দুঃখের সহিত তিনি লিখিয়াছিলেন, 'দেশীয় সরকার যদি বিজ্ঞানকার্যের ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু উহা করিবার মত উদার হৃদয় ইংরেজ জাতির নাই।'

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিবার বা জানিবার সুযোগ নিবেদিতার হয় নাই। এখন বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত আলোচনার ফলে তিনি দেখিলেন, মুষ্টিমেয় লোক ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ পার্লামেণ্টের সদস্যগণের মনোভাব ভারত-বিরুদ্ধ। উদারনীতিক দলের অন্যতম নেতা মিঃ জন ল্যাণ্ড প্রভৃতি দুই-চারিজন মাত্র তাঁহার মর্মবেদনা বুঝিতেন। তাই ইংলণ্ড-স্থিত ভারতীয়গণের সহিত তিনি পরিচয়ের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের স্বদেশানুরাগ ছিল, তাঁহাদের নিকট তিনি জানিতে পারিলেন, ভারতের জনসাধারণ কিভাবে রাষ্ট্রচেতনা লাভ করিতেছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত রাজনৈতিক মতবাদে নরমপন্থী, কিন্তু তাঁহার সহিত আলোচনায় নিবেদিতার ভারতের আর্থিক অবস্থা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোভাব

জানিবার সুযোগ হইল। কংগ্রেসের কার্যকলাপ তিনি অতি আগ্রহের সহিত অনুধাবন করিতে লাগিলেন। এমনকি, কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছাও তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। অপর দিকে মিশনরীগণের অপপ্রচার তাঁহাকে ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত একদিন জন-পঁচিশ ভারতীয় ছাত্রকে লইয়া আসিলে নিবেদিতা তাহাদের নিকট জ্বলন্ত ভাষায় 'ভারতের নবজাগরণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ইহারা যে তাঁহার একান্ত আপন জন, ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যধর! কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের দাসসুলভ মনোভাব তাঁহার হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করিল। নিজেদের দেশ সম্বন্ধে ইহাদের এতটুকু মর্যাদাবোধ নাই! নিবেদিতা নিজেকেই ধিক্কার দেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল সংবাদ আসিত, তাহাতে পরাধীন দেশের অসহায়তা ও গ্লানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। যেমন, জামসেদজী টাটার বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অনুদার মনোভাব। মিসেস বেশান্ত কাশীতে তাঁহার কলেজ স্থাপনের অনুমতি না পাইয়া অবশেষে ভারতীয় স্টেট সেক্রেটারী লর্ড জর্জ হ্যামিলটনের নিকট সরাসরি আবেদন করিয়াছেন। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে তাঁহার আইরিশ চিত্তে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইল, এবং উহার ফলে চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল।

বস্তুতঃ তাঁহার এবারের ইংলণ্ডে অবস্থান অতিপ্রিয় স্বদেশে ইতিপূর্বে যে দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন, তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া দেখা দিয়াছিল। পুরাতন সম্পর্ক তাঁহাকে নবপরিচিত ভারতবর্ষের কথা ভুলাইতে পারে নাই। তাঁহার সকল কাজকর্ম, চলাফেরার মধ্যে সর্বদা একটি লক্ষ্য থাকিত —তাহা ভারতের সেবা। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত পূর্বপরিচিত অধিকাংশের সহিত তাঁহার হৃদয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন, তাঁহার যাত্রাপথে ইহাদের সহিত কোথাও মিল নাই। যে পথ দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে, সে পথের সঙ্গী এই মার্জিত, সুসভ্য, প্রভুত্বপরায়ণ ব্রিটীশ নরনারী নহে ; তাঁহার যাত্রাপথের সঙ্গী ভারতের অগণিত জনগণ, যাহারা অনশনক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত, অশিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য জাতির নিকট বর্বররূপে পরিগণিত, কিন্তু যাহারা তাঁহার চক্ষে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী, কারণ তাহারা এমন এক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত।

স্বামিজীর প্রতি তাঁহার আস্থা পূর্ববৎ অটুট ছিল ; কিন্তু ভারত এবং তাহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁহার মধ্যে স্বামিজী-নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছিল। মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত বিভিন্ন পত্রের

মধ্যে এই মনোভাব সুস্পষ্ট। স্বাধীন চিন্তা হইলেও ইহার সহিত স্বামিজীর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পাশাপাশি বর্তমান।

রাশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা প্রিন্স ক্রপটকিন এই সময়ে লন্ডনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা তাঁহার ইংলন্ড-বিরোধী মনোভাব গঠনে বিশেষ সাহায্য করে। ইতিপূর্বে আমেরিকায় তিনি ক্রপটকিনের 'The Mutual Aid' নামক পুস্তকপাঠে বিশেষ প্রভাবিত হন। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষের যথার্থ প্রয়োজন কি, তাহা অপর যে-কোন লোক অপেক্ষা এই ব্যক্তি অনেক বেশী জানেন। যে বিষয়টি আমার মনে বিশেষ ভাবে স্থান পাইয়াছে, তাহা হইতেছে, শাসকবর্গের সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়তা। ইহাই আমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক। আমাদের ইহা শিক্ষা করিতে হইবে, এবং সমগ্র জনসাধারণের প্রতি রক্তবিন্দু ও স্নায়ুতে সঞ্চারিত করিতে হইবে, যাহাতে রাজনৈতিক যন্ত্র যেন কখনো একটি কৃষকের উপরেও প্রভুত্ব না করিতে পারে। সুতরাং ভারতের সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত—ইংলন্ডের সপ্তম এডোয়ার্ড, অথবা সমগ্র রাশিয়ার জার—তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভারতের প্রকৃত আশাভরসা নির্ভর করে তাহার জনসাধারণের শিক্ষার উপর। এই শিক্ষাদানের উপায় সম্বন্ধে ক্রপটকিনের মত হইতেছে যে, বহু বৎসর ধরিয়া প্রচার, লেখা, ছাপানো, বক্তৃতা ইত্যাদি চালাইতে হইবে। কোন অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে এখানে-সেখানে ফল দেখা যাইবে।

...'(সিপাহী) বিদ্রোহের শোচনীয় ব্যর্থতা সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহার পশ্চাতে কোন অবিচ্ছিন্ন কার্যপদ্ধতি ছিল না। কিন্তু গ্রামগুলিতে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। এবং আর কিছুরই আবশ্যক নাই—জনসাধারণের এই প্রচণ্ড বিশ্বাসই একমাত্র কার্যপ্রণালী বা নীতি। সুতরাং এখন আমি বুঝিয়াছি, আমাদের কাজ কী। যেহেতু ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সভ্য দেশ, আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, ভারতবর্ষই একমাত্র স্থান, যেখানে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য এক বিরাট জাতি সুসংবদ্ধ।

'সেখানেই পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান নিহিত। যুদ্ধ নহে, রক্তপাত নহে। একদিন অতি প্রশান্তভাবে আমরা ভারত-প্রতিনিধিকে হাসিমুখে জানাইব যে, তাঁহাকে আর আমাদের প্রয়োজন নাই। ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইবে, যখন আমরা মিঃ গেডিজ যাহাকে বলেন "প্রশান্ত মহাসাগরীয় জীবনের নীতি"—সেই নীতি অবলম্বন করিব' (১৮।৮।১৯০০এর পত্র)।

নিবেদিতা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক গুণ আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মূল্য ততক্ষণই, যতক্ষণ কেহ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করে। 'এই গোষ্ঠীর বাহিরে যাওয়া কি ভয়ংকর, তাহা যেন আমি মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত না হই।' স্বাধীনতা সম্বন্ধে যখন সকলে আলোচনা করে—পৃথিবীর সকল লোকের মুক্তির কথা, প্রত্যেক মানুষের নিকট মানুষের মুক্তি- জাতীয় আদর্শ বলিতে নিবেদিতা ইহাই বুঝিতেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, অপরের নিকট ইহার অর্থ ব্রিটিশের স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য, ঐশ্বর্য, তখন সমস্তই তাঁহার নিকট ভস্মস্তূপে পরিণত বলিয়া মনে হইল। 'মনে হয়, আমি চিরকালের জন্য বিরক্ত এবং মোহমুক্ত হইয়া গিয়াছি। কয়েকজন বিশ্বস্ত বা সৎলোক অবশ্যই আছেন, কিন্তু তাহা ইংলণ্ডের কৃতিত্বের পরিচয় নহে, কারণ তাহারা নিশ্চিত পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত' (১১।১।১৯০১-এর পত্র)।

'এ বিষয়ে আমি একমত যে স্বামিজীই আসল রোগ ধরিয়াছেন ; অপর সকল আন্দোলনই কেবল বাহ্য লক্ষণগুলির সহিত লড়াই করিতেছে। তথাপি বিভিন্ন প্রকার কার্যেরও আবশ্যকতা আছে। ধন্য ভারতবর্ষ! কী অশেষ ঋণী আমি তাহার নিকট! আমার মধ্যে এমন কিছু যোগ্যতা আছে কি, যাহা আমি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাহার নিকট লাভ করি নাই' (৭।৩।১৯০১-এর পত্র)?

'আমরা এতদিন যে স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি, বা যে সব কথা বলিয়াছি, উহা আমাদের সামনে যে বিরাট কাজ রহিয়াছে, তাহার তুলনায় ছেলেখেলা মাত্র।

'আমার মনে হয়, যেন এ পর্যন্ত একমাত্র আমিই প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। নিশ্চিতই স্বামিজী ব্যতীত অপর কেহই ইহা ধরিতে পারেন নাই। আর আমি জানি, তাঁহার কল্পনা আমার কল্পনাকে ব্যাহত করিবে না' (১৫।৩।১৯০১-এর পত্র)।

'এখন ভারত সম্বন্ধে তুমি কি এটা অতিশয়োক্তি মনে করবে যদি আমি বলি যে, আমি এখন এমন কিছু আয়ত্ত করেছি বলে অনুভব করছি, যা এ পর্যন্ত কেউই করেনি? হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যখন স্বামিজীর লেখা আবার পড়ি, তখন তার বিশালতা আমাকে স্তম্ভিত করে ; কিন্তু তারপর সামলে নিয়ে ভাবি, এই মুহূর্তে ভারতের পক্ষে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—অদূরপ্রসারী তীক্ষ্নদৃষ্টি ও স্পষ্ট আকুল আহ্বান—হয়তো স্বামিজীর জ্ঞানের বিপুলতাই তার অন্তরায়। হয়তো আমার অজ্ঞতা ও অগভীরতাই আমার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র।

অবশ্য স্বামিজীর বাণীই যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বকালোপযোগী, তা কি আমি ভাবি না? খুব ভাবি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ভয়ানক স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই যে, এ বাণী এত বিরাট যে, একপুরুষে তার ধারণা সম্ভব নয়।

'...ইংলণ্ডের কথা বলতে গেলে মনে হয়, ইংলণ্ড, অথবা তার মধ্যে যা-কিছু মহত্ত্ব ছিল, অন্ততঃ সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে...আমি বিশেষ করে পুনায় যেতে চাই, সুবিধা হলে রমাবাই-এর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমি তোমাকে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলছি যে, গভর্নমেণ্ট ভারতের জন্য যাই করুক না কেন, তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমার মতে, কোন কাজ যতই উৎকৃষ্ট বলে মনে হোক, যদি তা দেশের লোকের দ্বারা না হয়ে থাকে, তো তার ফল মন্দই হয়; যতই দিন যাচ্ছে, ততই দেখছি, এক সময় ব্যক্তির পক্ষে যেটা সত্য বলে মনে হয়েছিল, একটা জাতির পক্ষেও তাই সত্য। শিশুকে অঙ্কন-বিদ্যা শেখাবার জন্য অনেক চিত্রকর নিযুক্ত করতে পার, এবং তারা হয়তো শিশুর আঁকা ছবিটিকে তুলি বুলিয়ে চমৎকার করে দিতে পারে; কিন্তু শিশুর নিজের হাতে আঁকা সামান্য হিজিবিজির মূল্য এই রকম হাজার হাজার ছবির চেয়ে অনেক বেশী। যে-কোন দেশের পক্ষেও একই কথা। তারা নিজেরা যেভাবে গড়ে ওঠে, তাই ভাল। আর তাদের জন্য যা-কিছু করে দেওয়া হয়, সবই রংচঙে সাজানো জিনিস।

'ভারতের জন্য আমি কিছুই করছি না। আমি কেবল শিখছি। চারা-গাছটি কেমন করে বেড়ে ওঠে, তাই দেখবার চেষ্টা করছি। যখন সেটি ঠিকভাবে বুঝতে পারব, তখন জানব যে, বড় জোর ওটিকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ভারতবর্ষ স্বাধ্যায়ে মগ্ন ছিল। একদল দস্যু এসে আক্রমণ করে তার জমি-জারাত ধ্বংস করলে। তার চটকা ভাঙল। দস্যুর দল তাকে কিছু শেখাতে পারে কি? না, ভারতবর্ষকে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে যেতে হবে স্বস্থানে। মনে হয়, এই ধরনের একটা কিছু করাই হবে ভারতের পক্ষে যথার্থ কার্যসূচী। তাই খ্রীষ্টানদের সঙ্গে, এবং যতদিন পর্যন্ত সরকার বিদেশী, ঐ সরকারের দালালদের সঙ্গে, আমার কোন সম্পর্ক নেই। ভারতের পক্ষে যা কিছু ভারতীয়, তা যতই অর্থহীন ও তুচ্ছ হোক, আমার কাছে নমস্য। আর যা-কিছু, যদি একটু ভাল করে, মন্দ করবে অনেক বেশী, এবং তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। হাঁ, আমার পথও কিছু ক্ষতি করবে, কিন্তু দেশের লোকদের পক্ষে হবে প্রাণের জিনিস। ভাল হোক, মন্দ হোক, তাদেরই নিজস্ব জিনিস হবে, অন্য কারও চাপানো নয়। এ ধরনের ক্ষতি আমি গ্রাহ্য করি না। তাদের এ ক্ষতির প্রয়োজন আছে।

'ভারত, হে ভারত, আমার স্বজাতি তোমার যে মর্মান্তিক ক্ষতি করেছে, কে তার পূরণ করবে? তোমার যারা শ্রেষ্ঠ সন্তান, যারা সর্বাপেক্ষা সাহসী এবং তীক্ষ্ণস্নায়ুবিশিষ্ট তাদের উপর এই যে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ উৎকট অপমান বর্ষিত হচ্ছে, কে তার একটিরও প্রায়শ্চিত্ত করবে?

'ইংলণ্ডে বসে ভারতের জন্য কিছু করার প্রচেষ্টা কী মূর্খতা বলে এখন মনে হয়, তা তোমাকে বলে উঠতে পারব না। সময়ের কি প্রচণ্ড অপব্যয়! তোমার কি মনে হয়, ক্ষুধার্ত নেকড়েকে শিশুর মত শান্ত-শিষ্ট করা যায়? ছোট খুকীর মত নম্র-মধুর করে তোলা যায় তাদের? ইংলণ্ডে বসে ভারতের জন্য কাজ করার অর্থ এই। ইংলণ্ডেও কাজের প্রয়োজন আছে এবং করা উচিত, কিন্তু সে কাজ কী ধরনের? স্বামিজী, ডক্টর বসু, মিঃ দত্তের মত ব্যক্তির ইংলণ্ডে আসা প্রয়োজন, তাঁরাই ইংলণ্ডকে দেখাবেন, ভারত কী এবং কী হতে পারে। তাঁদের উচিত, লক্ষ লক্ষ বন্ধু, শিষ্য, অনুরাগীর দল সংগ্রহ করা। তারপর আজ থেকে বিশ বছর পরে, যখন এক প্রবল আঘাত হানা হবে (আমি জানি সে আঘাত আসবেই), তখন হঠাৎ ইংলণ্ডে একদল নরনারী দেখা যাবে, যারা পূর্বে নিজেদের কখনো ঐভাবে বিচার করেনি। তারা হঠাৎ জেগে উঠবে, এবং বলবে, "তফাৎ যাও, এরা নিশ্চয় স্বাধীন হবে।"

'কিন্তু এ হ'ল ইংলণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত, ভারতের জন্য এ কাজ নয়—বুঝলে? অন্ততঃ আমি এ কাজের জন্য সৃষ্ট হইনি। ঈশ্বর করুন, যেন স্বামিজী বোঝেন যে, তিনি ঐজন্য জন্মেছেন। কিন্তু তাঁর জগতে আসার প্রয়োজন সম্বন্ধে আমি কি জানি? সেটা আমাদের পরিমাপের বাইরে।

'ওঃ, ভারতে আমরা কত কী না চাই! কী চাই না? আমরা চাই, পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা আমাদের হয়ে আমাদের বাণী বহন করুক। আমরা চাই প্রকৃতির যে সংগঠন-শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, তাকে যথাযথ কাজে লাগাতে। বৃক্ষরোপণ, শিশুগণের শিক্ষাবিধান, ভূমিকর্ষণ, এ সব আমি ভুলে গেছি ভেব না। কিন্তু তার সঙ্গে আকুল আহ্বান, জনতার উন্মাদনা, আর প্রাণ-বিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা—তাও চাই। আমাদের প্রয়োজনের কথা ভেবে হতাশ হয়ে পড়ি: কিন্তু যখন ভাবি, এখনই যথার্থ সময়, আর আমরা নয়, স্বয়ং মহামায়া কর্মে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন আবার সাহসে বুক বাঁধি।

'আমাদের কাজ হ'ল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, যেখানে খুশি নিয়ে যাক্ আমাদের। যে সব কথা জেনেছি, তার সব যেন বলতে পারি, যথাসময়ে যেন উপযুক্ত কাজ করতে পারি।

'আমরা কি আশা করতে পারি যে বিফল হব না? আমার কাজ হ'ল

নিজে দেখা ও অপরকে দেখানো। বাকী আপনিই হবে। স্বপ্ন দেখতে পারাটাই সংকটকাল। এখন হয়তো বুঝতে পারবে আমার কী মনে হয়। আমার কাছে একজন মিশনরী ঠিক সাপের মত, যাকে পায়ের চাপে মাড়িয়ে ফেলতে হবে। যে মিশনরী যত ভাল কাজ করছে, সে তত ভয়ঙ্কর লোক—অন্ততঃ আমার কাছে তাই।...

'ইংরেজ কর্মচারিগণ মূর্খ,—ধূমায়মান ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খেলা করছে, আর যা-কিছু নিজে গড়ছে তার জন্য ঢাক পেটাচ্ছে। দেশীয় খ্রীষ্টান তার স্বদেশে বিশ্বাসঘাতক। এই সকল ব্যক্তি, আরও সব ক্রীতদাস, বেতনভোগী গুপ্তচর ও ভাড়া-করা লোকদের জন্য ভারতবর্ষের সময় নেই, প্রয়োজনও দেখি না। যে কাজ তাকে রক্ষা করবে, বা ঠিক পথ দেখাবে, তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। কংগ্রেস বোকামী সত্য, এমন কি কতকটা ক্ষতিকরও ; কিন্তু মিঃ টাটার পরিকল্পনা, অথবা সোরাবজীর ব্যবসার চেয়ে দশ হাজার গুণ ভাল। স্বামিজীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মূলকথাটি ধরতে পেরেছেন—জাতীয়ভাবে মানুষ-গঠন।

'কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। ভারত যদি একবার সচেতন হয় নিজেকে রক্ষা করবার জন্য, তাহলে সে যাকে খুশি, এখানেই হোক বা সেখানেই হোক নিযুক্ত করতে পারে—সে বিদেশী বা খ্রীষ্টান যাই হোক, আসে যায় না। আপাততঃ তারা তার মুখ চেপে ধরে আফিম-মেশানো ঠাণ্ডা শরবত খাওয়াচ্ছে, আর তারই নাম দিয়েছে "শিক্ষা"।

'আশা করি, তোমার বিশাল হৃদয়ে আমার এই সব ভাবনা আশ্রয় পাবে। যদি তোমার মনে হয়, আমার সমস্তই ভুল, সবই সর্বনেশে, আমি কেবল তোমার পাদস্পর্শ করে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজের পথে যাত্রা করব। যে স্বপ্ন আমি দেখেছি, তাকে আমায় রূপ দিতেই হবে' (১৯।৭।০১-এর পত্র)।

'বৃহত্তর, অনাস্বাদিত এক প্রশান্তির অনুভূতি আমায় তলিয়ে দিচ্ছে। এটা কি প্রস্তুতির অংশ? অথবা এও হতে পারে, আমার সামর্থ্য চরমে উঠে এবার অস্ত যেতে বসেছে। কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে সে মায়ের দোষ। আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। মায়ের যা ইচ্ছা, তাই তিনি গ্রহণ করবেন। কেবল ভারতের বৈদেশিক শাসন সম্বন্ধে তোমার বন্ধুর মত ঠিক নয়। যদি তার অথবা যে-কোন ব্যক্তির বিন্দুমাত্র সঠিক ধারণা থাকত, যে কোন দেশে বিদেশী শাসন বলতে কি বোঝায়, আর সর্বোপরি, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে এই শাসনের কী অর্থ—কী নৈতিক অধঃপতন, জঘন্য দুর্বলতা সৃষ্টি করে

চলেছে, তাহলে মনুষ্যত্বের বিপক্ষে এই অপমানকর কথা বলার পরিবর্তে সে নিজের গলা কেটে ফেলত।

...'ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য আছে কি? নিশ্চয় না। এমন কি তার শত্রুর দ্বারা লিখিত ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, পশ্চিম য়ুরোপের মতই বিশাল দেশ ভারতবর্ষ কখনো এ রকম বিশৃঙ্খলতার দুর্ভোগ ভোগ করেনি।

'কেবল ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যেই যে যুদ্ধগুলি ঘটেছে, তাদের কথা ভেবে দেখ ; ইংলণ্ড ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ, জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ এবং ফরাসী-বিপ্লবের কথা চিন্তা কর ; প্রত্যেক দেশের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়েছে, তাদের স্মরণ কর...। গভীর ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে অপূর্ব রাজনৈতিক শান্তিপ্রিয়তার সমন্বয়, এর চেয়ে অসাধারণ ব্যাপার ভারতবর্ষে আর কিছু নেই। একমাত্র জিনিস যা কখনো লেখা হয়নি, সেটা হচ্ছে ভাল ইতিহাস, অন্ততঃ ভারতবর্ষের—তা আমার ভাল করেই জানা আছে' (৩।১০।০১-এর পত্র)।

উপরের পত্রগুলি পাঠে নিবেদিতার চিন্তাধারার গতি অনুমান করা যায়। আশ্চর্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে তিনি বৈদেশিক শাসনের মূল কথাটা ধরিতে পারিয়াছিলেন? যে ইংরেজ জাতির পতাকাকে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, 'ইষ্টদেবতার মত প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন,' যে স্বজাতি-প্রেমের জন্য তিনি একদা স্বামিজীর তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছিলেন, 'তোমার এই স্বজাতিপ্রেম একপ্রকার পাপ'—কেমন করিয়া সেই দেশ ও জাতির প্রতি তাঁহার ভক্তি-প্রেম ধীরে ধীরে অপসারিত হইল, কেমন করিয়া তিনি 'চির-দিনের মত বিরক্ত ও মোহমুক্ত' হইলেন, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। কেবল বলিতে পারা যায়, ইহা একটি ঘটনা বা সত্য। নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কার্যসূচী এখানেই নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যে 'স্বপ্ন' তিনি দেখিয়াছিলেন তাহাকে রূপ দিবার প্রাণপণ চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। বিদেশী শাসনের ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর এক মুহূর্তও ভারতের উপর ইংরেজ জাতির আধিপত্য তাঁহার নিকট অসহ্য। পিতৃপুরুষগণের স্বাধীনতার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার শোণিতে বিদ্যমান ছিল, তাহার ফলে তাঁহার মানসিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়াছিল সাংঘাতিক রূপে।

প্রশ্ন জাগে, তাঁহার এই স্বপ্ন বা দর্শনের মূলে স্বামিজীর কোন প্রভাব ছিল কি? তাঁহার পত্রগুলির মধ্যে বার বার এই উক্তি দেখা যায়, স্বামিজীই একমাত্র মূল কথাটি ধরিতে পারিয়াছেন। মিস মেরী হেলকে স্বামিজী এক পত্রে লেখেন—

'আধুনিক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একটি মাত্র সুফল দেখা যায়। অজ্ঞাতসারে হলেও এই শাসন ভারতবর্ষকে আবার জগতের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেছে, বহির্জগতের সঙ্গে জোর করে তার যোগাযোগ ঘটিয়েছে।...রক্তশোষণই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হতে পারে না। মোটের উপর, সাধারণের পক্ষে আগেকার শাসন-ব্যবস্থা ছিল কতকটা ভাল, কারণ তখন তাদের সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়নি ; কিছু বিচার, কিছু স্বাতন্ত্র্যও ছিল।

'আধুনিক-ভাবাপন্ন, অর্ধ-শিক্ষিত ও জাতীয়-ভাব-বর্জিত কয়েক শ লোক —এই হল ইংরেজ-শাসিত বর্তমান ভারতের সেরা রূপ। আর কিচ্ছু নেই।... ইংরেজের বিজয়-প্রচেষ্টার কালে শতাধিক বর্ষব্যাপী অরাজকতা, ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালে ইংরেজের বীভৎস হত্যাকাণ্ড, এবং ততোধিক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, যা হল ইংরেজ রাজত্বের অনিবার্য ফল (করদরাজ্যগুলিতে কোন-দিন দুর্ভিক্ষের বালাই নেই), এবং যার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটছে— এই সব অন্তরায় সত্ত্বেও লোকসংখ্যার বেশ বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, তখন, অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের পূর্বে, লোকসংখ্যা যা ছিল, তা এখনও হয়নি।...

'এই তো অবস্থা! এমন কি, শিক্ষার প্রসারও আর হতে দেওয়া হবে না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আগেই বন্ধ করা হয়েছে (বলা বাহুল্য, নিরস্ত্রীকরণ বহু পূর্বেই হয়ে গেছে), যে সামান্য স্বায়ত্ত-শাসন কয়েক বৎসরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেটুকুও দ্রুত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা তাকিয়ে আছি, আরও কী হয়, দেখার জন্য। গুটিকতক নির্দোষ সমালোচনাত্মক কথার ফল—লোকের সঙ্গে সঙ্গে যাবজ্জীবন নির্বাসন, কারও বা বিনা বিচারে কারাদণ্ড ; তা ছাড়া, কেউ জানে না, কখন তার মাথাটা কাটা যাবে।

'ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছে। ইংরেজ সৈনিকদের হাতে আমাদের পুরুষেরা প্রাণ হারাচ্ছে, মেয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছে। তাদেরই আবার আমাদের ঘাড় ভেঙ্গে বৃত্তি ও পাথেয় দিয়ে ঘরে পাঠানো হয়। এক ভয়ঙ্কর হতাশার মধ্যে আমরা বাস করছি।...

'শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য পূর্ব পূর্ব সরকারেরা যে সব জমি-জারাত দিয়েছিল সে সব গ্রাস হয়ে গেছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষা-বাবদে রাশিয়ার চেয়েও কম খরচ করে—আর সে শিক্ষাও কেমন!

'মৌলিকত্বের এতটুকু প্রকাশ দেখলেই তাকে গলা টিপে মারা হয়। মেরি, সত্যই যদি ঈশ্বর থাকেন, তো তিনি ছাড়া আমাদের কোনও আশা দেখি না।...

'...আমরা এক নূতন ভারতবর্ষের সূচনা করেছি, এক অভ্যুদয়ের—এবং কী ফলাফল হয়, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে। —সমাজ ও আমাদের মধ্যে নয়—ওরা তো গেছেই। এ সংগ্রাম আরও কঠোর, গভীরতর ও আরও ভীষণ।'[১]

কিন্তু স্বামিজী ভারতবাসীকেও দায়ী করিয়াছিলেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সহায়ে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?'

স্বামিজী যে বিদেশী শাসনের ভয়াবহ পরিণাম আমূল দেখিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং ঐ শাসন হইতে মুক্তিলাভ না করিলে যে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নহে, তাহাই বা তাঁহার মত কে বুঝিয়াছিল? তথাপি রাজনৈতিক সংগ্রামকে তিনি জাতির মুক্তির পন্থারূপে গ্রহণ করেন নাই। সে কথা যথাসময়ে আলোচ্য।

নিবেদিতাও তাহা জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই ভয় করিতেন যে, তাঁহার কার্যপ্রণালী স্বামিজী অনুমোদন করিবেন না। স্বামিজী যদিও তাঁহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তথাপি যে-কোন কার্যে তাঁহার সমর্থন না পাওয়া নিবেদিতার নিকট মর্মান্তিক ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

...'আমার ভয় হয়,...শ্রীমায়ের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে পিতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করেন। হয়তো কংগ্রেসে বক্তৃতা দেবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হতে পারি, আর আশা করি, স্বামিজীও হয়তো বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ আমারই মত গ্রহণ করবেন।

'আমার কাছে স্বাধীনতার একটা কদর আছে, যার জন্য আমি অত্যন্ত ভয় পাই; কারণ আমার জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা জড়িয়ে গেছে, যা স্বামিজীর অনুমোদন লাভ করবে না। যাই হোক, আমার বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত কিন্তু সবই তাঁর জন্য, আর পূর্বের মতই তিনি আমাকে তাঁর সন্তান বলে গ্রহণ করবেন।...আমার আত্যন্তিক সম্পর্ক কাজের সঙ্গে, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ও ছোট মেয়েদের সঙ্গে। আর হিন্দুধর্মই এখন সবচেয়ে বেশী করে আমার ধর্ম, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজন এত স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি! এই আমার বক্তব্য, এবং এর কাছে আমায় খাঁটী থাকতেই হবে। এখন

[১] Complete Works, Vol VIII, pp 483-84

আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, ভারত এবং ভারতীয়দের জন্য আমার কিছু করবার আছে। কেমন করে সেটা সম্পন্ন হবে, তার ভার মায়ের ওপর, আমার ওপর নয়' (১০।৬।০১-এর পত্র)।

'তুমি কি ভাব, আমি জানি না যে, স্বামিজীর মহৎ বাণী অতুলনীয়? আমার পক্ষে তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার বাইরে আর কিছু নয়। গত সারাবছর ধরে আমি এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি, যা তিনি আমার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তার বাইরে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি এত দৃঢ়ভাবে ধরেছি যে, যদি কোন জায়গায় আমার ভুল হয়ে থাকে, তবে সে ভুল তাঁর, আমার নয়। অথচ এ সমস্তই হয়তো আমার ভবিষ্যৎ জীবনে আনবে বিপদের সূচনা, অথবা দুঃখ পর্যন্ত। জানি না, জানবার প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন কেবল বিশ্বস্ত হওয়া, আর আমার যথাসাধ্য আমি করেছি।

'আমার মনে হয়, ভারত সম্বন্ধে এই সব নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আমি এই সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই লাভ করেছি, অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব হ'ত না। যদিও অনুমান পর্যন্ত করতে পারি না, কেমন করে আমার এই দৃষ্টি-ভঙ্গীকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারব, অথবা সে দর্শনের আদৌ কোন মূল্য থাকবে কিনা' (৩।১০।০১-এর পত্র)।

নিবেদিতার রচনাবলীর মধ্যেই ইহার প্রমাণ যে, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তিনি ভারতকে দেখিবার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়াছিলেন। ঐ দৃষ্টিভঙ্গী স্বামিজী-নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু কার্যধারা স্বামিজী-নিরপেক্ষ।

দীর্ঘ তিন মাস পরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর নিবেদিতা নরওয়ে হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর গ্লাসগো প্রদর্শনীতে তিনি বক্তৃতা দিলেন। অক্টোবর মাসে বেথানী নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র মঠে এক সপ্তাহ কাটাইয়া আসিলেন। মঠটি তাঁহার খুবই ভাল লাগিল। চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা ও কর্মের এক অখণ্ড প্রবাহ সন্ন্যাসিনীগণের জীবনে। এই মঠে বসিয়াই তিনি লিখিলেন, 'আমার পরিকল্পনার কথা কিছুই বলতে পারছি না। কারণ এখন পর্যন্ত সবই অনিশ্চিত। আমি কেবল স্বামিজী ও শ্রীমার কাছে ফিরে যেতে চাই। আমার সব বাসনা এখন এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু স্থির না হচ্ছে, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি লিখতে, আর এইভাবেই উপস্থিত কর্তব্য সমাধান করছি।'

বিশ্রামের ফলে তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং

ভারতে প্রত্যাগমনের জন্য তিনি বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন। নভেম্বর মাস কাটিল অধ্যাপক গেডিজের সহিত আলাপ-আলোচনায়। শ্রীযুক্ত বসুর Living and Non-living নামক পুস্তকের সম্পাদন তিনি এই সময়েই করেন।

৩১শে ডিসেম্বর নিবেদিতা মম্বাসা জাহাজে জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিলেন এবং প্যারিস হইয়া ৯ই জানুয়ারী ঐ জাহাজে উঠিলেন।

মহাপ্রয়াণ

আবার মম্বাসা। এবার সঙ্গে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও মিসেস স্যারা বুল। কলম্বো হইয়া মম্বাসা ৩রা ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ পৌঁছিল। নিবেদিতার নিশ্চয় স্বামিজীর সহিত ইংলণ্ড যাত্রাকালে মাদ্রাজের দৃশ্য মনে পড়িতেছিল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের মহাজন-সভা হলে শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত ও নিবেদিতাকে সংবর্ধনা করা হইল। মিঃ জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার অভিভাষণে নিবেদিতার উল্লেখ করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের সেবায় যাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁহার সেই সহযাত্রিণীকে বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ করায় তিনি বিশেষ আনন্দিত।

নিবেদিতা এই সভায় যে বক্তৃতা দেন, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামিজী লিখিয়াছিলেন....'তাহার বক্তৃতা সত্যই সুন্দর।' এই বক্তৃতায় নিবেদিতার ভারতের প্রতি অকপট ভালবাসা, তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে যাহারা বর্বর দেশরূপে অভিহিত করে, সেই শাসকবর্গের প্রতি রুদ্ধ আক্রোশ অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

বক্তৃতা দিতে উঠিয়া তিনি প্রথমেই বলেন, য়ুরোপ-যাত্রার পূর্বে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ জীবনের সহিত তাঁহার পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। পবিত্রতা, গভীর চিন্তা ও অনুভূতিই ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য। কলিকাতায় অবস্থানকালে ঐগুলিই ছিল তাঁহার জীবন যাপনের মূল লক্ষ্য। ভোগবিলাসপূর্ণ পাশ্চাত্যে ভ্রমণকালে হিন্দু পরিবারের সুখময় গৃহই ছিল তাঁহার স্মৃতি।

অতঃপর হিন্দু জীবন ও চিন্তাধারার আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর জে. সি. বোসের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উল্লেখ-পূর্বক নিবেদিতা বলেন, 'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ধর্ম-ব্যাপারে আপনারা দাতা, পাশ্চাত্যের নিকট আপনাদের শেখবার কিছু নেই। সামাজিক ব্যাপারেও সেই রকম। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের যোগ্যতা আপনাদের যথেষ্ট আছে। বাইরের কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে উপদেশ দেবার, বা হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই। জীবনের অগ্রগতির জন্য পরিবর্তন অপরিহার্য, কিন্তু এই পরিবর্তন মৌলিক, স্বনিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। তিন হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার কি কোন মূল্য নেই যে, পাশ্চাত্য দেশের তরুণ জাতিগুলি প্রাচ্যবাসীদের পরি-

চালিত করবে? "ভারতীয় জীবন অনুন্নত, সুতরাং ভারত চায় অন্যান্য দেশের মত সভ্য হতে," এই উক্তির উত্তরে বলতে চাই যে, আড়ম্বরহীনতাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য আর সভ্যতারও ঐটেই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

'ভারতীয় নারীগণ অশিক্ষিত ও অত্যাচারিত, এই অভিযোগ কোনক্রমেই সত্য নয়। অন্যান্য দেশের চেয়ে এখানে নারীজাতির প্রতি অত্যাচার কম। ভারতীয় নারীর মহৎ চরিত্র তার জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আধুনিক অর্থে তারা অজ্ঞ বটে, অর্থাৎ লিখতে প্রায় কেউই পারে না; অক্ষর পরিচয়ও অতি অল্প স্ত্রীলোকের আছে। কিন্তু তাই বলে কি তারা অশিক্ষিত? যদি তাই হয়, তবে যে সব মা, ঠাকুরমা, দিদিমা ছেলেমেয়েদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও নানা উপাখ্যান বর্ণনা করেন, তাঁদের সকলকেই অশিক্ষিত বলা যেতে পারে। আবার এঁরাই যদি য়ুরোপীয় উপন্যাস এবং কতকগুলি বাজে ইংরেজী পত্রিকা পড়তে পারতেন, তবে আর অশিক্ষিত বলে অভিহিত হতেন না। এটা কি পরস্পরবিরুদ্ধ মনে হয় না?

'প্রকৃতপক্ষে, আক্ষরিক জ্ঞান সংস্কৃতির পরিচয় নয়। ভারতীয় জীবনের সংগে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, ভারতীয় পারিবারিক জীবনের মূলকথা হল মহত্ত্ব, ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ধর্মশিক্ষা, হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ, আর প্রত্যেক ভারতীয় নারীর মধ্যেই এই গুণগুলি বর্তমান। সুতরাং সে নিজের মাতৃভাষা পড়তে এবং নাম সই করতে না পারলেও, সমালোচকরা তাকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, এবং যথার্থ দৃষ্টিতে সে তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত।'

সাধারণতঃ ভারতবর্ষের উপর যে সকল অপবাদ আরোপ করা হইত, তাহার প্রত্যেকটির উত্তর দিয়া নিবেদিতা হয়তো কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ণ বক্তৃতাটি ৮ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার (১৯০২), অমৃতবাজার পত্রিকায় বাহির হয়। নিবেদিতা কিরূপ দৃষ্টিভংগী লইয়া ভারতের উপকূলে অবতরণ করিয়াছিলেন, ঐ বক্তৃতা হইতে তাহা অনুমান করা যায়। শাসকবর্গের পক্ষে অতঃপর তাঁহাকে মিত্রভাবাপন্ন মনে করিবার কোন সংগত কারণ ছিল না, এবং কলিকাতায় আসিবার পরেই তাঁহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার ও চিঠিপত্র খুলিয়া পড়িবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী নিবেদিতা পূর্বপরিচিত বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; এবার ১৭নং বাড়িতে। পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁহার আগমন ঘোষণা করিল।

স্বামিজী তখন অসুস্থতাবশতঃ কাশীতে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। ১০ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে তিনি মিসেস বুলকে

লিখিলেন, 'প্রিয় মাতা ও কন্যাকে আর একবার ভারতভূমিতে স্বাগত জানাইতেছি। জো-কর্তৃক প্রেরিত মাদ্রাজের পত্রিকা আমাকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছে। মাদ্রাজে নিবেদিতার অভ্যর্থনা নিবেদিতা এবং মাদ্রাজ উভয়ের পক্ষেই ভাল হইয়াছে। তাহার বক্তৃতা সত্যই সুন্দর।'

স্বামিজী ঐ পত্রে মিসেস বুলকে তাঁহার ইচ্ছা জানান যে, বিশ্রামের পর তিনি এবং নিবেদিতা যেন কলিকাতার পশ্চিমে কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া বাঁশ, বেত, খড় প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত বাঙ্গালী বাসগৃহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

'প্রাচীনকালে যে ব্যক্তি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিত, সেই আবার অতিথির জন্য পর্ণশালাও নির্মাণ করিত। আহা, নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি আমি ঐ ধরনে নির্মাণ করিতে পারিতাম!'

ঐ বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্বামিজীর কত আগ্রহ ছিল! নিবেদিতার পত্রের উত্তরে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি লিখিলেন, 'সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হউক। মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিতা হউন। অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হউক এবং সম্ভব হইলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর। ইহাই আমার প্রার্থনা।...

'যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখাইয়াছেন, ঠিক সেইভাবে অথবা তদপেক্ষা সহস্রগুণ স্পষ্টরূপে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখাইয়া লইয়া যান।'

ঐ তারিখেই স্বামিজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিলেন, 'তোমার পত্রে সবিশেষ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। নিবেদিতার স্কুল সম্বন্ধে যা আমার বলবার ছিল তাঁকে লিখেছি। বলবার এই যে, তাঁর যা ভাল বিচার হয় করবেন।'

আরব্ধ কার্যের ভার পুনরায় গ্রহণ করায় স্বামিজী নিবেদিতাকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন নির্দেশ দিতে সম্মত ছিলেন না।

১১ই, মঙ্গলবার, নিবেদিতা কামারহাটি গিয়া গোপালের মাকে দেখিয়া আসিলেন। ফিরিবার পথে দক্ষিণেশ্বর গেলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সরস্বতী পূজার পর বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ করিবেন। তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ছোট মেয়েদের ও প্রতিবেশিনীগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ পূর্বের মতই তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দিতে লাগিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্রে নিবেদিতার সরস্বতী পূজার সংবাদ পাইয়া স্বামিজী লিখিলেন, 'নিবেদিতা 'সরস্বতী পূজার ধূমধাম শুনে বড়ই খুশি হলাম। নিবেদিতা শীঘ্রই স্কুল খোলে খুলুক।' নিবেদিতার

সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ির বহুদিনের পুরাতন পরিচারিকা বেট্ আসিয়াছিল, সুতরাং বিদ্যালয় এবং অন্যান্য কার্যেও তাঁহার অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে ১৭নম্বর বাড়িতে তদানীন্তন রাজনৈতিক দল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রায় যাতায়াত করিতেন এবং মাঝে মাঝে নিবেদিতাকে বাংলা পড়াইতেন। মিঃ গোখলে, আবদুর রহমান, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি অনেকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীও নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মহাত্মা গান্ধী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'ভগ্নী নিবেদিতার ঠিকানা পাইলাম।...কথাবার্তায় আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন ঐক্যের সূত্র ধরা পড়িল না।

'পুনরায় একবার পেস্তনজী পাদশাহের বাড়িতে তাঁহার সহিত দেখা হয়। তিনি পেস্তনজীর বৃদ্ধা মাতাকে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় আমি সেখানে উপস্থিত হই। আমি তখন উভয়ের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিলাম। এই ভগ্নীর ভিতরে হিন্দুধর্মের জন্য যে উচ্ছ্বসিত প্রেম ছিল, তাহা তাঁহার সহিত মনের মিল না হইলেও আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাঁহার পুস্তকের পরিচয় পরে পাইয়াছি।'[১]

অনুমান করা যায় নিবেদিতা তখনই রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছেন। এই পরিচয় ইংরেজ অথবা আইরিশ মহিলা বলিয়া নহে; অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের ন্যায় দেশের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষিণী এবং হিতৈষিণী বলিয়াই।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ছিল। স্বামিজী তাহার পূর্বেই মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিবেদিতার সহিত দেখা হইবামাত্র বলিলেন, তিনি চলিয়া যাইতেছেন। স্বামিজীর জাপান গমনের কথা চলিতেছিল, সুতরাং নিবেদিতা ভাবিলেন, তিনি সেই কথাই উল্লেখ করিতেছেন। মঠে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইল। জন্মতিথির দিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দরজায় পাহারা দিতে লাগিলেন। স্বামিজীকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সহিত কথা বলিতে সকলেরই আগ্রহ। নিবেদিতা আরও দু-একজন ইংরেজ মহিলার সহিত মঠে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিলেন।

[১] মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ—পৃঃ ৩৮২

২৩শে মার্চ ক্লাসিক থিয়েটারে নিবেদিতা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয় —'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মন'।

এই বৎসর স্বামিজী মঠে একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। উহাতে নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। স্বামিজী অসুস্থ বলিয়া নীচে নামিতে পারেন নাই; ঘরে বসিয়া জানালা হইতে দেখিতেছিলেন। মিস ম্যাকলাউড নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া স্বামিজী বলিলেন, 'আমি কখনও চল্লিশ পৌঁছাব না।' এ কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিবে, ম্যাকলাউড তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। স্বামিজীর সহিত তাঁহার ও মিসেস বুলের এই শেষ সাক্ষাৎ। ম্যাকলাউড মায়াবতী হইয়া এপ্রিল মাসেই আমেরিকায় ফিরিয়া যান। মিসেস বুলও কয়েকদিন পরে যাত্রা করেন।

এপ্রিলের প্রথমেই কৃস্টীন গ্রীনস্টাইডেল আসিলেন এবং নিবেদিতার সহিত বোসপাড়া লেনে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর অভিপ্রেত কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার বাসনা।

তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জার্মানীর অন্তর্গত নুর্নবার্গ নগরীতে এক জার্মান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃস্টীনের তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করিয়া ডেট্রয়েট নগরীতে বাস আরম্ভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তাঁহাকে মাতা ও ভগিনীগণের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ করেন। বেদান্তদর্শনের প্রতি তাঁহার চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। সহস্রদ্বীপোদ্যানে গভীর ভাবভূমিতে অবস্থিত স্বামিজীর সান্নিধ্যলাভে যাঁহারা ধন্য হইয়াছিলেন, কৃস্টীন তাঁহাদের অন্যতম। এক অন্ধকার রজনীতে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তিনি একটি মহিলা বন্ধুর সহিত স্বামিজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সেই স্থানে আগমন করেন। স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র কৃস্টীন বলিয়া ওঠেন, 'ভগবান ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান থাকলে যেমন আমরা তাঁর কাছে উপদেশ ভিক্ষা করতাম, তেমনি আমরা আপনার কাছে এসেছি।'

স্বামিজী তাঁহাদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'শুধু যদি আমার ভগবান খ্রীষ্টের মত এই মুহূর্তে তোমাদের মুক্ত করে দেবার ক্ষমতা থাকত!' কৃস্টীনের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া স্বামিজী ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, 'আমার কলকাতার কাজের জন্য তাকে চাই।'

দ্বিতীয়বার আমেরিকা আগমনকালে স্বামিজী ডেট্রয়েটে সাত দিন অবস্থান করেন। অতঃপর কৃস্টীন স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্পর্শে আসেন।

ইংলণ্ডেই তাঁহার নিবেদিতার সহিত পরিচয়। অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা ডেট্রয়েট গমন করিলে তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করেন। ডেট্রয়েট শাখা সমিতির তিনি ছিলেন অবৈতনিক সম্পাদিকা। তিনিও একান্তভাবে প্রার্থনা করিতেন, সংসারের দায়িত্ব-অবসানে ভারতে গিয়া নিবেদিতার সহিত স্বামিজীর অভিপ্রেত কার্যে যোগদান করিবেন। নিবেদিতার একজন সহকর্মীর প্রয়োজন ছিল, এবং সেই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই যেন ক্রস্টীনের যথাসময়ে ভারতে আগমন।

ধীর, স্থির, শান্ত, সদা-হাস্যময়ী, মধুরভাষিণী ক্রস্টীন। স্বামিজী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমি জানি যে তুমি মহৎ, এবং তোমার মহত্ত্বে আমার সর্বদা আস্থা আছে। আর সকল বিষয়ে ভাবনা হইলেও তোমার সম্পর্কে আমার অণুমাত্র দুশ্চিন্তা নাই।

'জগজ্জননীর নিকটে আমি তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি। তিনিই তোমাকে সতত রক্ষা করিবেন ও পথ দেখাইবেন। আমি ইহা নিশ্চিত জানি যে, কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কোন বাধাবিঘ্ন মুহূর্তের জন্যও তোমাকে অবসন্ন করিতে পারিবে না।'

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে সংসারের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া ক্রস্টীন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলে স্বামিজী আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ক্রস্টীনের স্বভাব নিবেদিতার বিপরীত। তাঁহার ধীর, স্থির, অবিচলিত ভাব এবং স্বামিজীর উপর নির্ভরতা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিত। য়মকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলি ক্রস্টীনের অজস্র প্রশংসায় পূর্ণ থাকিত। এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—'শান্ত, নির্ভরশীল—তার স্বভাবে ঔদ্ধত্য নেই ; অনুগত ও সহৃদয়।...যথার্থ লোক নির্বাচনে স্বামিজীর কতদূর ক্ষমতা, ক্রস্টীনকে দেখিলে অনুমান করা যায়।'

চরিত্রগত প্রভেদ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইল।

গ্রীষ্মকাল আসিয়া গেল। নিবেদিতা ও ক্রস্টীন মায়াবতী গিয়া গরমটা কাটাইয়া আসিবেন, স্থির করিলেন। স্বামিজী উৎসাহ দিলেন। মায়াবতী কেন্দ্র বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য শিষ্যগণের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠিত, স্বামিজীর অতি প্রিয় স্থান। মিসেস সেভিয়ারের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতাও ছিল। নিবেদিতার সহিত মিঃ ওকাকুরাও মায়াবতী গমন করেন।

১৯০১এর শেষভাগে জাপানের এক বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ আচার্যপাদ ওডা ও মিঃ ওকাকুরা ভারতে আগমন করেন। মিস ম্যাকলাউডের সহিত ইঁহাদের জাপানে পরিচয় হয়। অদূর ভবিষ্যতে জাপানে সম্ভাবিত ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হইবার জন্য মিঃ ওডা স্বামিজীকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন।

শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ স্বামিজীর জাপানযাত্রা ঘটিয়া ওঠে নাই। কিন্তু তাঁহার সাহচর্যে ও তাঁহার সহিত শ্রীবুদ্ধের আলোচনায় মিঃ ওডা ও মিঃ ওকাকুরা উভয়েই অভিভূত হন। ওকাকুরার সহিত স্বামিজী বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করেন। ইঁহাদের সহিত নিবেদিতারও পরিচয় এবং বুদ্ধ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইয়াছিল। ওকাকুরা শিল্পী, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সর্বোপরি, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এক অখণ্ড ভাবগত ঐক্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান। এই সকল কারণেই নিবেদিতার সহিত তাঁহার মনের সংযোগ ঘটে। ওকাকুরা এই সময়ে 'Ideal of the East' নামক পুস্তক লিখিতেছিলেন। নিবেদিতা উহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং সমগ্র পুস্তকখানির সম্পাদনা করেন।

নিবেদিতা, কৃস্টীন, ওকাকুরা এবং আরও দুই-একজন একসঙ্গে ১১ই মে মায়াবতী পেঁছান। তখন কাঠগোদাম হইতে ভীমতাল, ধারী, দেবীধুরা প্রভৃতি হইয়া মায়াবতী যাইতে হইত। পথে তাঁহারা কোথাও হাঁটিয়াছেন ; অধিকাংশ পথ ডাণ্ডীতেই অতিক্রম করেন। সেই সরল বৃক্ষের সারি, রডোডেনড্রন পুষ্পের গুচ্ছ, প্রস্ফুটিত বন্য সাদা গোলাপ আর নানাজাতীয় ফার। বহুদিন পরে আবার দেওদার বৃক্ষতলে বসিয়া নিবেদিতা হিমালয়ের শান্ত নির্জনতা উপভোগ করিলেন। একদিন খুব বৃষ্টি হইয়া বেশ শীত পড়িয়া গেল।

মিঃ সেভিয়ারের জীবৎকালেই স্বামী স্বরূপানন্দ মায়াবতীর অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ও মিসেস সেভিয়ারের আতিথ্যে দিনগুলি আনন্দেই কাটিতে লাগিল। ওকাকুরা কয়েকদিন পরেই চলিয়া গেলেন। কৃস্টীনের একান্ত অভিলাষ, হিমালয়ের এই নিভৃত ক্রোড়ে কিছুদিন ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন। সুতরাং নিবেদিতা একাকী ফিরিলেন।

২০শে জুন মায়াবতী হইতে রওনা হইয়া বেরিলি, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি হইয়া ২৬শে জুন রাত্রে নিবেদিতা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ২৮শে জুন, শনিবার, স্বামিজী আসিলেন নিবেদিতার সহিত দেখা করিতে। বোসপাড়ার ১৭নম্বর গৃহ তাঁহার পাদস্পর্শে ধন্য হইল। নিবেদিতা তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার গৃহে স্বামিজীর এই শেষ আগমন।

শেষের দিনগুলি বড় তাড়াতাড়ি কাটিল। মহাপ্রস্থানের সময় আসিয়া গেল। ২৯শে জুন নিবেদিতা মঠে গেলেন। ২রা জুলাই, বুধবার, নিবেদিতা পুনরায় মঠে গেলেন স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে। কথাবার্তার মাঝখানে স্বামিজী বলিলেন, 'আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে।'

কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করিলেও স্বামিজীর কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিবেদিতার সন্দেহ রহিল না। স্বামিজী অধিকদিন পৃথিবীতে থাকিবেন না, তবে অন্ততঃ আরও তিন-চার বৎসর তিনি সকলের মধ্যে অবস্থান করিবেন, এই ধারণাই নিবেদিতার এবং অন্য অনেকের ছিল। নিবেদিতা একটি বিষয় স্বামিজীর সহিত আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন—বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয় তাঁহার বিদ্যালয়ে পাঠ্য করিবেন কি না। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার তখন একটা বিশেষ ঝোঁক আসিয়াছে ; শ্রীযুক্ত বসুর সহিত আলাপ-আলোচনার ফল। নিবেদিতার যুক্তিগুলি শুনিয়া স্বামিজী ধীরভাবে উত্তর দিলেন, 'তোমার কথা ঠিক হতে পারে, কিন্তু এসব ব্যাপার আমি আর আলোচনা করতে পারি না। আমি মৃত্যুর দিকে চলেছি।'

সাময়িক কোন সমস্যা সম্বন্ধে আর তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক। জাগতিক ব্যাপার হইতে তিনি মন তুলিয়া লইয়াছেন। কাশ্মীরে অবস্থান-কালে একবার পীড়া হইতে আরোগ্যলাভের পর নিবেদিতা প্রভৃতির সম্মুখে স্বামিজী দুইখণ্ড পাথর উঠাইয়া বলিয়াছিলেন, 'যখনই মৃত্যু কাছে আসে, আমার সব দুর্বলতা চলে যায়। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত থাকি। তখন আমি এইরকম শক্ত হয়ে যাই'—তিনি দুই হাতে পাথর দুইখানিকে পরস্পর ঠুকিলেন—'কারণ আমি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছি।' অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বলিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে স্বামিজী কম উল্লেখ করিতেন ; সেজন্যই উপরি-উক্ত ঘটনা দুইটি সকলেই মনে রাখিয়াছিলেন। নানাভাবে ইঙ্গিতও আসিতেছিল মহাপ্রস্থানের ; কিন্তু দুর্বল মানব-মন শুনিয়াও শুনিতে চাহে না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না।

নিবেদিতার প্রশ্নের কোন উত্তর স্বামিজী দিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সেদিন একাদশী। স্বামিজী নিজে উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু নিবেদিতার আহারের ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহারের মধ্যে কাঁঠালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, ভাত এবং বরফ দিয়া ঠাণ্ডা-করা দুধ। প্রত্যেক জিনিস পরিবেশন করিবার সময় সেগুলি সম্বন্ধে স্বামিজী হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। আহারান্তে হাত ধুইবার জন্য তিনি নিজেই নিবেদিতার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া তাঁহার হাত মুছাইয়া দিলেন।

স্বভাবতঃই নিবেদিতা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'স্বামিজী, এ সব আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য নয়।'

অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তর আসিল, 'ঈশা তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।'

নিবেদিতা চমকিত হইলেন, তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, 'সে তো শেষ সময়ে!' কিন্তু কথাগুলি যেন কিরূপে বাধিয়া গিয়া অনুচ্চারিত রহিয়া গেল। ভালই হইয়াছিল। কারণ এখানেও শেষ সময় আসিয়া গিয়াছিল।

এই কয়দিন স্বামিজীর কথাবার্তা ও চালচলনে কোন বিষাদ-গম্ভীর ভাব ছিল না। সকলেই তাঁহার মধ্যে এক জ্যোতির্ময় সত্তার আবির্ভাব অনুভব করিতেন, তাঁহার স্থূল দেহ যেন উহার একটি ছায়া বা প্রতীক মাত্র।

নিবেদিতা মাত্র ঘণ্টা তিনেক ছিলেন। তিনি জানিতেন না, ইহাই শেষ সাক্ষাৎ ; কিন্তু স্বামিজী জানিতেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'বুধবার সকালে আমি আবার গিয়েছিলাম এবং তিন ঘণ্টা ছিলাম। এখন মনে হয়, তিনি জানতেন যে, আমি তাঁকে আর দেখতে পাব না। এত আশীর্বাদ! যদি কেবল আমি জানতে পারতাম! তাঁকে সুস্থ দেখাচ্ছিল। সাবধানে থাকা তাঁর প্রয়োজন, এ কথা আমার বিশেষভাবে মনে ছিল। সেজন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি, পাছে তিনি উত্তেজিত হন। তিনি ক্লান্তবোধ করবেন, এই আশঙ্কায় বেশীক্ষণ অবস্থান করিনি। যদি কেবল জানতাম, প্রত্যেকটি মুহূর্ত কত মূল্যবান!'

স্বামিজীর অনন্ত করুণা ও আশীর্বাদ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া নিবেদিতা ফিরিয়া আসিলেন। ৪ঠা জুলাই, শুক্রবার, স্বামিজী নিবেদিতাকে সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি বেশ সুস্থ বোধ করিতেছেন। নিবেদিতার সহিত বেট্ নামে যে পরিচারিকা আসিয়াছিল, সে ইতিমধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহাকে লইয়া তিনি ব্যস্ত রহিলেন।

৪ঠা জুলাই রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সেই রাত্রে পুনরায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারে করাঘাত। একজন সংবাদবাহক অপেক্ষা করিতেছে। নিদারুণ সংবাদ। স্বামিজী দেহত্যাগ করিয়াছেন। পত্রখানি পড়িয়া নিবেদিতা নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সমগ্র সত্তা যেন লোপ পাইল। সংবিৎ ফিরিয়া আসিবার পরমুহূর্তেই তিনি বেলুড়মঠ যাত্রা করিলেন।

পূর্বদিন ভ্রমণান্তে সন্ধ্যারতির পর স্বামিজী ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তিনি শয়ন করিয়া একজন ব্রহ্মচারীকে বাতাস

করিতে বলিলেন; আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস—স্বামিজী মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন; শরীরটা ভাঁজ-করা পোশাকের মত পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল।

নিবেদিতা মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। স্বামিজীর দেহের কিছুমাত্র পরিবর্তন বা বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। নিজের ঘরে তিনি শয়ন করিয়া আছেন। কী সুস্থ সবল ও জীবন্ত! যেন সমাধিস্থ মহাদেব। নিবেদিতা স্বামিজীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন। এইটুকু সেবা ছাড়া আর কিছুই করিবার ছিল না। মাত্র একদিন পূর্বে যখন আসিয়াছিলেন, তখন যদি একবারও অনুমান করিতে পারিতেন যে মহাসমাধির সময় এত নিকটে! তাঁহার অন্তরের মর্মবেদনা অন্তর্যামীই জানিতেন। বাহিরে কিন্তু ধীর স্থির। একভাবে বসিয়া বেলা দুইটা পর্যন্ত বাতাস করিলেন।

তখন স্বামিজীর দেহ নীচে নামাইয়া আনা হইল, এবং নব গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করিয়া যথারীতি আরতির পর তাঁহার নির্দেশমত গঙ্গাতীরে বিল্ববৃক্ষের সমীপে লইয়া যাওয়া হইল। সকলের অনুসরণ করিয়া নিবেদিতাও আসিয়া দাঁড়াইলেন। শয্যার উপরে যে বস্ত্রখানি ছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িল, শেষবার স্বামিজীকে তিনি ঐখানি পরিতে দেখিয়াছিলেন। ইহাও কি অগ্নিসাৎ করা হইবে? তাঁহার প্রশ্নে স্বামী সদানন্দ জানাইলেন, তিনি ঐ বস্ত্রখানি নিবেদিতাকে দিতে পারেন। কিন্তু কাজটি শোভনীয় হইবে কি না সে বিষয়ে নিবেদিতার সন্দেহ ছিল সুতরাং রাজী হইলেন না। কেবল মনে হইল, জো-র জন্য যদি ঐ বস্ত্রের এক টুকরা কাটিয়া লইতে পারিতেন! তাঁহার ও ধীরা মাতার কথা বিশেষ করিয়া মনে পাড়িতেছিল! মাত্র কয়েকমাস পূর্বে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কি একবারও ভাবিয়াছিলেন, ইহাই শেষ সাক্ষাৎ! জগতে কত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, আশ্চর্য! জ্বলন্ত চিতার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া নিবেদিতা নীরবে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা প্রায় ছয়টার সময় সহসা মনে হইল, কে যেন তাঁহার জামার আস্তিন ধরিয়া টানিল। নিবেদিতা নীচের দিকে তাকাইলেন। হঠাৎ জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্য হইতে তাঁহার প্রার্থিত বস্ত্রখণ্ডের এক টুকরো পায়ের নিকট সরাসরি উড়িয়া আসিয়া পড়িল। নিবেদিতা সাগ্রহে সেটি তুলিয়া লইলেন।

কর্মপ্রবাহ

জীবনের তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। স্বামিজীর আকস্মিক অন্তর্ধান নিবেদিতার নিকট কতখানি মর্মান্তিক ও অসহনীয়, তাহা বাহির হইতে বুঝিবার উপায় ছিল না। তাঁহার ডায়েরীতে ৪ঠা জুলাই লিখিয়াছেন, 'Swami died', অর্থাৎ 'স্বামিজী মারা গিয়াছেন।' মাত্র দুটি শব্দ। নিবেদিতার মনোভাব সম্বন্ধে যাহা খুশি অনুমান করিতে পারা যায়। শোকে অধৈর্য হইবার তাঁহার সময় কোথায়? স্বামিজী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য পড়িয়া আছে। উহার ভার তিনি শিষ্যগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। 'কর্মিগণকে প্রস্তুত করিয়া তাহাদের কর্মে হস্তক্ষেপ না করাই বোধ করি মহাপুরুষগণের অভিপ্রায়।' তাঁহাদের আরব্ধ কার্য স্বাধীন-ভাবে সম্পন্ন করাই পরবর্তীদের প্রথম কর্তব্য। এই কার্য কী? সমগ্র দেশকে আত্মস্থ করা। এ বিষয়ে নিবেদিতার সন্দেহ ছিল না। ইতিমধ্যে অন্য এক প্রবল সমস্যা দেখা দিল। তাঁহার কর্মপ্রণালী লইয়া রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসিগণের সহিত মতের বিরোধ ঘটিল। নিবেদিতা ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের সদস্যা। সংঘ হইতে তাঁহার পদত্যাগ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত নানারকম জল্পনা-কল্পনা ও সমালোচনা হইয়াছে, এবং রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রতি কেহ কেহ কটাক্ষ করিয়াছেন; প্রকৃত ব্যাপার তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

স্বামিজী-প্রতিষ্ঠিত সংঘ, যাহা রামকৃষ্ণ মিশনরূপে পরিচিত, তাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্বামিজী স্বয়ং স্থির করিয়াছিলেন—নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও লোকসাধারণের সেবা; রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। 'The aims and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian, it shall have no connection with politics.' (The Life of Swami Vivekananda, p. 610)

যদিও রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং সমগ্র সন্ন্যাসিসংঘের পরিচালক। সুতরাং সন্ন্যাসিসংঘের কার্যপদ্ধতি তিনি স্বয়ং যেরূপ নির্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য যে পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ধরিয়াই সকলকে চলিতে হইবে; তাহার ব্যতিক্রম করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই।

যে কোন ব্যক্তির স্বনির্বাচিত পথে স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার আছে ; কিন্তু সংঘের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ নিয়মকানুন না মানিয়া চলিলে ক্ষতি নাই, সংঘের পক্ষে নিয়ম পালন অপরিহার্য। পক্ষান্তরে, নিবেদিতা স্বয়ং লিখিয়াছেন, 'গত সারা বৎসর ধরিয়া আমি এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া গিয়াছি যাহা তিনি আমার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার বাহিরে।' আর লিখিয়াছেন—'হিন্দুধর্মই আমার ধর্ম,... কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি!...আমার জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা জড়াইয়া গিয়াছে যাহা স্বামিজীর অনুমোদন লাভ করিবে না।'

স্বামিজী অনুমোদন করিয়াছিলেন কি না জানা নাই ; তবে ইহা ঠিক যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিবেদিতার মত অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, প্রখর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না ও অকপট কর্মীর পক্ষে কোন ব্যক্তির অধীনে অথবা নিয়মকানুনের বশবর্তী হইয়া চলা সম্ভবপর নহে। সুতরাং তিনি নিবেদিতার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল, নিবেদিতার কর্ম তাঁহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। এই অব্যাহত গতির দ্রষ্টারূপে থাকিয়া তিনি বিরুদ্ধ মত প্রকাশে বিরত ছিলেন। নিবেদিতা তাঁহার নব দৃষ্টিভঙ্গী স্বামিজীর নিকট গোপন করেন নাই। মহাসমাধির কয়েক দিন পূর্বে, ২৯শে জুন, স্বামিজীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনাও হয়।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে বিধবাশ্রম বা অনাথ আশ্রম স্থাপন করিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র, কারণ উহা দ্বারা ভাল অপেক্ষা মন্দই হইয়া থাকে। মিশনরীরা অবশ্য ঐ প্রকার আশ্রম করিয়াছে ; কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিধবা ও অনাথদের ক্রয় করিয়া নির্যাতন করিয়াছে মাত্র। ইহার পশ্চাতে ছিল অর্থ ও তরবারি।

স্বামিজীর কথাগুলির উদ্দেশ্য অনুধাবনের চেষ্টা না করিয়া নিবেদিতা আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ, আপনি কি বুঝতে পারছেন না, এই জন্যই আমি বলি যে, অন্য প্রশ্নটির উত্তর সর্বাগ্রে দিতে হবে, তার পরে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপার।' বলা বাহুল্য, নিবেদিতার মনে সর্বাগ্রে যে প্রশ্নটিকে স্থান দিবার কথা উদিত হইয়াছিল, তাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

স্বামিজী উত্তরে বলিলেন, 'তাই হবে, মার্গট, বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক। কেবল আমার মনে হয়, আমি মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছি। এই সব জাগতিক ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ঐদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী নিবেদিতাকে বলেন, 'দেখ, মার্গট, আমি

দেখতে পাচ্ছি, তোমার মধ্যে উপস্থিত এই বিষয়ে একটা দৃঢ়তা এসেছে, যেমন ইতিপূর্বে অন্যান্য বিষয়ে এসেছিল—আর যেমন ঐগুলিও চলে গিয়েছিল, এটাও চলে যাবে।'

নিবেদিতার মনে যখন যে বিষয়ে ঝোঁক উঠিত, তিনি তাহার বশবর্তী হইয়া চলিতেন, ইহা স্বামিজীর জানা ছিল। আর চিন্তাধারা নূতন পথে প্রবাহিত হইলেও নিবেদিতার অটুট বিশ্বাস ছিল, 'সবই স্বামিজীর কাজ, আর স্বামিজী তাঁহাকে সর্বদা সন্তানরূপে গ্রহণ করিবেন।'

নিবেদিতার এই ধারণা কতদূর সত্য, তাহা শেষ সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত স্বামিজীর আচরণে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকৃতই তাঁহার প্রতি স্বামিজীর বিশ্বাস ও স্নেহ একদিনের জন্যও শিথিল হয় নাই। কিন্তু স্বামিজীর অবর্তমানে সমস্যাটি নূতন আকারে দেখা দিল। দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণের পর নিবেদিতা যে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়াইয়া পড়িতেছিলেন, তাহার প্রতিকার স্বামিজী বর্তমান থাকিলে কিরূপে করিতেন, তাহা মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পক্ষে স্থির করা সম্ভব ছিল না। পরন্তু মঠ-মিশন সর্বতোভাবে রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে, স্বামিজীর এই অভিপ্রায় সকলেই অবগত ছিলেন। সুতরাং সংঘের সদস্য থাকিতে হইলে নিবেদিতাকে রাজনৈতিক সংস্রব ও কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের পক্ষে খুবই সঙ্গত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহাদিগকে সেইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন।

৮ই জুলাই নিবেদিতা মঠে গেলেন। সেদিন ওকাকুরা সঙ্গে থাকায় বিশেষ কথাবার্তা হইল না। ১০ই জুলাই পুনরায় মঠে গেলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহিত বহুক্ষণ আলোচনা হইল। তাঁহাদের মতে নিবেদিতার কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের হওয়া উচিত। অথচ নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব। এক মুহূর্তে যেন সব পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। স্বামিজীর উপস্থিতিতে যাহা ছিল, তাহা আর নাই।

জীবনের চরম সংকট সমুপস্থিত। কী গভীর সমস্যা ও দ্বন্দ্ব! কে নিবেদিতাকে সাহায্য করিবে, বলিয়া দিবে তাঁহার পক্ষে কোন্ পথ শুভ! রামকৃষ্ণ সংঘ তাঁহার প্রাণের বস্তু ; স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁহার অকপট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ; এবং স্বামিজী সবেমাত্র পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত সংঘ ও কর্ম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া অত্যন্ত মর্মান্তিক। অথচ সন্ন্যাসিগণের নির্দেশানুসারে কর্মপন্থার পরিবর্তন অসম্ভব। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহার নিকট তাঁহাকে খাঁটী

থাকিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে কে তাঁহাকে পরামর্শ দিবে? বার বার নিবেদিতার মনে হইতে লাগিল, যদি তিনি স্বামিজীর সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ পাইতেন! তাহা হইলে কর্মপন্থা নির্বাচন কত সহজ হইত! গুরুর আদেশেই কেবল তিনি নিজের সর্বপ্রকার মতবাদ বা কর্মপন্থা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মঠে গিয়াও শান্তি পাইলেন না। সমগ্র মঠ স্বামিজীর তিরোধানে শোকে মগ্ন। তাঁহার মনে হইল, এখন কি শোক করিবার সময়? স্বামিজী কি বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যান নাই? শোকাবেগে সে দায়িত্ব পরিহার করিয়া চলা নিবেদিতার দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে, স্বামিজীর অন্তর্ধান এত অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যে, প্রতিমুহূর্ত তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, এক বিরাট কর্মপ্রবাহে যদি নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারেন! স্বামিজীর দেহত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি মিসেস লেগেটকে লিখিয়াছিলেন—

'আমাদের প্রিয় আচার্যদেব চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। জীবনের সান্ধ্য-বন্দনা সমাপ্ত, পৃথিবীর নীরবতা, মুক্তির সম্ভাবনা শেষ। তাঁহার প্রকৃত সেবা করিবার জন্য আমার হৃদয় অধীর—পরিণামে যাহাই হউক। যদি ইহার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিতে হয় তাহাতেও আনন্দিত। তাঁহার কার্য করিবার জন্য যেন শক্তি, বিশ্বাস ও জ্ঞান লাভ করি, ইহাই প্রার্থনা, আর কোন আশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। আর কিছু চাই না। আমাদের প্রিয়জন মরেন নাই; তিনি আমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন। আমি শোক করিতেও পারি না, আমি কেবল কাজ করিয়া যাইতে চাই।'

তাঁহার একমাত্র চিন্তা স্বামিজীর কার্যে সমগ্র মনপ্রাণ সমর্পণ। মঠের সহিত বোঝাপড়া হওয়া আশু প্রয়োজন। নিবেদিতা মন স্থির করিলেন। বর্তমান কর্মপন্থা ত্যাগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মনে প্রাণে তিনি অনুভব করিতেছেন, তাঁহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। সমগ্র দেশ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, সে আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার নাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহিত পুনরায় আলোচনা হইল। স্থির হইল, এতদিন ধরিয়া তিনি যে অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহা সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছু নিজের নানাবিধ কার্যের জন্য রাখিয়া বাকী অর্থ স্বামী সারদানন্দের অভিপ্রায় অনুযায়ী শ্রীমার গৃহনির্মাণের উদ্দেশে দিবেন। স্বামিজীর অবর্তমানে এবং নিবেদিতার বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিকল্পিত বিধবা আশ্রম বা অনাথ-আশ্রম স্থাপনের কোন সম্ভাবনা রহিল না। সমস্ত ব্যবস্থারই অচিন্তনীয় পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

শীঘ্রই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে পত্র আসিল, নিবেদিতা কী স্থির করিয়াছেন জানিবার জন্য।

নিবেদিতা উত্তর দিলেন—

১৭, বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার
কলিকাতা, ১৮ই জুলাই, ১৯০২

প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

আজ সন্ধ্যায় আপনার যে চিঠি পাইলাম, তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি, আপনি সংঘের ও আমার পক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করুন। ব্যাপারটি বেদনা-দায়ক; তথাপি আমার পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে কোন ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহাতে আমার সম্মতি আছে।

যাহা হউক, বিশ্বাস আছে, আপনি এবং সংঘের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আমার শ্রীগুরুর ভস্মাবশেষের বেদীমূলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে ভুলিবেন না।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে লিখিয়া যথাসম্ভব সহজভাবে তাহাদিগকে আমার নূতন পরিস্থিতির বিষয় জানাইয়া দিব।

কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা সহ

রামকৃষ্ণের নিবেদিতা।[১]

এতদিন নিবেদিতা 'Nivedita of the Ramakrishna Order' (রামকৃষ্ণ সংঘের নিবেদিতা) রূপে পরিচিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ সংঘ হইতে নিজের নামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া বেদনাদায়ক; সুতরাং 'Nivedita of

17, Bosepara Lane
Bagbazar
Cal. July 18th. 1902

১ Dear Swami Brahmananda,

Will you accept on behalf of the Order and myself my acknowledgement of your letter received this evening. Painful as the occasion, I can but acquiesce in any measures that are necessary to my complete personal freedom.

I trust, however, that you and other members of the Order will not fail to lay my love and reverence daily at the foot of the ashes of Sri Ramakrishna and my own beloved Guru.

I shall write to the Indian papers and aquaint them as quietly as possible with my changed position.

Yours in all gratitude and good faith.

Nivedita of Ramakrishna.

Ramakrishna' (রামকৃষ্ণের নিবেদিতা) লিখিয়া নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত যুক্ত রাখিলেন। পরে লিখিতেন, 'Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda' (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা)। সত্যই তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-গতপ্রাণা। পরদিনই অমৃতবাজার পত্রিকায় 'সিস্টার নিবেদিতা' শিরোনামা দিয়া সংবাদ বাহির হইল। নিবেদিতার কার্যকলাপের সহিত বেলুড় মঠের সদস্যগণের কোন সম্পর্ক রহিল না।[১]

নিবেদিতার সংঘত্যাগ লইয়া কলিকাতায় পরিচিত মহলে একটা ঝড় উঠিয়াছিল। ইহাতে বুঝো যায়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সমাজে নিবেদিতা কতদূর পরিচিত হইয়া উঠেন। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, দেশসেবা, ব্রাহ্মগণও সমাজ সংস্কার চাহিতেছেন। নিবেদিতার একান্ত আগ্রহ ছিল উভয়ে যুক্তভাবে কাজ করেন। নিবেদিতার ঐ প্রচেষ্টা বৃথা জানিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে চাহেন নাই। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা ঘোষালকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সহ স্বামিজীর পত্রদ্বয় (৬।৪।৯৭ ও ২৪।৪।৯৭) পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। নিবেদিতা তখনো ভারতে আগমন করেন নাই। কিন্তু দুই বছর পরে তাঁহাকে লিখিত স্বামিজীর তৃতীয় পত্রখানি (১৬।৪।৯৯) পাঠে জানা যায়, স্বামিজীর অনুমান যথার্থ। সরলা ঘোষাল স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং এক সময়ে তাঁহার কার্যে আত্মনিবেদনের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে রামকৃষ্ণ সংঘ ও অপরাপর সন্ন্যাসিগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় নিবেদিতার সংঘত্যাগের পর 'ভারতী' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩০৯) সম্পাদকীয় কটূক্তিপূর্ণ মন্তব্য হইতেই প্রমাণিত হয়। স্বামিজীর অপ্রত্যাশিত দেহত্যাগ, নিবেদিতার সংঘত্যাগ এবং মিশনের প্রতি আক্রমণ মিলিয়া সংঘ ও সংঘনেতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর একটা প্রচন্ড আঘাত আসিয়াছিল। তবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সন্ন্যাসিগণ বিচলিত হন নাই এবং আক্রমণের প্রতিবাদ না করিয়া নিরুত্তর থাকাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। নিবেদিতা স্বাধীনভাবে কার্য করিবার জন্য অপরিহার্য বোধে মিশনের সহিত বাহিরের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাকে উচ্চে স্থাপন ও মিশনকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার

১ The Amrita Bazar Patrika, dated Saturday, July 19, 1902.

Sister Nivedita We have been requested to inform the public that at the conclusion of the days of mourning for the Swami Vivekananda it has been decided between the members of the Order at Belur Math and Sister Nivedita that her work shall henceforth be regarded as free and entirely independent of their sanction of authority.

প্রচেষ্টায় উল্লসিত হইবার মত সংকীর্ণ চিত্ত তিনি নহেন, এ-কথা তাঁহার অনুরাগী বন্ধুগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অন্যতম হইল, নিবেদিতাই স্বামিজী পরিত্যক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। কেহ কেহ তাঁহাকে বেলুড়-মঠের অধ্যক্ষরূপেও কল্পনা করিয়াছিলেন। ব্যথিত নিবেদিতা এই সকল মন্তব্যের ও সংঘের উপর আক্রমণের উত্তরে একটি বিবৃতি দিবার প্রয়োজন অনুভব করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় (৩১শে জুলাই, ১৯০২) প্রকাশিত ঐ বিবৃতিতে নিবেদিতা স্পষ্ট করিয়া লেখেন, রামকৃষ্ণ সংঘের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের উপর ন্যস্ত—যাঁহাদের তুল্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অল্পই দেখা যায়। সংঘের কর্তব্য ধর্মীয় সম্পদ ভাণ্ডারের সংরক্ষণ ও বিস্তারসাধন এবং নিবেদিতার সম্পর্ক তাহার সহিত দীন শিক্ষার্থিনী ব্রহ্মচারিণীর, পূর্ণব্রতী সন্ন্যাসিনীর নহে ইত্যাদি। সম্প্রতি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'উদ্বোধনে' (৬৯ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৫০০ পৃঃ) উপরোক্ত বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় বাহুল্যভয়ে উহা হইতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

ইতিমধ্যে স্বামিজীর স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছিল। ১৯শে জুলাই নিবেদিতা যশোহর যাত্রা করিলেন। যশোহরে তিন দিন অবস্থান করিয়া তিনি স্বামিজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

অন্তর্দ্বন্দ্ব সমানেই চলিতেছিল। স্বামিজীর অভিপ্রেত কর্ম নারীজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা ; কেবল সেই কর্মে পূর্বের মত উৎসাহ নাই, আবার সে কর্ম একেবারে ত্যাগ করিতেও মন চায় না। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্পর্ক রহিত হওয়ায় অন্য পরিকল্পনা বিধবা আশ্রম বা অনাথ আশ্রম স্থাপনের—আর সম্ভাবনা রহিল না। তাঁহার মনে হইত, প্রাচ্য নারীর জীবনের গতি যে পথে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার কোনপ্রকার পরিবর্তন করিবার কি অধিকার তাঁহার আছে? দশ-বারোটি মেয়ের মধ্যে শিক্ষা এবং আদর্শ প্রচারে লাভ কী? বরং পুরুষদের মত মেয়েদের মধ্যেও যদি জাতীয় চেতনা সঞ্চার করিয়া তাহাদের বৃহত্তর সমস্যা ও দায়িত্বের প্রতি তাহাদিগকে অবহিত করা যায়, তবে বহুগুণ বেশী কার্য হইবে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিলে তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিবে কী তাহাদের প্রয়োজন। 'হতে পারে, আমার এই সকল যুক্তি ভ্রান্ত। কেবল আমি জানি, আমার কাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা, কয়েকটি মেয়েকে প্রভাবিত করা নয়।' নিবেদিতা জানিতেন, কার্যে সাফল্য অনিশ্চিত। নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাহার জন্য কার্যক্ষেত্রে

কোন শৈথিল্য আসা উচিত নহে। 'আমাদের কি কর্তব্য নয়, মহাশক্তির তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়া? তীরে উত্তীর্ণ হব কি না সে ভার মহামায়ার উপর। তোমার কি মনে নেই যে, তিনি বলেছিলেন, যখন কোন মহাপুরুষ তাঁর কর্মীদের প্রস্তুত করে তোলেন, তখন তাঁর অন্যত্র সরে যাওয়া উচিত, কারণ তাঁর উপস্থিতি দ্বারা কর্মীদের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়?'

এইভাবে চিন্তার দ্বারা নিবেদিতা স্বয়ং যে পথ নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহা অনুমোদন করিবার দৃঢ়তার জন্য নিজের মনে সর্বপ্রকার যুক্তি অনুসন্ধান করিতেন এবং সেগুলি জোরাল ভাষায় ম্যাকলাউডের নিকট উপস্থিত করিতেন—তাঁহার সমর্থন লাভের আশায়।

২৯শে জুলাই ক্লাসিক থিয়েটারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় নিবেদিতা বক্তৃতা দিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিপুল জনসমাগমের প্রতি নির্দেশ করিয়া নিবেদিতা বলেন, 'এই ধরনের সভায় কেহই বলিতে পারে না যে, বাংলাদেশে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বর্তমান। এক বিরাট জাতির সদস্য হিসাবে এই সভায় সকলে যোগদান করিয়াছে এক মহাপুরুষের স্মৃতি পালন করিবার উদ্দেশ্যে।'

যশোহর ও ক্লাসিক থিয়েটারে প্রদত্ত বক্তৃতা দুইটিকে তাঁহার পরবর্তী ব্যাপক বক্তৃতা-সফরের উদ্বোধন বলা যাইতে পারে।

আগস্ট মাসের প্রথমেই তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ মঠ হইতে আসিয়া চিকিৎসা ও ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। নিবেদিতা পুরা নিরামিষাশী ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য বোধে তাঁহারা অন্যবিধ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন। এই ঘটনায় নিবেদিতা উপলব্ধি করিলেন যে, মঠের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বাহ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হইলেও স্বামিজীর গুরুভ্রাতারা, বিশেষতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই; সংঘকে নিরাপদ রাখিয়া স্বামিজীর নির্দেশানুসারে কাজ করিবার জন্য একটি অত্যাবশ্যক পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন মাত্র। সর্বপ্রকার বিপদে তাঁহাদের সাহায্য লাভ করিবেন, এই পরম আশ্বাস নিবেদিতার মনোবেদনা অনেকাংশে লাঘব করিল। বাকীটুকু স্বাধীন জীবনযাত্রার জন্য স্বীকার্য।

অসুস্থ অবস্থায় নিবেদিতা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলেন, কী কঠোর জীবন তাঁহার সম্মুখে। বাড়ীভাড়া, লোকজন রাখিবার খরচ, নিজের আহার এবং একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহ—সমস্তই আছে; নাই কেবল অর্থাগমের কোন উপায়। তথাপি স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের

প্রশ্ন মুহূর্তের জন্যও তাঁহার মনে উদিত হইত না। এই কঠোর জীবনই তো তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন! 'The Web of Indian Life' পুস্তকখানি শীঘ্র শেষ করিয়া ছাপাইবার কথা বার বার মনে উঠিত, যদি উহা দ্বারা কিছু অর্থাগম হয়।

সুস্থ হইয়া উঠিবামাত্র তিনি কার্য আরম্ভ করিলেন। 'আমার কাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা', দিবারাত্র ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। এ কাজ স্বামিজীর, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। স্বামিজীর একটি কথা কেবল তাঁহার মনে জাগিত, 'আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্তও নয়, আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।' ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী স্বদেশে পদার্পণ করিবার পর কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত এবং তাহার পরেও স্বামিজী সর্বত্র যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে অনুধাবনপূর্বক নিবেদিতার মনে হইয়াছিল, নিছক ধর্মপ্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না ; আবার তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমাজ-সংস্কারকগণ হইতে পৃথক রাখিয়াছিলেন! তাঁহার অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় সকলের মধ্যে মানুষ হইবার প্রেরণা জাগিতেছিল। 'Man-making'—মানুষ তৈরী করা—ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সমগ্র দেশকে আত্মস্থ হইবার যে প্রবল প্রেরণা স্বামিজী দিয়া গিয়াছেন তাহা জাগ্রত রাখিবার এক প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিবেদিতা অনুক্ষণ নিজের মধ্যে অনুভব করিতেছিলেন। স্বামিজীর বাণী ভারতের সর্বত্র ঘোষণা করিতে হইবে ; প্রচার করিতে হইবে তাঁহার মহৎ আদর্শ। তবেই এ জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচিবে, এবং তখনই ভারতের মহিমা জগতের মধ্যে পুনরায় বিঘোষিত হইয়া নরনারী-নির্বিশেষে সকলকে উচ্চতম জীবনের সন্ধান দিবে।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় নানাস্থানে বিভিন্ন সমিতি কর্তৃক স্বামিজীর উদ্দেশ্যে যে সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, নিবেদিতা তাহার প্রায় সবগুলিতে স্বামিজী সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৯০২এর ২৩শে আগস্ট কলিকাতায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' স্থাপনের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। বহুবার ঐ সোসাইটিতে তিনি বক্তৃতা দিয়াছেন এবং এই আশা অন্তরে পোষণ করিতেন যে, কালে বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপিত বহু 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' স্বামিজীর আদর্শ ও ভাবধারা চতুর্দিকে প্রচার করিবে।

২১শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতার ভ্রমণ এবং বক্তৃতা-পর্ব আরম্ভ হইল। নাগপুর হইয়া ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি বোম্বাই পৌঁছিলেন। সঙ্গে স্বামী সদানন্দ। তাঁহার পূর্বপরিচিত মিঃ পাদশাহ ছিলেন ঐ শহরে তাঁহার বক্তৃতার

ব্যবস্থায় অন্যতম উদ্যোক্তা। ২৬শে, ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর গেটী থিয়েটারে তিনি যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দ', 'এশিয়ার জীবন' ও 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দুমন'—পরপর এই তিনটি বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতার ফলে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বিপুল আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। নিবেদিতার স্বলিখিত পত্র (১।১০।০২) হইতে জানা যায় প্রতি বক্তৃতায় সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন।

তৃতীয় দিনের বক্তৃতায় নিবেদিতা বলেন, ভারতের যুবক এবং ছাত্রগণের নিকট ভারতীয় স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মচর্য-পালন অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই। ব্রহ্মচর্যই উচ্চ জাতীয় আদর্শ—যাহা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও শক্তি প্রদানে সমর্থ। এই ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারাই যে-কেহ স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করিয়া জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিতে এবং জাগতিক মোহ দূর করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে। ঐ বক্তৃতায় ছাত্রগণ বিশেষ অনুপ্রাণিত বোধ করে।

১লা অক্টোবর হিন্দু ইউনিয়ন ক্লাবের সদস্যগণ নিবেদিতাকে একটি চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করেন। বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদের পরিবারের মহিলারা যাহাতে নিবেদিতার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করেন। অধ্যাপক পাধ্য ইংরেজীতে তাঁহার পরিচয় দেন। সার বালচন্দ্র কৃষ্ণ মারাঠী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ-পূর্বক তাঁহার শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার বোম্বাই শহরে আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। নিবেদিতা তাঁহার ভাষণে মহিলাগণের সংস্পর্শে আসায় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, তাঁহারা যদি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যাকে দেখিবার পরিবর্তে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিতেন, তবে নিশ্চিত উহা বহুগুণ ভাল হইত। মারাঠী ভাষায় বলার অক্ষমতা-হেতু তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

২রা অক্টোবর হিন্দু লেডিজ সোশ্যাল ক্লাবের উদ্যোগে একটি বক্তৃতার আয়োজন হয়। তাঁহার সংবর্ধনার জন্য একটি ক্ষুদ্র মঞ্চ নির্মাণ করা হইয়াছিল। বক্তৃতা দিতে উঠিয়া নিবেদিতা বলেন, 'ভারতীয় নারী' বিষয়টি তিনি স্বয়ং নির্বাচন করেন নাই ; বিশেষতঃ সভায় বহুসংখ্যক হিন্দু নারীর সমাবেশে ঐ বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া তাঁহার মনে হয় ধৃষ্টতা মাত্র। সুতরাং তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করা হইলে অথবা অন্য কোন বিষয় স্থির করিয়া দিলে তাঁহার পক্ষে সুবিধা হয়।

অতঃপর তাঁহার স্বধর্ম পরিত্যাগের কারণ কী, এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদিতা বর্ণনা করেন, কিরূপে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে খ্রীষ্টান ধর্মের মতবাদ

সম্পর্কে তাঁহার মনে গভীর সংশয় জাগে, এবং স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ লাভের পর জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়।[১]

অবশেষে তিনি বলেন, 'আমি ভারতকে ভালবাসি, কারণ জগতের ধর্মমত-গুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ভারত তার জন্মদাত্রী।

'...হে ভগ্নিগণ, আপনাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত ভালবাসা আছে, কারণ আপনারা এই প্রিয় ভারতভূমির কন্যা। আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিবর্তে এই মহিমময় প্রাচ্য সাহিত্যের অনুশীলন করুন। আপনাদের সাহিত্যই আপনাদের উন্নত করবে। আপনাদের পারিবারিক জীবনের যে সরলতা ও গাম্ভীর্য, তা যেন অটুট থাকে। প্রাচীন কালে এই পারিবারিক জীবনে যে পবিত্রতা ছিল, এবং যা এখনও আপনাদের ঘরে রয়েছে, সেই পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

'পাশ্চাত্যের আধুনিক রীতিনীতি ও আড়ম্বর এবং তার ইংরেজী শিক্ষা যেন আপনাদের বিনম্র সৌজন্য নষ্ট না করে।...আমার এই অনুরোধ কেবল হিন্দু ভগ্নিগণের কাছে নয়, মুসলমান ভগ্নিগণকেও আমার এই অনুরোধ। আপনারা সকলেই আমার ভগ্নী, কারণ যে দেশকে আমি স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছি, এবং যেখানে আমি আমার গুরুদেব বিবেকানন্দের অভিপ্রেত কাজ করে যেতে আশা করি, আপনারা সকলেই সেই দেশের কন্যা।'

বক্তৃতান্তে ক্লাবের অধ্যক্ষা মিসেস এন. এন. কোঠারী নিবেদিতাকে মূল্যবান বক্তৃতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ক্লাবের পক্ষ হইতে নিবেদিতার এই আগমন স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে একপ্রস্থ ঋগ্বেদ গ্রন্থ এবং ১০৮ রুদ্রাক্ষের একটি মালা উপহার দেওয়া হয়। মহিলারা তাঁহার ললাটে কুঙ্কুমের টীকা দিয়া দেন। নিবেদিতা বলেন, এই মালার প্রত্যেকটি রুদ্রাক্ষের উপর তিনি ভারতীয় ভগ্নীগণের জন্য মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবেন।

৪ঠা অক্টোবর গিরগাঁও অঞ্চলে তত্রত্য অধিবাসীদিগের উদ্যোগে একটি বক্তৃতার আয়োজন হয়। উহাতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভামণ্ডপে টেবিলের উপর স্বামী বিবেকানন্দের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি দেখিয়া নিবেদিতা তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া ফেলেন। আনন্দের সহিত তিনি বলেন —'এইরূপ এক সভায় অভ্যর্থনার জন্য আপনাদিগকে বহু ধন্যবাদ। আমাদের মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশ, সামনে হরিৎ বৃক্ষ—এই পামজাতীয় বৃক্ষ যুরোপে

[১] ভারত-তীর্থে নিবেদিতা পৃঃ ৩২৯

বিজয়লাভের সূচনা জ্ঞাপন করে।' সভাস্থ সকলে এই কথায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

অতঃপর স্থানীয় পুস্তকাগার পরিদর্শনান্তে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

৬ই অক্টোবর গেটী থিয়েটারে বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতীয় নারী'। ঐদিন সংরক্ষিত আসনের জন্য টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা বলেন, আধুনিক যুগে য়ুরোপে নারীগণ সমাজে যে পদমর্যাদা উপভোগ করেন, প্রাচ্যে বৈদিক যুগে নারীগণ তাহার অনুরূপ মর্যাদা লাভ করিতেন। পাশ্চাত্যে নারীর আদর্শ দান্তের 'বিয়াত্রিচে', ভারতে যুগ যুগ ধরিয়া সীতা এবং সাবিত্রীই পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। ধর্মানুভূতিই সমগ্র এশিয়ার নারীজাতির আদর্শকে এরূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এশিয়াতে নারী পূজা পাইয়াছে।

ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষা কী ধরনের হইবে, তাহাই প্রশ্ন। ইংরেজী লিখিতে ও পড়িতে পারাই শিক্ষা নহে। মানুষ হওয়ার শিক্ষালাভ করা চাই। উন্নতির সম্ভাবনার মূলে যে অন্তরায়গুলি বর্তমান, তাহা দূর করিতে পারিলেই ভারতীয় নারী যথার্থ শিক্ষার আধার হইবে।

সমগ্র বোম্বাই শহরের বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলাগণ নিবেদিতার সংস্পর্শে আসিয়া মুগ্ধ হন। তরুণ ছাত্রগণ তাঁহার বক্তৃতায় স্বদেশ-প্রেমের অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

'বোম্বাই গেজেট', 'টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় তাঁহার বক্তৃতাগুলির পূর্ণ বিবরণ ও তৎসহ উচ্চ প্রশংসা থাকিত।

৭ই অক্টোবর নিবেদিতা নাগপুর যাত্রা করেন। এখানে তিনি বিচারপতি মিঃ কোল্‌হটকারের বাড়িতে অবস্থান করেন এবং ৮ই হইতে ১১ই পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় বক্তৃতা দেন। ঐ সকল বক্তৃতায় অত্যধিক জনসমাগম হইয়াছিল। ১১ই অক্টোবর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহাকে তিনটি বক্তৃতা দিতে হয়। এখানেও সর্বত্র তিনি বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন ও শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা যায়। বিশেষ করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ দলে দলে তাঁহার নিকট আসিত। তাহাদের সঙ্গে স্বামিজীর প্রসঙ্গ করিয়া তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা দিতেন। একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনি সভানেত্রীত্ব করেন। এখানেও এক মহিলা-সভায় চায়ের আসরে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়।

১৪ই অক্টোবর ওয়ার্ধা পৌঁছিয়া ঐ দিনই সন্ধ্যায় 'খ্রীষ্টধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল—'স্বামিজী' এবং 'ভক্তি ও শিক্ষা'।

ইহা ব্যতীত সারাদিন ধরিয়া বহুলোক তাঁহার নিকট স্বদেশ ও স্বামিজী সম্বন্ধে মূল্যবান প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন।

ওয়ার্ধা হইতে তিনি ১৬ই অক্টোবর অমরাবতী গমন করেন এবং ১৭ই ও ১৮ই পরপর 'এশিয়ার মহাপুরুষগণ' ও 'আধুনিক চিন্তায় হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অতঃপর সুরাট হইয়া তিনি বরোদায় আগমন করেন। এখানে ২১শে, ২২শে ও ২৩শে যথাক্রমে বক্তৃতার বিষয় ছিল—'প্রাচীন ও নূতন', 'এশিয়ার ঐক্য' ও 'শক্তিপূজা'। বরোদার মহারাজা ও মহারাণী কর্তৃক একটি চায়ের আসরে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বরোদা-আগমন একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ এখানেই শ্রীঅরবিন্দের সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁহার বরোদা আগমন ও শ্রীঅরবিন্দের সহিত পরিচয় লইয়া নানাবিধ কাল্পনিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। নিবেদিতার স্বলিখিত কোন বিবরণ নাই।

শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার সহিত তাঁহার যোগাযোগ সম্পর্কে শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখার বহু প্রতিবাদ করিয়াছেন। সে সকল যথা সময়ে আলোচ্য। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 'নিবেদিতা বরোদার গাইকওয়াড় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জানা নাই ; তবে তিনি রাজ-অতিথি-রূপে বরোদায় বাস করিয়াছিলেন। নিবেদিতা আধ্যাত্মিক অথবা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে না। আমরা রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলিয়াছিলাম।' শ্রীঅরবিন্দ কাশীরাওএর সহিত তাঁহাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে যান। স্টেশন হইতে শহরে আসিবার পথে নিবেদিতা যখন কলেজের বাড়ি এবং উহার উচ্চ গম্বুজের সৌন্দর্যহীনতার তীব্র নিন্দা ও নিকটস্থ ধর্মশালার প্রশংসা করেন, তখন কাশীরাও অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই মহিলা সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ।'[১]

নিবেদিতার ডায়েরী হইতে জানা যায়, ২৩শে অক্টোবর 'শক্তিপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার পর রাত্রে মহারাজার নিকট হইতে এক পত্র পাইয়া তিনি বিচলিত বোধ করেন। পরদিন তিনি মহারাজা ও মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

বরোদা হইতে রওনা হইয়া তিনি আহমেদাবাদ গমন করেন। এখানে ২৬শে. ২৮শে, ২৯শে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'কর্ম', 'এশিয়ার ঐক্য' ও 'স্বামিজী'। একদিন স্থানীয় মহিলাগণের এক আসরে উপস্থিত ছিলেন।

[১] Sri Aurobindo on Himself, p, 96-97

আহমেদাবাদ হইতে বাঁদরা আগমন করিয়া তিনি কন্‌হেরি গুহাগুলি পরিদর্শন করেন। অতঃপর দৌলতাবাদ হইয়া ইলোরার বিখ্যাত গুহাগুলি দেখিয়া ৭ই নভেম্বর কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অত্যধিক বক্তৃতার ফলে তিনি ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন, সুতরাং বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ২৩শে নভেম্বর চন্দননগরে বক্তৃতা দিয়া আসিলেন। ইহা ব্যতীত বিবেকানন্দ সোসাইটি ও নিউ ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউটে দুইটি বক্তৃতা দেন।

দাক্ষিণাত্যে

নিবেদিতার বক্তৃতা-অভিযান শেষ হয় নাই; মাদ্রাজ হইতে বার বার আহ্বান আসিতেছিল। ৮ই ডিসেম্বর তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেন। মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত 'কাস্‌ল কার্নান' নামক ভবনে তিনি বাস করেন। এ যাত্রায়ও স্বামী সদানন্দ সঙ্গে ছিলেন।

মাদ্রাজ আগমনের পর স্বামী সদানন্দ ভুবনেশ্বরের নিকট খণ্ডগিরি পাহাড়ে 'ক্রিসমাস ইভ' (খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব-সন্ধ্যা) পালনের প্রস্তাব করেন। নিবেদিতার বক্তৃতার কার্যসূচী পূর্বেই নির্ধারিত হওয়ায় বড়দিনের সময় মাদ্রাজ ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ১৩ই ডিসেম্বর তাঁহারা ঐ দিনটি পালন করেন। নিবেদিতা ও স্বামী সদানন্দর সহিত রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দও (তখন ব্রহ্মচারী, সবে মঠে যোগদান করিয়াছেন) গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় একখানা জ্বলন্ত মোটা কাঠের গুঁড়ির চারিধারে ঘাসের উপর তাঁহারা বসিলেন। একদিকে পাহাড়ের গায়ে গুহাগুলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। নিস্তব্ধ রজনীতে কেবল বায়ু-বিকম্পিত, সুপ্ত অরণ্যানীর মৃদু শব্দ। স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন। ঈষৎ আলোকে তাঁহাদিগকে কৃষকের মত দেখাইতেছে। সেণ্ট লুক-প্রণীত ঈশার জীবনী তাঁহাদের সঙ্গে। পরিকল্পনা ছিল, ঈশার আবির্ভাবের পূর্ব-রজনীতে দেবদূতগণের আবির্ভাব প্রভৃতি পাঠ করার সঙ্গে সকলে মনে মনে সেই দিব্য রজনীর কল্পনা করিবেন। নিবেদিতা পড়িতে লাগিলেন; পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। একের পর এক অধ্যায় পড়া চলিতে লাগিল। লুক-প্রণীত বাণীর সরলতা যেন স্পষ্টরূপে অনুভূত হইল। সেই অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশ পাঠের পর অবশেষে মৃত্যু এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে পুনরুত্থানও পঠিত হইল। পুনরুত্থানের বর্ণনাটি আর মনে হইল না যে স্থূল অলৌকিক কাহিনী। সত্যই যেন এক দিব্যানুভূতি। যে দিব্যমানবের সঙ্গ নিবেদিতা এবং স্বামী সদানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মহৎ জীবনালোকে যেন সমগ্র ঘটনাটিই প্রত্যক্ষ, সত্য ও জাগ্রত বলিয়া বোধ হইল।

নিবেদিতা সেই রজনীর তন্ময়তা ও অনুভূতি পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিতভাবে শেষ করিয়াছেন—

'ঈশ্বর করুন, আমাদের আচার্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা, স্বয়ং মৃত্যুও

যাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য আমাদের নিকট মাত্র স্মরণীয় বস্তু না হইয়া সর্বদা জ্বলন্ত জাগ্রতভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।'

এক গভীর অনুভূতি লইয়া নিবেদিতা খণ্ডাগিরি হইতে পুনরায় মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন।

পথে ওয়াল্‌টেয়ার, বেজওয়াড়া, গুণ্টাকল প্রভৃতি স্থানে নামিয়া তিনি ১৯শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ পোঁছেন এবং তথায় প্রায় একমাস অবস্থান করেন। ঐ দিন হইতে প্রায় প্রতিদিন তিনি বহুলোক সমক্ষে নানা আলোচনা বা প্রসঙ্গ করিতেন। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় 'সিস্টার নিবেদিতা' নাম দিয়া তাঁহার বক্তৃতা ও আলোচনা-সভার ঘোষণা থাকিত, এবং বক্তৃতাগুলি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইত।

২০শে ডিসেম্বর 'ইয়ং মেনস্ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন' কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া মৈলাপুর পাচায়াপ্পা হলে নিবেদিতা 'ভারতের ঐক্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মিঃ এন. সুব্বারাও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ নটেশান, অধ্যাপক রঙ্গাচার্য প্রভৃতি মাদ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কয়েকজন শিষ্যসহ সভায় যোগদান করেন। বহুসংখ্যক ছাত্র ঐ বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল।

বক্তৃতার প্রারম্ভে নিবেদিতা শিবগুরুর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন, ভারতের ঐক্য কথাটি অনেকের নিকট পরিহাসব্যঞ্জক বস্তু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ সন্ধ্যায় তাঁহারা সমবেত হইয়াছেন ভবিষ্যতে ভারতে ঐক্য স্থাপন সম্ভব কি না, অথবা অতীতে ঐক্য বিদ্যমান ছিল কি না, তাহা লইয়া চিন্তা বা আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে নয়।

'হয় এখনই ভারতবর্ষে একতা আছে, নয় কোনদিনই আমাদের মধ্যে একতা সম্ভব হবে না। একতা নেই, একথা কাউকে উচ্চারণ করতে দেবেন না। যারা কেবল বলে বেড়ায়, আমরা দুর্বল, বিভক্ত, আর্ত, অসহায়, পরাধীন, কিন্তু যদি আমরা লড়াই করি ও যত্নপর হই, তবে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি—তাদের এই ধরনের স্বদেশপ্রেম (ইংরেজীতে যাকে বলে কুমীরের কান্না) কখনো যেন প্রশ্রয় না পায়। দেশ ও জাতির মধ্যে মুহূর্তের জন্যও যদি ঐ নিদারুণ ক্ষত দেখা দেয়, আমার ভয় হয়, হয়তো আমরা তাই সত্য বলে ধরে নেব, আর কোনদিনই সেই ধারণা থেকে নিষ্কৃতি পাব না। ত্রিশ কোটী লোকের সমষ্টি এক বিরাট জাতির জীবনে সামান্য একপুরুষ সময় কিছুই নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধি ও বিচারের প্রয়োজন। সম্পূর্ণ

সুস্থতা অপরিহার্য। স্বদেশপ্রেম শারীরিক উত্তাপবিশেষ নয়, যা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে পর মুহূর্তে অবসন্ন করে দেয়। আমি আপনাদের নিকট একটি মাত্র শব্দ স্থাপিত করতে চাই, যে শব্দ আপনাদের প্রতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যেন উচ্চারিত হয়—সেটি হল "জাতীয়তা"।

'মানবজীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা অনুসারেই মানুষ মহান্ ও শক্তিশালী হয়। এদেশে ভারতবাসীদের চেয়ে য়ুরোপীয়েরা বেশী শক্তিশালী। এর কারণ অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট। তারা নিজ সম্প্রদায় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোগ রেখে কাজ করতে সর্বদা তৎপর। আর এদেশের লোকের কাজের ধরন দেখলে মনে হয় না যে, তার দেশের সংহতি সম্বন্ধে তার এতটুকু হুঁশ আছে।'

নিবেদিতা বলেন, মধ্যাহ্ন-গগনের সূর্যের মত তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছেন যে, ভারতবর্ষে এক অখণ্ড, শক্তিশালী, অনুপম মহান্ ঐক্য বিরাজ করছে, এবং তিনি আশা করেন, শীঘ্রই সেই সময় আসছে যখন সকলে সেটা ধারণা করে সেই শক্তির বলে কাজ করতে সমর্থ হবে।

'পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুজাতিই প্রত্যক্ষ করেছে যে, মনই জগতের সৃষ্টিকর্তা ; জগৎ মন সৃষ্টি করেনি। আমরাই জগতের স্রষ্টা। উদীয়মান তরুণ ছাত্রসম্প্রদায়, যাদের মন নবীন ও মুক্ত, যাদের সম্পর্ক কেবল আগামী কালের সঙ্গে, তাদের কাছে একথা বিশেষরূপে সত্য। আমরা শুনে থাকি যে, পঞ্চাশ বছর আগে ভারতে একতা বলে কিছু ছিল না। একথা সত্য যে, ডাকবিলির প্রচলন, রেলপথে যাতায়াত ও ইংরেজীভাষার ব্যবহার এক বৃহত্তর অখণ্ড ভারত গঠনে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের পূর্বে ভারতে ঐক্য ছিল না, এই ধারণাকে আমি অবজ্ঞার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চাই। যদি ভারতের নিজস্ব ঐক্য না থাকত, তবে বাইরে থেকে কোন প্রকার ঐক্য সাধন সম্ভব হত না।'

বক্তৃতার উপসংহারে নিবেদিতা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'আপনারা যেন কোন-মতেই জাতীয়তার জন্য ধর্ম পরিত্যাগ করবেন না। সব রকম শৃঙ্খল চূর্ণ করুন। প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে, অন্তরের অন্তস্তলে হৃদয়ঙ্গম করে তাকে নতুন ভাবে প্রকাশ করা চাই। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে এই দাক্ষিণাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল—ভারতের প্রতি তাঁর সেই মহৎ বাণী উচ্চারণ করে আমি বক্তৃতা শেষ করতে চাই—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' বক্তৃতান্তে মিঃ নটেশান ও অধ্যাপক রঙ্গাচার্য বক্তৃতার অকুণ্ঠ প্রশংসাপূর্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

২৩শে ডিসেম্বর এক মহিলা সভায় নিবেদিতার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ঘটনাবশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় ২৭শে ডিসেম্বর পুনরায় ঐ সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু নির্ধারিত দিনে বক্তৃতা না দিবার কারণ দেখাইয়া এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি মাদ্রাজের মহিলাদিগের উদ্দেশ্যে 'খোলা চিঠি' নাম দিয়া এক বিবৃতি দেন। ২৪শে ডিসেম্বর উহা 'হিন্দু' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ভারতীয় নারীগণের প্রতি নিবেদিতার এই পত্রে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কী সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে! তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া লেখেন, 'আমি বুঝেছি, আমার গুরুদেবের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবশতঃই আপনারা দলে দলে সভায় সমবেত হয়েছিলেন। যদি আপনাদের সংগে আমার দেখা হত এবং আপনাদের নিকট বর্ণনা করতে পারতাম, পাশ্চাত্যে আমাদের নিকট তাঁর আগমনের কী অর্থ, এবং তাঁর স্বদেশবাসীর উপর তাঁর কী প্রচন্ড আশা ছিল, তাহলে সত্যই আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করতাম।

'তাঁর (স্বামী বিবেকানন্দের) দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের পুরুষের চেয়ে নারীর উপর বেশী নির্ভর করছে। আর আমাদের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ। একমাত্র ভারত-ললনাই প্রাচীনকালে সানন্দে মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করত, কেউ তাকে নিবৃত্ত করতে পারত না। সীতা ভারতের নারী ছিলেন, সেই রকম সাবিত্রী ও উমা। কঠোর তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে লাভ করা—এই হল ভারতীয় নারীর চিত্র।...সকল দেশেই জাতি তার পবিত্রতা ও শক্তি, এই দুই সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত করে এসেছে, পুরুষের উপর নয়। মুষ্টিমেয় পুরুষ হয়তো কোথাও কোথাও আচার্যরূপে পরিগণিত হয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশকেই জীবিকা অর্জনেব জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে। গৃহেই তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন ; তাঁদের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি এবং মহত্ত্বের উৎস যে গৃহ-পরিবেশ তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত। ভারতীয় মাতা ও বধূ, আপনাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং শঙ্করাচার্য তাঁদের মায়ের কাছে কতদূর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মত নীরব, শান্ত জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন! বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতা লাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐ সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতে সংগ্রামের দ্বারা নয়।

'আজ আমাদের দেশ এবং ধর্ম দারুণ দুর্দশায় এসে পড়েছে। ভারতমাতা এই মুহূর্তে তাঁর মেয়েদের বিশেষভাবে আহবান করছেন· তাঁরা যেন প্রাচীন-

কালের মত শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। কী করে তা সম্ভব হবে? আমাদের সকলেরই এই প্রশ্ন। প্রথমতঃ, হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা ফের জাগিয়ে তুলুন। এ ছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্য লাভ সম্ভব নয়। ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান্ আদর্শ নেই ; যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে আর কোথায় তাকে রক্ষা করবার আশা করা যেতে পারে? ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তানেরা মহৎ হবে।

'দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরদুঃখ-কাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপদ্‌গ্রস্ত তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বহু শক্তিশালী কর্মী জন্মাবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই স্বদেশের কাছ থেকেই আমরা সব পেয়েছি—জীবন, আহার, বন্ধু, পরিজন ও শ্রদ্ধা। এই দেশই কি আমাদের প্রকৃত জননী নন? আবার কি তাঁকে মহাভারতরূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করব না?

'প্রিয় জননী ও ভগিনিগণ, আমার মনে হয়, আমার গুরুদেব এই সকল কথাই আমার চেয়ে আরও সুন্দর ভাষায় আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতেন।

'একান্ত অযোগ্যা আমাকে সম্মান দেখিয়ে আপনারা যে তাঁকেই সম্মান দেখিয়েছেন, সেজন্য আবার আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার সতত অনুরোধ, যিনি আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করে আপনাদের স্বদেশবাসী করেছেন, তাঁর জন্যই আমাকে আপনাদের কনিষ্ঠা ভগিনীরূপে (যে এই সুন্দর এবং পবিত্র ভূমিকে ভালবাসে ও আপনাদের সেবা করবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে) স্মরণ করবেন ও আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। এই সঙ্গে আমি স্বামী বিবেকানন্দের পিছনে সর্বদা অবস্থিত তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও সেই জগজ্জননী কালী, যাঁর শক্তি এই দুই মহামানবের মধ্য দিয়ে কাজ করেছিল, এবং নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যেও কাজ করবে, তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

'সেই মহামায়ার নামের ভরসা করেই আমি নিজেকে আপনাদের সামনে দাঁড় করিয়েছি।'

মাদ্রাজে অবস্থানকালে ১৯শে ডিসেম্বর হইতে প্রত্যহ বক্তৃতা ব্যতীত

নিবেদিতা যে আলোচনা বা প্রসঙ্গ করিতেন, সেইগুলি অধিক চিত্তাকর্ষক হইত। এই সময়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজের দূরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের সহিত পূজা, ভজন ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য দানের কার্য পরিচালিত হইত। নিবেদিতা ঐসকল সমিতির কার্য দর্শনে বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং উহাতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 'ভারতীয় বিবেকানন্দ সমিতিগুলির জন্য কার্যের ইঙ্গিত' নামক তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বুঝা যায়, দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের সহিত স্বামিজী ও স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনার ধারা কিরূপ ছিল।[১] প্রতিদিন দলে দলে যুবক, ছাত্র ও অধ্যাপক তাঁহার নিকট আসিতেন। ভাবের সহিত তিনি যখন ভারতের মহিমা ব্যাখ্যা করিতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম বর্ণনা করিতেন, তখন শ্রোতৃবর্গের চিত্ত অভিভূত হইত। সিংহীর ন্যায় তেজোদৃপ্তকণ্ঠে তিনি যখন দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য সকলকে জীবন পণ করিতে আহ্বান করিতেন, সকলে হৃদয়ে এক প্রবল অনুপ্রেরণা বোধ করিতেন।

বহুস্থানে তাঁহার বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের আয়োজন করা হইয়াছিল। কমলেশ্বরম্ পেটাপ্রোগ্রেসিভ ইউনিয়নের উদ্যোগে সার আন্নামালাই মুদালিয়র রিডিং রুম হলে, হিন্দু ইয়ং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মৈলাপুর পাচায়াপ্পা হলে এবং ট্রিপ্লিকেন লাইব্রেরী হলে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণগুলি উল্লেখযোগ্য। কাঞ্চীর স্টেশন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতায় অত্যধিক জনসমাগম হইয়াছিল। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে 'নবীন বার্তা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাপুরুষগণ', 'হিন্দুদর্শনে ধর্ম' প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনাকালে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় ব্যতীত নূতন আলোকপাতও করিয়াছিলেন।

নববর্ষ আসিয়া গেল। ২০শে জানুয়ারী এই প্রথম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন করিলেন। সারা সকাল নিবেদিতা পূজাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও নিবেদিতা তিনজনের চিত্তই স্বামিজীর স্মৃতিভারে উদ্বেলিত।

মাদ্রাজে নিবেদিতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত ট্রিপ্লিকেনে 'কাস্‌ল কার্নান' নামক ভবনে অবস্থান করেন। আমেরিকা হইতে প্রথম প্রত্যাবর্তন-কালে মাদ্রাজে মিঃ বিলিগিরি আয়েঙ্গারের এই 'কাস্‌ল কার্নান' ভবনে স্বামিজী অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক এখানেই

[১] Hints on National Education in India, p, 81,

মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মিশন কার্যের সূত্রপাত। স্বামিজীর পাদস্পর্শে পূত এই ভবনটির বিক্রয়ের কথা চলিতেছিল। নিবেদিতা ইহাতে বেদনা বোধ করেন। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার যদি অর্থ থাকিত, তবে এই পবিত্র স্থানটি তিনি বিক্রয় করিতে দিতেন না।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে সর্বতোভাবে বক্তৃতাদানে সাহায্য করেন। তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন, 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে কেবল ভাল বলিলে অল্পই বলা হয়। আমার বক্তৃতা এবং আলোচনা-সভায় তাঁর নীরব, দৃঢ় উপস্থিতি ও সমর্থন লাভ করিয়াছি।'

এই একত্র বাসকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নিবেদিতা তাঁহার প্রতি বরাবর বিশেষ শ্রদ্ধালু ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখনই বেলুড়মঠে আসিতেন নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কর্মে উৎসাহ দিতেন।

অত্যধিক পরিশ্রমে নিবেদিতা বিশেষ ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন। তখন পর্যন্ত বক্তৃতার জন্য অনুরোধ আসিতেছিল ; কিন্তু শারীরিক অক্ষমতা হেতু সে সকল প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। ২০শে জানুয়ারী তাঁহার অনুরোধে 'হিন্দু' পত্রিকা ঘোষণা করিল, বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় সিস্টার নিবেদিতা পরদিন মাদ্রাজ ত্যাগ করিবেন।

দাক্ষিণাত্যে তাঁহার বক্তৃতা সার্থক। কোন কোন পুস্তকে তাঁহাকে এই ভ্রমণপর্বে গুপ্ত বিপ্লব-সমিতির প্রচারিকারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলা দেশ হইতে গুপ্ত বিপ্লবের মন্ত্র বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট লইয়া যাওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, ইত্যাদি। নিবেদিতার কার্যাবলী ও বক্তৃতা হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, রামকৃষ্ণ সংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেও রামকৃষ্ণ মিশন ও তাহার পরিচালক সন্ন্যাসিগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করে না যে, এই সময়ে তিনি বৈপ্লবিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মাদ্রাজের দৈনন্দিন সংবাদপত্রে তাঁহাকে 'সিস্টার নিবেদিতা অব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন,' বলিয়া উল্লেখ করা হইত ; স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। বরং নিবেদিতার পত্র হইতে জানা যায়, তিনি তাঁহার বক্তৃতা-প্রচারে সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন।

স্বামিজীর বক্তৃতাগুলির সহিত নিবেদিতার বক্তৃতার আশ্চর্য মিল আছে। স্বামিজীর বক্তৃতাগুলিকে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, দেশের জনসাধারণ মানুষ হউক, স্বাধীনতা লাভের যোগ্য হউক— 'দিবারাত্র প্রার্থনা কর, মা আমায় মানুষ কর।' নিবেদিতার বক্তৃতাগুলিতে

স্বামিজীর আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তেজ ও উৎসাহপূর্ণ তাঁহার ভাষণগুলি সত্যই অনুধাবনযোগ্য। স্থানাভাবে উহাদের উল্লেখ সম্ভবপর নহে ; কিন্তু উল্লেখ করিলে দেখা যাইত, জাতীয়তাবোধ, ভারতের ঐক্য, ব্রহ্মচর্য পালনের আবশ্যকতা, ধর্মের সংরক্ষণ প্রভৃতি কী সুন্দর, প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন! তাঁহার প্রত্যেকটি সুচিন্তিত ভাষণে প্রকাশ পাইয়াছে ভারত-জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সর্বোপরি অকপট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। তাঁহার অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হইয়াছিল। নিজের মধ্যে তিনি একটা অস্থিরতা অনুভব করিতেছিলেন, কী উপায়ে তিনি সমগ্র দেশের যুবকগণের মধ্যে এক অখন্ড জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করিবেন! ইহাই স্বামিজীর কাজ—to awake the nation—জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়ন। স্বামিজী কি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই? জলদগম্ভীর কণ্ঠে তিনি কি দেশের যুবকগণকে আহ্বান করিয়া বলেন নাই, 'আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউন—অন্যান্য দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে ক্ষতি নাই'! দেশকে জাগ্রত করিবার কার্য স্বামিজী আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অগ্নিগর্ভ ভাষণে দেশের সর্বত্র যে গভীর উৎসাহের সঞ্চার দেখা গিয়াছিল, তাহাকে উদ্দীপিত রাখিবার দায়িত্ব নিবেদিতা নিজেই অনুভব করিতেছিলেন।

বক্তৃতাকালে স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল এক অখন্ড ভারতের উজ্জ্বল, গৌরবময় চিত্র প্রদর্শন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ভাষাগত বহু অনৈক্যের মধ্যে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে যে গভীর ঐক্য, যে অপূর্ব সমন্বয় বিরাজ করিতেছে, স্বামিজীর মতে তাহাই মৌলিক ও প্রাথমিক। ইহাকেই তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, এইভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। নিবেদিতাও তাঁহার ভাষণে স্বামিজীর ঐ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়াছেন। আর সর্বত্রই তাঁহার প্রচেষ্টা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ এবং মহিমা প্রচার।

'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন বর্তমানে আমি বিশেষভাবে অনুধাবন করছি। আমি দেখতে চাই, আমাদের জনসাধারণ ভারতের সর্বত্র দলে দলে সমবেত হয়েছেন, এবং তাঁদের উদ্দেশ্য কর্ম নয়, কেবল প্রার্থনা করা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করা। এই দুই মহাজীবনের মধ্যেই সমগ্র ভারতের ঐক্য রয়েছে। ভারতবর্ষ এই দুই মহাপুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করবে, এইটিই সবচেয়ে প্রয়োজন।'

আর একটি কারণে মাদ্রাজ নিবেদিতার মনে উৎসাহ এবং আবেগ সঞ্চার করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করিবার দাবী মাদ্রাজবাসী করিতে পারে ; তাহারাই উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় প্রেরণ করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছিল। বিজয়টীকা লইয়া তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন সমগ্র মাদ্রাজ আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে রাজোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। সেই স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ; আর তাঁহার বক্তৃতাও গুরুর উপযুক্ত শিষ্যার ন্যায়। সুতরাং মাদ্রাজ যে নিবেদিতাকে স্বাগত জানাইবে এবং তাঁহার বক্তৃতায় সাড়া দিবে, তাহা আশ্চর্য কি! মাদ্রাজবাসীর চিত্ত তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে বাগ্মিতা ও কর্মশক্তি ছিল, তাহার বিচিত্র প্রকাশ ঘটিতেছিল। বাস্তবিক, মাত্র একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের কার্যে ঐ শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব ছিল না।

স্বামিজী একদা বলিয়াছিলেন, 'সমগ্র ভারত তার ভাবে মুখর হইয়া উঠিবে (India shall ring with her).' নিবেদিতার এই বক্তৃতা-অভিযান স্বামিজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল করিয়াছিল।

বিদ্যালয়

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর নিবেদিতার প্রথম উদ্যোগ হইল বিদ্যালয়টির পুনর্গঠন এবং আরব্ধ পুস্তকখানি শেষ করা। স্বামিজীর আকস্মিক তিরোধানের পর কয়েক মাস ধরিয়া তিনি অশান্ত চিত্তে, অধীর উত্তেজনায় ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন। নিজেকে বিস্মৃত হইবার ইহাই উপায়, অনুক্ষণ এক বিরাট কর্মপ্রবাহে মগ্ন হইয়া থাকা। ক্রমে উত্তেজনা বহু পরিমাণে প্রশমিত হইয়া আসার সহিত তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে ধীরভাবে চিন্তা করিবার মত মানসিক স্থৈর্য লাভ করিলেন। স্বামিজীর কথাগুলি বার বার মনে পড়িতে লাগিল, 'স্বদেশের নারীগণের উন্নতিকল্পে আমার কতকগুলি পরিকল্পনা আছে, তুমি ঐ কাজে সাহায্য করিতে পার।' তাঁহাকে ভারতে আহ্বানের পশ্চাতে ইহাই ছিল স্বামিজীর অভিপ্রায়। মাদ্রাজে বসিয়াই স্বামী সদানন্দের সহিত নিবেদিতার পরামর্শ চলিতে লাগিল। বোসপাড়া লেনকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ কর্মের প্রসার ঘটিবে। বিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করা চাই ; তবে নিবেদিতার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ঐ কার্যে লিপ্ত থাকা সম্ভব নহে, সুতরাং বাহির হইতে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের প্রয়োজন। ক্রস্টীন আসিয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করায় নিবেদিতা স্বস্তি বোধ করেন।

সরস্বতী পূজানুষ্ঠানের (১৯০২) পর বাগবাজার অঞ্চলের বালিকাগণ পুনরায় বিদ্যালয়ে আসিতে শুরু করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহাদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন নাই। বেটের উপরেই বিদ্যালয়ের ভার ছিল। ১৯০৩ খৃীঃ জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে, বক্তৃতা সফরের পর, তিনি প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। মার্চ মাসে ক্রস্টীন মায়াবতী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিবেদিতার সহিত যোগদান করিলেন।

তখন বিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ছিল না। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে মুখে মুখে শিক্ষাদানের রীতি ছিল। সেলাই, ছবি-আঁকা ও খেলাধুলাই ছিল প্রধান। নিবেদিতা ছিলেন শিক্ষাবিৎ। কিরূপ তীক্ষ্ন অন্তর্দৃষ্টির সহিত তিনি ছাত্রীগণকে পর্যবেক্ষণ করিতেন ও তাহাদের সকলের প্রতি তাঁহার কতদূর স্নেহমমতা ছিল, তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত একটি রিপোর্ট তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ১৯০৩ খৃীঃ ২৭শে জানুয়ারী হইতে তিনি নিয়মিত বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ করেন। ঐ সময়ের ছাত্রীগণ সম্বন্ধে তাঁহার
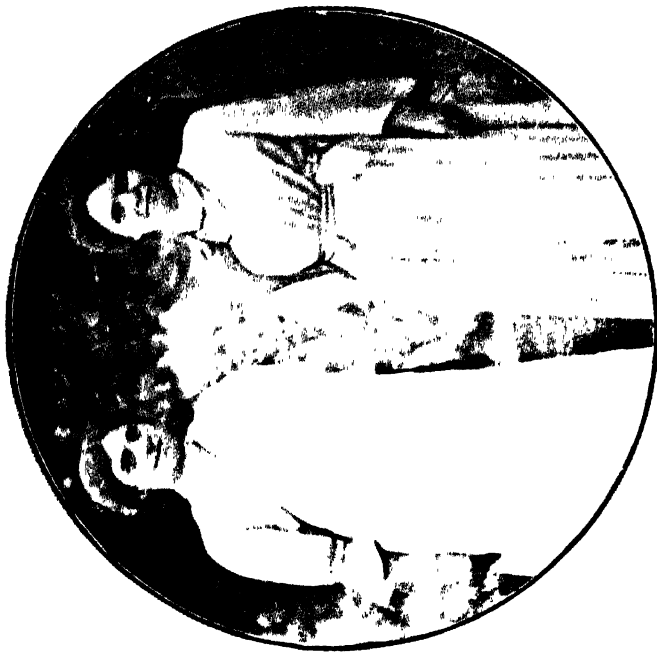
ভগিনী ক্রিস্টান ও ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী সুধীরা

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বর্তমান গৃহ

বিবরণ ও মন্তব্য একাধারে শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য। ঐরূপ পঁয়তাল্লিশটি ছাত্রীর মধ্যে তিনি আটাশ জনের রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন হিন্দু সমাজভুক্ত বালিকাগণের পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। নিম্নে কয়েকটি ছাত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার বিবরণ ও মন্তব্য উদ্ধৃত হইল।

সুভাষিণী দত্ত : জাতি কায়স্থ। ৬০ দিনের মধ্যে ৫১ দিন উপস্থিত। শুনিতে পাই, পিতামহীর সহিত তাহার স্বভাবের বেশ মিল আছে। তাঁহারই মত বুদ্ধিমতী, মিশুক, অমায়িক। তবে সম্পূর্ণ চপল প্রকৃতির। মেয়েটিকে আমার ভাল লাগে। ইংরেজী ভালই শিখিতেছে। তাহার রঙ-এর কাজ চমৎকার। হাতের কাজে গভীর অনুরাগ এবং উহাতে সে তন্ময় হইয়া যায় ; বার বার করিয়াও ক্লান্ত হয় না। সহজেই ভদ্র ব্যবহার শিখিতেছে।

কান্ত বসু : জাতি কায়স্থ। ৬০ দিনের মধ্যে ৪৮ দিন উপস্থিত। চমৎকার হাসিখুশী স্বভাব। সব সময় সন্তুষ্ট। স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত হইবার আগ্রহ আছে ; এমনকি, বাড়িতে কাজের জন্য দেরী হইলেও আসা চাই। বইগুলি বেশ পরিপাটী করিয়া গুছাইয়া রাখে। আঁকা খুব সুন্দর, সেলাই অত্যন্ত খারাপ। যথার্থই চালাক ও শিক্ষা দিবার উপযুক্ত মেয়ে।

বিদ্যুৎমালা বসু : যতগুলি বলিষ্ঠ চরিত্রের মেয়ে দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে অন্যতম। তাহার সাহস ও দৃঢ়তা অদ্ভুত। রুচিবোধ আছে। প্রথম প্রথম বড়ই বেয়াড়া গোছের ও অবাধ্য ছিল। একদিন তাহার সহিত শান্তভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিবার পর হইতে পরিবর্তন হইয়াছে। এখন সস্নেহ হাসিই যথেষ্ট। আর প্রায়ই নানাবিধ ভাল ভাল উপহার আসিতেছে। তাহার মধ্যে তেজ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, অবশ্য বিবাহের দ্বারা সবই নষ্ট হইয়া যাইবে।

জ্ঞানদাবালা : এক মজার নিম্নশ্রেণীর বালিকা। অন্তঃকরণ খুব ভাল। বাড়ির কাজকর্মের বাতিক আছে। পড়াশুনা একেবারেই পছন্দ করে না, এবং তাহাকে শিক্ষা দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যদি ক্লাসঘর পরিষ্কার করিতে বা বেটকে কোন কাজে সাহায্য করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে খুব খুশী। প্লেগের সময় আমি যখন কাজ পরিদর্শন করিতে যাইতাম, সে সর্বদা আমার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইত। পরে জানা গেল, তাহার মার একটি ক্ষুদ্র দোকান আছে এবং সে-ই উহার দেখাশুনা করে। একদিন আমি যখন কিছু কলা কিনিবার জন্য ঐ দোকানে

গিয়াছিলাম, তখন সে তাহার মার অপেক্ষা অনেক বেশী উদারতা দেখাইতে চাহিয়াছিল, আর সেজন্য মার নিকট তিরস্কৃত হইয়া লজ্জায় কিরূপ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি ভুলিতে পারি না।

ঐ রিপোর্ট হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পড়িতে আসিবার নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরেও কোন কোন বালিকা যখন-তখন স্কুলে আসিয়া হাজির হইত। রাস্তায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলে ছুটিয়া কাছে আসিত। তিনিও তাহাদের কাছে ডাকিয়া আদর করিতেন। এই ছোট মেয়েগুলির মধ্যে কেহ কেহ আবার নিবেদিতার শিক্ষয়িত্রীর স্থান অধিকার করিত। তাহাদের নিকট তিনি বাংলা শিখিতেন। একটি বালিকার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'ভারী চালাক ও অদ্ভুত মেয়ে। গলার স্বর কর্কশ। কিন্তু কেমন ভাল আর চটপটে! গায়ের রঙ খুব কাল, আর দেখিতে অনেকটা জংলী ধরনের। তাহার চেহারা ও স্বভাবে বিন্দুমাত্র লাবণ্য বা ভব্যতা নাই, কিন্তু দয়ার প্রতিমূর্তি। তাহার একটি ভাইএর সহিত খুব বন্ধুত্ব। তাহারা দুইজনেই বিকালে আমার নিকট আসিত ও আমাকে বাংলা শিখাইত।'

ইহাদের নানা উৎপাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত। একটি মেয়ের ছবি আঁকায় খুব ঝোঁক ছিল। সে একদিন উৎসাহের আতিশয্যে তাঁহার নূতন রঙ-এর বাক্স শেষ করিয়া ফেলিল, এবং তুলি দিয়া নানা চিত্র-বিচিত্র করিয়া একখানি নূতন পুস্তকও নষ্ট করিল। যাহা হউক, পরে অপরাধ স্বীকার করায় তিনি আনন্দিত হন।

খুব কম ছাত্রীই তখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসিত। তাহাদের লেখাপড়া সম্বন্ধে অভিভাবকদিগের তেমন আগ্রহ ছিল না। শিক্ষাদানের ইহাও একটি গুরুতর অন্তরায় ছিল। কেহ অল্পদিনের জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাকে ভুলিয়া যাইতেন না। খবর লইতেন, কেন আসিতেছে না। নানাভাবে চেষ্টাও করিতেন যাহাতে মেয়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে, কিন্তু বিশেষ ফল হইত না। দুইটি বালিকার সম্বন্ধে তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'মেয়ে দুটি বেশ সুশ্রী ও সৎ প্রকৃতির। আর তাহাদের মুখে কোন প্রকার অলঙ্কার না থাকায় প্রথম হইতেই তাহারা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তবে স্কুলে পড়িতে আসার ব্যাপারে অত্যন্ত খেয়ালী। প্রকৃতপক্ষে, বাড়িতে তাগাদা দিয়া বা জোর করিয়া স্কুলে পাঠাইবার কেহ নাই। সুতরাং যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হইলেও তাহাদের জন্য কিছুই করা যাইবে না।'

ইহা ব্যতীত, সে সময়কার বাল্যবিবাহ-প্রথা বালিকাগণের শিক্ষালাভে

অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রতিকূল ছিল। বুদ্ধিমতী ও পাঠে মনোযোগী কোন ছাত্রীর প্রতি যেই তিনি আগ্রহ লইতে আরম্ভ করিলেন, অমনি কিছুদিন পরেই তাহার বিবাহ হইয়া গেল। নিবেদিতা হতাশ হইয়া পড়িতেন। একজনের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'সে বিবাহ না করিতে দৃঢ়সংকল্প। তাহার বিশ্বাসভাজন কাহাকেও বলিয়াছে যে, বলপূর্বক বিবাহ দিলে সে আত্মহত্যা করিবে। তাহার তীক্ষ্ম বিবেক, অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং যথেষ্ট সতেজ কাণ্ডজ্ঞান আছে। উচ্চভাব অতি সহজে ধরিতে পারে। বিবাহ হইতে তাহাকে রক্ষা করা উচিত।'

বলা বাহুল্য, মেয়েটিকে বাল্যবিবাহের হাত হইতে রক্ষা করা যায় নাই। এইরূপ প্রায়ই ঘটিত। অতি অল্প সময়ের জন্যই বালিকাগণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাইত। নিবেদিতা ও কৃস্টীন উপলব্ধি করিতেছিলেন, এরূপ-ভাবে মেয়েদের শিক্ষাদান বিশেষ সফল হইবে না। অতঃপর তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, অন্তঃপুরিকাগণেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এদেশের নারীগণের সহিত সংযোগ স্থাপনে নিবেদিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বক্তৃতা উপলক্ষ্যে তিনি যেখানে গিয়াছেন, সর্বত্রই মহিলা-সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন, এবং সর্বদাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাদিগকে স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া তাহার প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেতন করা। বক্তৃতা দ্বারা সাময়িকভাবে জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু নরনারী নির্বিশেষে সকলের হৃদয় জয় করিবার উপায় তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন। কে তাঁহার নিকট আসিবে এবং কখন আসিবে, তাহার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন না। নিজেই অযাচিতভাবে সকলের নিকট ছুটিয়া যাইতেন, সকলকে গৃহে আহবান করিতেন।

ইতিপূর্বেই নভেম্বর মাসে (১৯০২) তিনি স্বগৃহে কয়েকদিন ধরিয়া কথকতা ও চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া মহিলাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উঠানের মাঝখানে একটি ছোট বেদীর উপর কথক ঠাকুরের বসিবার ব্যবস্থা হইল। মহিলারা বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিলেন। ধূপধুনা দ্বারা একটি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হইল। নিবেদিতাকে সকলেই ভালবাসিতেন; কথকতা উপলক্ষ্যে মহিলারা আরও নিকটে আসিলেন। পূর্বে তাঁহারা গঙ্গাস্নানের পথে নিবেদিতার বাড়ির দিকে একবার তাকাইয়া যাইতেন, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, চোখাচোখি হইলে মৃদুহাস্যে অভ্যর্থনা করিতেন। পাড়ার মধ্যে একজন খাঁটি মেমসাহেব তাঁহাদেরই একজন হইয়া হিন্দু জীবনযাত্রা অনুসরণ

করিতেছেন, ইহা সত্যই বিস্ময়কর। এখন হইতে সন্ধ্যার পর অবসর হইলে মহিলারা দুই-একজন করিয়া তাঁহার বাড়ি বেড়াইতে আসিতেন। নিবেদিতা তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য মোড়া দিতেন, এবং বহু সময় তিনি ও ক্রিস্টীন মেঝের উপর বিনীতভাবে বসিয়া থাকিতেন। ঘরকন্নার নানারকম কথা হইত। এদেশের পারিবারিক জীবন নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল ; তিনি সাগ্রহে নানারূপ প্রশ্ন করিতেন। নিবেদিতাও ক্রিস্টীনকে সঙ্গে লইয়া প্রতিবেশিনীদের বাড়ি যাইতেন। এই পাড়ায় প্রথম বাসের সময়েই নিবেদিতা তাঁহাদের প্রিয় পাত্রী ছিলেন। এখন এইভাবে যাতায়াতের ফলে সকলের সহিত একটা সহজ সৌহার্দ্য স্থাপিত হওয়ায় নিবেদিতার আশা হইল, ইঁহাদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে ফল পাওয়া যাইবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেন, এবং স্বামী সারদানন্দ একান্ত-ভাবে নিবেদিতাকে এই কার্যে সাহায্য করেন। ৯ই কার্তিক, ইংরেজী ২৬শে অক্টোবর, ১৭নং বোসপাড়া লেনে একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হইল। স্বামী সারদানন্দ গীতার উপর বক্তৃতা দিলেন। ইতিমধ্যে মিসেস বুল জাপান ঘুরিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং নিবেদিতার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থির হইল, প্রতি মঙ্গল-বার বেলুড়মঠের স্বামী বোধানন্দ গীতাপাঠ করিবেন।

২রা নভেম্বর বয়স্কা মহিলাগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খোলা হইল। ক্রিস্টীন সূচীশিক্ষার এবং শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু পড়াইবার ভার লইলেন। এই সময়েই কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে যোগীন-মা বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

এই বিবরণ উদ্বোধনে[১] 'রামকৃষ্ণ মিশন অন্তঃপুর প্রচার' নামে বাহির

---

১ রামকৃষ্ণ মিশন
—অন্তঃপুর প্রচার—

বিগত ৯ই কার্তিক, সোমবার, ১৭নং বোসপাড়া লেনে রমণীগণের উপকার জন্য স্বামী সারদানন্দ একটি গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রায় ৫০।৬০ জন অন্তঃপুরচারিণী বক্তৃতা শুনিতে সমাগতা হন। মিসেস ওলিবুল (বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলিবুলের বিধবা পত্নী—স্বামী বিবেকানন্দের একজন পরম ভক্ত) হারমোনিয়ম বাজাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রতি মঙ্গলবার বেলুড়মঠের স্বামী বোধানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিগত ১৬ই কার্তিক হইতে ঐ স্থানেই বয়স্কা স্ত্রীলোকগণের জন্য স্ত্রী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। প্রতি সোম ও শুক্রবার ইহা খোলা থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস ক্রিষ্টিনা গ্রীনষ্টীডেল সেলাই ও অধ্যাপক জগদীশ বসুর ভগিনী লেখাপড়া শিখাইবেন। এতদ্ব্যতীত পরমহংসদেবের স্ত্রীলোক ভক্তগণ আসিয়া ধর্মশিক্ষা দিবেন। শিক্ষার্থিনীগণকে বিদ্যালয়ের গাড়ি করিয়া আনা ও রাখিয়া আসা হইবে।

(উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ৬০৫)

হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের সহিত মিশনের সম্পর্ক না থাকিলেও তাঁহার পরিচালিত বিদ্যালয় এবং শিক্ষাকার্য রামকৃষ্ণ মিশনের বহির্ভূত ছিল না।

বিধবাশ্রম বা অনাথাশ্রম স্থাপনে স্বামিজীর আগ্রহ কার্যে পরিণত না হইলেও এই বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা নিবেদিতা অনেকটা সান্ত্বনালাভ করিয়াছিলেন। ক্রিস্টীনের সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্ভব ছিল না। নিবেদিতা তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, '১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে সিস্টার ক্রিস্টীন নামক স্বামিজীর জনৈক আমেরিকান শিষ্যা ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষা কার্যের সমগ্র ভার গ্রহণপূর্বক প্রণালীবদ্ধভাবে উহার পরিচালনা করেন। একমাত্র তাঁহার চরিত্র, একনিষ্ঠতা ও উদ্যম আজ ইহার উন্নতির কারণ' (The Master as I Saw Him p. 141)।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সকলেই প্রাচীনপন্থী পরিবারের কন্যা বা বধূ; অতএব পর্দাপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা হইল। এইরূপে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কোনরূপ অতিক্রম না করিয়া বিধবা ও বিবাহিতা নারীগণ সহজেই শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। তখন মিশনরী বিদ্যালয়গুলিতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাবের অভাব, এই দুই কারণে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ফলে কন্যাগণ বিদেশী-ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় অভিভাবকগণ তাহাদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, নিবেদিতার বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হিন্দু সংস্কৃতি ও রীতিনীতি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া সম্পূর্ণ দেশীয় ঢঙে জাতীয় শিক্ষা দেওয়া। অবশ্যই সর্বপ্রকার সাফল্যের মূলে ছিল নিবেদিতা ও ক্রিস্টীনের ঐকান্তিক উদ্যম ও পরিশ্রম। বাগবাজার পল্লীর বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া নিবেদিতা অভিভাবকগণের নিকট করজোড়ে তাঁহাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার ও ক্রিস্টীনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত আন্তরিকতা ও আগ্রহ সকল বাধা জয় করিয়াছিল।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ নিবেদিতার বিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'ক্ষুদ্র কিণ্ডারগার্টেনরূপে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে এই শিক্ষায়তনটি এরূপ বর্ধিত হইয়াছিল যে, বিবাহোপযোগী বয়স পর্যন্ত বহুসংখ্যক হিন্দু বালিকা ইহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইত। বিধবা ও বিবাহিতার সংখ্যা আরও অধিক ছিল। নিবেদিতা ও তাঁহার সহকর্মি-পরিচালিত এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল পরিচিত গণ্ডির মধ্যে রাখিয়া হিন্দু বালিকাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান। বালিকা অথবা মহিলা কাহাকেও স্বগৃহ হইতে পৃথক, বিজাতীয়

ভাবাপন্ন পরিবেশে লইয়া যাওয়া হইত না। এ যেন সেই অঞ্চলেরই এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন মাত্র। বিজাতীয় ধর্ম অথবা সামাজিক প্রথার প্রতি বালিকাগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার পরিবর্তে এখানে ছিল দেশীয় আচার-ব্যবহার ও ভাবধারার মধ্য দিয়া সকলকে ভারতীয় আদর্শে উন্নত করিবার প্রচেষ্টা। শিক্ষয়িত্রীগণ স্বয়ং সেই সকল আদর্শ যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতেন। অবশ্য এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, নিবেদিতা সমাজের অগ্রগতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, "পুরাতন প্রথার মধ্যে নারীগণ কেবল শৃঙ্খলা নহে, জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে।" কিন্তু তিনি ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, আধুনিক বিপ্লব ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় নারী সমাজে যে পরিবর্তন আনয়ন করিতেছিল, তাহাতে পুরাতন প্রথা সম্পূর্ণ বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। "ভারতীয় নারী অধুনা রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শিনী : কিন্তু সূচীকর্মে তাহার অভিজ্ঞতা নাই, এবং দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের পর সে শুধু গল্পগুজবেই অবকাশ যাপন করে।" সুতরাং নিবেদিতা এবং তাঁহার সহকর্মী বিধবা ও বিবাহিতাদিগকে বাংলা শিক্ষার সহিত সূচীশিল্প শিক্ষা দিতেন। কিন্তু প্রগতির স্রোত রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যেও দেখা দিল। ফলে কন্যা এবং বধূগণকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার ক্রমবর্ধমান আগ্রহ তিনি দমন করিতে পারেন নাই, এবং বাধ্য হইয়াই পরে বাংলার সহিত ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল (Studies from an Eastern Home—In memoriam).'

বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতির সহিত ১৭নং বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পূর্বে তিনি যে বাড়িতে বাস করিয়াছিলেন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সেই ১৬নং বাড়িটিও ভাড়া লওয়া হইল। নিবেদিতার পত্র হইতে এই সময় বিদ্যালয় ও তাঁহার কার্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

'এই ১৭নং বাড়ির দরজা হইতে ১৬নং বাড়ির দরজা বেশ খানিকটা দূরে, কারণ উভয়ের মধ্যে একটি বাগান রহিয়াছে। ১৬নং বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে স্কুলের কার্যে ব্যবহৃত হয়। ঐ বাড়ির বাহিরের যে ঘরে আমি সর্বপ্রথম স্কুল আরম্ভ করি, সেই ঘরেই পুনরায় ক্লাস হইতেছে। উহার উপরের ঘরে কৃস্টীন বিবাহিতা মেয়েদের জন্য প্রতি সোম ও বুধবার সেলাইএর ক্লাস করেন। প্রত্যহ একটি ক্ষুদ্র সেলাইএর ক্লাস তো আছেই। কৃস্টীন আমার পুরাতন শয়নকক্ষে শয়ন করেন। ১৭নং বাড়ির ভিতরের দিকে গোপালের মা, ঝি ও আমি থাকি। সামনের দিকে আমার পাঠকক্ষ ও ক্ষুদ্র ঠাকুরঘর।

'সকালে যত শীঘ্র সম্ভব আমি এই পাঠকক্ষে আসিয়া বসি। বেলা নয়টার সময়ে কয়েকজন ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রীকে ঘণ্টাখানেক কিণ্ডারগার্টেন ট্রেনিং দিই।

ছোট মেয়েদের স্কুল আরম্ভ হয় বেলা বারোটায়। সাড়ে চারিটায় স্কুল শেষ হইলে তাহারা চা খাইয়া পাঁচটার সময় চলিয়া যায়। কৃস্টীনের বউরা[১] প্রতিদিন ১টা হইতে ৪-৪৫ মিঃ পর্যন্ত অবস্থান করে।

'বিবাহিতা মেয়েরা গৃহের বাহিরে আসিতেছেন, এই ঘটনা [এ দেশের] ইতিহাসে প্রথম। কৃস্টীনের ছাত্রীসংখ্যা কুড়ি হইতে ষাট। তাহার রবিবার ও আমার শনি, রবি দুইদিন ছুটি থাকে। প্রতি সোম ও বুধবার দুপুরে যখন বড় সেলাইএর ক্লাস আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সকলকেই খুব পরিশ্রম করিতে হয়' (১১।৮।০৪)।

'আমার কাছে যাহারা ট্রেনিং পড়ে, এই বিদ্যালয়েই তাহারা পাঠ দেওয়ার অভ্যাস করে।...অন্তঃপুরিকাগণ য়ুরোপীয় মহিলার গৃহে শিক্ষালাভ করিতেছেন, ইহা অশ্রুত ব্যাপার ; কিন্তু একদিনের জন্যও এ পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয় নাই' (২৬।৭।০৪)।

নিবেদিতা স্বয়ং প্রত্যহ সেলাই ও অঙ্কনের ক্লাস লইতেন ; পরে ইতিহাস ও ইংরেজী পড়াইতেন। প্রতিদিন বিদ্যালয় আরম্ভের পূর্বে বালিকাগণ ঠাকুরদালানের টেবিলের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণামপূর্বক সমবেত কণ্ঠে নানাবিধ স্তবপাঠের সহিত বন্দেমাতরম্ গানটি গাহিত। তখন বিদ্যালয়ের কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল বলিয়া জানা যায় না। স্থানীয় লোক 'সিস্টার নিবেদিতার স্কুল' বলিত। নিবেদিতা তাঁহার পরিকল্পনায় উহাকে 'রামকৃষ্ণ গার্লস স্কুল' নামে অভিহিত করেন। পাশ্চাত্যবাসী কেহ কেহ 'বিবেকানন্দ স্কুল' বলিতেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইলে উহার নাম হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস' স্কুল। বর্তমানে বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অন্তর্ভুক্ত।

নিবেদিতার সর্বপ্রকার কর্মের উৎসাহ দাতা ছিলেন স্বামী সদানন্দ। ধীর, স্থির, নির্ভীক সাধু—নিবেদিতার সহিত বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, বক্তৃতায় উৎসাহ দিতেন। সর্বোপরি, দেশের কল্যাণ ও সেবাকার্যে তাঁহার মনে যখন যে সংকল্প জাগিত, তাহাতেই স্বামী সদানন্দের সম্মতি ও অকপট সাহায্য মিলিত। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের মূল্য নিবেদিতা বুঝিতেন, এবং ইহাও জানিতেন যে, সংঘের পক্ষে কতকগুলি বাধা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহার ইচ্ছা করিত, স্বাধীনভাবে তিনি স্বামিজীর প্রত্যেক আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবেন। সুতরাং সম্ভব, অসম্ভব

[১] বিবাহিতা মহিলাগণকে নিবেদিতা 'Bo' অর্থাৎ বউ বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

নানারকম চিন্তা ও কল্পনা তাঁহার মাথায় ঘুরিত ; বোসপাড়া লেনকে ধীরে ধীরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা যাইতে পারে। তাঁহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইবে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। কতকগুলি বালককে তিনি শিক্ষা দিয়া নূতন ধরনের সন্ন্যাসিরূপে গঠন করিবেন। একমাত্র দেশমাতাকে ভালবাসা এবং দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা—ইহাই হইবে তাহাদের ব্রত। বালকগণ ছয় মাস তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিবে, ছয় মাস ভারত পর্যটন করিবে। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ ব্যতীত অখন্ড ভারতের স্বরূপ ধারণা হয় না। স্বামিজীর এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। ভ্রমণের দ্বারা একাধারে শিক্ষা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়।

অতএব এপ্রিল মাসে (১৯০৩) কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। 'বিবেকানন্দ হোম' নাম দিয়া একটি ছাত্রাবাস কলিকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে খোলা হইয়াছিল। ঐ ছাত্রাবাসের কয়েকটি বালককে লইয়া স্বামী সদানন্দ যাত্রা করিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সঙ্গে ছিলেন। কাঠগোদাম হইয়া কেদার-বদরী পর্যন্ত তাঁহাদের অভিযান। নিবেদিতার অনুরোধে এক মহিলা দুই শত টাকা দিলেন। ইহাদের যাত্রার জন্য নিবেদিতার কত চিন্তা, উদ্বেগ! শেষ পর্যন্ত জননীর স্নেহাঞ্চল ত্যাগ করিয়া বালকগণ যাত্রা করিতে সমর্থ হইবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অবশেষে তাহারা রওনা হইয়া গেলে নিবেদিতা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পর্বত-ভ্রমণান্তে সদানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পরেও আর একবার নিবেদিতা সদানন্দের সহিত কয়েকটি বালককে পাঠাইয়াছিলেন ; শেষে অর্থাভাবে দুঃখের সহিত তাঁহাকে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হয়। অনুরূপ কারণেই বহুবার বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে ভারতের অন্যান্য স্থানে লইয়া যাইবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবেন। 'বর্তমানে প্রকৃত কার্য হইতেছে, সর্বপ্রকার তাৎপর্য ও অর্থবোধের সহিত ভারতের সর্বত্র "জাতীয়তা" শব্দটি প্রচার করা। এই বিরাট চেতনা সর্বদা ভারতকে পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকা আবশ্যক। এই জাতীয়তা দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান দেশের প্রতি এক গভীর অনুরাগে একত্র হইবে। ইহার অর্থ—ইতিহাস ও প্রচলিত রীতিনীতিকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখা ; ধর্মের মধ্যে সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ ভাবনার সমাবেশ—সর্বধর্মসমন্বয়। বুঝিতে হইবে যে, রাজ-নৈতিক প্রণালী ও অর্থনৈতিক দুর্বিপাক গোণমাত্র. পরন্তু ভারতবাসী কর্তৃক ভারতের জাতীয়তা উপলব্ধিই প্রকৃত কাজ।

'পত্রিকাই এই জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। অযাচিত অর্থসাহায্যও আসিয়াছে, কিন্তু অসংখ্য প্রতিবন্ধক।'

মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউড য়ুরোপ ভ্রমণ করিতেছিলেন ; নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে তখন ভারত ত্যাগ করা অসম্ভব। মিসেস লেগেটকে তিনি লিখিলেন, 'আমার পুস্তকের শেষ অধ্যায়গুলি এখনো লেখা হয় নাই। একখানি পত্রিকা বাহির করিবার চেষ্টায় আছি। অধিকন্তু, আমার ভারতে অবস্থান একটি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ততঃ এই আদর্শের সহিত সংযুক্ত, এমন কোন প্রয়োজন ব্যতীত ভারত-ত্যাগের অর্থ সেই আদর্শকেও বিপন্ন করা। এমন কি, জাপান গমনের প্রস্তাবও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমাদের সামনে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম ও কর্ম এবং সম্ভবতঃ পরিণামে পরাজয়—ইহা ব্যতীত আর কিছু দেখি না। আমাদের কাজ একটি ভাব সৃষ্টি করা ; সে ভাব স্বামিজীর। এই ভাবকে জন্ম দিতে হইবে ধূলামাখা ছাপাখানায়—ভিড়ের রুদ্ধ বাতাসের মধ্যে ; গ্রীষ্ম-কালের শৈলাবাসে ইহার স্থান নাই। অতীতের দিকে যখন ফিরিয়া চাই, তখন মনে হয়, গ্রীষ্মকালে প্যারিসে আপনার আতিথেয়তা না পাইলে কী করিতাম!'

অবশ্য পত্রিকা বাহির করা সম্ভব হয় নাই। অর্থসাহায্য কিছু আসিলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে লিখিয়াই মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। ম্যাকলাউডের পত্র পুনরায় ফ্লোরেন্স হইতে আসিল। একদা নিবেদিতার নিকট ফ্লোরেন্স ছিল স্বপ্ন। কত সাধ ছিল ঐ নগরী পর্যটন করিয়া অতীত ইতিহাস অনুধ্যান করিবেন! কিন্তু এখন তাহার জন্য ভারত ত্যাগ করিয়া যাওয়া চলে না। ইলোরা ও অজন্তাই তাঁহার নিকট অন্য এক ইটালীর ফ্লোরেন্স, তবে তাহা এক বৃহত্তর ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন কল্পনার ইটালী। 'ব্যর্থতা বা সফলতা যাহা আসে আসুক, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন বিশ্বস্ততার সহিত স্বামিজীর কর্ম করিয়া যাইতে পারি'—ইহাই ছিল নিবেদিতার একমাত্র প্রাণের বাসনা।

১৭নং বোসপাড়া লেন

১৭নং বোসপাড়া লেনের যে বাড়িটিতে নিবেদিতা ১৯০২ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাস করিয়াছিলেন, সে বাড়িটি আজ পূর্বাবস্থায় নাই। সম্পূর্ণ নূতন করিয়া নির্মিত হইয়াছে। অথচ এই বাড়িটির কী ঐতিহাসিক মূল্যই না ছিল? নির্বেদিতার চরিত্রের অসাধারণ গুণগুলি ব্যতীত তাঁহার আন্তরিকতা সকলকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিত। বোসপাড়া লেনের এই বাড়িতে তদানীন্তন সকল গুণীব্যক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছে। শ্রেষ্ঠ কবি, বৈজ্ঞানিক, দেশনেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, ছাত্র কে আসিতেন না? কত আলাপ-আলোচনা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প-সাহিত্যের আরাধনা, দেশনেতৃগণের পরস্পর যুক্তি, এই ১৭নং বাড়ির এক কক্ষে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বাড়িতে শ্রীমা কয়েকবার আগমন করিয়াছেন; স্বামী বিবেকানন্দ পদার্পণ করিয়াছেন। গোপালের মা জীবনের শেষ বৎসরগুলি এই বাড়িতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। এখানেই বড়লাটপত্নী লেডি মিণ্টো আসিয়াছিলেন নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। পুরাতন ধরনের বাড়িটির চতুর্দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ির দরজার উপর একটি ছোট ফলকে লেখা 'The House of Sisters' (ভগিনী-নিবাস) যাতায়াতের পথে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ক্ষুদ্র উঠান, লাল রঙের সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো। একধারে টবের উপর কতকগুলি গাছ। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই নির্বোদতার পাঠকক্ষ। স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল, নিবেদিতার গৃহটি সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-রমণীর অন্তঃপুর হইবে। তাহা হয় নাই; তাঁহার এই ক্ষুদ্রগৃহদ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত ছিল। প্রাতরাশের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সারাদিন লোকের অবিরাম আনাগোনা চলিত। বিশেষতঃ রবিবার ও ছুটির দিন অনেকেই আসিতেন। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ চৌরঙ্গী হইতে প্রতি রবিবার নিবেদিতার গৃহে প্রাতরাশে যোগ দিতেন। তাঁহার স্ত্রীও আসিতেন। সাধারণতঃ দেখা করিবার সময় ছিল সকাল সাতটা হইতে নয়টা। সার যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'একথা বলিতে লজ্জাবোধ করিতেছি যে আমাদের শিক্ষিত (?) দেশবাসীর অনেকেই যে কোন সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার কর্ম ও ধ্যানের বিঘ্ন ঘটাইতেন। আলাপান্তে কেহ কেহ তাঁহার নিকট আর্থিক সাহায্য

প্রার্থনা করিতেন, পত্রিকার জন্য লেখা আদায় করিতেন, অথবা কোন পদস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের জন্য পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিতেন। অতি অল্প ব্যক্তিই তাঁহাকে অর্থ বা সামর্থ্যের দ্বারা সাহায্য করিতেন ; তথাপি তাঁহার কার্য বন্ধ হয় নাই।'

প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিতেন না বলিয়াই তাঁহার পক্ষে সকলের দাবী পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। বিনিময়ে তিনি সকলের অযাচিত ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন। এদেশবাসীর সহিত তাঁহার প্রীতি ও সৌহার্দ্য তাঁহার ইংরেজ বন্ধুদিগকে বিস্মিত করিত। তাঁহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া র‍্যাটক্লিফ লিখিয়াছেন—

'প্রতি রবিবার সকালে তাঁহার গৃহে আমরা প্রাতরাশে যোগ দিতাম। প্রাতরাশের আয়োজন ছিল অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু হাস্য-কৌতুক ও পরিশেষে নানারূপ আলোচনার মধ্য দিয়া দীর্ঘ সময় চলিয়া যাইত। নিবেদিতার গৃহ ছিল চমৎকার বৈঠকখানা। নবাগত আমেরিকান অথবা ইংরেজের কলিকাতায় স্বল্প সময় অবস্থানকালে নিবেদিতার গৃহে তাঁহাদের দর্শন মিলিত। ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন চরিত্রের বহু ভারতীয়ের সহিত পরিচয়ের এরূপ সুযোগ আর কোথাও ছিল না। কাউন্সিলের সদস্যগণ, বাংলা দেশ ও কলিকাতার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের নাম ও কার্য দৈনিক সংবাদপত্রগুলির প্রতিদিনের আলোচনার বিষয় ছিল, ভারতীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বক্তা, সাংবাদিক, ছাত্র সকলেই এখানে আসিয়া জুটিতেন। প্রায়ই রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসীকে দেখা যাইত। দেশপর্যটক কোন পণ্ডিত, কোন ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তা, অথবা, সুদূর কোন প্রদেশাগত দেশনেতা, সকলেই তাঁহার গৃহে বেড়াইয়া যাইতেন। একজন বাঙালী সম্পাদকের কথা মনে পড়ে ; তিনি প্রায়ই যাতায়াত করিতেন ও নানারূপ কথায় উচ্চহাসির রোল তুলিতেন। তাঁহার সরস মন্তব্যগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে মর্মবিদ্ধ করিত। আর একদিনের মধুর স্মৃতি মনে পড়ে। সম্ভবতঃ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক শীতের প্রভাতে, মিঃ উইলিয়াম জেনিংস সপত্নীক নিবেদিতার বাগবাজারস্থ গৃহে প্রাতরাশে যোগ দেন। তিনি তখন ভূপর্যটনে বাহির হইয়াছেন ; ভারত ভ্রমণকালে কলিকাতায় তাঁহার আগমন। সেদিনকার প্রভাতটি বড় আনন্দের ছিল।

'বাগবাজার পল্লীর শান্ত, গর্বিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অধিবাসিগণের সন্দেহ দূর করিয়া ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে ভগিনী নিবেদিতার কতদিন সময় লাগিয়াছিল, আমার জানা নাই। ইঁহাদের সহিত তাঁহার একত্র বাসের দুই-তিন বৎসর পরে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই বলিতে পারি।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তিনি আশ্চর্যভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দু প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে একান্ত আত্মীয় জ্ঞান করিত। বাজারে, পথে, গঙ্গা-তীরে প্রত্যেকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, এবং পথ দিয়া চলিবার সময় সকলেই তাঁহাকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অভিবাদন করিত, তাহা প্রকৃতই সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী।'

নিবেদিতার গৃহ কেবল বিদ্যালয় ছিল না ; বিপদে আপদে সে গৃহ হইতে সর্বদাই অযাচিত সেবা ও সাহায্যের স্রোত বহিত। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মারম্ভের সহিত প্লেগের আবির্ভাব-আশঙ্কায় সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁহার শৈথিল্য বা ত্রুটি ছিল না। বাগবাজার পল্লীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় বহন করিতেন। এ বিষয়ে চির-উদাসীন ভারতবাসীকে তিনি প্রাণপণে সচেতন করিতে চাহিতেন। যখন-তখন আবর্জনা ফেলিয়া পথঘাট অপরিষ্কার করাই মহিলাগণের অভ্যাস। নিবেদিতা পল্লীর নারীগণের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহাতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার বিধি ও আবশ্যকতা সবিস্তারে আলোচনাপূর্বক তিনি অনুনয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে যথাসাধ্য দৃষ্টিপাত করেন। 'নারীগণের প্রতি নারীর উক্তি' নামে তাহার অনুবাদ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ঐ রচনায় তিনি পল্লীর অধিবাসিনীগণেরই একজন, এইরূপ মনোভাব কী সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছিল!

এ দেশে পদার্পণ অবধি তাঁহার অর্থাভাব। কেবল উহাই তাঁহার বিদ্যায়তনটির বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার অন্তরায় ছিল। অর্থের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বহু পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বাসভবনের একাংশে নিবেদিতাকে একটি বিদ্যালয় স্থাপনে অনুরোধ করেন। নিবেদিতারও বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু তাঁহার পক্ষে অন্যত্র শিক্ষকতা সম্ভব ছিল না ; সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর বেতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ রক্ষা সম্ভব হয় নাই।

একদিন বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীমা বলেন, হয়তো অর্থসংগ্রহের জন্য নিবেদিতাকে পুনরায় পাশ্চাত্যে যাইতে হইবে। নিবেদিতার নিকট উহার চিন্তাও বেদনাদায়ক ছিল। তাঁহার দৃঢ় সংকল্প ছিল, সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমেই ভারত পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার পুস্তক-রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক সমস্যার সমাধান। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'The Web of Indian Life' পুস্তকখানি সমাপ্ত করিবার জন্য তিনি সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেন। কলিকাতায় তাঁহার বহু কাজ। লেখার জন্য

প্রয়োজন অবকাশ ও নির্জনতা। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ক্রস্টীনের উপর অর্পণ করিয়া জুলাই মাসে তিনি দার্জিলিঙ গমন করেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয়টি অধ্যায় শেষ হইল।

'ওয়াহ্ গুরু কী ফতহ' কথাটি স্বামিজীর বিশেষ প্রিয় ছিল। একাধিক বার পত্রে উহা উল্লেখ করিয়া তিনি শিষ্যগণের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করিতেন। নিবেদিতা পুস্তকের প্রারম্ভেই 'ওয়াহ্ গুরু কী ফতহ' লিখিয়া গুরুর উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি উৎসর্গ করেন। আর লিখিলেন, 'জাতীয় ধর্ম সংস্থাপনার্থে'।

পুস্তকের সূত্রপাত উইম্বল্ডনে (১৯০১)। ইহার মধ্যে 'The Story of the Great God' (মহাদেবের কাহিনী) নামক রচনাটি প্যারিসে স্বামিজী ও জগদীশ বসুর সম্মুখে পাঠ করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকখানি বাহির হয়। ঐ পুস্তক পাশ্চাত্য জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং উহাতে তাঁহার এক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। পরে উহা আলোচনা করা হইবে।

নিবেদিতার ভারত অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বৎসরগুলির প্রতি মুহূর্ত নিরলস কর্ম ও সেবায় পূর্ণ। প্রত্যেকটি বৎসর কর্মজীবনের গৌরবময় অধ্যায়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পড়িল। ৯ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তিনি বেলুড় মঠে কাটাইয়া আসিলেন। পরদিন রবিবার সাধারণ উৎসব।[১] ঐ দিনও তিনি মঠে গিয়া স্বামিজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৭ই জানুয়ারী কলিকাতায় 'বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দিরে' স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে অপরাহ্নে এক সভার অধিবেশন হয়। স্বামী সারদানন্দ সভাপতি, বক্তা—রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, মিঃ জে. চৌধুরী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, 'নেশন'-সম্পাদক মিঃ এন. ঘোষ ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বামিজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা-পর্ব আরম্ভ হইল। ২০শে জানুয়ারী রাত্রে নিবেদিতা বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন। স্বামী সদানন্দ ইতিমধ্যে জাপান ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ও স্বামী শঙ্করানন্দ সঙ্গে ছিলেন।

[১] স্বামিজীর দেহত্যাগের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া জন্মতিথির পরবর্তী রবিবারে বেলুড়মঠে সাধারণ উৎসব প্রতিপালিত হইত। বক্তৃতাদি ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা ছিল উহার প্রধান অঙ্গ।

বুদ্ধগয়া

বর্তমান পাটনা প্রাচীনকালে পাটলীপুত্র নামে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ঘটে। নিবেদিতা পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখিলেন ; অশোকের রাজধানীর ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিলেন। বিখ্যাত শস্যাগারটিও দর্শন করিলেন। ২৫শে জানুয়ারী তিনি বাঁকীপুর পরিত্যাগ করেন। এখানে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে 'ভারতে শিক্ষাসমস্যা', 'গীতা' ও 'স্বামিজীর মিশন' উল্লেখযোগ্য।

পাটনার 'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকা লিখিলেন, 'ভগিনী নিবেদিতার ভাষণগুলি চিত্তাকর্ষক ও উচ্চপ্রেরণাদায়ক। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বিহার প্রদেশে এইরূপ একজন বক্তার বিশেষ প্রয়োজন—যাঁহার উদ্দেশ্য যৌগিক রহস্যে দীক্ষাদান বা হিন্দুধর্মের জটিল ব্যাখ্যা নহে, পরন্তু জাতি হিসাবে ভারতীয়গণ যাহাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তজ্জন্য কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ। আমাদের ছেলেদের শারীরিক শিক্ষা ও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, এবং আজ সকালে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণস্পর্শী, উল্লেখযোগ্য বক্তৃতাটি শ্রোতৃবর্গের জড়তা নাশ করিয়া তাহাদিগকে কর্মে প্ররোচিত করিবে।'

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে 'পাটলীপুত্র হিন্দু বালক সংঘ' কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নিবেদিতা ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে বলেন, তাহাদের সর্বদা চিন্তা করা কর্তব্য, ভারত তাহাদের নিকট কী প্রত্যাশা করে। ছেলেদের সাহসী হওয়া উচিত। তাহারা যেন সর্বদা মহাভারতের কথা স্মরণ রাখে। ছেলেদের প্রথম কর্তব্য উত্তম আহার ও নিদ্রার প্রতি মনোযোগ অর্পণ, দ্বিতীয় কর্তব্য খেলাধুলায় যোগদান। তাহারা যে শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহাতে এক বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতেই অর্ধেক শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। পরিশেষে তিনি বলেন, 'আমাদের দরকার শক্তিশালী যুবকবৃন্দ। পড়াশোনাতেই সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ না হয়। তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। সর্বদা মনে রেখো, সমগ্র ভারতই তোমার দেশ আর এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন কর্ম। জ্ঞান, শক্তি, সুখ ও ঐশ্বর্য লাভের জন্য চেষ্টা কর। ঐগুলিই যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে, তখন যেন তোমরা নিদ্রায় মগ্ন থেকো না।'

মহিলাগণের জন্য একদিন ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল। বিষয়—'জাপান', স্বামী সদানন্দ উদ্যোক্তা। দলে দলে মহিলারা উহাতে যোগদান করেন, এবং বিভিন্ন পরিবার হইতে পুনরায় ঐরূপ বক্তৃতার জন্য আহ্বান নিবেদিতাকে বিশেষ প্রীত করিয়াছিল।

পাটনাতেও তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকায় প্রতিদিন তাঁহার বক্তৃতার পূর্ণ উল্লেখ ও তৎসহ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা থাকিত। তরুণ ছাত্রসম্প্রদায় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে, এবং বলা বাহুল্য তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ শহরে বক্তৃতার দিন পূর্ব হইতেই নির্ধারিত ছিল। নিবেদিতার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করিবেন। স্বামিজী ওকাকুরা ও ম্যাক-লাউডের সহিত বুদ্ধগয়া ভ্রমণান্তে কাশীধামে কয়েক দিন অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহার শেষ ভ্রমণ। এত নিকটে আসিয়া বুদ্ধগয়া ও রাজগৃহ দর্শন না করিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা নিবেদিতার ছিল না। সুতরাং ২৫শে জানুয়ারী বাঁকীপুর ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বক্তিয়ারপুর হইয়া এক্কাযোগে রাজগৃহ (বর্তমান রাজগীর) উপস্থিত হইলেন। পরদিন সকলে হস্তিপৃষ্ঠে নালান্দার বিখ্যাত ভগ্নস্তূপ দর্শন করিয়া আসিলেন। ২৭শে রাজগৃহ হইতে পুনরায় যাত্রা করিলেন। যানবাহনের অভাব। চন্দ্রালোকে সারারাত্রি পদব্রজে গমন করিয়া তিলাইয়া নামক স্টেশনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও আহারাদির পর তাঁহারা ট্রেনে বুদ্ধগয়া পৌঁছিলেন।

এখানে ডাকবাংলায় মোহন্তের অতিথিরূপে তাঁহারা অবস্থান করেন। বুদ্ধগয়া হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে মিস ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, 'সম্প্রতি বুদ্ধগয়া ঘুরিয়া আসিয়াছি। সেখানে মোহন্তের অতিথি হইয়াছিলাম। মন্দির ও বৃক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। তুমি তো আমাকে এ বিষয় কিছু বল নাই? সত্যই কি তুমি উপলব্ধি কর নাই যে, ভারতবর্ষে এই স্থানটির গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক?'

চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত রজনী। নিবেদিতা নিঃশব্দে গিয়া বোধিদ্রুমতলে উপবেশন করিলেন। এই মুহূর্তে কত স্মৃতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া-ছিল! বুদ্ধগয়ায় স্বামিজীর প্রথম আগমন। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অন্তিম শয্যায়। তরুণ শিষ্যগণের মধ্যে অবিরাম বুদ্ধের প্রসঙ্গ চলিতেছে। প্রবল বৈরাগ্যে স্বামিজী অশান্ত, সহসা একদিন বুদ্ধগয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে তারক (স্বামী শিবানন্দ) ও কালী (স্বামী অভেদানন্দ)। এই বোধি-

দ্রুমতলে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধের প্রেম, করুণা ও মৈত্রী স্মরণে স্বামিজীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল।

সময় নাই! নির্দিষ্ট তারিখে লক্ষ্মৌ পৌঁছান আবশ্যক। ভবিষ্যতে পুনরাগমনের সংকল্প লইয়া অতৃপ্তচিত্তে নিবেদিতা বুদ্ধগয়া পরিত্যাগ করিলেন। পথের মধ্যে সুজাতার গৃহ দেখিয়া লইলেন। কাশী হইয়া ৩০শে জানুয়ারী তাঁহারা লক্ষ্মৌ আগমন করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রত্যহ বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'আজিকার সমস্যা', 'শিক্ষা', 'বুদ্ধগয়া ও হিন্দুধর্মে ইহার স্থান', 'ভারতে মুসলমান', 'প্রকৃত গুরুভক্তি' ও 'হিন্দুমুসলমান মিলন'।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আজিকার ন্যায় তখনো বর্তমান, এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের ন্যায় নিবেদিতাও এই সমস্যার সমাধানে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

বুদ্ধগয়ার প্রতি নিবেদিতা বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জীবনের প্রথমে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আস্থা হারাইয়া বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নপূর্বক তাঁহার যুক্তিবাদী মন কতক পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। পরে স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীবুদ্ধের প্রগাঢ় মানবপ্রেমের পরিচয়লাভে তিনি অভিভূত হইয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ার প্রতি আকর্ষণ-বোধের অন্যতম কারণ, স্থানটি স্বামিজীর স্মৃতির সহিত জড়িত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বুদ্ধগয়ায় একটি বিদ্যায়তন স্থাপনে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন, যেখানে ছাত্রগণ ভারতের যথার্থ প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিবে। অবশ্য উহা কার্যে পরিণত হয় নাই। কলিকাতা আগমনের পর ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি 'বুদ্ধগয়া' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

মার্চ মাসে কাশী হইতে বক্তৃতার আমন্ত্রণ আসিল। যাইবার পথে পুনরায় তিনি বুদ্ধগয়া গমন করেন ; সঙ্গে ছিলেন মিসেস সেভিয়ার। এইবার মোহন্তের সহিত তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা হয়। সকলে কাশী গেলে মিসেস সেভিয়ার তথা হইতে মায়াবতী চলিয়া গেলেন। কাশীতে নিবেদিতা সর্বশুদ্ধ তিনটি বক্তৃতা দেন—'ধর্ম ও ভবিষ্যৎ', 'নাগরিক জীবন' ও 'শিক্ষাসমস্যা'।

এই বৎসর কলিকাতায় তিনি যে কয়েকটি বক্তৃতা দেন, তাহার মধ্যে ১৬ই ফেব্রুয়ারী 'বুদ্ধগয়া', ২২শে ফেব্রুয়ারী চৈতন্য গ্রন্থাগার কমিটির তত্ত্বাবধানে ডালহৌসী ইন্‌স্টিটিউটে 'ব্রহ্মচর্য বনাম বিবাহ', ২৭শে ফেব্রুয়ারী টাউন হলে 'ডাইনামিক রিলিজিয়ন' (জোরালো ধর্ম), ২০শে মার্চ কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে কলিকাতা মাদ্রাসা কর্তৃক আহূত সভায় 'এশিয়ায় ইসলাম' ও ১লা এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে পুনরায় 'বুদ্ধগয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিয়া বাগবাজার স্ট্রীটে অবস্থান করেন। বহুদিন পরে তাঁহার দর্শনলাভে নিবেদিতা ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় আনন্দে অধীর হইলেন। তাঁহার অসংখ্য কাজ, তথাপি সময় পাইলেই শ্রীমার নিকট গিয়া বসিতেন। যে দিনগুলি তাঁহার জীবনে বহুস্মৃতি-বিজড়িত, ঐ দিনগুলিতে তিনি শ্রীমার নিকট ছুটিয়া যাইতেন। ১৮৯৮-এর ১১ই মার্চ স্বামিজীর সভাপতিত্বে তিনি স্টার থিয়েটারে প্রথম বক্তৃতা দেন। এই বৎসর ঐদিন সন্ধ্যায় নীরবে শ্রীমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তিনি আনন্দ লাভ করেন। ১৭ই মার্চ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিলেন, 'শ্রীমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও বেলুড়ে স্বামিজীর সহিত আলোচনার বার্ষিক দিবস।' এই বৎসরেই ২৫শে জুলাই, যেদিন গ্রীষ্মাবকাশের পর ১৬নং বাড়িতে পুনরায় বিদ্যালয় আরম্ভ হয়, সেদিন শ্রীমা বিদ্যালয়ে আগমন করিয়া তাঁহার অকৃপণ আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতার আনন্দের সীমা ছিল না।

মিসেস সেভিয়ারের অনুরোধে এই বৎসর নিবেদিতা ও ক্রিস্টীন গ্রীষ্মের ছুটিতে মায়াবতী গমন করেন; সঙ্গে গিয়াছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু ও লাবণ্যপ্রভা বসু। ১৭ই মে মায়াবতী বসিয়া শ্রীযুক্ত বসুর বিখ্যাত ইংরেজী পুস্তক 'উদ্ভিদের সাড়া' লেখা আরম্ভ হয়। মায়াবতীর দিনগুলি মিসেস সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দের আতিথ্যে আনন্দেই কাটিল। একদিন সকলে ধরমগড় বেড়াইয়া আসিলেন। এখানেই নিবেদিতা খবর পাইলেন, 'The Web of Indian Life' এর মুদ্রণকার্য শেষ হইয়াছে। ২৩শে জুন তাঁহারা কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

বুদ্ধগয়া লইয়া এই সময়ে একটি আন্দোলন চলিতেছিল। মন্দিরের অধিকার বৌদ্ধদের হাতে যাওয়া উচিত, ইহাই ছিল আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য নিবেদিতা দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়া গমন করেন। এই আন্দোলনে ব্যথিত হইয়া বুদ্ধগয়া যাহাতে হিন্দুগণের অধিকারে থাকে, সেজন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় 'বুদ্ধগয়া' সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি সুন্দরভাবে প্রমাণ করেন যে, শঙ্করাচার্যের সময় হইতে তাঁহার নির্দেশানুযায়ী বুদ্ধগয়া মন্দিরের পরিচালন-ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, এবং উহার কোনরূপ পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা নিতান্ত অযৌক্তিক। এই আন্দোলনের বিপক্ষে তিনি স্টেট্‌সম্যান, অ্যাডভোকেট, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ট্রিবিউন, বম্বে ক্রনিকল, বিহার হেরাল্ড, হিন্দু ও মারাঠা পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে একসঙ্গে অতি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রদর্শন করেন।

পূজার ছুটি হইলে, ৮ই অক্টোবর নিবেদিতা পুনরায় বুদ্ধগয়া যাত্রা

করেন। এবার একটি বড় দলের সহিত নিবেদিতা, ক্রিস্টীন, জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফ, স্বামী সদানন্দ ও সপ্তম মঠাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও কেহ কেহ গিয়াছিলেন। পাটনা হইতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও মথুরানাথ সিংহ যোগদান করেম। বুদ্ধগয়ায় তাঁহারা মোহন্তের অতিথি ছিলেন। প্রতিদিন ওয়ারেনের 'বৌদ্ধধর্ম' পুস্তক হইতে অথবা এডউইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' হইতে নিবেদিতা পড়িতেন; রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে গান ও আবৃত্তি করিতেন। দিনের বেলা তাঁহারা মন্দিরচত্বরে পায়চারি করিতেন, অথবা আশেপাশের গ্রামগুলিতে বেড়াইতে যাইতেন। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিত, গোধূলির ধূসর আলোকে সকলে বোধিদ্রুমতলে নীরবে উপবেশনপূর্বক সমগ্র অন্তর দিয়া স্থানটির মাহাত্ম্য উপলব্ধির চেষ্টা করিতেন। 'ফুজি' নামে এক দরিদ্র জাপানী ধীবর এই সময় এখানে বাস করিত। স্বদেশে দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল, যে পবিত্র স্থানে ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছেন, সেই মহাতীর্থে গমন করিবে। স্বপ্ন চরিতার্থ হইয়াছে, সুদূর জাপান হইতে ভারতে আগমন, অবশেষে বুদ্ধগয়ার পবিত্র ভূমিস্পর্শে তাহার জীবন ধন্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বোধি-বৃক্ষতলে বসিয়া সে গুনগুন স্বরে একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিত :

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়, নমো নমো গোতম-চন্দ্রিকায়।
নমো নমো অনন্তগুণ-নরায়, নমো নমো শাক্য-নন্দনায়॥

সন্ধ্যার নীরব অন্ধকারে জাপানী কণ্ঠে উচ্চারিত এই সংস্কৃত স্তোত্রটি মৃদু ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় মধুর শুনাইত; অভিভূতের মত সকলে বসিয়া থাকিতেন। ফুজি তাঁহাদের আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই নিবেদিতার ডায়েরীতে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় ও যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধে সে স্থান পাইয়াছে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'পিতৃস্মৃতি' পুস্তকে (পৃঃ ২৫৬) তাঁহাদের বুদ্ধগয়া অবস্থানের একটি বর্ণনা দিয়াছেন। 'মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে কারও আর উঠতে ইচ্ছা হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথা-যোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই।...বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশ-চন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব এক

পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র দু-তিন দিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল। বড় দুঃখ যে তার আজ কোন অনুলিপি নেই।' তিন শ্রেষ্ঠ মনীষীর একত্র সমাবেশ সত্যই দুর্লভ!

এক সন্ধ্যায় নিবেদিতা প্রস্তাব করিলেন, 'চলুন, আমরা সুজাতার বাড়ি দেখে আসি। সেখানে কোন ভগ্নাবশেষ বা ধ্বংসস্তূপ নেই। জায়গাটির চারদিক ঘাসে ঢাকা, কিন্তু ভারী পবিত্র। সুজাতাই ছিলেন আদর্শ গৃহিণী, কারণ তিনিই বুদ্ধদেবকে যথাসময়ে আহার্য দিয়েছিলেন।'

যে পল্লীতে সুজাতা বাস করিতেন, তাহার পূর্বনাম উরুবিল্ব, বর্তমানে 'উরবেল'। নির্বাণ লাভের পর ভগবান বুদ্ধ সুজাতার আনীত পায়স গ্রহণ করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। যদিও স্থানটিতে সুজাতার গৃহের কোন চিহ্নই বর্তমান নাই, তথাপি নিবেদিতা আনন্দে অধীর হইলেন। একখন্ড মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত বক্ষে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'সমগ্র স্থানটি পবিত্র।'

নক্ষত্রখচিত এক অন্ধকার রজনীতে মন্দিরের ছায়াতলে বসিয়া তিনি অতীত স্মৃতিতে তন্ময় হইয়া গেলেন, তারপর সহসা অনুপ্রাণিত হইয়া বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে প্রথমে একটি নূতন ধর্ম ছিল না। বুদ্ধ একজন হিন্দু আচার্য ছিলেন, তবে ঐ সময়ের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের। তাঁর অনুগামীরা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা নিজেদের নূতন সম্প্রদায় বলে মনে করতেন না, তবে জানতেন, তাঁরা প্রতিবেশীদের চেয়ে সৎ ও ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দু। রামকৃষ্ণের অনুবর্তীরা যেমন নিজেদের হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত মনে করেন না। তাঁরা হিন্দুসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, কেবল তাঁদের ধারণা, রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের অন্যান্য আচার্য বা সন্ন্যাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সারা বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্ম জীবন্ত ছিল, যদিও বৌদ্ধ লেখকরা এ বিষয়ে নীরব। আমি যদি আমার গুরুদেবের জীবনকাহিনী ও শিক্ষা বর্ণনা করি, তবে স্বভাবতঃই তাতে বৈষ্ণবধর্মের কোন উল্লেখ থাকবে না। আমার গুরুদেবের সঙ্গে তুলনা করে শ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না ; কারণ গুরুদেবকেই আমি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আচার্য বলে বর্ণনা করব। কিন্তু পরবর্তী কালে কোন ঐতিহাসিক যদি আমার বই থেকে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, রামকৃষ্ণের বহিরঙ্গ ভক্তেরা বৈষ্ণবধর্ম থেকে একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন, অথবা হিন্দুসমাজ থেকে চৈতন্যের অনু-

গ্রামীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ও নিষ্ঠুরভাবে তাদের মেরে ফেলেছিলেন, তাহ'লে ঐ ঐতিহাসিক কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারেন না। হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা ভারত থেকে বিতাড়িত, এ ইতিহাস আমার কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়। খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তা কখনো ছিল না।'

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নিবেদিতার এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বুদ্ধগয়া পরিত্যাগকালে তিনি দুঃখে অভিভূত হইয়া সারারাত্রি অশ্রু বিসর্জন করেন। গভীর আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, 'আমরা ব্যর্থ হয়েছি। দেশের গভীর নিদ্রা এখনও ভাঙেনি। জীবনের সঞ্চার দেখা যায় না। জনসাধারণ আমার কথা শুনতে আসে, কিন্তু পরক্ষণেই সব ভুলে গিয়ে গতানুগতিক পথে চলে। আমরা কিছুই করতে পারিনি। যে মহা জাগরণ একদিন ভারতকে বিশ্বের গর্ব ও এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল, তার অন্তরাত্মার সেই পুনর্জাগরণ এখনও ঘটেনি। কবে আবার এই জাতি তার মহান্ উত্তরাধিকার, ও মানবজাতির চিন্তা ও সভ্যতার সংগঠনে একদিন সে যে বিশেষ স্থান লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে অবহিত হবে? কবে আবার সেই শক্তি, সেই উৎসাহ ফিরে আসবে?'

১২ই অক্টোবর সকলে গয়া স্টেশন হইতে বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে চলিয়া যান। নিবেদিতা ও ক্রস্টীন পরদিন বিহার (বিহারশরীফ) নামক স্থানে উপনীত হইয়া একদিন অতিবাহিত করেন। পরদিন সেখান হইতে রাজগৃহ বা বর্তমান রাজগীরে উপস্থিত হন। নিবেদিতা পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন রাজগীর এবং নালন্দা প্রভৃতির বিখ্যাত বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলি পর্যবেক্ষণ করিবেন। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্রও কয়েকদিন পরে পুনরায় রাজগীরে নিবেদিতার সহিত মিলিত হন। পূজার অবকাশ এখানেই কাটিল। বহু সময়ে নিবেদিতা একাকী ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূর চলিয়া যাইতেন। ইতিহাসের পদধ্বনি তিনি যেন কান পাতিয়া শুনিতেন। তাঁহার নিকট অতীত ভারত মৃত নহে, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ। নগরের যে প্রবেশদ্বার দিয়া প্রেম ও করুণার অবতার মহামানব একটি ছাগশিশু স্কন্ধে লইয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহা আবিষ্কার করিলেন। আবিষ্কার করিলেন অম্বপালীর আম্রকানন। প্রত্যেকটি স্তূপ, প্রত্যেকটি ভগ্নাবশেষ যেন অতীতকালের অসংখ্য ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া বেদনার ভারে মৌন, নিশ্চল। কিন্তু যদি কেহ কান পাতে, তবে শুনিতে পাইবে তাহাদের পদক্ষেপ : অতীত মুখর হইয়া উঠিবে, অসংখ্য ঘটনা

লইয়া তাহার চোখের সামনে জ্বলন্তভাবে দেখা দিবে। রাজগীর অবস্থান-কালেই নিবেদিতা 'Rajgir—an Ancient Babylon' (রাজগীর—প্রাচীন ব্যাবিলন) প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে রাজগীর সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথার্থ অনুধাবন যোগ্য। ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা তাঁহার কতদূর ছিল, তাহার সাক্ষপ্রদান করে তাঁহার 'ভারত-ইতিহাসের পদক্ষেপ'।

বিপ্লব

বাংলা দেশের ইতিহাসে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ চিরস্মরণীয়। বাংলার জাতীয় জীবনে বহুদিক দিয়া এই বৎসরটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্গ-ভঙ্গ, বিদেশী দ্রব্যবর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্যে সমগ্র বাংলায় কেবল পুনর্জাগরণ নহে, যে প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা গিয়াছিল, তাহার ফল সুদূরপ্রসারী। বিদেশী শাসকজাতির বিরুদ্ধে ইহাই প্রথম প্রকাশ্য সক্রিয় প্রতিবাদ। এই আন্দোলনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বিপ্লববাদের ইতিহাসও গুরুত্ব-পূর্ণ। উভয়েরই উদ্দেশ্য বিদেশী শাসন হইতে মুক্তিলাভ। কংগ্রেসও পূর্ব হইতে নানাভাবে স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিয়া আসিতেছিল। বিদেশী শাসন সম্বন্ধে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী ১৯০০ ও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকলা-উডকে লিখিত পত্রগুলির মধ্যেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রামকৃষ্ণ সংঘের সদস্যপদ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কারণ দ্বিতীয়বার ভারতে আগমনের পর রাজনীতির সহিত তিনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার সংগ্রামে নিবেদিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা অতীব কঠিন।

স্বাধীন ভারতে সাহিত্যজগতের একটা বিশেষ অংশ আজ পরাধীন ভারতের গৌরবময় বিপ্লববাদের অনুকীর্তনে ব্যাপৃত। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে নিবেদিতাকে একজন প্রধান বিপ্লবীর ভূমিকায় চিত্রিত করিবার প্রচেষ্টা তাঁহার কোন কোন জীবনীকারের মধ্যে বিদ্যমান। পরাধীন ভারতে যে সকল বিপ্লবী সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া অশেষ-লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের মধ্যে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে জীবন বলি দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা জাতির চিরনমস্য ; তথাপি একথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে-কোন দেশেই বিপ্লবীর কার্য ও দানের পরিধি সীমাবদ্ধ। দেশের একটি বিশেষ সঙ্কটকালে পরাধীনতার পরিবেশেই তাঁহার জীবন ও বাণী অপরকে অনুপ্রাণিত করে। বিপ্লবীর আত্মনিবেদনকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করিয়াই বলা যাইতে পারে, বিপ্লবীর কার্যধারা সর্বযুগের নহে। বিপ্লবীকে পরবর্তী কালে দেশের জনসাধারণ শ্রদ্ধা করিতে পারে, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দ্বারা সম্মান ও অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নির্বিচারে তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে না। যে বাণী সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বলোককে অনুপ্রাণিত করে,

তাহা বিপ্লবের নহে, সে বাণী সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব লাভ করিবার আরাধনার। ভারতের মহামানবগণের কণ্ঠে বার বার সেই চিরন্তন বাণী নূতন করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই বাণীর প্রচারক। তাই পরাধীন ভারতের বিপ্লবযুগে তাঁহার বাণী যেমন গৃহত্যাগী বিপ্লবীকে দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে আহুতিদানের অনুপ্রেরণা দিয়াছে, তেমনি অনুপ্রেরণা দিয়াছে বহু যুবককে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংঘে যোগদান করিয়া নীরবে, নিঃশব্দে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' প্রাণ উৎসর্গ করিতে। আবার বহু আদর্শবাদী যুবক দৈনন্দিন জীবনকে এক উচ্চ আদর্শে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাঁহারই ভাবাদর্শকে জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া। যদি মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পূর্ণ বিকাশই মানবমাত্রের জীবনের চরম লক্ষ্য হয়, অথবা যদি ত্যাগমণ্ডিত উচ্চতম আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে অসমর্থ সাধারণ নরনারী জীবনসংগ্রামে এক মহৎ আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহে, তবে তাহাদের সম্মুখে এমন এক চরিত্র বর্তমান থাকা প্রয়োজন, যাহার মধ্যে আদর্শ শুধু বিচিত্র ভঙ্গীতে নহে, প্রতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই প্রকার আদর্শ চরিত্রের সম্যক্ বিকাশ। মানুষ যাহাতে যথার্থ মানুষের মত বাঁচিতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহার পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাই আজ স্বাধীন দেশেও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং বাণীর প্রভাব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই , উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দকেও কেহ কেহ বিপ্লবী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, বাংলার বিপ্লবযুগের তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা, এবং নিবেদিতাকে তিনিই বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার ও বাস্তবে পরিণত করার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি বাস্তবিকই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণাদায়ক। প্রচণ্ড শক্তির সহিত তিনি জাতির সুপ্ত আত্মাকে নাড়া দিয়াছিলেন—আদর্শে, কর্মে, চিন্তায় এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা ভাবাদর্শের এক প্রচণ্ড বিপ্লব। সে বিপ্লব রাজনৈতিক নহে, তাহার প্রভাব আরও গভীর, ব্যাপক। সমাজজীবনের জড়তা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে জাগ্রত, জীবন্ত করিতে পারেন, ব্যক্তি ও জাতিকে যিনি নূতন ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিই যুগপ্রবর্তক। স্বামী বিবেকানন্দ নবযুগের স্রষ্টা, ভারতের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সংগঠক। তদানীন্তন বিপ্লবী যুবকগণের নিকট গীতা ও চণ্ডীর সহিত স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলি পাওয়ার ফলে বিদেশী সরকারের পক্ষে তাঁহাকে বিপ্লবের প্রবর্তক মনে করা স্বাভাবিক। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত বৈপ্লবিক বা রাজ-

নৈতিক কার্যকলাপের কোনও সংস্রব না থাকিলেও, পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ইহার সহানুভূতি এবং জাতীয় ভাবের পুনরুত্থানে উৎসাহদান সরকারের বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিল। মিশনের পরিচালকগণ নিজেদের উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা বার বার বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াও অব্যাহতি লাভ করেন নাই। ইহার পর কয়েকজন বিপ্লবী সংঘে যোগদান করিলে স্বভাবতঃই সরকারের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু বহু বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁহাদের লক্ষ্য স্থির ছিল। যাঁহারা স্বামিজীর দেশপ্রেম ও জাতীয়ভাবের উদ্দীপক বক্তৃতাগুলি উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বিপ্লবী আখ্যা দেন, তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যান। স্বামী বিবেকানন্দ যে অপ্রতিহত শক্তি এবং অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহাতে তিনি অনায়াসে বিপ্লবী দল গঠন করিয়া দেশের মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারিতেন, অথচ তিনি তাহা করেন নাই ; উপরন্তু স্বপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সংঘের সংগঠনেই সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেন। দেবব্রত, শচীন প্রভৃতি বিপ্লবিগণ পরবর্তী কালে বিপ্লব-পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত সংঘেই নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহা কি স্বামিজীর চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফল নহে ?

যে-কোন জাতির পক্ষে পরাধীনতা মর্মান্তিক অভিশাপ ; দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার উন্নতির প্রবল পরিপন্থী। স্বামিজী জানিতেন, স্বাধীনতা ব্যতীত দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু স্বাধীনতালাভের জন্য প্রচলিত কোন উপায় তিনি সমর্থন বা গ্রহণ করেন নাই। তদানীন্তন কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন-নীতির উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, যে কোন জিনিস নিজে অর্জন করিতে হয় ; ভিক্ষা করিয়া যথার্থ যোগ্য হওয়া যায় না। বিপ্লবেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। প্রকৃতপক্ষে স্বামিজী ছিলেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা। তাঁহার মানসচক্ষে আগামী কাল উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, 'সমগ্র য়ুরোপ বারুদের স্তূপের উপর দণ্ডায়মান এবং য়ুরোপের চিন্তাধারা সমভাবে চলিলে শীঘ্র উহার বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী।' তাঁহার অন্যতম ভবিষ্যদ্‌বাণী—ভারতবর্ষ অভাবিতরূপে স্বাধীনতা লাভ করিবে, আর সেজন্যই বলিয়াছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ জননী ভারতবর্ষ তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউক।'

নিবেদিতা স্বামিজীর বাণী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ছিল তাঁহার উপাস্য দেবতা। তাঁহার লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তি, কিন্তু ইহার উপায় সম্বন্ধে

তিনি স্বামিজীর মত সর্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। স্বামিজী জানিতেন, স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। নিবেদিতা তাহা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। স্বামিজীর দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল না ; তাঁহার ব্রত ছিল জাতিগঠন। তিনি বলিতেন, 'My aim is nation-making', শুধু তাহাই নহে, অধীরচিত্তে ভারত যাহাতে অতি সত্বর পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্বসভায় ভারতের স্থান সর্বোচ্চ, এবং পৃথিবীর নরনারীকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে ভারতবর্ষ, এ বিষয়ে তাঁহার ধারণা অতিশয় দৃঢ় ছিল। তাঁহার ধমনীতে ছিল স্বাধীন আইরিশ জাতির রক্ত। যে দেশকে তিনি স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উপর বিদেশীর আধিপত্য এবং ঐ শাসনের দুর্নীতি তাঁহার মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত, এবং ইহার হাত হইতে মুক্তিলাভের সর্বপ্রকার আন্দোলনের প্রতি তাঁহার একান্ত সমর্থন ছিল।

কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী সকল নেতৃবৃন্দের সহিত যেমন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, বিপ্লবী নেতাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাধীনতালাভের প্রতিও তেমনই তাঁহার সহানুভূতির অভাব ছিল না। দেশের সকল তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়ভাব সঞ্চারের জন্য তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বিপ্লবী তরুণগণ তাঁহার নিকট স্নেহ, প্রেরণা এবং আশ্রয় লাভ করিয়াছে। দেশের মুক্তিসাধনায় শ্রীঅরবিন্দকে তিনি উৎসাহ দিয়াছিলেন। অনুশীলন সমিতিতে তাঁহার যাতায়াত ছিল, এবং নিয়মিত হিতোপদেশ দেওয়া ছাড়াও বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, যেগুলি সহজেই তরুণ সম্প্রদায়কে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিত। তথাপি নিবেদিতা বিপ্লবকার্যে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন একথা বলা চলে না। বিপ্লবীর আদর্শের সমর্থন এবং স্বাধীনতাসংগ্রামে উৎসাহ প্রদান এক কথা, আর উহাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান অন্য কথা। একথা সত্য, দেশের রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'তাঁহার রাজনৈতিক মত জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখিব না। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসী ছিলেন। স্বাধীনতার পতাকা নামাইতে বা ঢাকা দিতে তাঁহার প্রাণে লাগিত। তবে আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বরাজ বা অভ্যন্তরীণ জাতীয় আত্মকর্তৃত্বে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহাকে উচ্চতম বা চরম লক্ষ্য বলিতে তিনি রাজী ছিলেন না। তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে আর একটি কথা এই বলিব যে,

তিনি সকল অবস্থাতেই অহিংসার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রয়োজন-বিশেষে বা স্থান-বিশেষে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ তিনি আবশ্যক মনে করিতেন। তিনি যোদ্ধৃপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন' (উদ্বোধন, ১৩৩৫, পৃঃ ২০)।

দীনেশ সেন লিখিয়াছেন, 'নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একেবারেই করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন ; রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের সহিত বলিতেন—দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নয়, আমি আপনার সঙ্গে ও বিষয়ে কথা বলব না।' ইহা নিবেদিতার চরিত্রের একটি সুন্দর চিত্র।

নিবেদিতার পত্র প্রমাণ করে, তিনি স্বামিজীর প্রবর্তিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত অভিপ্রায় ছিল, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করুক এবং সেজন্য প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র সংগ্রামে অগ্রসর হউক। কিন্তু বিপ্লবকার্যে তিনি যে অন্যতম প্রধান নেত্রী ছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের মতই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই।

নিবেদিতার বৈপ্লবিক কার্যে পূর্ণ সক্রিয়ভাবে যোগদানের বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি আছে। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন, 'নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী শুধু বৈপ্লবিক নহে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই অতি মারাত্মক রকমের বিপ্লববাদী, বিপ্লবকর্মী ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি তিনি "Nihilist of the worst tvpe" ছিলেন। যা ছিলেন আবার স্বামিজীর দেহত্যাগের পর তাহাই হইলেন। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে বিপ্লবী হওয়া নূতন কিছুই নয়।...আরো শুনিয়াছি, এই সময় ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারের চেষ্টায় পি. মিত্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার নিভৃতে কথোপকথন হইয়াছিল। অরবিন্দের সহিত বরোদায় প্রথম সাক্ষাতের পর তিনি ১৯০৩ জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া অরবিন্দ-প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতির প্রথমপর্বে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন' (শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ, পৃঃ ৩২৬)।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, উপরি-উক্ত কথাগুলি সবই শোনা। স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে নিবেদিতা অতি মারাত্মক রকমের বিপ্লবী ছিলেন, ইহা নিছক কল্পনা। তাঁহার স্বপ্রদত্ত বক্তৃতা ও স্বলিখিত পুস্তক হইতে জানা যায়, স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া তিনি এক প্রচণ্ড ধর্মসংশয়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। স্বামিজী-প্রচারিত বেদান্ত

তাঁহার ধর্মসংশয় ও পিপাসা দূর করে। তাঁহার দিনলিপিতে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, তিনি শৈশব হইতেই সত্যের উপাসিকা। বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ সত্যের এক চিরানুসৃত ধারণা তাঁহার মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল বটে, তথাপি সত্য লাভের জন্য পূর্বেই সেই তীব্র ব্যাকুলতার অভাব ছিল না। স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের পর ধীরে ধীরে এক বৃহত্তর তত্ত্বের আভাস তিনি পাইলেন।[১]

একই ব্যক্তির পক্ষে একসঙ্গে মারাত্মক বিপ্লবী এবং প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী হওয়া কি সম্ভব? নিবেদিতা যদি পূর্বেই প্রবলভাবে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বামিজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে আকৃষ্ট হইলেও, নিজের প্রবল মতামত বিসর্জন দিয়া তিনি স্বামিজীর অভিলষিত নারীজাতির শিক্ষাকার্যে আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাঁহার প্রকৃতি এরূপ নিরীহ ছিল না।

'যা ছিলেন আবার স্বামিজীর দেহত্যাগের পর তাহাই হইলেন'—অর্থাৎ স্বামিজী দ্বারা তিনি কিছুমাত্র প্রভাবিত হন নাই। নিবেদিতার পরবর্তী জীবন, কর্ম ও রচনা ইহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁহার সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত ছিলেন, তাঁহার উপর স্বামিজীর প্রভাব কত গভীর ছিল।

শ্রীঅরবিন্দের কার্যের সহিত নিবেদিতাকে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত করিবার যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, বরোদা আগমনের পর হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর তাঁহার জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—বিপ্লব-সংসাধন। পক্ষান্তরে, নিবেদিতার জীবনে বিপ্লবের সহিত সংযোগ একটা গৌণ দিক মাত্র। বিপ্লবের কাজ ধ্বংস। অথচ নিবেদিতার জীবনব্যাপী সংগঠনমূলক কার্যের ইয়ত্তা নাই। দেশের সর্বপ্রকার কল্যাণকর কার্যে ও উন্নতিমূলক প্রচেষ্টায় তাঁহার অপেক্ষা উৎসাহী নিরলস কর্মী বিরল। তিনি গুরুর উপযুক্ত শিষ্যা।

নিবেদিতা মারাত্মক রকমের বিপ্লবী হইলেও সরকার-কর্তৃক তাঁহাকে কোন প্রকার নির্যাতন অথবা কারারুদ্ধ না করিবার কারণ, তাঁহার সহিত

[১] In my childhood, as it seems to me, I was pushing on eagerly. along a narrow path to *truth.* At 18 to 21 the idea of a certain *truth*, specifically and historically reliable, died in me. Still I sought *truth* with the same feverish and fanatical longing as before. At 28 I met Swamiji—gradually introduced into a large generalisation (from Diary, dated 22nd July, Monday, 1907).

সরকারের বহু উচ্চ কর্মচারীর পরিচয় ছিল, এবং তিনি শ্বেতাঙ্গিনী—ইহাই অনেকের অভিমত। সরকারের অনেক কর্মচারীর সহিত নিবেদিতার পরিচয় ছিল সত্য, লেডি কার্জনের সহিতও তাঁহার বিশেষ আলাপ ছিল ; তথাপি তিনি সাংঘাতিক রকমের বিপ্লবী জানিয়াও কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গিনী বলিয়া সরকার তাঁহার সর্বপ্রকার শাসনবিরোধী কার্যকলাপ সহিয়া যাইবেন এবং তাঁহার কেশও স্পর্শ করিবেন না, তদানীন্তন শাসকবর্গের প্রবল দমননীতির যে পরিচয় আগাগোড়া পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐ শাসক-গণই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব এবং সন্ত্রাসবাদ যখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ, তখন হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করায় স্বজাতীয়া শ্রীমতী অ্যানী বেশান্তকে এক বৎসর অন্তরীণ করিয়াছিলেন। সরকার নিবেদিতার প্রতিও প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চিঠিপত্র খুলিয়া পড়ার নির্দেশ ছিল। যদি সত্যই তিনি শ্রীঅরবিন্দের মত বিপ্লবকার্যে লিপ্ত থাকিতেন, তবে তাঁহাকেও পণ্ডিচেরী গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত ; কলিকাতায় বাস করা চলিত না।

নিবেদিতার মারাত্মক রকমের বিপ্লবী হওয়ার আর একটি বিশেষ বাধা ছিল। জগদীশচন্দ্র বসুর ১৯০২ সালের অক্টোবরে ভারত প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পর হইতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত নিবেদিতা তাঁহার গবেষণাকার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'উদ্ভিদের সাড়া' (Plant Response) এবং পরবর্তী পুস্তকগুলিতে নিবেদিতার লিপিচাতুর্য যথেষ্ট রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার সাহায্য শ্রীযুক্ত বসুর অপরিহার্য ছিল। নিবেদিতার ডায়েরী হইতে জানা যায়, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বসু-দম্পতীর সহিত তাঁহার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ছিল। শ্রীযুক্ত বসু প্রায় প্রতিদিন ১৭নং বোসপাড়া লেনে আসিতেন, অথবা নিবেদিতা ৯৩নং সার্কুলার রোডে বসুর গৃহে গমন করিতেন। প্রতি গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে তাঁহারা মায়াবতী অথবা দার্জিলিঙ গিয়াছেন। ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ দুই বৎসর তাঁহারা একত্র পাশ্চাত্যে অবস্থান করেন, এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন একত্র। শ্রীযুক্ত বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা নির্ভর করিত সরকারী সাহায্যের উপর। নিবেদিতার বৈপ্লবিক কার্যে সক্রিয় সংশ্লেষ থাকিলে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে শ্রীযুক্ত বসুর উপরেও সরকারী প্রতিক্রিয়া দেখা যাইত। আর শ্রীযুক্ত বসু জানিয়া শুনিয়া কখনই নিবেদিতাকে ঐ পথে চলিতে দিতেন না ; সর্বতোভাবে নিষেধই করিতেন। কারণ, দেখা যায়, নিবেদিতার রাজনৈতিক মতামতের জন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না। ১৯১০ সালে লেডি মিণ্টোর সহিত সাক্ষাতের ফলে তাঁহার

অনুরোধে নিবেদিতা প্রধান পুলিশ-কর্মচারীর সহিত দেখা করিলে শ্রীযুক্ত বসু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

শ্রীযুক্ত বসুর ন্যায় উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি সক্রিয় বিপ্লবকার্যে নিযুক্ত ছিলেন না। থাকিলে তখনকার দিনের ঐ সব কর্মচারীরা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন না। বস্তুতঃ সার্ যদুনাথ সরকার প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া জানিয়াছি যে, তাঁহারা ঐ সব আধুনিক অপবাদ মিথ্যা বলিয়াই মনে করিতেন।

শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতার যোগাযোগ লইয়া অনেক কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছে; এবং প্রধানতঃ উহারই উপর ভিত্তি করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, নিবেদিতাই বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেত্রী। শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতার কতখানি যোগ ছিল, তাঁহার কার্যে নিবেদিতার সহযোগিতা কতদূর বিস্তৃত ছিল, এ সকল তথ্য অনুমান ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রমাণের কোন উপায় নাই। ফলতঃ উভয় পক্ষকেই শ্রীঅরবিন্দ-প্রদত্ত কোন ক্ষুদ্র বিবরণ, নিবেদিতার নিজের লেখা, অন্যান্য পুস্তক হইতে সংগৃহীত পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং নিবেদিতার পরিচিত সমসাময়িক ব্যক্তি-গণের নিকট অনুসন্ধানপূর্বক যাহা জানা গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই নিবেদিতার বৈপ্লবিক কার্যধারা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

নিবেদিতার ডায়েরী এবং পত্রে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। শ্রীঅরবিন্দও এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করেন নাই। নিবেদিতার ডায়েরী হইতে জানা যায়, তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বক্তৃতা-সফরে বাহির হইয়া অক্টোবর মাসে বরোদা গিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্বেই নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' পড়িয়া মুগ্ধ হন। নিবেদিতা বলেন, তিনি শুনিয়াছেন অরবিন্দ শক্তির উপাসক। অতঃপর উভয়ের মধ্যে রাজনীতি ও অন্যান্য আলোচনা হয়। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেন—

'বরোদার মহারাজার সহিত নিবেদিতার সাক্ষাৎকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। নিবেদিতা মহারাজাকে গুপ্ত বিপ্লবীদলকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন, মহারাজা এ বিষয়ে আমার মারফৎ নিবেদিতার সহিত আদানপ্রদান করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ বিপজ্জনক কার্যে প্রবৃত্ত না হইবার মত চতুরতা সয়াজী রাওএর যথেষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি এ প্রসঙ্গ

আমার নিকট কখনও উত্থাপন করেন নাই' (Sri Aurobindo on Himself, p. 97)[১]।

বরোদার মহারাজার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালেই গুপ্ত বিপ্লবী দলকে সাহায্য করিবার জন্য নিবেদিতা অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ বরোদার মহারাজার সহিত নিবেদিতার সাক্ষাৎ এবং শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতার পরস্পরের পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ অন্যত্র যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই (Sri Aurobindo on Himself, p. 116)।

তবে নিবেদিতার ভ্রমণ ও বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল দেশের সর্বত্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধ-জাগরণ। জাতীয় জীবনে তখন জাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছে, এবং ইহার পশ্চাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলির প্রভাব বড় কম ছিল না। ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন সমিতি গঠন করিয়া বহু উৎসাহী যুবক ইতিমধ্যে ঐ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নিবেদিতার ঐ সকল সমিতিতে যাতায়াত ছিল। দেশের সর্বত্র এই জাতীয়তা প্রচারের সর্ববিধ প্রচেষ্টায়, প্রকাশ্যে এবং গোপনে ঐ সকল সমিতিকে আর্থিক সাহায্যদানে নিবেদিতা যদি বরোদার মহারাজাকে অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বাংলা দেশে ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতির কার্য আরম্ভ হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। গুপ্ত সমিতির উদ্ভব ইহাদের কিছু পরে, এবং প্রথমাবস্থায় বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাংলা দেশের বৈপ্লবিক উদ্যমের বার্তা নিবেদিতাই অরবিন্দের নিকট বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন, অরবিন্দ তাহা বলেন নাই ; যদিও কেহ কেহ ইহা অনুমানপূর্বক অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন।

তবে শ্রীঅরবিন্দ যদি দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁহার পরিকল্পনা নিবেদিতার নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকেন, এবং নিবেদিতা যদি তাঁহাকে উত্তরে বলেন যে, বাংলা দেশে বহু যুবক আছে যাহারা অরবিন্দের কার্যে যোগদানে প্রস্তুত, তাহা অসম্ভব নহে। অবশ্য ইহাও অনুমানের কথা। তাঁহার সহিত নিবেদিতার কি আলোচনা হয়, তাহা অজ্ঞাত। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, 'আমরা রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম।'

[১] 'Sri Aurobindo on Himself' নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের বিষয় ও অন্যান্য কথাও আছে। ভগিনী নিবেদিতার সহিত যুক্ত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতার জীবনচরিত এবং অন্যান্য প্রবন্ধে যে সকল তথ্য বিবৃত করা হয়, তাহার মধ্যে যাহা কিছু তাঁহার মতে সঠিক নহে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতার কার্যপ্রণালীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, নিবেদিতার সহিত তাঁহার সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত বিপ্লবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল (as my collaboration with her was solely in the secret revolutionary field)। অতএব এই গুপ্ত বিপ্লবের কার্যধারা কিরূপ এবং তাহার সহিত নিবেদিতার যোগাযোগ কতদূর ছিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,...'অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?'

যে ব্যক্তি স্বদেশকে জড় পদার্থরূপে দেখার পরিবর্তে সাক্ষাৎ জননীর ন্যায় ভক্তি করে, পূজা করে, তাহার সহিত নিবেদিতার মতের এবং মনের মিলন ঘটা বিচিত্র নহে। দেশের প্রতি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিবেদিতা পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনেই কথাপ্রসঙ্গে বাহির হইতে দেখিতে শান্তশিষ্ট, নিরীহ ব্যক্তির এই মনোভাব নিশ্চিত তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। তাঁহার লোক চিনিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সুতরাং বৈদেশিক শাসন হইতে দেশমাতৃকার মুক্তি-লাভের জন্য অরবিন্দের কর্মপ্রণালীর প্রতি নিবেদিতার সহানুভূতি এবং সমর্থন খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

এখন অরবিন্দের কর্মপ্রণালীর সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন। তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ এবং কর্মপ্রণালী প্রধানতঃ ত্রিধারায় পরিচালিত ছিল।

প্রথমতঃ, গুপ্ত বিপ্লব প্রচার ও সংগঠন, যাহার প্রধান উদ্দেশ্য রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্য প্রচারের দ্বারা সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। অরবিন্দ যখন রাজনীতিতে যোগদান করেন, তখন অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট এই স্বাধীনতার আদর্শ অবাস্তব এবং অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইত।

তৃতীয়তঃ, সংঘবদ্ধ জনসাধারণ কর্তৃক অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধরূপে সরকারের বিরোধিতা এবং বৈদেশিক শাসনের ভিত্তি শিথিল করিবার প্রচেষ্টা।

বিশাল সাম্রাজ্যগুলির সামরিক শক্তি তখনো বর্তমানের ন্যায় প্রবল এবং আপাতদৃষ্টিতে অপরাজেয় বলিয়া মনে হয় নাই। রাইফেল তখনো প্রধান অস্ত্র, এবং কামান, গোলা প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রও পরবর্তী কালের ন্যায় সর্ব-বিধ্বংসী হইয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষ নিরস্ত্র হইলেও অরবিন্দ ভাবিয়াছিলেন, অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত এবং বাহির হইতে আমদানী দ্বারা এই বাধা অতিক্রম করা যাইবে। ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ, বিদ্রোহ, এমন কি, গরিলা যুদ্ধের দ্বারাও ব্রিটিশের স্থায়ী ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে পরাজিত করা সম্ভব। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও সাধারণ বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল (Sri Aurobindo on Himself, pp. 38-39)।

ভারতবর্ষে আগমনের পর কয়েক বৎসর শ্রীঅরবিন্দ গভীরভাবে দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন, যাহাতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থানির্ণয় সহজ হয়। ইহার মধ্যে 'ইন্দুপ্রকাশে' কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্ম হইতে তিনি বিরত ছিলেন। তাঁহার প্রথম উদ্যম হইল বাঙ্গালী সৈনিক যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দিষ্ট কর্মসূচী দিয়া বাংলাদেশে প্রেরণ করা। তাঁহার ধারণা ছিল, সমগ্র দেশকে প্রস্তুত করিতে ত্রিশ বৎসর লাগিবে। সুতরাং উদ্দেশ্য ছিল, যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে বা গোপনে নানাভাবে বাংলার সর্বত্র বিপ্লব প্রচার ও বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহ। বিপ্লবী কর্মী সংগৃহীত হইবে দেশের যুবকসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে, আর ঐ কার্যে সহানুভূতি, সমর্থন এবং আর্থিক ও অন্য বিষয়ে সাহায্যের জন্য দেশের উদারমতাবলম্বী প্রবীণ ব্যক্তিগণকে প্রভাবিত করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা ছিল, এই উদ্দেশ্যে প্রতি শহরে ও গ্রামে কেন্দ্রস্থাপন পূর্বক প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া বাহ্যতঃ সাংস্কৃতিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানার্থে বহু সমিতি গঠন এবং পূর্ব হইতেই বর্তমান সমিতিগুলিকে বিপ্লবাদর্শে প্রভাবিত করা। ভবিষ্যৎ সংগ্রামে প্রস্তুতির জন্য যুবকগণকে অশ্বারোহণ, ব্যায়াম, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বঙ্গভঙ্গের পর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ্য আন্দোলনের ফলে দেশে চরমপন্থীদলের অভ্যুত্থান ও জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রস্তুত হয়। শ্রীঅরবিন্দের কার্যধারা তখন হইতে ক্রমেই এই আন্দোলনে নিবদ্ধ ছিল, এবং গুপ্ত কার্যপ্রণালী গৌণ হইয়া দাঁড়ায়। তবে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহ সম্বন্ধে জন-সাধারণকে অবহিত করিবার জন্য তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করেন। ইহার পরে বারীনের পরামর্শে 'যুগান্তর' পত্রিকা মারফৎ প্রকাশ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রচার আরম্ভ হয় (Sri Aurobindo on Himself, pp. 41-44)।

সংক্ষেপে ইহাই শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা ও তাহা কার্যকরী করিবার উপায়। দেখা যাইতেছে, নিবেদিতা নিজেও ঐ ধরনের চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের দ্বিতীয় কর্মপন্থা প্রকাশ্যে জনসাধারণকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। নিবেদিতা এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে ইতিপূর্বেই অগ্নি-গর্ভ বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক শাসন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতেন এবং শাসক ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহার বিরাগ প্রবলভাবে অপরের মধ্যে সংক্রমিত করিতেন।

শ্রীঅরবিন্দের তৃতীয় কর্মপন্থা জনসংঘ-সংগঠন ও প্রকাশ্যে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বনে সরকারের বিরোধিতা করা।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা পরে ব্যাপকভাবে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে পরিণত হয়, এবং ইহার মূল লক্ষ্য ছিল অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। নিবেদিতা এই আন্দোলনে যোগদান করেন।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এই কার্যপ্রণালী অরবিন্দ ও নিবেদিতা কর্তৃক যুক্তভাবে গৃহীত হইয়াছিল কি না। নিবেদিতা বলিতেন, 'আমার কাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা।' স্বামিজীর আদর্শে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তা-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যপদ পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, গরম-গরম বক্তৃতা-দান, ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটন, স্বাধীনতা অর্জনে সকলকে উৎসাহ-দান, পাশ্চাত্যের অনুকরণ না করিয়া মনে-প্রাণে, আচারে-ব্যবহারে, শিক্ষা-দীক্ষায়, খাঁটী ভারত-বাসী হইয়া স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আত্মবিশ্বাসী হইবার জন্য জন-সাধারণের নিকট আবেদন—ইহাই ছিল নিবেদিতার কার্য, এবং এই কার্য তিনি স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ করেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে পরিচয় পর্যন্ত তখনো হয় নাই। সুতরাং ইহা শ্রীঅরবিন্দ-প্রভাব-নিরপেক্ষ।

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃগণের সহিত দেশের তদানীন্তন সকল মনীষিবৃন্দের সমর্থন, উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল। সে আন্দোলনে নবজীবনের যে প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল, তাহাতে ভাসিয়া যান নাই এমন ব্যক্তি কম ছিলেন। যিনি যেভাবে পারিয়াছেন, আন্দোলনকে সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিবেদিতাও তাঁহাদের একজন। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের সহিত এখানেও নিবেদিতার বিশেষ সংস্রব নাই।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম কার্যপন্থা গুপ্ত বিপ্লবপ্রচার এবং ঐ উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি সংগঠন। গুপ্ত সমিতি হইতেই পরবর্তী কালে মারাত্মক বিপ্লব-কার্যের অনুষ্ঠান ও সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি। সুতরাং দেখিতে হইবে, এই গুপ্ত সমিতি ও ইহার বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের সহিত নিবেদিতার কতদূর সংযোগ ছিল। কারণ এই গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপের সহিত যুক্ত করিয়াই নিবেদিতাকে বিপ্লব-আন্দোলনের নেত্রীরূপে খাড়া করিয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অরবিন্দ স্বয়ং বলিয়াছেন, বাংলার বিপ্লবদলগুলিকে সম্বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা দেশে আগমন করিয়া রাজনৈতিক নেতা পি. মিত্রের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেন। ঐ পরিষদের পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে নিবেদিতা ছিলেন অন্যতমা। পি. মিত্রের নেতৃত্বে কার্যের দ্রুত প্রসার ঘটে, সহস্র সহস্র যুবক উহাতে যোগদান করে, এবং পরে বারীনের 'যুগান্তর' পত্রিকা মারফৎ যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লবাদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার হয়। কিন্তু তাঁহার বরোদা থাকাকালে পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় (Sri Aurobindo on Himself, p. 117)।

গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় কবে, তাহার সঠিক তারিখ কেহ দিতে পারেন না। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি পাওয়া যায়।

'স্বামী বিবেকানন্দ জগন্মাতার নিকট বাঙ্গালী জাতিকে মানুষ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—সতীশচন্দ্র সেই কর্মভার গ্রহণ করেন।...বাঙ্গালী জাতিকে শৌর্যে, বীর্যে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইবে, বাঙ্গালী জাতি সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার পরিকল্পনা।...অপর-দিকে খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পি. মিত্র মহাশয়ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে বাঙ্গালীর শক্তিচর্চার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন। সরলা দেবী চৌধুরাণীও এই উদ্দেশ্যে বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্তন করিয়াছিলেন।... সোদপুরের শশীদা (শশীভূষণ রায় চৌধুরী) মিত্তির সাহেবকে সমিতিতে আনেন।...স্মরণ রাখিতে হইবে, জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অনুশীলন সমিতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সমন্বিত আদর্শ মানবগঠনের যে নির্দেশ আছে—তাহাই অনুশীলন সমিতির ভিত্তি।...

'১৯০২ সালে দোলপূর্ণিমার দিন কলিকাতায় প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতির পৃষ্ঠপোষক পি. মিত্র মহাশয়ই এই সময় আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন—পরলোকগত সুরেন হালদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ

রায়, রজত রায়, এইচ. ডি. বসু প্রমুখ ব্যারিস্টারগণ তাঁহার সহিত এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন। এমন কি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ ও বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

'...অনুশীলন সমিতি সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহার উচ্চ আদর্শ যুবকসম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহারা দলে দলে সভ্য হইতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় সুললিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাহিয়া সভ্যাদিগকে উল্লসিত করিতেন। সিস্টার নিবেদিতা নিয়মিত হিতোপদেশ দিতেন।

'...শারীরিক উৎকর্ষের জন্য নানাবিধ ব্যায়াম, ডন-বৈঠক, কুস্তী ইত্যাদি হইত। মানসিক উন্নতির জন্য বীরপুরুষদিগের জীবনচরিত, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার কাহিনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, গ্যারীবল্ডীর জীবনচরিত, নিহিলিস্ট-রহস্য ইত্যাদি পাঠের ব্যবস্থা ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশের কথা, জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা হইত।

'...নৈতিক উন্নতির জন্য সপ্তাহে একদিন (রবিবার) moral class হইত। রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা, গীতা, চন্ডী-পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত।

'...আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানাবিধ উপদেশ ও সাধন পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। সংযম শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য পালনের উপায় ও নির্দেশ দেওয়া হইত। তজ্জন্য সত্যচরণ শাস্ত্রী, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিত আসিতেন ও উৎসুক সভ্যাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন' (অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)।

এই অনুশীলন সমিতির সহিত গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লববাদের সম্পর্ক ছিল।

'জন্মভূমির মুক্তিকল্পে শক্তিসাধনাই ছিল সেকালের যুগধর্ম।...যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের সহিত বিপ্লববাদের মন্ত্রণা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন অনুমান ১৯০৩ সালে এবং বিপ্লব-আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। উপযুক্ত কর্মীগঠনের উদ্দেশ্যে তাঁহারাও বাঙালী যুবকদের ব্যায়াম শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন, ইহাতে শরীরচর্চার আরও প্রচার হইল। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং সৈনিকবেশে অশ্বারোহণ করিয়া কলিকাতা শহরের রাজপথে যুবকদিগকে সামরিক শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করিতেন এবং ক্ষাত্রশক্তি ভিন্ন স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে ইহা প্রচার করিতেন।...তিনিই বাংলার বিপ্লববাদের জন্মদাতা বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের

কার্যের সুবিধা ও সহযোগিতার জন্য ও কর্মী সংগ্রহের জন্য পি. মিত্র মহাশয় মারফৎ অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাঙ্গালী যুবকদিগকে অশ্বারোহণ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একটি Riding Club প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরিচালনার ভার ছিল মন্মথ চাটুয্যে ও দেবব্রত বসুর উপর। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা গুপ্ত সমিতির একটি ছদ্মবেশ—ইহার অন্তরালে গুপ্ত সমিতির কার্যোদ্ধার হইত' (ঐ)।

অনুশীলন সমিতিতে নিবেদিতার যাতায়াত ছিল। সুতরাং ইহার সহিত গুপ্ত সমিতির যোগাযোগ থাকায় এই সূত্রে নিবেদিতারও ইহার সহিত যুক্ত থাকিবার সম্ভাবনার কথা উঠে। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, '১৯০২ সালে বঙ্কিমের অনুশীলনের আদর্শ নিয়ে কলিকাতায় অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়। সোদপুরে শশীভূষণ রায় চৌধুরী ইহার সভ্য ছিলেন। তিনি গণ-আন্দোলনে দেশের মুক্তি আনার স্বপ্ন দেখতেন এবং গ্রামে কাজ করতেন। তিনি মিত্তির সাহেবকে অনুশীলন সমিতিতে আনেন। স্বামী বিবেকানন্দ সানন্দে এই তরুণের দলকে কাজের বহু উপদেশ দিতেন। সমিতির অনেকেই আগে থেকে বেলুড়মঠে যেতেন।

'মিত্তির সাহেব সতীশবাবু প্রভৃতিকে বলেন—বরোদা থেকে একটা দল এসেছে। তোমাদের উদ্দেশ্যের মত তাদেরও উদ্দেশ্য। সামরিক শিক্ষা তারা দেবে। তাদের সঙ্গে তোমাদের মিলিত হতে হবে। এর ফলে উভয় দল মিলে গেল। মিলিত দলের সভাপতি মিত্তির সাহেব। সহ-সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও শ্রীঅরবিন্দ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন ঠাকুর' (শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামী, পৃঃ ৮)।

বলা বাহুল্য, ইহাই অরবিন্দ-উক্ত কেন্দ্রীয় পরিষদ (Central Council), কেবল নিবেদিতার নাম এখানে নাই।

'...এই মিত্তির সাহেব অনুশীলনের সঞ্চালক বা ডাইরেক্টর পদে বৃত হন। ...যতীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে সরলা দেবীর নামে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন। এখানে মিত্তির সাহেবের আনুকূল্য লাভ করেন এবং অনুশীলন সমিতির সঙ্গে পরিচিত হন। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য সারকুলার রোড সুকিয়া স্ট্রীট থানার কাছে একটি বাড়ি ভাড়া করে সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। এখানে একটি সমিতি স্থাপন করা হল। এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল বিপ্লবী-নীড়। এখানে ঘোড়-দৌড়, সাইকেল, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা শেখান হত এবং বিপ্লবী ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বক্তৃতা ও পাঠচক্র পরিচালিত হত। ভগিনী নিবেদিতা এটির সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দিলেন তাঁর বিপ্লববাদের পুস্তক-সংগ্রহ। তাঁর বইগুলির মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ইটালীর মুক্তিদাতা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী, রমেশ দত্ত, ডিগবী, দাদাভাই নৌরজীর অর্থনীতির বই, অধ্যাপক ওকাকুরার বই প্রভৃতি। নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথকে রাজনীতি শেখাবার জন্য এবং কর্মী গঠনের জন্য এই বইগুলি দিয়েছিলেন। ১৯০১ সালে বরোদার মহারাজার নিমন্ত্রণে তিনি বরোদায় যান। সেথায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে' (ঐ, পৃঃ ৯)।

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত এই বিবরণে অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাৎকাল সম্বন্ধে ভুল রহিয়াছে। ১৯০১ সালে নিবেদিতা ভারতবর্ষেই ছিলেন না। তিনি ১৯০২ সালে বরোদা গমন করেন। অরবিন্দের নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া যতীন্দ্রনাথের আগমন ও গুপ্ত সমিতি স্থাপন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হইবার সম্ভাবনা। অরবিন্দ সাল উল্লেখ করেন নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, নিবেদিতা তাঁহাকে পিটার ক্রপটকিন ও ম্যাটসিনির পুস্তকাবলী উপহার দিয়াছিলেন এবং তাঁহার মারফৎ বাংলার বিপ্লব সমিতিকে ম্যাটসিনির আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড দান করিয়াছিলেন (Swami Vivekananda—Patriot Prophet, p. 119)। এ পুস্তকগুলি দেশের সর্বত্র সরবরাহ করা হইত। অতএব গুপ্ত সমিতির সহিত নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গুপ্ত সমিতির স্থাপনে অরবিন্দের উদ্দেশ্য ছিল গোপনে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্বাধীনতাসংগ্রামে অরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। তবে উহাই একমাত্র নীতি ছিল না, এবং বাংলা দেশে অবস্থানকালে তিনি গোপনে বিপ্লবকার্যও পরিচালনা করেন। উদ্দেশ্যসাধনে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বিফল হইলে যাহাতে প্রকাশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করা যাইতে পারে, তজ্জন্যই এই প্রস্তুতি (Sri Aurobindo on Himself, p. 34) নিবেদিতার ইহাতে সমর্থন থাকা অসম্ভব নহে। কারণ, দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে তিনি ঠিক অহিংস ছিলেন না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় বক্তৃতাকালে ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমাদের প্রয়োজন শক্তিশালী যুবকবৃন্দের। ...দেশের কল্যাণ যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়। সর্বদা স্মরণ রাখিও, সমগ্র ভারতবর্ষই তোমাদের স্বদেশ, এবং বর্তমানে এই দেশের প্রয়োজন কর্ম। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসিবে, তখন যেন নিদ্রায় মগ্ন থাকিও না।'

স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং তাহার জন্য গোপন প্রস্তুতি—যেখানে প্রকাশ্যে প্রস্তুতির কোন সম্ভাবনা নাই—নিন্দনীয় নহে। গুপ্ত সভা-সমিতির সৃষ্টির কারণও ইহাই। পরাধীন দেশে বিদেশী শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার বা উহা পরিবর্তন করিবার প্রকাশ্য ক্ষমতার অভাবে গোপন আন্দোলনের সৃষ্টি অনিবার্য। সুতরাং নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সমিতি গঠনপূর্বক গোপন আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করায় নিবেদিতার সমর্থন এবং উৎসাহ ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি গুপ্ত সমিতিতে বিপ্লববাদের পুস্তক উপহার দেন এবং স্বয়ং উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা যুবকগণের হৃদয়ে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করিতেন। কিন্তু এই গুপ্ত সমিতির পরিচালনার ব্যাপারে তাঁহার কোন দায়িত্ব ছিল না। বিশেষতঃ এই গুপ্ত সমিতি হইতে পরে যে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়, তাহার সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না, বা তিনি সক্রিয়ভাবে ইহাতে যোগদান করেন নাই। কোন কার্যে উৎসাহ দান বা সমর্থন এক কথা, পরিচালনা বা সক্রিয় যোগদান অন্য কথা।

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন, 'অরবিন্দ তাঁহার গুপ্ত সমিতির দলকে এইরূপ সংগঠন এবং কর্মের কৌশল কোনদিন শিক্ষা দেন নাই, কেননা উহা তিনি জানিতেন না। ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিকে এই শিক্ষা দিয়াছেন' (শ্রীঅরবিন্দ, পৃঃ ৫৩২)।

'অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির দলকে ভগিনী নিবেদিতার গুপ্ত সমিতির দল বলিলে কিছু মিথ্যা বলা হয় না' (ঐ, পৃঃ ৫৩৩)।

'অরবিন্দের হাতে গুপ্ত সমিতির যে দলটি ছিল, নিবেদিতা হাতেকলমে সেই দলটিকে আগাগোড়া পরিচালিত করিয়াছেন। অরবিন্দ অপেক্ষা গুপ্ত সমিতির টেকনিক (technique) ভগিনী নিবেদিতার বেশী জানা ছিল' (ঐ, পৃঃ ৭২৬)।

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এই ধরনের কথা অসংখ্য বার লিখিয়াছেন এবং প্রমাণস্বরূপ মাঝে মাঝে লিজেল রেম'র ফরাসী পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অন্য কোন প্রমাণ নাই। গুপ্ত সমিতির সহিত কর্মক্ষেত্রে যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁহারা এ কথা বলেন না। অরবিন্দ বলিয়াছেন, বিপ্লব-পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হয়, তাঁহার বরোদা অবস্থানকালে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। 'বন্দেমাতরমের প্রধান সম্পাদকীয় লেখকরূপে এবং জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষরূপে বাংলা দেশে

স্থায়িভাবে বাস করিবার পূর্বে নিবেদিতার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।...আমরা স্ব স্ব কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এবং বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সুযোগ ঘটে নাই' (Sri Aurobindo on Himself, p. 117)।

অরবিন্দ বরোদার চাকরী ত্যাগ করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে আগমন করেন। তাহার পূর্বেই কেন্দ্রীয় পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত তিনি সুস্পষ্টভাবে বিপ্লব আন্দোলনে নিবেদিতার নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং কার্য সম্বন্ধে অন্য যে সকল বিবরণ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও নিবেদিতার বিপ্লব সম্বন্ধে পুস্তকদান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কর্মের উল্লেখ নাই। গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লববাদের সহিত জড়িত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও মাখনলাল সেন বিপ্লব পরিচালনায় নিবেদিতার দায়িত্ব অস্বীকার করেন।

অরবিন্দ-প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতিতে প্রথমে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ, যথা, বৈপ্লবিক হত্যা ও ডাকাতি, যাহা সন্ত্রাসবাদরূপে পরে ব্যাপকভাবে দেখা যায়, তাহার পরিকল্পনা ছিল না। অরবিন্দ বলিয়াছেন, 'ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গুপ্ত সমিতির কার্যসূচীর মধ্যে সন্ত্রাসবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু কঠোর দমননীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বাংলা দেশে এই সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়' (Sri Aurobindo on Himself, p. 44)। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি পরে।

অন্যত্রও ঐরূপ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে।

'এইরূপে অনুশীলন সমিতি বাংলার নবীন যুবকসম্প্রদায়কে নানারূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্যে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিল। সভ্যরা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু এক বিশিষ্ট অংশ এই সকল সাধারণ কার্যে সন্তুষ্ট রহিলেন না। বাংলার বিপ্লববাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন সমিতি Recruiting centreএ পরিণত হইল ; ইহার ফলে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের বহু মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সভ্য বাংলার বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন। মাণিকতলার বোমার আড্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া রডা কোম্পানীর পিস্তল সংগ্রহ, তথাকথিত রাজনৈতিক ডাকাতি, রাজকর্মচারী হত্যা প্রভৃতির দ্বারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবী ও সেনাদলের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও আমদানীর উদ্যোগ হইল।...এই বিপ্লবের সংগঠন, ক্রমবিকাশ, ষড়যন্ত্র, আয়োজন, কর্মপ্রণালী ও পরিণাম প্রভৃতি এক সুবিশাল ইতিহাস' (অনুশীলন

সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃঃ ১৬-১৭)। ক্রমে ক্রমে যুগান্তর পত্রিকাকে মুখপত্র করিয়া যুগান্তর দলের আবির্ভাব। কেমন করিয়া গুপ্ত সমিতির এক বিশিষ্ট অংশ কর্তৃক ধীরে ধীরে বিপ্লব আন্দোলন অন্য পথে পরিচালিত হইতে লাগিল, মাণিকতলার বাগানে আশ্রমের সূত্রপাত হইল, এবং বোমা তৈয়ারীর প্রচেষ্টা, লাটসাহেব ও রাজনৈতিক কর্মচারী হত্যার আয়োজন আরম্ভ হইল, সে সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

বিপ্লববাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুস্তকের ভূমিকায় আছে, 'বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পূর্বে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য গুপ্ত সভা-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা কার্যতঃ বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বাংলা দেশ লর্ড কার্জনকৃত অপমানে যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল সেই চাঞ্চল্য হইতে প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বিপ্লববাদের উৎপত্তি। দেশের মধ্যে তখন যে প্রবল উত্তেজনা-স্রোত বহিতেছিল তাহাই আধার বিশেষে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হইয়া বিপ্লবকেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। "যুগান্তর" ছিল ঐরূপ একটি বিপ্লবকেন্দ্রের মুখপত্র। ঐ সংবাদপত্রের মুখপত্রের পরিচালকগণের সংস্রবে আসিয়াই আমি বিপ্লবীদলে যোগ দিয়াছিলাম।

'১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তখন শীতকাল। আসর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় সবেমাত্র "সন্ধ্যায়" চাটিম চাটিম বুলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন; অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষার জন্য বরোদার চাকরী ছাড়িয়া আসিয়াছেন; বিপিনবাবুও পুরাতন কংগ্রেসী দল হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন; সারা দেশটা যেন নূতনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। আমি তখন সবেমাত্র সাধুগিরির খোলস ছাড়িয়া জোর করিয়া মাষ্টারীতে মনটা বসাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় এক সংখ্যা "বন্দেমাতরম্" হঠাৎ একদিন হাতে আসিয়া পড়িল। ভারতের রাজনৈতিক আদর্শের কথা আলোচনা করিতে করিতে লেখক বলিয়াছেন—"We want absolute autonomy free from British control"...একেবারে ছাপার অক্ষরে ঐ কথাগুলো দেখিয়া আমার মনটা তড়াং করিয়া নাচিয়া উঠিল।...

'...সেই সময় কলিকাতা হইতে "যুগান্তর" কাগজখানা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লোকে কানাকানি করে যে যুগান্তরের আড্ডাটা নাকি একটা বিপ্লবের কেন্দ্র।...এ দেশে যাহারা বিপ্লব আনিবে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের যাহারা মূর্ত বিগ্রহ, সেগুলি কি রকমের জীব তাহা দেখিবার বড় আগ্রহ হইল।

আমি ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আর পাঁচজনে মিলিয়া রাতারাতি ভারতটাকে স্বাধীন করিয়া লইবে, এ তো আর সহ্য করা যায় না!

'কলিকাতা যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম, ৩।৪টি যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলিগোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত। কাল না হয় দুদিন পরে যুগান্তর আফিসটা যে গবর্ণমেণ্ট হাউসে উঠিয়া যাইবে, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ মাত্র নাই। কথায়, বার্তায়, আভাসে, ইঙ্গিতে এই ধারণাটা আমার মনে আসিয়া পড়িল যে, এ সবের পশ্চাতে একটা দেশব্যাপী বড় রকমের কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

'দুই চারিদিন আনাগোনা করিতে করিতে ক্রমে "যুগান্তরের" কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল। দেখিলাম—প্রায় সকলেই জাতকাট ভবঘুরে বটে। দেবব্রত (ভবিষ্যতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বি-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিলেন ; হঠাৎ ভারত উদ্ধার হয়-হয় দেখিয়া আইন ছাড়িয়া "যুগান্তরের" সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারে গৃহিনী-বিশেষ। বারীন্দ্রের সহিত আলাপ হইতে একটু বিলম্ব হইল, কেন না সে তখন ম্যালেরিয়ার জ্বালায় দেওঘরে পলাতক। পরে... দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, কল্পনা ও ভাবের আবেগে যাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে, বারীন্দ্র তাহাদেরই একজন।...দেখা হইবার পর তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হইবেই হইবে।

'ভারত-উদ্ধারের এমন সুযোগ ত আর ছাড়া চলে না! আমিও বাসা হইতে পুঁটলী-পাঁটলা গুটাইয়া যুগান্তর আফিসে আসিয়া বসিলাম।

'...সত্য সত্যই তখন একটা জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য ; ইংরেজের তোপ, বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেসিনগান—ওসব শুধু মায়ার ছায়া! এ ভোজবাজীর রাজ্য, এ তাসের ঘর—আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম ; মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন' (নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃঃ ১-৬)।

'এই সময় হইতে দেশে রাজদ্রোহের মামলার ধুম লাগিয়া গেল।...একে একে এরূপ অনেকগুলি ছেলে জেলে যাইতে লাগিল। তখন বারীন্দ্র বলিল—"এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে দেখাইতে হইবে।" এই সংকল্প হইতেই মাণিকতলার বাগানের সৃষ্টি' (ঐ, পৃঃ ৮)।

'বারীনের চিঠি পাইয়াই তল্পি-তল্পা গুছাইয়া রওনা হইলাম।...বাগানে ফিরিয়া দেখিলাম একেবারে "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গিয়াছে। যে সমস্ত নূতন ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে, উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে একজন।...সে সময় কিংসফোর্ড সাহেব একে একে সব স্বদেশী কাগজ-ওয়ালাদের জেলে পুরিতেছেন। পুলিশের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশশুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—"নাঃ এ আর চলে না। ক' বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।" তথাস্তু। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যখন সাহেবদের মধ্যে ছোটলাট আণ্ড্রু ফ্রেজারের মাথাটাই সব চেয়ে বড়, তখন তাঁহারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা আগে করা দরকার। কিন্তু লাটসাহেবের মাথার নাগাল পাওয়া ত' সোজা কথা নয়। ডিনামাইট কার্ট্রিজ লাটসাহেবের গাড়ীর তলায় রাখিয়া দিলে কাজ চলিতে পারে কি না তাহা পরীক্ষার জন্য চন্দননগর ষ্টেশনের কাছাকাছি রেলের উপর গোটা কয়েক ডিনামাইট কার্ট্রিজ রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উড়া ত দূরের কথা—ট্রেনখানা একটু হেলিলও না' (ঐ, পৃঃ ২৪-২৫)।

উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'ইহার পর পুনরায় পরামর্শ করিয়া রেলের জোড়ের মুখের নীচে মাটির মধ্যে বোমা পুঁতিয়া রাখা হয়. কিন্তু লাটসাহেবের অদৃষ্ট ভাল, এবারেও তিনি বাঁচিয়া গেলেন। ক্রমে পুলিশের ঘোরাঘুরি বাড়িতে থাকার পরে বৈদ্যনাথের কাছে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া সেইখানেই বোমার আড্ডা উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। এখানেই বোমা ফাটিয়া একটি ছেলের মৃত্যু হয়। পরে যাতায়াতের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য পুনরায় বোমার আড্ডা দেওঘর হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হইল' (ঐ)। 'এই রকমে আরও একটা মাস কাটিল। শেষে মোজাফরপুরে বোমা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের পরমায়ু ফুরাইল' (ঐ, পৃঃ ৪১)!

উপরে প্রদত্ত বিবরণগুলি হইতে ইহা স্পষ্টতঃ অনুমান হয় যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর গুপ্ত ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ পর্যন্ত বহু হত্যা ও ডাকাতি হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অরবিন্দ-প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতির কার্যসূচী হইতে পরবর্তী কালের বিপ্লবাত্মক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখা দিয়াছিল, এই সকল বিপ্লবাত্মক কার্য প্রধানতঃ কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত। নিবেদিতা যে এই গুপ্ত ডাকাতি এবং হত্যার বিরোধী ছিলেন, তাহার স্বপক্ষে বহু যুক্তি এবং প্রমাণ আছে।

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, 'একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি যুবক অনুমতি না নিয়ে কোথাও উধাও হল। কয়েকদিন বাদে তারা ফিরলে যতীন্দ্রনাথ কৈফিয়ৎ তলব করলেন। প্রথমটা তারা কিছু না বলে মুখ বুজে রইল। তারপর যতীন্দ্রনাথ চাবুক হাতে নিয়ে তাদের শাসন করতে গিয়ে বললেন—সব কথা পরিষ্কার স্বীকার কর, নৈলে রক্ষা রাখব না। তখন তারা স্বীকার করল আর একজনের প্রোৎসাহে তারা তারকেশ্বরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। যেখানে টাকা ছিল বলে তাদের সংবাদ সেখানে দেখল কয়লার কাঁড়ি। এই ঘটনার সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথের কাছে আগেই নালিশ করেন যে কয়েকটি যুবক তাঁর রিভলভারটি ধার চাইতে গিয়াছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে এই প্রস্তাবিত ডাকাতির কথা বলা হয়। নিবেদিতা খুব অসন্তুষ্ট হন। যন্ত্রটি দিলেন না। উপরন্তু যতীন্দ্রনাথের কাছে সব কথা ফাঁস করে দেন' (শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামী, পৃঃ ১০)।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, একবার বিপ্লবী দেবব্রত বসু নিবেদিতার বাড়ি গেলে কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতা তাঁহাকে বলেন, 'তোমাদের গুপ্ত আন্দোলন সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে বলো না।' ইহার বহুদিন পরে কৌতূহলী হইয়া তিনি একদিন দেবব্রত বসুকে গুপ্ত আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে দেবব্রত তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ইতিপূর্বে তিনি ঐ বিষয়ে কোন কথা তাঁহাকে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা চুপ করিয়া যান। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যখন ভূপেন্দ্রনাথের সহিত নিবেদিতার দেখা হয়, তখন তিনি পুনরায় ভূপেন্দ্রনাথকে বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনিও দেবব্রত বসুর উত্তরের পুনরাবৃত্তি করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার পুস্তকেও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন (Swami Vivekananda—Patriot Prophet, p. 118)।

ইহাতে কি অনুমান হয় যে, নিবেদিতা গুপ্ত সমিতির দলটিকে আগাগোড়া পরিচালিত করিয়া বিপ্লব-শিক্ষা দিয়াছেন? গোপনে বিপ্লব আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস অন্যরূপ। ইহাতে অরবিন্দ প্রথমাবধি জড়িত ছিলেন, ও তাঁহার নির্দেশানুসারে 'যুগান্তর' দল কর্তৃক বিপ্লবকার্য, অর্থাৎ হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য গিরিজাশঙ্কর

রায় চৌধুরী যে কয়খানি পুস্তক হইতে নানা তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোথাও নিবেদিতার কোন উল্লেখ নাই। প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত, বিপ্লব সম্বন্ধে তদানীন্তন বিপ্লবিগণ-কর্তৃক রচিত কোন পুস্তকে নিবেদিতার বিপ্লবে সক্রিয় সম্পর্কের উল্লেখ নাই। কোন কোন পুস্তকে এইমাত্র আছে যে, বিপ্লবকার্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল ও তিনি বিভিন্ন পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার, বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ, যাঁহারা নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন, এবং এস, কে. র‍্যাটক্লিফ, অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজ, মিঃ এইচ. ডব্লিউ নেভিনসন, মিঃ এ. জে. এফ. ব্লেয়ার, এফ. জে. আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুগণের কেহই তিনি বিপ্লবী ছিলেন বা বিপ্লব আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, এ কথা বলেন নাই। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়া স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাহার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

'যুগান্তর' দলের অন্যতম বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, নিবেদিতা বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য নানাবিধ পুস্তক দিয়াছিলেন, বিপ্লবকার্যে তাঁহার অনুমোদন ছিল, এই পর্যন্ত; উহার সহিত তাঁহার যোগাযোগ আদৌ ছিল না। তদানীন্তন অন্যতম বিপ্লবী মাখনলাল সেনও বলেন, গুপ্ত বিপ্লব সমিতির কোন অধিবেশনে তাঁহাকে যোগ দিতে দেখেন নাই, অথবা তিনি ইহার পরিচালনার সহিত জড়িত আছেন, এ কথা পর্যন্ত কোনদিন শুনেন নাই।

বিপ্লবী যুবকগণের বোমা তৈয়ারীর প্রচেষ্টা নিবেদিতার অজ্ঞাত না থাকিবার কথা; কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরীতে পি. সি. রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্ররূপে কয়েকজন যুবককে বোমা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতেন, ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য, এবং নিবেদিতার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। ভূপেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন যে, নিবেদিতা যদি ল্যাবরেটরীতে বসিয়া বোমা প্রস্তুত করার প্রণালী শিক্ষা দিতেন, তবে ঐ বিদ্যা শিখিবার জন্য হেমচন্দ্র দাসকে প্যারিস পাঠাইবার কোন প্রয়োজন হইত না।

বাংলা দেশের বৈপ্লবিক কার্যধারার সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনো রচিত হয়

নাই। গুপ্ত আন্দোলনের সকল তথ্য নষ্ট করিয়া ফেলাই ছিল বিপ্লবী কর্মিগণের আদর্শ। সুতরাং যথাযথ তথ্যের অভাবে ভবিষ্যতেও বিপ্লবের পূর্ণ ইতিহাস রচিত হইবার আশা কম। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিপ্লবের গোড়াপত্তন ও শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতাকে যুক্ত করিয়া কেহ কেহ একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ পরস্পরবিরুদ্ধ ঘটনার সমাবেশে জোরালো ভাষায় একটি চিত্তাকর্ষক বিপ্লব-ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। নিবেদিতা সে কল্পিত ইতিহাসের নায়িকা। আর এই অনুমানের ভিত্তিরূপে পাওয়া যায় শুধু শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ বাংলা দেশের মধ্যে, কাহার সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল না?

প্রকৃতপক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতার যোগাযোগ অতি অল্পকালের জন্য। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশাল কন্‌ফারেনসে যোগদান করেন এবং আগস্ট মাসে জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করেন। নিবেদিতা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বহুদিন শয্যাগত থাকেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি পাশ্চাত্যে গমন করিয়া দুই বৎসর অবস্থান করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পুনরায় ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর প্রকৃতপক্ষে ১৯১০এর ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর গমনের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগাযোগ ছিল, এবং 'কর্মযোগিন' পত্রিকার পরিচালনায় তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষ সাহায্য করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির ন্যায় নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন। ১৯০৫ ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশী ও কলিকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া কংগ্রেস কর্তৃক যাহাতে স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলন সমর্থিত ও গৃহীত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে দ্রুত প্রসারিত হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল কারারুদ্ধ হন। ঐ বৎসর নরমপন্থী দলের সহিত চরমপন্থী দলের বিরোধের ফলে সুরাট কংগ্রেস ব্যর্থ হইবার পর অরবিন্দ অন্য নীতি গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যর্থ হইলে যাহাতে প্রকাশ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে গুপ্ত বিপ্লবকার্য পরিচালনার প্রয়োজন ছিল (Sri Aurobindo on Himself, p. 34)। অতঃপর বিপ্লবি-গণের উদ্যোগে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার

প্রচেষ্টা এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রচেষ্টায় দুইজন নিরপরাধা য়ুরোপীয় মহিলার প্রাণনাশ হয়। কিন্তু এই সকল বৈপ্লবিক কার্যের সহিত নিবেদিতার কোন সম্পর্ক ছিল, এ কথা কেহ বলিতে পারেন নাই।

কেবল শ্রীঅরবিন্দের সহিত ঘনিষ্ঠতা এবং স্বাধীনতা অর্জনে তাঁহার পরিকল্পনার প্রতি সহানুভূতিবশতঃ নিবেদিতাকে বিপ্লবী আখ্যা দেওয়া চলে কি? শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই কংগ্রেসে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, উভয়ে একযোগে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা পরিচালনা করিতেন, এবং ঐ পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বিপিনবাবুর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। কিন্তু বিপিনচন্দ্র বিপ্লবী ছিলেন না। শ্রীঅরবিন্দের সহিত অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগিতা থাকিলেও গুপ্ত বিপ্লবের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী।

বিপ্লববাদ ভাল কি মন্দ, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। বিপ্লবিগণের অনেকেই পরে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ভুলপথে পরিচালিত হইয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে বাঙ্গালী প্রকাশ্য আন্দোলনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জন করিতে চাহিয়াছিল। সেই সময়েই স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত বহু যুবক উত্তেজনার আবেগে বিপ্লবাগ্নিতে ঝাঁপ দেয়। দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে সর্বস্ববিসর্জনে প্রস্তুত তাহাদের আত্মত্যাগ অপূর্ব। বিপ্লবিগণের সে মারাত্মক কার্যকলাপে, মরণ-আলিঙ্গনের উন্মাদনায় জনসাধারণ সায় দেয় নাই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাহাদের প্রতি একান্ত ভালবাসা, মমতা অনুভব করিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিপ্লবের একান্ত বিরোধী, কিন্তু এই শহীদগণের আত্মত্যাগে তাঁহার মহৎ প্রাণ বিচলিত হইয়াছিল; তাই সরকারের রোষাগ্নি হইতে তাহাদের মুক্ত করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য, বৈপ্লবিক ডাকাতি এবং বৈপ্লবিক হত্যা—যে দুইটির মাধ্যমে তদানীন্তন বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদের কোনটি নিবেদিতা-কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কেহ দিতে পারেন নাই; তিনি মারাত্মক রকমের বিপ্লবী ছিলেন এবং বিপ্লবকার্যে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছেন, এই মনগড়া কথাটির অসংখ্য বার পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।

ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার যে ভালবাসা, তাহা সাধারণ দেশপ্রীতির উর্ধ্বে। ভারতের মুক্তিসাধনায় তাঁহার আত্মত্যাগ অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নিবেদিতার নবজন্ম। জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য গভীর তাৎপর্য লইয়া

এখানেই তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট যে আত্মানুসন্ধানের মন্ত্রে তাঁহার দীক্ষা, তাহার সাধনার পীঠস্থান ভারতবর্ষ। তাঁহার স্বদেশসেবা এই আধ্যাত্মিক সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংগ ; সে সাধনায় জগন্মাতার সহিত ভারতমাতা এক হইয়া গিয়াছিলেন। আর উহার বহিঃ-প্রকাশ ছিল সকল কর্মের মধ্যে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, নিঃশব্দে তিল তিল করিয়া আত্মনিবেদন। ইহাই নিবেদিতার জীবনাদর্শ। এই আদর্শ হইতে পৃথক করিয়া ঐ জীবনকে দেখিবার চেষ্টা করিলে যথাযথ দেখা হইবে না।

লোকমাতা

বিপ্লবী বলিয়া নিবেদিতাকে বড় করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। তিনি যে কী ছিলেন, নবযুগের উদ্বোধনে তাঁহার দান কতখানি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁহার স্মৃতিতর্পণ করিতে উঠিয়া সার রাসবিহারী ঘোষ বলিয়াছিলেন, 'যদি আজ শুষ্ক অস্থিপঞ্জরে জীবনের লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ—ভগিনী নিবেদিতা ইহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন।'

স্নেহময়ী জননী যেমন অহরহঃ সন্তানের সর্বপ্রকার কল্যাণ কামনায় ব্যাকুল হইয়া থাকেন, নিবেদিতা সেইরূপ অতন্দ্র স্নেহদৃষ্টি লইয়া ভারতের সমাজজীবনের প্রত্যেকটি দিক পুষ্ট করিয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেন। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, বিপ্লবী, দেশসেবক—নিবেদিতার দানে কে পুষ্ট হয় নাই? মোহিতলাল মজুমদার সত্যই বলিয়াছেন, 'বাংলার মাটিতে হলকর্ষণের পর, যখন নবজীবনের বীজবপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অংকুর দেখা দিয়াছিল ; তাহারই মধ্যে এই আর একটি বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে—নিজেকেই ফলেপুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়—অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পোঁছায় না সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে ; সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী-শোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার এই নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল,—তাহা নির্ণয় করিবে কে?' (উদ্বোধন, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪, পৃঃ ৫৯)

নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার যে ঐকান্তিক অনুরাগ ও তাহার সেবার জন্য দারিদ্র্য, অর্ধাশন ও সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ, রবীন্দ্রনাথের মতে তাহাই সতীর দুশ্চর তপস্যা। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কঠোরতা কোনদিন তাঁহাকে হতাশ, বা নিরুদ্যম করে নাই।

ভারতে প্রথম আগমনের সময় নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল, 'ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন।' বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে স্বপ্ন যখন নির্মম-ভাবে ছিন্ন হইয়া গেল, উদ্ঘাটিত হইল বিদেশী শাসনের বিকৃত রূপ, তখন

হইতে ভারতবর্ষ হইল তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা। ভারতের জাতীয় জীবনের মর্মকথা এমন নিগূঢ়ভাবে বুঝিবার এবং অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা বোধ হয় আর কেহ করে নাই। বিদেশের আমদানী জাতীয়তার আদর্শ ও ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য, তাহার প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, প্রতীচ্যের কাছে সভ্যতা যে বস্তু, আমাদের কাছে ধর্ম তাহাই। এই ধর্মই জীবনের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে অতিক্রম করিয়া সকলের সহিত পরিপূর্ণ একাত্মতা অনুভব করা—ইহাই ধর্ম।

তাঁহার ভারতে আগমনকালে লর্ড কার্জন ছিলেন বড়লাট। বহুদিক দিয়া কার্জনী যুগ ভারত-ইতিহাসে অখ্যাতি লাভ করিয়াছে। এক পত্রে নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রভাব বর্ধনের সহায়করূপেই ইতিহাসে লর্ড কার্জন টিঁকিয়া থাকিবেন।' লর্ড কার্জন ছিলেন অতিশয় দাম্ভিক, জেদী ও ভারতীয় স্বার্থের একান্ত বিরোধী। এ দেশের জনসাধারণের মতামতের প্রতি তাঁহার অবহেলার চূড়ান্ত নিদর্শন বঙ্গ-বিচ্ছেদ-ব্যবস্থা।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে দিল্লীতে মহাসমারোহে দরবার অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। কার্জনের জাঁকজমক, আড়ম্বরের প্রতি আগ্রহ ও ব্রিটিশ শাসনের আধিপত্য প্রচারের আকাঙ্ক্ষা দরবারের মধ্য দিয়া উগ্রভাবে প্রকাশ পাইল। দরবারে যে দেশীয় রাজন্যবৃন্দ ও অন্যান্য পদস্থ ভারতীয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাঁহাদের আনুগত্য নিবেদিতার মর্ম বিদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় এক বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর পুত্র যখন ঐ প্রসঙ্গে আক্ষেপের সহিত বলিলেন, 'আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গের চরম অবমাননা ঘটিয়াছে', তখন নিবেদিতা এই মন্তব্যে আনন্দে অধীর হইয়া লিখিয়াছিলেন, 'দেখা যাইতেছে, গত দরবার অনুষ্ঠিত হইবার পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ বহু পরিমাণে রাজনৈতিক ব্যাপারে দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছে। শতাব্দীর আর এক পাদে তাহার অগ্রগতি আর কত বেশী হইবে?'

কতকগুলি সংবাদপত্রে দরবারের আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান ফলাও করিয়া ঘোষণা করা হইল, কিন্তু বাংলার ইংরেজী পত্রিকাগুলি কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করার ফলে শীঘ্রই ছাপাখানা-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী হইল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি বিল পাশের পর দেখা গেল, শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিবেদিতার হৃদয় ক্ষোভে, অপমানে দগ্ধ হইত, এবং তাঁহার বহু পত্রে লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ ও কঠোর মন্তব্য প্রকাশ পাইত। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'ভারতের উপর বহু অবিচার হইতেছে। ভারতের ভারত হইবার, নিজের জন্য চিন্তা

করিবার ও জ্ঞানার্জনের অধিকার নাই এই অবিচারই আমার মনে সর্বাপেক্ষা জ্বালা সৃষ্টি করে।' এই মহৎ বেদনার নিকট অন্ন, সুবিচার ও অন্যান্য জিনিসের অভাব তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র হইয়া দেখা দিত।

লর্ড কার্জনের শাসনকাল শেষ হইয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি তাঁহার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বঙ্গ-বিচ্ছেদ-ব্যবস্থায় সমগ্র বাংলা দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঐ বৎসরই ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া লর্ড কার্জন প্রাচ্য দেশবাসীর সত্যতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া বলেন, 'প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচীর লোকদিগের নিকটেই সত্য বিশেষ আদৃত।'

সভায় উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উক্তিতে বিলক্ষণ অপমান বোধ করিলেও কেহ কোন উত্তর দিলেন না। সভাকক্ষে অখণ্ড নীরবতা দেখা গেল। বক্তৃতান্তে লর্ড কার্জন চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেনেট হলের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এই অপমানজনক উক্তির আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিবেদিতাও সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ক্রোধে, অপমানে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে এই অপমানের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন। অধীর হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, লর্ড কার্জনের 'প্রব্লেমস্ অব দি ফার ঈস্ট' নামক পুস্তক কাহারো নিকট আছে কি না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ঐ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি সেই রাত্রেই উত্তর প্রস্তুত করিলেন।

লর্ড কার্জন স্বলিখিত পুস্তকে তাঁহার কোরিয়া ভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, কোরিয়ার পররাষ্ট্রদপ্তরের প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি অসঙ্কোচে মিথ্যা কথা বলিয়া নিজ বয়স তেত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসরে বাড়াইয়া প্রেসিডেণ্টের আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয় বাগবাজারে, নিবেদিতার বাড়ির অতি নিকটে। রাত্রেই তিনি সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় লর্ড কার্জনের বক্তৃতায় আপত্তিকর অংশ এবং তাঁহার স্বলিখিত পুস্তকের উক্ত অংশ পাশাপাশি উদ্ধৃত হইল। মিথ্যাবাদী বলিয়া যে অভিযোগ লর্ড কার্জন প্রাচ্য দেশবাসীর উপর আনিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার নিজেরই সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাঁহার স্বলিখিত পুস্তকই ইহা প্রমাণ করিল। ইহাই লর্ড কার্জনের দাম্ভিক এবং অসত্য উক্তির সমুচিত উত্তর। ১৪ই ফেব্রুয়ারী পুনরায় স্টেট্সম্যান পত্রিকায় উক্ত অংশদ্বয় বাহির হইল। লর্ড কার্জনের ভাষণ শিক্ষিত মহলে এক চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি

করিয়াছিল। সর্বদাই ইহা লইয়া আলোচনা চলিত। সংবাদপত্রের মারফৎ ঐ উপযুক্ত উত্তরে বহু পরিমাণে ক্ষোভ দূর হইল। নিবেদিতাই যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা প্রথমে জনকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত কেহ জানিতে পারেন নাই।

কিন্তু নিবেদিতা তখনও ক্ষান্ত হন নাই। যে দেশে যুগে যুগে সত্যের উচ্চতম আদর্শ বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি কটাক্ষ তাঁহার মনে উত্তাপের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারত তাঁহার স্বদেশ, স্বদেশের অপমান তিনি সহ্য করিবেন না। দুই দিন ধরিয়া তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করিলেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় প্রবন্ধটি বাহির হইল। 'সত্যের উচ্চতম আদর্শ' নামক প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই লিখিলেন, অধ্যাপক ম্যাকস্‌মুলার 'ভারত আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতে পারে' নামক স্বীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সত্যাশ্রয়ী হিন্দু' বিষয়টি কেন সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহার অর্থ সুস্পষ্টরূপে গত শনিবার (১১ই ফেব্রুয়ারী) ভারতের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বক্তৃতা-সভায় লর্ড কার্জনের সদম্ভ ভাষণে শ্রোতৃবৃন্দ অপমানিত বোধ করিলেও কেহই প্রত্যুত্তর করে নাই, ইহাতে নিবেদিতা আহত হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ প্রবন্ধে তাহাদের উপরেও অগ্নিময় বাণী নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যে ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের নীরবতা প্রশংসনীয়, কিন্তু পূর্বপুরুষগণের প্রতি অভিযোগ নিঃশব্দে সহ্য করা সঙ্গত হয় নাই।' ঐ প্রবন্ধে মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ হইতে নানা ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইলেন, এ দেশে সত্যের ধারণা কত উচ্চ। ঐ প্রবন্ধেও তাঁহার নাম ছিল না। নিবেদিতা ও তাঁহার লেখনীর সহিত যাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই কেবল জানিতেন, ঐ বলিষ্ঠ, দৃপ্ত রচনা নিবেদিতা ব্যতীত আর কাহারো হইতে পারে না। এই ঘটনাটি কলিকাতার সমাজজীবনে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। নিবেদিতার প্রতি নীরব শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় সেদিন মনীষিগণের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু তাঁহাকে লেখেন, তাঁহার উত্তরে দেশের লোকের বহু ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিবে বলিয়া তিনি আনন্দিত। সেই সঙ্গে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অভিপ্রায়, প্রবন্ধের রচয়িত্রীর নাম যেন গোপন থাকে। 'বজ্র সর্বদা কালো মেঘের আড়ালে থাকিবে ও আকাশের কোন্ প্রান্ত হইতে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল তাহা যেন তাহারা [শাসক জাতি] জানিতে না পারে।' ইহার পর ১১ই মার্চ টাউন হলে লর্ড কার্জনের উক্তির প্রতিবাদে এক সভা হয়। সার্ রাসবিহারী ঘোষ উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতা ভারতবর্ষকে সেবা করিবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে তাহার মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'ভগিনী নিবেদিতা যে সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল ; তাহাকে আকারে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যে সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয়, তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

'এইজন্যই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা, তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না, এও সেইরূপ।...

'তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক অপরকে দান করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে।...কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে বিন্দুমাত্র হাতে রাখেন নাই।...জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই "পীপল'কে (People), এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন।

এ যদি একটি মাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

'বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি ত ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our People তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি ত লাগে না (পরিচয়, পৃঃ ৯৭-১০০)।'

নিবেদিতা বলিতেন, জাতীয়তার আদর্শ সৃষ্টি করাই বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা। তাঁহার মতে ভারতীয় ঐক্যের মধ্যেই এই জাতীয়তাবাদ নিহিত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বৈচিত্র্যই ঐক্যের প্রাণ। এই ঐক্য যান্ত্রিক নয়; ইহা জীবনধর্মী। ১৯০২ খৃীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর এক অশান্ত উত্তেজনায় তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইলেন। জাতীয়তার অপূর্ব রাগিণী সেদিন তাঁহার কণ্ঠে শতধারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে তাঁহার বক্তৃতা জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু তিনি বেদনার সহিত উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দেশের মোহনিদ্রা ভাঙ্গে নাই। দেশের মধ্যে তখনো গণজাগরণের অপেক্ষা ছিল সত্য, ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা সমাজজীবনকে গ্রাস করিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতে-ছিল, জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধের যে প্রেরণা জাগিতেছিল, তাহাতে নিবেদিতার প্রভাব কতখানি, তাহার হিসাব কে করিবে?

নিজের লেখনীপ্রতিভা যে মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করিলেন, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, লেখার মধ্য দিয়াই জাতীয়তার আদর্শ প্রচারের অধিক সম্ভাবনা। ১৯০৩ খৃীষ্টাব্দ হইতে নিউ ইণ্ডিয়া, ডন, ইণ্ডিয়ান রিভিউ, মডার্ন রিভিউ, প্রবুদ্ধ ভারত, হিন্দু রিভিউ, মাইসোর রিভিউ, বিহার হেরাল্ড, ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট, সিন্ধ জার্নাল, বালভারতী প্রভৃতি ভারতের প্রায় সমুদয় ইংরেজী সাময়িক পত্রিকায় ও অমৃতবাজার পত্রিকা, স্টেট্‌সম্যান, ইংলিশম্যান প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রে তিনি নিয়মিতভাবে দেশের আদর্শ ও নানা সমস্যার আলোচনা শুরু করেন। ইহাও এক অপূর্ব সাধনা।

১৯০২ খৃীষ্টাব্দ হইতে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

ইয়ংমেনস্ হিন্দু ইউনিয়ন কমিটি, গীতা সোসাইটি, ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি, বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন, গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, স্বামিজীর আদর্শ ও বাণী জ্বলন্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়তা, এবং বলা বাহুল্য ঐ সকল বক্তৃতা অনেককেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষালাভে সহায়তা করিয়াছে।

ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। উহার প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং প্রথম হইতেই তিনি ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার নিয়মিত সদস্য ছিলেন। বিনয় সরকার বলিয়াছেন, 'তাঁকেও ঐ প্রথম দেখেছিলাম (১৯০৪)। আইরিশ বেটি, ইংরেজী বলে ভাল। তাছাড়া স্বাদেশিকতার ঝাঁজ তো আছেই...মনে হয়েছিল, বিদেশিনী হয়েও নিবেদিতা ষোলআনা ভারতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি। ...প্রেসিডেন্সি কলেজে গোটা কয়েক সাদা অধ্যাপক ছাড়া আর কোনও সাদা লোকের সংস্পর্শে তখনো আসিনি। নিবেদিতা প্রথম সাদা লোক যার কথায় ভারতীয় স্বাধীনতার অকপট বাণী শুনতে পেলাম। অধিকন্তু বুখ্‌নিগুলো বেশ জোরালো ও ঝাঁঝালো। মনে হয়েছিল, তাঁকে ভগ্নী বলা যেতে পারে।... তিনি যুবক ভারতকে স্বদেশনিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। স্বদেশ-সেবকের কাজে যে লোকটা কাঠখড় যোগাতে পারে না যুবক বাংলা তাকে বড় একটা পুছে না (বিনয় সরকারের বৈঠকে, প্রথমভাগ, পৃঃ ২৮৮)।'

নিবেদিতা বলিতেন, 'যুবক ভারত স্বাধীনতার মাঠে দৌড়ের জন্য তৈয়ার হচ্ছে মাত্র। এখনো দৌড় শুরু করেনি।' কথাটা প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীনতার এই প্রস্তুতি-পর্বে তাঁহার দান অনেকখানি।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডন সোসাইটির উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হইলে শ্রীঅরবিন্দ উহার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি অর্থ প্রদান করিলেন। দেশের হিতকামী সকলের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যমে যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা, তাহাতে প্রচার করিবার মত নিবেদিতার কোন অংশ ছিল না। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার এই পরিকল্পনায় তাঁহার মত আনন্দিত বোধ হয় আর কেহই হন নাই। সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে তিনি যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ইতিপূর্বে স্থাপন করেন, বলিতে গেলে তাহাই প্রথম জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। উপরি-উক্ত পরিষদ

স্থাপিত হইলে নিবেদিতা শিক্ষা সম্পর্কে কত যে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বলিষ্ঠতা, স্বকীয়তা ও গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল তাঁহার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশের মূল্য সকলে বুঝিতেন।

স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের শাসনকাল শেষ হইবার পূর্বেই বঙ্গ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ২০শে জুলাই বাংলা দেশ বিভক্ত করার প্রথম ঘোষণার সহিত বাঙ্গালী মাত্রেই আহত ও অপমানিত বোধ করে ও ইহার প্রতিবাদে পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে এক অধিবেশন আহূত হয়। ইহার পর প্রায় প্রত্যহ মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যের গৃহে অথবা অন্যত্র আলোচনা চলিতে লাগিল। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল ; কিন্তু লর্ড কার্জন ছিলেন সেই জাতীয় লোক যাঁহারা কোনক্রমেই নিজের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার শাসননীতির চূড়ান্ত পরিচয় দিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। এতদিন ধরিয়া জনতার মধ্যে অসন্তোষের যে গুঞ্জন চলিতেছিল, উপলক্ষ্য পাইয়া তাহা প্রকাশ্য আন্দোলনে পরিণত হইল। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দমন করা যুক্তিসংগত নহে, ইহা নরমপন্থী দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রভৃতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং ৭ই আগস্ট টাউন হলে প্রতিবাদ-সভার দিন ধার্য হইল। ঐ দিন আরও দুইটি বিরাট সভা হইয়াছিল। অনেকেই বক্তৃতা করিলেন, এবং সভায় বয়কট অর্থাৎ ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিতে গেলেই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের কথা উঠে, সুতরাং একই সঙ্গে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত।

আন্দোলন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা হইল। ইহার প্রতিবাদে পরদিন সর্বত্র শোকসভা পালন করা হইয়াছিল এবং ২২শে সেপ্টেম্বর পুনরায় প্রতিবাদ-সভা হয়। ইহার পর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নিষেধ করিয়া সার্কুলার জারী হইলে স্বভাবতঃই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। চারিদিকে নূতন উদ্দীপনার বিস্ফোরণ, ছাত্রগণের উত্তেজনা ও বিক্ষোভ সহজেই অনুমেয়। তাহাদের উদ্যোগে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কলেজ স্কোয়ারে ও ফীল্ড অব একাডেমি ক্লাবে বহু বক্তৃতা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসরের বহু দিন স্মরণীয়। ১৬ই অক্টোবর রাখীবন্ধন উৎসব প্রতিপালিত হইল। অধিকাংশ বাঙ্গালী অরন্ধন পালন করিয়াছিল। শহরের প্রায় সর্বত্র দোকান, বাজার বন্ধ রহিল। এই জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান কম নহে। সাধারণ লোক বিশেষ চিন্তা না করিয়া প্রাণের আবেগে

আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু সেই আন্দোলনে যাঁহারা প্রেরণা দান করেন, তাঁহারা নিশ্চিত সাধারণ মানবের ঊর্ধ্বে। সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতগুলি আন্দোলনকে কতখানি প্রেরণা ও শক্তিদান করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই উপলক্ষ্যেই তিনি সেই বিখ্যাত গানটি রচনা করিয়াছিলেন :

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান।

সে সংগীতে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। বহুদিনের জড়তা, ঔদাসীন্যের পর সমগ্র দেশে এক প্রাণের বন্যা বহিয়া চলিল। নব-জীবনের মহাতরঙ্গ। এতদিন ধরিয়া ডন, নিউ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকাগুলির মধ্যে জাতীয়তার সুর ঝংকৃত হইতেছিল, এখন সন্ধ্যা, যুগান্তর ও বন্দে-মাতরমের কণ্ঠে উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ এবং বিপ্লববাদের প্রবল নিনাদ শোনা গেল। সমাজ ও জাতীয় জীবন গঠনে সংবাদপত্রের প্রভাব অসীম। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, অনুকূল বাতাস পাইয়া তাহা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ১৯০৬, ১৯০৭ ও ১৯০৮ পরপর তিন বৎসর ধরিয়া বিপ্লবের অগ্নিশিখা শাসক জাতিকে কম ভীত ও সন্ত্রস্ত করে নাই। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন-যুগ ও বিপ্লব-যুগ সমকালীন, সমগৌরবের এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার সহিত নিবেদিতার কতদূর সংস্রব ছিল, ও স্বাধীনতার এই সংগ্রামে তাঁহার দান কতখানি। কনভোকেশন সভায় লর্ড কার্জন প্রকারান্তরে প্রাচ্যদেশবাসীকে মিথ্যাবাদী বলায় নিবেদিতা বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যাপারে তাঁহার উদাসীন থাকিবার কথা নহে। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনায় তিনি প্রকাশ্যে নেতৃত্ব না করিলেও সকল নেতৃবর্গের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঐ বৎসর ১৩ই মার্চ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ব্রেন ফিভারে প্রায় একমাস শয্যাশায়ী ছিলেন। নার্স রাখিয়া সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই কঠিন পীড়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি কৃস্টীনের সহিত দার্জিলিঙ গমন করেন। বসু-দম্পতীও সঙ্গে

গিয়াছিলেন। দার্জিলিঙ হইতে ৩রা জুলাই তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষ্যে যে আন্দোলনের সূত্রপাত, তাহার কোন লক্ষণ তখন পর্যন্ত দেখা যায় নাই। তবে বৎসরের প্রথম হইতেই চারিদিকে জাগরণের যে পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছিল, তাহার মূলে নিবেদিতার প্রভাব কতদূর, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ ডন সোসাইটি; অনুশীলন সমিতি প্রভৃতির মধ্য দিয়া তরুণ সম্প্রদায়কে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা, চরমপন্থী নেতৃবর্গের সহিত উগ্র রাজনৈতিক আলোচনা, নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সহিত দেশের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ সব একসঙ্গে চলিত। চরমপন্থী নেতা বিপিন পালের নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকার তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান লেখিকা। রাজনৈতিক মতবাদে বিপিন পালের সহিত তাঁহার বিশেষ ঐক্য ছিল; আবার নরমপন্থী রমেশচন্দ্র দত্ত ও গোখলের সহিত তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত এই সময়ে বরোদা স্টেটের অর্থ সচিব। তাঁহার আদর্শ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। এই সম্বন্ধে নিবেদিতার সহিত তাঁহার যে যথেষ্ট আলোচনা হইত, তাহার প্রমাণ, বরোদা হইতে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক সংস্কারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া নিবেদিতাকে পত্র লেখেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে নিবেদিতার আপত্তি ছিল না।' অতএব রমেশচন্দ্র দত্তের পক্ষে তাঁহাকে স্বমতাবলম্বী বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে, যদিও উহা নিবেদিতার অন্তরের কথা ছিল না। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার পত্রে কৃষকগণের কর-লাঘব, ধনী ব্যক্তিদিগের দ্বারা বিভিন্ন মিল ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, লেজিসলেটিভ কাউন্‌সিল গঠন প্রভৃতি শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম নিবেদিতার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য নিবেদিতার উৎসাহ ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। আবার এই সময়েই গোখলে দিনের পর দিন ১৭নং বোসপাড়া লেনে বসিয়া নিবেদিতার সহিত দেশে জাতীয়ভাব সম্প্রসারণের উপায় সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিতেন। গোখলে তাঁহাকে জাতীয়তা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি ছিলেন নরম-পন্থী, সুতরাং উগ্র রাজনৈতিক পথ অবলম্বনের পরিবর্তে কংগ্রেস সংগঠন-মূলক পন্থা অবলম্বন করুক, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়, এবং ঐ ব্যাপারে নিবেদিতাকেও দলে টানিবার প্রয়াস স্বাভাবিক। ইতিপূর্বেই আমরা আলো-চনা করিয়াছি যে, ১৯০২ অথবা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের উদ্যোগে বাংলা দেশে যে বিপ্লব সমিতি গঠিত হয় তাহাতেও নিবেদিতা বক্তৃতা এবং বিভিন্ন পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিতেন। এইরূপে দেখা

যায়, দেশের স্বাধীনতার কথা যাঁহারাই চিন্তা করিতেন তাঁহাদের সকলের কার্যে তাঁহার সমর্থন ও সাহায্য ছিল। বিভিন্ন চিন্তাধারা ও কার্যের সহিত একসঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা অসাধারণ শক্তির পরিচয় সন্দেহ নাই। সমাজ-জীবনে তখন ধর্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পকলায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়। স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত-প্রচার ব্যর্থ হইবার নয়। বিদেশীর অনুকরণের পরিবর্তে মনে প্রাণে, আচার-ব্যবহারে খাঁটী হিন্দু হইতে হইবে, এ কথাও অনেকে জোরের সহিত প্রচার করিতে-ছিলেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজের নূতন করিয়া অনুরাগী হওয়ার মূলেও নিবেদিতার প্রভাব অনেকখানি। ১৯০৫ এর জানুয়ারী মাসে তিনি 'Aggressive Hinduism' (বিজিগীষু হিন্দুধর্ম) সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক মিঃ নটেশান কর্তৃক উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্মকে সক্রিয় ও সম্প্রসারী করা সম্বন্ধে স্বামিজী কাশ্মীরে যাহা বলিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহা বিস্মৃত হন নাই। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি হিন্দুধর্মের সার্বভৌমত্ব প্রদর্শন করিয়া অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, হিন্দুধর্ম অপর সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিবার শক্তি রাখে। তাঁহার কণ্ঠে সেদিন ভবিষ্যৎ ভারতের অবশ্যম্ভাবী পুনরুত্থানের কথা স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল—

'বিপ্লব ও বিবর্তনজনিত ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতের প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে জাতীয় মনের পরিচিতি ঘটিয়া উঠে নাই, এবং তাহার স্বরূপও ভাষায় রূপায়িত হইতে পারে নাই। আজ প্রথম পর্বের শেষ। ভারতীয় জীবন আর জড়তাগ্রস্ত নহে ; সে এক নূতন শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, এবং বর্তমান ও বিগতকালের সামগ্রিক জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারই পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ ভারত গড়িয়া তুলিতে আজ কৃতসঙ্কল্প।

'হে ভারতসন্তান, তোমরা প্রাচীনের সমগ্র ঐতিহ্যকে পূজা করিতে শিক্ষা কর, নীরন্ধ্র আগ্রহে জ্ঞান আহরণ কর, যে চিন্তা ও ভাবা তোমাকে প্রাচীনের গভীরে নিহিত অতুল সম্পদ আবিষ্কার করিতে সাহায্য করিবে, তাহা তোমার নিকটেই রহিয়াছে, বিদেশীর কাছে নহে। এই প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসা ও সত্যোদ্ঘাটনের উপরই নির্ভর করে ভারতের ভবিষ্যৎ। যে সত্যকেই কেন্দ্র করিয়া চলে, উৎসাহ ও উদ্দীপনাই হয় তাহার অফুরন্ত পাথেয় ; নৈরাশ্য তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না। আজ প্রতি ভারতীয় ভাষায় বৃহৎ সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। এই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীনকে করিতে হইবে মুখর,

বর্তমানকে দিতে হইবে রূপ এবং এই উভয়ের সমবায়েই ফুটিয়া উঠিবে ভবিষ্যৎ ভারতের অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য।

'শুধু জগতের সমক্ষে ভারতকে পরিচিত করা নয়; যাহাতে ভারতের মর্মবাণী ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম হয়, ইহাই হইবে প্রকৃত সাধনা, ইহাই বর্তমান কর্তব্য। জাতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এক বিরাট সংগ্রাম, যাহা জাতীয় জীবনকে করিয়া তুলিয়াছে আক্রমণশীল (Aggressive Hinduism)।'

স্বামিজীর জীবনী লিখিবার সংকল্পও এই সময় হইতেই তাঁহার মনে দৃঢ় হইতে থাকে; কারণ এ বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না যে, নূতন করিয়া সমাজ ও সভ্যতার সংগঠনে স্বামিজীর জীবনী ও চিন্তাধারার সহিত পরিচয় আবশ্যক। ৩রা জুলাই নিবেদিতা সুস্থ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীযুক্ত বসুর 'Plant Response' নামক পুস্তকটির লেখার কার্য সমানেই চলিতেছিল, সুতরাং তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। ২২শে জুলাই বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা হইল, ৭ই আগস্ট টাউন হলে প্রতিবাদ-সভা বসিল। নিবেদিতা এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাঁহার ডায়েরীতে ঐদিন লেখা আছে, 'Partition of Bengal meeting. The black shadow (বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধ সভা। কালো ছায়া)' তিনি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু বক্তৃতা দেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত তাঁহার কতখানি সংযোগ ছিল এবং দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁহার প্রতি কতদূর আস্থাসম্পন্ন ছিলেন, তাহা একটি ব্যাপারে অতিশয় পরিস্ফুট। ২৯শে অক্টোবর বঙ্গ-বিভাগ আইনে পরিণত হয়, এবং ১৬ই অক্টোবর উহা কার্যে পরিণত হইবার দিন ধার্য হইয়াছিল। ঐদিন অখণ্ড বাংলার নিদর্শন-স্বরূপ সংগঠনমূলক কিছু করার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মিলন-মন্দির (Federation Hall) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই প্রস্তাবে সর্বপ্রথম তিনি শ্রীতারকনাথ পালিত এবং সিস্টার নিবেদিতার গভীর সমর্থন লাভ করেন।[১] ১৬ই অক্টোবর মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়, এবং অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় বৃদ্ধ আনন্দমোহন বসু উহার সভাপতিত্ব করেন। নিবেদিতা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই; কারণ পূজার ছুটি হইলে পূর্বেই, ৩রা অক্টোবর,

[১] The proposal was carefully considered, and it was warmly supported by the late Sir Taraknath Palit and Sister Nivedita of the Ramakrishna Mission, that beneficent lady who had consecrated her life to, and ideal in, the service of India (A Nation in the Making, p. 213).

দার্জিলিঙ গমন করেন ; কিন্তু ১৬ই অক্টোবর তিনি ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন, 'All India Day meeting'—অর্থাৎ 'নিখিল-ভারত-দিবস সভা'। প্রতি বৎসর ঐ দিনটি তিনি পালন করিতেন। বঙ্গ-বিভাগ আইনে পরিণত হইবার পূর্বে এবং পরে ছাত্রদের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ার এবং ফীল্ড অব একাডেমীতে বহু সভা হইয়াছে, এবং কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ঐ সকল সভায় নিবেদিতা একাধিক বার বক্তৃতা দিয়াছেন। নিবেদিতা তাঁহার ডায়েরীতে প্রায় সব সময় স্বপ্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়, স্থান এবং সময় লিখিয়া রাখিতেন। ঐ ডায়েরী হইতে জানা যায়, ঐ বৎসর (১৯০৫) ১৮ই ফেব্রুয়ারী ডন সোসাইটিতে 'ভারতীয় আদর্শ', ২৩শে ফেব্রুয়ারী আর্ট স্কুলে 'ললিতকলা', ১৩ই আগস্ট রামমোহন লাইব্রেরীতে 'কি কি পুস্তক পঠনীয় ও কেন' এবং ২০শে আগস্ট পুনরায় ডন সোসাইটিতে 'পরিবার, না স্বদেশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অন্য কোন বক্তৃতার উহাতে উল্লেখ নাই। অবশ্য বহু বক্তৃতা-সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন। ইহার পূর্ব হইতেই তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া প্রায় বন্ধ করিয়াছিলেন সুতরাং এই সময় ছাত্রগণ-পরিচালিত প্রকাশ্য সভায় বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিভিন্ন সমিতিতে যে সকল বক্তৃতা দিতেন তাহা স্বদেশ অথবা জাতীয়তামূলক। আন্দোলন পরিচালনার জন্য আলোচনা-সভায় তাঁহার পরামর্শের বিশেষ মূল্য ছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব লেখনীতে আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ আশ্চর্য নিপুণতা ও আবেগের সহিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। স্বদেশী আন্দোলন তো কেবল রাজনৈতিক জাগরণ নহে ; ইহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধির সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একান্ত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে ; আবার ইহাই প্রেরণা দিয়াছে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে পুনঃপ্রচার করিতে। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সমাজ-জীবনে স্বদেশী আন্দোলন বাংলার স্বতন্ত্র সাধনা, শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু শুধু আন্দোলনের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া নিবেদিতার স্বভাববিরুদ্ধ। স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া আর্থনীতিক ব্যাপারে সমাজকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন এবং ব্যবহারের জন্য একটি আন্দোলনও তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের জন্য আমাদের মরণ-পণ করিতে হইবে।' ইণ্ডিয়ান রিভিউতে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধক এবং নিশ্চয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ও উপদেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নিবেদিতা স্বয়ং

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। অদ্ভুত ধরনের স্বদেশী পেয়ালায় তিনি চা খাইতেন। বাগবাজারে ডাঃ শশীভূষণ ঘোষের স্ত্রী নগেন্দ্রবালা ঘোষের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। নগেন্দ্রবালা একজন প্রকৃত উচ্চহৃদয়া ও বহুগুণসম্পন্না মহিলা ছিলেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি বাড়িতে নিজে স্বদেশী সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। নিবেদিতা তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতেন এবং ঐ সাবান তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের নিকট বিক্রয় করিতেন। যে-কোন স্বদেশী তুচ্ছ বস্তুও তাঁহার নিকট অমূল্য বোধ হইত। স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের কোন প্রকার চেষ্টা দেখিলে তিনি আনন্দে অধীর হইতেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছিলেন, 'এ কথা বলা প্রয়োজন যে, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণ সমগ্র জগতের নিকট সম্মান লাভ করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছে। যেখানে শক্তি, বুদ্ধি এবং সম্মিলিত কার্যের প্রয়াস, সেখানেই আশঙ্কার অবকাশ ও শ্রদ্ধার উদ্রেক। স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা বীর্য এবং স্বাবলম্বন। ইহার মধ্যে কাহারো নিকট সাহায্যের প্রত্যাশা অথবা সুবিধা লাভের জন্য কাঁদুনি নাই। নিজের জন্য যতটুকু করিবার ক্ষমতা, ভারতবর্ষ তাহা করিবে ; এবং বর্তমানে যাহা করা সম্ভব নহে, ভবিষ্যতে তাহা ভাবিয়া দেখা যাইবে।

'ভারতীয়গণের কর্তব্য হইল, ব্যবসায়ীমহলের যে ষড়যন্ত্রে আজ স্বদেশ এবং স্বজাতি ক্রমশঃ সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে, তাহার যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ করা।

'যদি কেহ এ কথা বলে যে, কোন জিনিস সস্তায় পাওয়া যাইলে স্বেচ্ছায় বেশী মূল্য দিয়া কেহ উহা ক্রয় করিতে চাহিবে না, তবে তাহার উত্তরে আমরা বলিব, কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই যাহারা দশজনের সহিত সহযোগিতা করিতে শিখিয়াছে, সেই য়ুরোপীয়গণ সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে ; কিন্তু যাহারা চিরদিন পরার্থে আত্মত্যাগের আদর্শে শিক্ষিত, সেই ভারতীয় জাতির পক্ষে এ কথা খাটে না।'

নিবেদিতার সৌন্দর্য ও রসবোধ ছিল প্রচুর। ইহারই সঙ্গে বিলাতী জিনিসের উপর তাঁহার বিশেষ রাগ ছিল, কারণ এই সকল আমদানী করিয়া ভারতের অর্থশোষণের নীতিটা তাঁহার মনে সর্বদা জাগ্রত থাকিত। যেকোন স্বদেশী দ্রব্য, সাদাসিধা গড়নের তৈজসপত্র, মাটির প্রদীপ প্রভৃতি তাঁহার নিকট অপূর্ব হইয়া দেখা দিত, এবং সেই সম্বন্ধে তিনি নানা বর্ণনা দিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে স্বদেশী মেলা হয়, নিবেদিতার

উৎসাহ ও উদ্যম তাহাতে কম ছিল না। তাঁহার বিদ্যালয়ের মেয়েদের দ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ সূচীশিল্প তিনি এই মেলায় প্রদর্শনীর জন্য দিয়াছিলেন। চরকা আন্দোলনের বহু পূর্বে তিনি এই সময়ে তাঁহার বিদ্যালয়ে মেয়েদের চরকা কাটা শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহা ব্যতীত দেশে বহু ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বস্তুতঃ জাতীয় আন্দোলনে তাঁহার কার্য অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি সাধারণ-ভাবে আন্দোলনে যোগদান মাত্র করেন নাই, নেতৃত্বও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বপ্রকার উদ্যমের মূল্য তদানীন্তন নেতৃবর্গই যথাযথ উপলব্ধি করিতেন। শিক্ষিত মহল ছাড়াও তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ও বাগবাজার পল্লীর প্রতিবেশিগণ সকলেই জানিতেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ভারতের মুক্তি। ছাত্রীগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণের অভিলাষে তাহাদিগকে বক্তৃতা-সভায় লইয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তবপাঠের সহিত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে ভারতীয় নারীগণের উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা ও প্রবন্ধে কী আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন!

'ভারত-রমণীর কণ্ঠস্বর আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। যতদিন না আমরা জীবনের সকল রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া, আগ বাড়াইয়া তাঁহাকে সাদরে আনিয়া আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করিব, ততদিন এই মাতৃভূমি বিশ্বের দরবারে দৃষ্টিহীনা, নিষ্ক্রিয়া, অবগুণ্ঠিতা থাকিবেন। সেই মহাদেশমাতৃকার আনন্দোজ্জ্বল রূপ পুনরুদ্ভাসিত করিতে হইলে তাঁহার কন্যাগণের, সেই উত্তরকালের ভারত-কন্যাগণের, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া দলে দলে সমবেত হওয়া প্রয়োজন। যখন এই কন্যাগণ তাঁহাদের গর্বোন্নত মস্তক দ্বারা দেশমাতৃকার চরণ স্পর্শ করিয়া সংকল্প গ্রহণ করিবেন স্বামি-পুত্রের সহিত নিজ জীবন উৎসর্গের, তখনই কেবল ভারত-জননী বিজয়-মুকুটে ভূষিতা হইয়া সমুন্নতশিরে বিশ্বসভায় দণ্ডায়মান হইবেন। আজ তাঁহার দেবালয় ছায়াগ্রস্ত। যেদিন ভারত-রমণীগণ জাতীয়তার মহারতি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন, সেদিন আবার এই দেবমন্দির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আর অচিরেই দেখা দিবে প্রভাতের মধুর আলোক।'

ভারতবর্ষের কথা উঠিলে তিনি ভাবমগ্না হইয়া যাইতেন। তাঁহার মেয়েদের বলিতেন, 'ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করবে—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!' এই বলিয়া নিজের জপমালা লইয়া নিজেই জপ করিতেন, 'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!'

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ। সে ইতিহাস-গঠনে আন্দোলন ও বিপ্লবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন ও বিপ্লব দ্বারা স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহা বহুদূর পর্যন্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। অন্যান্য নেতৃবর্গের ন্যায় নিবেদিতাও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেন, আর সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়াই স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার কল্পনা করিয়াছিলেন। ঋষি দধীচির পবিত্র, অকলঙ্ক অস্থির দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র। দধীচি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আত্মোৎসর্গই শক্তির উৎস। সেই শক্তিশালী বজ্রের দ্বারাই অন্যায়ের উচ্ছেদ এবং ধর্ম ও ন্যায়ের স্থাপনা সম্ভব হইয়াছিল। বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে নিবেদিতা, জগদীশ বসু প্রভৃতি একটি বৃহৎ গোলাকার প্রস্তরের চারিধারে বজ্র অঙ্কিত দেখেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে, ভগবান বুদ্ধের সত্যসাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য ইন্দ্র এই বজ্রাসনটি প্রেরণ করেন। নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভারতের জাতীয় পতাকায় শক্তির প্রতীকস্বরূপ বজ্রচিহ্ন অংকিত থাকিবে। তিনি বলিতেন, 'যখন কেহ মানবজাতির কল্যাণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে, তখন সে দেবতার হস্তস্থিত বজ্রের মত শক্তিসম্পন্ন হয়।'

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, তখন উহার অন্তর্গত প্রদর্শনীতে নিবেদিতা জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কাপড়ের উপর নকশা তুলিয়া উহা তৈয়ারী করে। গাঢ় রক্তবর্ণের জমির উপর সোনালী সুতার বজ্র ও উহার উভয় পার্শ্বে লেখা বন্দেমাতরম্। মডার্ন রিভিউতে (১৯০৯) ঐ বজ্র-চিহ্নের সহিত 'জাতীয় পতাকারূপে বজ্র' নামক রচনাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ঐ রচনায় নিবেদিতার নাম নাই, তবে উহা পাঠে স্পষ্টই অনুমান হয় তিনিই রচয়িত্রী। নিবেদিতা স্বলিখিত পুস্তকের উপর এই প্রতীকটি ব্যবহার করিতেন। জগদীশ বসুও উহার পক্ষপাতী ছিলেন।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় নিবেদিতার পরিকল্পিত বজ্রের স্থান হয় নাই। যাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের এই নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও আর নাই। বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক উহার শীর্ষে এই বজ্র-প্রতীক স্থাপনের দ্বারা নিবেদিতার প্রতি মৌন সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল।

স্বাধীনতাকে ধ্রুবতারা করিয়া একদা যাত্রা শুরু হইয়াছিল। সেদিন সে যাত্রার পুরোভাগে যাঁহারা জীবন পণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংকল্প ছিল, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন।'

নিবেদিতা বলিতেন, 'আমরা আশা করব না, নিরাশও হব না, আমরা দৃঢ়নিশ্চয়—আমরা অগ্রগামী মরিয়া দল (Band of despair)। আমরা নিজেদের শরীর দিয়ে সেতু প্রস্তুত করব, পরবর্তী সৈন্যদল সেই সেতুর ওপর দিয়ে পার হয়ে যাবে।'

ভগিনী ও মনীষিবৃন্দ

দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনের মূলে সমাজের উচ্চস্তরে যে সকল শিক্ষিত এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের উপর নিবেদিতার প্রভাব বড় কম ছিল না। নিজের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, দেশ ও জাতির কল্যাণোদ্দেশে অপরের উপর ইহা প্রয়োগও করিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বার্থবুদ্ধির লেশমাত্র ছিল না বলিয়াই তাহা কাহারো নিকট দূষণীয় মনে হইত না। যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা দেখিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ হইয়াছেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগিতা লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। বিভিন্ন কর্ম-ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত মেলামেশা ও আদান-প্রদান যেমন তাঁহার চরিত্রের ও কর্মজীবনের বহু দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তেমনি নানাভাবে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাহারও পরিচয় দেয়।

এ দেশে নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও তদীয় পত্নী অবলা বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়-গণের সহিত পরিচয়ের প্রথম অধ্যায়ে স্বভাবতঃই তিনি শিক্ষিত ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। শ্রীযুক্ত বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা শুনিয়া নিবেদিতা ও মিসেস বুল বিশেষ কৌতূহল লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার সহিত আলাপে ও তাঁহার ল্যাবরেটরী দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া উভয়েই তাঁহার কার্যে সাহায্য করিতে সংকল্প করেন। ঐদিন অবলা বসুর সহিতও নিবেদিতা তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা-কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া-ছিলেন। শ্রীমতী বসু জানিতেন, নিবেদিতার ঐ প্রচেষ্টায় প্রবল অন্তরায়ের সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহার অবিশ্বাস তিনি গোপন রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু কয়েকদিন পরে বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার কার্য দেখিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল যে, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। পরিচয় পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

শ্রীযুক্ত বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার মনে হইয়াছিল, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যে জড়প্রকৃতির গবেষণা করিতে করিতে বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, ইঁহার গবেষণা সে জাতীয় নয়। এই গবেষণার উৎস অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ দর্শন, যাহা ভারতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের

মূল কথা—যাহার উপর ভারতীয় সমুদয় দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই চরাচর বিশ্ব চৈতন্যময়, সর্বভূতে সেই অদ্বিতীয় চৈতন্যেরই সত্তা, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'—এই যাহা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয়, সমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত এবং প্রাণসত্তায় স্পন্দিত হইতেছে—এই তত্ত্বের উপর শ্রীযুক্ত বসুর বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত। লতাগুল্মের মধ্যে তিনি যে প্রাণের স্পন্দন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি একটি সুস্পষ্ট বোধ বা বিশ্বাস হইতে। তিনি শুধু অন্ধের মত হাতড়াইয়া কিছু পাইবার চেষ্টা করেন নাই।

ভারতীয় বলিয়া শ্রীযুক্ত বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিপদে অজস্র বাধা। সরকারের নিকট উৎসাহের পরিবর্তে লাভ করিয়াছেন একান্ত উদাসীনতা। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য মেলে নাই। রয়্যাল সোসাইটিতে তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রতিপাদন করিবার অনুমতি সহজে পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু তাঁহার আবিষ্কারগুলিকে চাপা দিবার জন্য সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করা হইত। একটি পত্রে নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন, 'ডক্টর বসুর কাজের ওপর যে আক্রমণ চলছে তাতে যথেষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে ভারতের বিরাট কাজের এখনো অনেক বাকী আছে।' সরকার ও বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণের সহিত বৈজ্ঞানিক বসুর সংগ্রামকে নিবেদিতা 'বোস ওয়ার' (Bose war) বলিয়া অভিহিত করিতেন। বহু সময় এই সকল বাধা বসুকে হতাশ করিত। নিবেদিতা তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ ও অসুবিধা অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন, স্বাধীন দেশে সাধারণ বৈজ্ঞানিকেরও কত সুযোগ, সুবিধা। বিদেশী সরকারের প্রতি তাঁহার আক্রোশের ইহা অন্যতম কারণ। শ্রীযুক্ত বসুর বৈজ্ঞানিক সাধনা জয়-যুক্ত হইলে বিজ্ঞানজগতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিবে, তাহার ফলে ভারতবর্ষ গভীর মর্যাদা লাভ করিবে বিশ্বের দরবারে। ভারতের অদ্বৈত-তত্ত্ব বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া পুনরায় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান-চর্চা ব্যতীত বর্তমান ভারতের ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি অসম্ভব। এই সকল কারণেই তাঁহার বিজ্ঞান-গবেষণায় নিবেদিতার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সাহায্য।

১৯০১ খৃীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অবস্থানকাল হইতে নিবেদিতা জগদীশ বসুর গবেষণার কার্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ হইতে ১৯০৭-এর মধ্যে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বসুর তিনখানি বিখ্যাত পুস্তক 'Living and Non-living', 'Plant Response', Comparative Electro-physiology' পরবর্তী পুস্তক 'Irritability af Plants' এবং অন্যান্য বহু প্রবন্ধ, যাহা পরে ধারাবাহিকরূপে রয়্যাল সোসাইটি-পরিচালিত 'Philosophical Transac-

tions' পত্রিকায় বাহির হয়—সমস্তই নিবেদিতা কর্তৃক শুধু সম্পাদিত বলিলে যথার্থ বলা হয় না। ভাষার উপর নিবেদিতার অসাধারণ দখল থাকায় ঐ সকল পুস্তক প্রণয়নে তাহা যথেষ্ট কাজে লাগিয়াছিল। এই কয় বৎসরে তিনি নিজেও কয়েকখানি পুস্তক এবং অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। শ্রীযুক্ত বসু প্রায় প্রতিদিন বোসপাড়া লেনে আসিতেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া লেখা চলিত। ১৯০৯ সালে সিস্টার দেবমাতা নিবেদিতার গৃহে কিছুদিন বাস করেন। নিবেদিতার বিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'ভগিনী নিবেদিতা লেখার কার্যে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকিতেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জে. সি. বোসের উদ্ভিদ্‌জীবন সম্বন্ধে নূতন পুস্তক রচনার কার্যে তিনি সহায়তা করিতেন, এবং উহাতেও বহু সময় যাইত। ডক্টর বসু প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিতেন, এবং কখনো কখনো তথায় আহারাদি সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং তাঁহার সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম।'

প্রতি বৎসর পূজাবকাশে বসু-দম্পতির সহিত নিবেদিতা ও কৃস্টীন দার্জিলিঙ ও গ্রীষ্মাবকাশে মায়াবতী, মুসৌরী প্রভৃতি গমন করিতেন। শ্রীমতী বসুকে নিবেদিতা 'Bo' অর্থাৎ বউ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার সহিত কৃস্টীন ও নিবেদিতার বিশেষ সখ্য ছিল। সমগ্র বসু-পরিবারের সহিত তাঁহারা এক হইয়া গিয়াছিলেন। একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় নিবেদিতা এই পরিবারের সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন। কতদিন ইঁহাদের গৃহে অভ্যাগতের ছোটখাট সম্মেলনে তিনি বুদ্ধগয়া, চিতোর, কাঞ্চী প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। রাত্রে পারিবারিক আসরে তাঁহার প্রিয় ইংরেজী কবিতাগুলি আবৃত্তি করিতেন। নিবেদিতার কার্যেও অবলা বসু ও ডক্টর বসুর ভগিনী লাবণ্যপ্রভা বসু নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

ডক্টর বসু নিবেদিতা অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, এবং নিবেদিতা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। সাধারণতঃ তিনি তাঁহাকে 'Man of Science' বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্তু তাঁহার ডায়েরীতে এবং পত্রেও একাধিকবার বসুর উদ্দেশ্যে 'Bairn' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজী Bairn শব্দের অর্থ খোকা। কোনরূপ বাধা পাইলে শ্রীযুক্ত বসু নিরুৎসাহ বোধ করিতেন ; সেই সময় নিবেদিতা স্নেহময়ী মাতার ন্যায় তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন, জোর করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করিতেন। শ্রীযুক্ত বসুও বলিয়াছেন, 'হতাশ ও অবসন্ন বোধ করিলে আমি নিবেদিতার নিকট আশ্রয় লইতাম।' এই শিশুসুলভ স্বভাবের জন্যই কি তিনি ঐ আখ্যা পাইয়াছিলেন? বস্তুতঃ,

নানাভাবে শ্রীযুক্ত বসুকে নিবেদিতা কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত ছিলেন। নিবেদিতার সহিত তাঁহার পরিচয়ের কাল ১৮৯৯ হইতে ১৯১১ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত শ্রীযুক্ত বসুর পত্রগুলি প্রমাণ করে, এই সময়েই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। জীবনের সেই সংকটকালে নিবেদিতার অযাচিত, অনলস সাহায্য স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বসুর মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে! জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য' (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৪)।

অধ্যাপক গেডিজ শ্রীযুক্ত বসুর জীবনীতে লিখিয়াছেন, 'ডক্টর বসুর নূতন আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে অপরের প্রত্যয় জন্মাইবার পক্ষে বহু বাধা ছিল ; ঐ সকল বাধা দূর করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিবেদিতা সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন।' বসুর কার্যে মিসেস বুলের যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য ছিল, এবং ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ পর্যন্ত তাঁহার পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে মিসেস বুল নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহারও পশ্চাতে ছিলেন নিবেদিতা। প্রায় প্রতি পত্রে শ্রীযুক্ত বসুর নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে লিখিয়া নিবেদিতা তাঁহার প্রয়োজনের প্রতি মিসেস বুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। ধীরাজ বসু কর্তৃক প্রকাশিত নিবেদিতা স্মারকগ্রন্থে শ্রীযুক্ত গোখলেকে লিখিত নিবেদিতার পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। কীভাবে নিবেদিতা কাউন্সিল সদস্য গোখলেকে ডক্টর বসুর বিজ্ঞানকার্যে সহায়তা করিবার ব্যাপারে সচেষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ঐ পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ডক্টর বসু ও তাঁহার আবিষ্কারসমূহ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ নিবেদিতার নিকট শ্রীযুক্ত বসু জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হইতেন, তাই তাঁহার কার্যের সাফল্যে নিবেদিতার দায়িত্ব ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জেনোয়া হইতে ৩০শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত বসুর জন্মদিনে তিনি যে নিম্নলিখিত অভিনন্দন প্রেরণ করেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক চূড়ামণির প্রতি তাঁহার অন্তরের সুগভীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা কি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে!

জেনোয়া

৩০শে নভেম্বর, ১৯১০

'আপনি যখন এই পত্রখানি পাবেন, তখন জন্মদিনের মধ্যে সেরা আমাদের প্রিয় ৩০শে নভেম্বর তারিখটি এসে যাবে।

'অনন্তকাল ধরে ঐ দিনটি ধন্য হোক—ঐ শুভ দিনটিকে অনুসরণ করে ফিরে আসুক মাধুর্য ও পবিত্রতায় পূর্ণ আরও বহু বহু দিন। বাইরে দেখা যাচ্ছে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের খোদাই করা বিরাট প্রতিমূর্তি, তাঁর নামের নীচে শুধু লেখা আছে 'লা পাত্রে' (দি ফাদার)। আমি সেই অনাগত দিনটির কথা ভাবছিলাম, যখন ঐ কথাগুলি আপনার নামের নীচে নীরব বাণী হয়ে থাকবে। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে ইতিমধ্যেই আপনি এক হয়ে গেছেন তাঁর সঙ্গে, এক হয়ে গেছেন সেই সব মহৎ অভিযাত্রীদের সঙ্গে—যাঁরা নিজ নিজ জাতির কল্যাণ সাধনায় অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন।

'চির বিজয় লাভ করুন। জাতির সম্মুখে আপনার জীবন আলোক বর্তিকার মত পথ দেখাক, তাদের কল্যাণে প্রদীপের মত নিবেদিত হোক। আপনার অন্তর শান্তিতে পরিপূর্ণ হোক। আপনিই আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিক—আবিষ্কার করে চলেছেন নব নব জগৎ।'[১]

নিবেদিতার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জগদীশ বসুর কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'তাঁহার বিষয়ে আচার্য বসু মহাশয়ের নিকট অনেক কথা শুনিয়াছি, তাহা অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর।' নিবেদিতার প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ঐ সকল প্রসঙ্গকালেই ব্যক্ত হইত। ঐরূপ এক কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করতে পারব না। দেশ উপযুক্ত হলে তাঁর কদর বুঝবে।' সম্প্রতি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এক প্রবন্ধে কয়েকটি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিয়া নিবেদিতার প্রতি ডক্টর বসুর অন্তরের শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিয়াছেন।

নিবেদিতার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভারতীয় অর্থে ভারতীয়ের দ্বারা একটি বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ভারতীয় ছাত্রগণ বিজ্ঞান-সাধনার অব্যাহত সুযোগ লাভ করিবে। ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লইয়া শ্রীযুক্ত বসুর সহিত তাঁহার জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। শ্রীযুক্ত বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারদেশে প্রাচীর-গাত্রে ক্ষোদিত দীপহস্তে নারীমূর্তিটি নিবেদিতার পুণ্য স্মৃতির নিদর্শন। অধ্যাপক গেডিজ

[১] অনুবাদ—ভারততীর্থে নিবেদিতা, পৃঃ ৩৮৬

লিখিয়াছেন, 'বিজ্ঞান ও ভারতের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ, বহু-আকাঙ্ক্ষিত এই গবেষণাগারের বাস্তবরূপ গ্রহণে নিবেদিতার জ্বলন্ত বিশ্বাস কম প্রেরণা ও উৎসাহ দেয় নাই। তাঁহার [বসুর] গবেষণাগারের প্রবেশপথে স্মৃতি উৎসের সম্মুখস্থিত মন্দিরাভিমুখে দীপহস্তে নারীমূর্তিটির এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে' (The Life and Work of J. C. Bose, p. 222)।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন-ভাষণে শ্রীযুক্ত বসু যখন বলেন, 'সর্বপ্রকার সংগ্রামের উদ্যমে আমি একেবারে একাকী ছিলাম না। জগৎ যখন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল. তখন এমন কয়েকজন ছিলেন, যাঁহাদের আমার প্রতি বিশ্বাস মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয় নাই; আজ তাঁহারা পরপারে'—সেই মুহূর্তে তিনি নিবেদিতাকে স্মরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী, নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার সাহচর্য ও সহায়তা স্বল্পকালের জন্য। কিন্তু তাহার প্রভাব কী গভীর! নিবেদিতার আকস্মিক দেহত্যাগে তিনি কেবল শোকে অধীর হন নাই; মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত কৃস্টীনের ২১শে মার্চ, ১৯১৩ তারিখের পত্রে জানা যায়, বহুদিন ধরিয়া নিদারুণ মানসিক অবসন্নতা ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা তাঁহার জীবনকে দুর্বিষহ করিয়াছিল। 'মার্গট তাঁকে যথার্থ বুঝেছিল। তাঁকে সহানুভূতি, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিল, তাঁর কাজে সাহায্য করেছিল। বুঝতেই পারছ, সে কী বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে চলে গেছে।'

শ্রীযুক্ত বসুর মৃত্যু হয় পরিণত বয়সে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও নিবেদিতাকে তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার উইলে নিবেদিতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে এক লক্ষ টাকা রাখিয়া যান, তাহা দ্বারা শ্রীমতী বসু স্বপ্রতিষ্ঠিত বাণী মন্দিরে 'নিবেদিতা হল' তৈয়ারী করিয়া দেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সহিত, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রথম দর্শনেই রবীন্দ্রনাথের আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে তিনি ডায়েরীতে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া তিনি যখন তাঁহার প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তখন কথাপ্রসঙ্গে মহর্ষি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। স্বামিজী একদিন নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়াছিলেন। পরিবারবর্গের অনেকেই সেদিন স্বামিজীকে সাদর অভ্যর্থনা করেন, ও মহর্ষির সহিত তাঁহার নানারকম আলোচনা হয় (নিবেদিতার পত্র, ১৫।২।৯৯)।

নিবেদিতা তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণ এবং স্বামিজী ও রামকৃষ্ণ সংঘের মধ্যে

একটা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এ-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতায় প্রথম বাসকালে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এক চা-পান সভায় স্বামিজী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একত্র সমাবেশ নিশ্চিত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে উহার দ্বারা নিবেদিতার আশা পূর্ণ হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এ বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত 'নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য' (দেশ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৭৪) প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হওয়ায় এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

তাঁহাদের প্রথম পরিচয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণতঃ ইংরেজ মিশনরী মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক ; কেবল ইঁহার ধর্ম-সম্প্রদায় স্বতন্ত্র।'

এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার কন্যার শিক্ষাভার গ্রহণে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী এবং ইংরেজী ভাষা অবলম্বনে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী জানিয়া নিবেদিতা বলেন, 'বাইরে থেকে কোনো একটা শিক্ষা গিলিয়ে দিয়ে লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভেতর যে জিনিসটা আছে, তাকে জাগিয়ে তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষা দিয়ে সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল মনে হয় না।' রবীন্দ্র-নাথের প্রস্তাবে তিনি রাজী হন নাই, কাহারো অধীনে কার্য করিবার অভিপ্রায়ও তাঁহার ছিল না।

পরে তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রবীন্দ্রনাথ যখন জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে তাঁহাকে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ জানান, তাহাতে নিবেদিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু কতকগুলি কারণে উহা কার্যে পরিণত হয় নাই, ইহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। পরে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় ও আশ্রম স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ আদর্শকে বাস্তবরূপ প্রদান করেন। নিবেদিতার সহিত পূর্বেই এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া অসম্ভব নহে। ভারতীয় আদর্শে উভয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল। নিবেদিতার গভীর, হিন্দু-প্রীতি এবং ইংরেজ-বিরাগ রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস রচনায় অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিয়া থাকিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তাই উপন্যাসের কাহিনীর সহিত বিন্দুমাত্র মিল না থাকিলেও 'গোরা'-চরিত্রের জটিল দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে নিবেদিতা-চরিত্রের চকিত দর্শন পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ১৭নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার গৃহে বহুবার আসিয়াছেন। তাঁহারা একসঙ্গে বুদ্ধগয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিষ্টাচার ও সৌজন্য নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নিবেদিতা বাংলা ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্মার্থ তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার বিখ্যাত ছোটগল্প 'কাবুলীওয়ালা', 'দেনা-পাওনা' ও 'ছুটি'র অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিবেদিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এতদূর আস্থা ছিল যে, তাঁহার অনুরোধে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে স্বামী সদানন্দের সহিত কেদার-বদরী পাঠাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন অধিকাংশ সময় শিলাইদহে অবস্থান করিতেন। নিবেদিতা কয়েকবার সেখানে গিয়াছিলেন। ১৯০৪এর ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন ডক্টর বসুর সহিত প্রথম শিলাইদহে গমন করেন, তখন পদ্মার তীরে অবস্থিত এই গ্রামটিতে পদার্পণ করিয়া তাঁহার কী আনন্দ! পল্লীজীবনের প্রতি তাঁহার যে ঔৎসুক্য, তাহা বাহির হইতে অপরিচিতের কৌতূহল মাত্র নহে। দরিদ্র নরনারীর জীবনের মধ্যেও যে সরলতা ও পবিত্রতা, নিবেদিতার নিকট তাহা আন্তরিক শ্রদ্ধার যোগ্য। তাই তাঁহার সহিত ছোটখাট সুখদুঃখের গল্পে পল্লীবাসিগণ একজন নিকট আত্মীয়ের সহানুভূতি লাভ করিত। তবে কোন কোন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা বলিয়া এ বিষয়ে অত্যুক্তি করা হইয়াছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'চাষীরা শশব্যস্তে তাঁকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—নিবেদিতা যেন আমাকে চিনতে পারেন না ইত্যাদি' (উদ্বোধন, কার্তিক ১৩৫৯)।

নিবেদিতা একমাত্র গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশে মায়াবতী অথবা দার্জিলিঙ গিয়া দীর্ঘদিন থাকিতেন। বক্তৃতা উপলক্ষ্যে দীর্ঘদিন অন্য প্রদেশে অবস্থানের কথা পূর্বেই লেখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভ্রমণে গিয়া অযথা সময় নষ্ট করিবার মত প্রচুর সময় তাঁহার হাতে ছিল না। দরিদ্র কৃষক নরনারীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি, ভালবাসা ছিল। তাহাদের বাড়ি গিয়া দু-একবার ঢেঁকিতে ধানভানায় যোগ দেওয়া হয়তো অসম্ভব নহে, কিন্তু সমস্ত কাজ (ভারতে তাঁহার আট বৎসর অবস্থান কাল অসংখ্য কর্মের মধ্যে কাটিয়াছে) ছাড়িয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাহাদের সহিত বাস করিয়া চিঁড়ে কোটা, ধানভানা ইত্যাদি নিবেদিতার চরিত্রে নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব। এই শিলাইদহে পল্লীগ্রামের পরিবেশে অতি নিকট হইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই নিবেদিতার যথার্থ মহত্ত্ব প্রকাশিত, 'ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন

শুধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটিরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান-রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ, সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের অতি নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই' (পরিচয়, পৃঃ ১০০)।

নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের মতের ঐক্য ঘটে নাই। তাঁহাদের চলার পথ ছিল বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'তাহার পর মাঝে মাঝে নানা দিক দিয়া তাঁহার পরিচয় লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সহিত মিলিয়া চলা কঠিন ছিল।...তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারো প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে।...তাঁহার এই পাশ্চাত্য স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেকদূর ছাড়াইয়া গিয়াছিল' (পরিচয়, ৯৪, ৯৯)।

নিবেদিতার স্বভাবের একটি সুন্দর চিত্র। তাঁহার চরিত্রের এই 'পাশ্চাত্য স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা' স্বামিজী বহু পূর্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং উল্লেখও করিয়াছিলেন তাঁহার পত্রে। এ জগতে ত্রুটিশূন্য কে? কিন্তু নিবেদিতার এই প্রবল ত্রুটিও যেন তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য অনুপম গুণের নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছিল। নিবেদিতার সকল কার্য এবং মতামত রবীন্দ্র-নাথ মানিয়া লইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার ঔদার্য এবং ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ছিল। নিবেদিতার চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণে তাঁহার যুক্তি ও মন্তব্য প্রকৃতই বিশেষ মূল্যবান।

সেই মহীয়সী নারীর কথা স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন

উপকার পাইয়াছি, এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না ; তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে, যখন তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।...

'যেমনি হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন বলিয়াই আমাদের ভক্তির যোগ্য' (পরিচয়)।

এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির এই অকপট শ্রদ্ধা যিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রের যথাযথ অনুধাবন সহজ নহে।

ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য যাঁহাদের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতী-সম্পাদিকা সরলা ঘোষাল অন্যতম। সরলা ঘোষালের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার উৎসাহ, শিক্ষা ও দেশের কল্যাণকামনায় নানাপ্রকার হিতকর অনুষ্ঠান স্বামিজী অতীব প্রশংসার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। নিবেদিতা জানিতেন, নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারার, সর্বোপরি স্বামিজীর প্রতি সরলা ঘোষালের যথার্থ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আরও জানিতেন, কেবল একটা আদর্শগত অনৈক্য তাঁহার স্বামিজীর কার্যে যোগদানের অন্তরায়। স্বামিজীর সহিত বিশেষ পরিচয়ে ঐ বাধা দূর হইয়া যাইবে, এবং তাঁহারা একযোগে এক কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবেন, এই আশায় নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামিজীর নিকট লইয়া যাইতেন। ঐ সকল সময় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সঙ্গে থাকিতেন। নিবেদিতার মারফৎ স্বামিজী সরলা ঘোষালকে তাঁহার সহিত পাশ্চাত্যে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, প্রতীচ্যের নারীগণের নিকট তিনি ভারতীয় নারীর প্রতিনিধিরূপে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বার্তা প্রচার করিবেন। সরলা ঘোষাল লিখিয়াছেন, 'আমার সঙ্গে দেখা হবার পূর্বে যে পত্রাবলী [স্বামিজী] আমাকে লিখেছিলেন তার একখানিতেও তাঁর এ বিষয়ে কল্পনা জ্বলন্ত ভাষায় ফুটে উঠেছিল। এমন অমূল্য সুযোগ গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার হল না। আমার নিজের মনের অপ্রস্তুততা, সঙ্কোচ এবং অভিভাবকদের অমত এই দুইই প্রবলভাবে বাধা দিলে। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামিজী চলে গেলেন, সে-ই তাঁর বাণী-বাহিনী হল' (জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ১৬১-৬২)।

সরলা ঘোষালের দেশপ্রীতি ছিল আন্তরিক। বাংলার জাতীয়তার

পুনরুত্থানে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই অবস্থানকালে তিনি মারাঠা জাতীয় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর ঐ উদ্দেশ্যে বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে দেশের জন্য যথার্থ কিছু করিবার আশায় স্বামিজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, পারিপার্শ্বিক ও মানসিক সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিবার মত দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। তিন বৎসর পরে তিনি মন স্থির করিয়া পত্রদ্বারা স্বামিজীকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ঐ পত্রখানি স্বামিজীর নিকট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া নিবেদিতাকেও এক পত্র লিখিয়াছিলেন। স্বামিজীকে লিখিত পত্রে কি ছিল এবং তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন, সবই অজ্ঞাত। কেবল অনুমান করা যায়, তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হইয়াছিল ; কারণ নিবেদিতার দ্বিতীয়বার ভারতে আগমনের পর স্বামিজী অতি অল্পদিন এ পৃথিবীতে অবস্থান করেন। স্বামিজীর তিরোধানের পর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তাঁহার 'ভারতী' পত্রিকা মারফৎ আক্রমণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিবেদিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী মনীষী ওকাকুরা এদেশে আগমন করিলে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি উৎসাহী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ দলের সহিত ঠাকুরবাড়ির অনেকের এবং নিবেদিতারও যোগাযোগ ছিল। নিবেদিতার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসলের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপ্শন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা : ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।

'আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস্ হোমউডের বাড়িতে। আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরী করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজারাজড়া সাহেব-মেম গিস্‌গিস্ করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব ; কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা ; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে,

ফ্যাশনে চারিদিক ঝলমল করছে। হাসি, গল্প, গানে বাজনায় মাত। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালী রুপালীতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগলো। উড্রফ, ব্লাণ্ট এসে বললেন, 'কে এ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

'সুন্দরী "সুন্দরী" কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।

'...ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনের বল পাওয়া যেত।...নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; কি ক'রে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি' (জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১০৯)।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী, নিবেদিতার সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলি যেন কয়েকটি রেখা, যাহার মধ্যে নিবেদিতার স্বভাব ও সৌন্দর্যের মহিমা অপূর্ব রূপায়িত। এ পর্যন্ত যে নিবেদিতাকে আমরা জানিয়াছি, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে তাঁহার পরিচয় অন্যরূপ। তাঁহাদের মিলনের ক্ষেত্র রাজনীতি নহে, ভারতীয় শিল্প-সাধনার পাদপীঠে দাঁড়াইয়া একান্ত অনুরাগের সহিত উভয়ে সে সাধনায় মগ্ন হইয়াছেন। নিবেদিতার অতুলনীয় শিল্পবোধের বিষয় অন্যত্র আলোচ্য।

অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যই ভালবেসে-ছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়।'

তদানীন্তন অন্যতম প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—'কুমারী মার্গারেট নোব্‌ল ভগিনী নিবেদিতা নামে সমগ্র ভারতে পরিচিত ও ভারতের প্রিয়। নিবেদিতা নাম গ্রহণ তাঁহার সার্থক। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধারণ ধারাতে তিনি নিঃশেষে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই ইংরেজ মহিলা সমস্ত জীবন দিয়া যেভাবে ভারতকে ভালবাসিয়াছেন, আমাদের দেশের—বিশেষ করিয়া আধুনিক শিক্ষাভি-মানীর মধ্যে খুব কম লোকেই সেভাবে দেশকে ভালবাসেন।'

আমেরিকায় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে ভ্রমণকালে নিবেদিতা

কয়েক দিন বস্টনের কেম্ব্রিজ শহরে মিসেস বুলের নিকট অবস্থান করেন। মিসেস বুলের সহিত পূর্বেই পরিচিত বিপিনচন্দ্র পালও তাঁহার আমন্ত্রণে ঐ সময় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'সেই সময়েই মিস নোবলের (ভগিনী নিবেদিতা) সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে অদ্ভুত পরিচয়। আমাদের ফলিত জ্যোতিষে মানুষের একটা "গণ" নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, কেহ দেবগণ, কেহ বা নরগণ, কেহ বা রাক্ষসগণ। নিবেদিতার কোন্ "গণ" ছিল জানি না, আমারই বা কি "গণ" সে কথাও মনে নাই। কিন্তু আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলেই সেই প্রথম দিন অবধি যেরূপ দৈব দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহাতে নিবেদিতার দেবগণ এবং আমার রাক্ষসগণ, এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কারণ দেখা হইলেই একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঝগড়ার দরুন উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় কোন বৈরিতার লেশমাত্র জাগে নাই।...স্বর্গীয় পি. মিত্র মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, নিবেদিতা আমার কথা উঠিলেই বলিতেন—"পালের দাঁতগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি? ঐ দাঁত দেখিলেই আমার মনে হয় তাহার ভিতরে বাঘ লুকাইয়া আছে।" কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে অনাবিল সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।...

'প্রাতরাশে বসিয়া স্বভাবতঃই কলিকাতার কথা উঠিল। আমি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক, নিবেদিতা ইহা জানিতেন। আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার একটা গভীর অশ্রদ্ধা ছিল। নিবেদিতার স্বচ্ছ চিত্তে কখনও কোন মনোভাব ঢাকা পড়িত না। সুতরাং সৌজন্যের খাতিরেও আমার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে তিনি তাঁহার অন্তরের অশ্রদ্ধা গোপন করিতে পারিলেন না। একেবারে সোজাসুজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিলেন' (মার্কিনে চারিমাস)।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইল। বিরোধের মধ্য দিয়া তাঁহাদের পরিচয়, সুতরাং সেখানেই বিরোধের অবসান হইল না। সেইদিন বিকালে মিসেস বুলের প্রতিবেশী ডাঃ জোন্সের গৃহে এবং পুনরায় মিসেস বুলের গৃহে বস্টনের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রী-সম্মেলনে নিবেদিতার সহিত শ্রীযুক্ত পালের আরও দুই দফা সংগ্রাম হইয়া গেল। নিবেদিতা শিক্ষয়িত্রীদিগের সহিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ জাতিভেদের কথা উঠিল। শ্রীযুক্ত পালও যোগ দিলেন এবং কথায় কথায় বলিলেন হিন্দুর এই জাতিভেদ ভারতের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

নিবেদিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'ও কথা ঠিক নয়। আপনি ব্রাহ্ম বলে হিন্দু-ধর্মকে আক্রমণ করছেন।' শ্রীযুক্ত পালও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বলেন, প্রচলিত শাস্ত্রের প্রাচীন প্রভাব বিদ্যমান থাকিলে ব্রাহ্মণের নিকট ধর্মপ্রচার স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে অনধিকার চর্চা বলিয়াই মনে হইত।

নিবেদিতা এই কথায় একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'It is a lie. The Swami has been accepted as the Guru of the Hindus—অর্থাৎ মিথ্যা কথা। স্বামিজীকে হিন্দুরা ধর্মগুরুর পদে বরণ করে নিয়েছে।'

উত্তরে শ্রীযুক্ত পাল বলিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদিগের ধর্মগুরু নহেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করে নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির মত একজন ধর্ম ও সমাজসংস্কারক মাত্র।

শ্রীযুক্ত পাল লিখিয়াছেন, 'নিবেদিতার কোমল প্রাণে এ আঘাত সহ্য হইল না। আমার কথায় তাঁহার গুরুর অপমান হইয়াছে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে কথা তো মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। কহিলেন, "যখন তখন তোমরা আমাদের স্ত্রীলোক বলে অপমান কর—You always insult us as woman in every argument." আমি কহিলাম, "স্ত্রীলোক বলিয়া অপমান করি না, সম্মান করি। এতটা সম্মান করি বলিয়াই আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী কহিলেন, অথচ তাহার যথাযোগ্য জবাব আমি দিতে পারিলাম না।"

বারংবার নিবেদিতার সহিত এইরূপ কথাবার্তায় অশান্তির সৃষ্টি হওয়ায় বিপিন পাল মিসেস বুলের আতিথ্য সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি বস্টনে ধর্ম-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হইয়া হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'এই উপলক্ষ্যে পুনরায় নিবেদিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এই কংগ্রেসে আমি যখন বক্তৃতা করিতেছিলাম, তখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার গৌরব-কাহিনী শুনিয়া নিবেদিতার দেহ-মন-প্রাণ সকল গরবে ভারী হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে ব্রাহ্মসমাজের লোক, নিবেদিতা তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার গুরুনিন্দা করিয়াছি বলিয়া আমার উপরে যে রাগ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি পর্যন্ত তাঁহার মনে রহিল না। ভারতের কীর্তিগাথা বিদেশীয়দের নিকট গাহিতেছি দেখিয়া নিবেদিতার চক্ষে আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভাল-

বাসিতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। মিসেস বুলের বাড়িতে আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে মিলিয়াছিলাম। এই "কংগ্রেস অব রিলিজিয়নের" অধিবেশনে ভারতের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া আমরা উভয়ে এমন এক সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, যাহা শত মতভেদ সত্ত্বেও চিরদিন অটুট ছিল।'

বিপিন পাল তাঁহার 'Soul of India' নামক পুস্তকে নিবেদিতার প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীযুক্ত পাল 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিলে নিবেদিতা ছিলেন তাহার অন্যতম প্রথম ও প্রধান লেখিকা।

স্বপরিচালনাধীনে পত্রিকা বাহির করিবার আশা নিবেদিতার পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের বহু পত্রিকা, বিশেষ করিয়া জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিই ছিল তাঁহার ভাবাদর্শ-প্রচারের প্রধান অবলম্বন। প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাও ঐ উপলক্ষ্যে।

ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছেন, 'ঠিক সাল আমার মনে নাই, বোধ হয় ১৯০৬ সালে ভগিনী নিবেদিতা কিছুদিন কাশী তিলভাণ্ডেশ্বরে একটি বাড়িতে বাস করেন।[১] তিনি একদিন রামানন্দ বাবুর "প্রবাসীর" প্রচুর প্রশংসা করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কেমন করিয়া "প্রবাসীর" প্রশংসা করিলেন ইহাই ভাবিতেছিলাম, কারণ "প্রবাসী" ত বাংলা কাগজ। তবু দেখিলাম "প্রবাসীর" সব মতামত, সব খোঁজখবর তিনি রাখেন এবং রামানন্দ বাবুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন।

'ভগিনী নিবেদিতা একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "এই যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায়—বাংলার সুখদুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনাপ্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখন ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।" পরে "মডার্ন রিভিউ" বাহির হইবার পর ভগিনী নিবেদিতার সহিত দেখা হইলে আমি বলিয়াছিলাম, "আপনার সেই ভবিষ্যদ্-বাণী এতদিনে সফল হইয়াছে। কিন্তু আপনি এত আগে হইতে কি করিয়া

[১] নিবেদিতা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য কাশী আগমন করেন। ঐ সময় হইতে ১৯০৬এর জানুয়ারী মাসের কয়েকদিন তিল-ভাণ্ডেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

এমন একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন?" ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, "গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার মতই তাহাতে আলোকশক্তি দেন। এই যে একটি প্রদীপ জ্বলিল, দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। তখনই বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ-প্রদীপ হইবে। আলোকস্তম্ভের মহাদীপের মত যে শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতেই নিঃশেষিত হয়?"'

'মডার্ন রিভিউ'এর প্রথম প্রকাশকালে রামানন্দ বাবুর নিবেদিতার সহিত পরিচয় ছিল না। তিনি জগদীশচন্দ্র বসুকে অনুরোধ করেন তাঁহার পত্রিকায় লেখা দিবার জন্য, এবং শ্রীযুক্ত বসুই তাঁহার হইয়া নিবেদিতাকে উক্ত পত্রিকায় লিখিতে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন, 'লেখার অভাব যাতে না হয়, সে চেষ্টা করব।' এই প্রতিশ্রুতি তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করেন। 'মডার্ন রিভিউ'এর প্রথম প্রকাশ ১৯০৭ খৃীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ পর্যন্ত নিবেদিতা ছিলেন ইহার অন্যতম প্রধান লেখিকা। তাঁহার দেহত্যাগের পরেও কয়েক মাস ধরিয়া 'Star Picture' নামক প্রবন্ধটি উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ হইয়াছিল। 'মডার্ন রিভিউ'তে সরকারের কার্য সম্বন্ধে খোলাখুলি সমালোচনা থাকিত। কয়েকবার রামানন্দ বাবুর বাড়ির খানাতল্লাস হইয়াছে। নিবেদিতা প্রথমেই খবর পাইয়া তাঁহাকে সাবধান করিতেন।

'নিবেদিতার গভীর আধ্যাত্মিকতা, আশ্চর্য চারিত্রিক শক্তি, ভারতপ্রীতি, ভারতসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, মনীষা, পাণ্ডিত্য, শিল্পজ্ঞান, নানাবিষয়ে আশ্চর্য লিখিবার ক্ষমতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি রামানন্দের নিকট শ্রদ্ধার জিনিস ছিল। তিনি 'মডার্ন রিভিউ'এর জন্মকাল হইতে লেখা দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সম্পাদককে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তেমন সাহায্য সচরাচর কাহারও নিকট মিলে না। সম্পাদক বলিতেন যে, নিবেদিতা সাধারণ কথা-বার্তার সময় সম্পাদকের কাজের দোষত্রুটি যাহা দেখিতেন তাহার কঠোর সমালোচনা করিতেন। সেই সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল না। এই যে নানাভাবের সাহায্য ইহার মূল্য নিবেদিতার মৃত্যুর পরও সম্পাদক স্মরণ করিতেন। ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতি যাঁহারা সদয় তাঁহারা যেন সকলেই নিবেদিতার মত কঠোর সমালোচক হইতে পারেন, এবং যাঁহারা এখন কেবলমাত্র কঠিন সমালোচনা করেন তাঁহারা যেন নিবেদিতার মতই সদয় ও সহায় হইতে পারেন।

নিবেদিতা প্রকৃতই তাঁহার ভগিনী ছিলেন, এবং নিবেদিতার জীবনপথে যাঁহারা তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের কাছে নিবেদিতা সত্যই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করিয়াছিলেন ; এমন প্রাণ দিয়া "মডার্ন রিভিউ"এর উন্নতির চেষ্টা আর কেহ করিয়াছিলেন কি না জানি না' (রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দী, পৃঃ ১৫৭)।

নিবেদিতা তাঁহার লেখার উপর কলম চালানো পছন্দ করিতেন না। কিন্তু রামানন্দের প্রতি তাঁহার এতদূর আস্থা ছিল যে, তাঁহাকে সে অধিকার দিয়াছিলেন। যে-কোন বিষয় লইয়া আলোচনা এবং যুক্তি দ্বারা নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা নিবেদিতার ছিল। রামানন্দ লিখিয়াছেন, 'চিঠিতে ছাড়া এ সব বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সহিত মৌখিক কথা যখন হইত তখন কথা বলার কাজ তিনিই বেশী করিতেন, আমি বেশীর ভাগ শ্রোতার কাজ করিতাম। আচার্য বসু হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "উনি চান যে তুমিও খুব তর্ক কর এবং তর্কে তাঁহার নিকট তুমি পরাস্ত হও, তাহা হইলে তিনি খুব খুশি হন।" নিবেদিতা শুনিয়া হাসিতেন।'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নিবেদিতার পরিচয়ের প্রধান উপলক্ষ্য 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা। প্রথমাবধি বিভিন্ন প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় মন্তব্য, কবিতা, শিল্প সমালোচনা প্রভৃতি দ্বারা অবিচ্ছিন্নরূপে তিনি যেমন উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও তেমনি বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি নিবেদিতার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কারণ রামানন্দ বাবু স্বদেশসেবাকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য গুণগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা যথার্থ দেশসেবী, স্বদেশের আদর্শে আস্থাবান এবং স্বদেশের কল্যাণকল্পে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিবেদিতার পরম শ্রদ্ধাভাজন ও ভালবাসার পাত্র।

নিবেদিতা জানিতেন, স্বদেশসেবার কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথ নাই। যে কেহ কোনভাবে দেশের জন্য কিছু করিলে মতের ঘোরতর পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি নিবেদিতার ভালবাসার অন্ত থাকিত না। দীনেশ সেনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, 'দীনেশবাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সেদিক দিয়ে আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নয়, মর্মপীড়া দেয়, কিন্তু তবু আমার আপনাকে ভাল লাগে কেন শুনবেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন ও দেশের ওপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন

যে, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের স্থানের দাবী করবার যোগ্যতা রাখেন—এজন্য আপনাকে আমার ভাল লাগে।'

দীনেশচন্দ্র সেন বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে অবস্থান করিতেন। তিনি ইংরেজীতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে তাঁহার মনে হয়, নিবেদিতাই উহা দেখিয়া দিবার উপযুক্ত লোক। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ, নিবেদিতা তখন দুই বৎসর পাশ্চাত্যে অবস্থানের পর মাত্র কয়েক দিন হইল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। দীনেশবাবু একদিন সকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। নিবেদিতা সানন্দে সম্মত হইলেন। পুস্তকখানি বেশ বড় শুনিয়াও হাসিমুখে বলিলেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, তিনি দেখিয়া দিবেন।

প্রায় বৎসর খানেক ধরিয়া নিবেদিতা এই পুস্তকখানি অধ্যবসায়ের সহিত দেখিয়া দিয়াছিলেন। দীনেশ সেন লিখিয়াছেন, কোন একটা বিষয়ের ভার লইলে নিবেদিতা মনে করিতেন না যে উহা পরের। সেটি সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়া খাটিতেন। এইভাবে পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। কোন দিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত উভয়ে খাটিয়াছেন, মধ্যে ২।৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছেন মাত্র। 'এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপর-ভাব-বিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম।'

এই পুস্তক দেখিবার সময় দীনেশবাবুর সহিত সাহিত্য, কবিতা এবং সঙ্গীত সম্পর্কে নিবেদিতার বহু মূল্যবান আলোচনা হইত। আলোচনা মাঝে মাঝে প্রবল তর্কের আকার ধারণ করিত। কোন কোন দিন এক লাইনও পড়া হইত না, তর্কযুদ্ধেই সময় চলিয়া যাইত। তাঁহার উপর ভার ছিল ইংরেজী সংশোধনের, কিন্তু পুস্তকের কোন অংশ তাঁহার মনোমত না হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন এবং জোরের সহিত বলিতেন, 'দীনেশবাবু, ঠিক বলছি, যদি এই অংশ পরিবর্তন না করেন, তবে এ পুস্তক আমি আর পড়ব না।'

দীনেশবাবু প্রমাদ গণিয়া কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন। নিবেদিতার পক্ষে নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া অপরের মত গ্রহণ করা অসম্ভব। ইহা ব্যতীত মনে হয়, পুস্তকখানি ইংরেজীতে লিখিত হওয়ায় তাঁহার মনে হইত, বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনপ্রকার ত্রুটি বা অন্যায় থাকিলে তাহা দ্বারা

জগৎসমক্ষে ভারতবাসীর মর্যাদাহানি হইবে। সুতরাং পুস্তকের মধ্যে ধনপতির গল্পে খুল্লনার প্রতি সমাজের শাস্তিবিধান সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আপত্তি ছিল। তাহার কারণ, প্রকৃত দোষী লহনার পরিবর্তে নির্দোষ খুল্লনার প্রতি যদি সমাজ শাস্তির বিধান করে, তবে সে সমাজ সম্বন্ধে লোকের উচ্চ ধারণা হইতে পারে না। নিবেদিতা বলিতেন, 'আপনার গল্পে যদি এ কথা থাকে, তবে পৃথিবীর লোক এটাকে "কাজির বিচার" বলে আপনাদের ঠাট্টা করবে। না, না, না, এ কথা আপনি রাখতে পারেন না ; গল্প থেকে এটা ছেঁটে ফেলুন।'

অবশ্য কোন কাহিনী হইতে এইভাবে প্রকৃত তথ্য বাদ দিলে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় না, এবং সেই সকল ক্ষেত্রে দীনেশবাবু প্রকৃতই সংকটে পড়িতেন। এরূপ প্রায়ই ঘটিত। পুস্তক পড়িবার সময় তিনি লেখকের উপর বহু কঠোর মন্তব্য করিতেন ; কিন্তু দীনেশবাবু উহাতে কখনো বিরক্ত হন নাই। 'কেন না, আমি তাঁহার রূঢ় কথার মধ্য দিয়া তাঁহার অতি কোমল পুষ্পকোরকের মত সহৃদয়তায় ভরপুর প্রাণটি দেখিতাম।' নিবেদিতাও কেবল কঠোর মন্তব্য করিতেন তাহা নহে, বহু সময় বলিতেন, 'দীনেশবাবু, আপনি সত্যই একজন প্রধান কবি ; আপনার লেখা গদ্য হলে কি হবে? আপনার ভাষা প্রকৃত কবির। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব।' ইহা ব্যতীত বাহিরের লোকের নিকট তিনি দীনেশবাবুর এভাবে পরিচয় দিতেন যে, তাহাতে সেন মহাশয় বিশেষ শ্লাঘা অনুভব করিতেন।

নিবেদিতার কবিতা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি অসামান্য ছিল। গ্রাম্য ছড়ার সম্বন্ধে কোনরূপ অশ্রদ্ধার ভাব তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিত। বলিতেন, 'লম্বা লম্বা শব্দ লাগিয়ে যাঁরা মহাকবির নাম কিনেছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাদের চেয়ে ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে।'

নিবেদিতা সম্বন্ধে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, 'তাঁহার ভগিনীজনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও প্রীতিকর ছিল, তাহা আর কি লিখিব! যেদিন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।'

যে কারণে দীনেশবাবুকে নিবেদিতার ভাল লাগিয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই রমেশচন্দ্র দত্তের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীযুক্ত দত্ত ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং অমায়িক। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর ছিল। নিবেদিতা তাঁহাকে Godfather অর্থাৎ ধর্মপিতা বলিতেন। রমেশ-বাবুও তাঁহাকে কন্যার মতই স্নেহ করিতেন। তিনি ছিলেন উচ্চ রাজকর্মচারী

এবং রাজনৈতিক মতবাদে একেবারে নরমপন্থী, অর্থাৎ আলাপ-আলোচনা ও আবেদনের দ্বারা শাসননীতির পরিবর্তনের পক্ষপাতী ; সুতরাং নিবেদিতার সহিত মতের ঐক্য সম্ভব নহে। কিন্তু নিবেদিতা গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং বাহিরের পরিচয়ের অন্তরালে যে প্রকৃত মানুষ, তাহাকে চিনিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। স্বদেশের প্রতি শ্রীযুক্ত দত্তের যথার্থ ভালবাসা এবং দেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার মূল্য নিবেদিতা বুঝিতেন। রমেশবাবু তাঁহাকে বাংলা এবং সংস্কৃত শিক্ষায় সাহায্য করেন। বিশেষতঃ নিবেদিতার প্রথম পুস্তক 'The Web of Indian Life' রচনায় রমেশ দত্তের সাহায্য তিনি পুস্তকের প্রারম্ভে অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। পরাধীন ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নিবেদিতা তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন এবং ছাত্রগণকে তাঁহার 'অর্থনীতির ইতিহাস' পুস্তক পাঠ করিতে নির্দেশ দিতেন।

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক জীবনে নিবেদিতার গভীর প্রভাবের অন্যতম কারণ এই যে, তিনি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। নিবেদিতাকে চিনিতেন না, বা তাঁহার নামের সহিত পরিচিত ছিলেন না, এরূপ লোক সেই যুগে বিরল। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার্ রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ডাঃ নীলরতন সরকার, আনন্দমোহন বসু, মতিলাল ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ পালিত, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি দেশের মনীষিগণ নিবেদিতার গভীর পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, কর্মতৎপরতা এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অকপট ভালবাসা দর্শনে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন। দেশের যে কোন সমস্যায় নিবেদিতার পরামর্শ এবং সহযোগিতা তাঁহাদের নিকট অতিশয় আদরের বস্তু ছিল। বিনয় সরকার বলিয়াছেন, 'নিবেদিতা তুখোর মেয়ে, মগজটা ছিল ভারী ধারালো। পাশ্চাত্য-স্বাদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠা, রোমাণ্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তা-ভাণ্ডার ছিল ভরপুর। সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফৎ ভারত ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে। ভারতীয় নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়িমুড়কি খাওয়ার মত সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক ভারতীয় স্বদেশসেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিকাশধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন...কোন

বিদেশী পণ্ডিত ভারতীয় নরনারীর জীবন-কথা এত গভীরভাবে বুঝতে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব। নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর এই বিশ্লেষণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি সহজেই ধরা পড়ত। এই সবের ভেতরকার ভারতীয় দরদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য' (বিনয় সরকারের বৈঠকে)।

এই কারণেই তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায়ের উপর নিবেদিতার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। তিনি যখন তাহাদের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করিতেন, অথবা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করিতেন, তখন তাঁহার মধ্য দিয়াই তাহারা ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিত, পরাধীন দুর্বল জাতির অসহায় বেদনা তাহাদের মর্মবিদ্ধ করিত, বীরত্ব ও পৌরুষে তাহাদের অন্তর ভরিয়া উঠিত। সিস্টার নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিয়া অনুপ্রেরণা লাভ করেন নাই, এরূপ লোক বিরল। ইহা ব্যতীত নিবেদিতার গবেষণাশক্তি, সংস্কৃতি-বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ইংরেজী রচনার কৌশল বহু ছাত্রকে আকৃষ্ট করিয়া জীবনযাত্রায় উচ্চ প্রেরণা দিয়াছে। ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার যে কেবল স্নেহ-ভালবাসা ছিল তাহা নহে ; ভবিষ্যৎ ভারতের যাহারা প্রতিনিধি, তাহারা জীবনযাত্রায় যে কর্মক্ষেত্রই নির্বাচন করুক, উচ্চ আদর্শ, আত্মমর্যাদা-বোধ এবং স্বদেশনিষ্ঠা যেন তাহাদের জীবনের লক্ষ্য হয়—ইহাই ছিল নিবেদিতার অন্তরের অভিলাষ। যে সকল ছাত্র পরে নানাভাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই নিবেদিতার নিকট ঋণী। উদীয়মান অধ্যাপক, ঐতিহাসিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকের প্রতিও অনুরূপ কারণে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। নানাভাবে তাহাদের সাধনায় তিনি সাহায্য করিতেন, অকপটে প্রশংসা করিয়া তাহাদের হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতেন। যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করিয়া নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, 'বিদেশীর কাছে আপনার পতাকা কখনো নিচু করবেন না। যে বিশেষ বিভাগ আপনি গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন, তাতে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষ যেন এ বিষয়ে প্রথম বলে স্বীকৃতি লাভ করে।' দীর্ঘকালের কর্মক্ষেত্রে আচার্য যদুনাথ এই কথাটি কখনো বিস্মৃত হন নাই। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় যখন ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন নিবেদিতা তাঁহাকে যে নির্দেশগুলি দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি কথা মূল্যবান।[১] শিল্পী নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পিগণ বলেন, শিল্পীরূপে তাঁহাদের সাফল্য অর্জনের

১ A Note on Historical Research (Hints on National Education, p. 95).

মূলে ছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতাই উদ্যোগী হইয়া নন্দলাল বসুকে অজন্তায় প্রেরণ করেন, নানাভাবে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন ঘোষ, তারক দাস প্রভৃতি বিপ্লবিগণ নিবেদিতার নিকট যে সাহায্য ও প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তারক দাস তাঁহার 'জাপান ও এশিয়া' নামক পুস্তক তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। বস্তুতঃ, তাঁহার প্রতি সকলের কী অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তাবোধ ছিল, তাহা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল বাংলা দেশ নহে, বোম্বাই, পুণা, মাদ্রাজ, নাগপুর, কাশী, পাটনা প্রভৃতি শহরে তাঁহার গুণমুগ্ধ বহু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর কুমারস্বামী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, মিঃ নটেশান, মিঃ পাদশাহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন, নিবেদিতাই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শিকা। তিনি যে সকল পত্রিকায় লিখিতেন, তাহাদের সম্পাদকগণ তাঁহার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন। উহার সুযোগ লইয়া ভারত সম্বন্ধে কত গভীর চিন্তাপূর্ণ, মূল্যবান সম্পাদকীয় মন্তব্য তিনি লিখিয়াছেন,.তাহার কোন হিসাব নাই।

সাধারণভাবে শাসক ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহার বিরাগ নানাভাবে প্রকাশ পাইত। কোন বিদেশীর প্রভুত্বসূচক দম্ভপূর্ণ ব্যবহার তিনি সহ্য করিতেন না, শ্বেতাঙ্গী বলিয়া কেহ আত্মীয়তা করিতে আসিলে বিরক্ত হইতেন। একবার দীনেশ সেনের সহিত তিনি ট্রামে যাইতেছিলেন, এমন সময় একজন ইংরেজ উহাতে উঠিয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিলে, তিনি এমন চোখ রাঙ্গাইয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন যে, সাহেবকে মুখ নিচু করিয়া অন্য বেঞ্চিতে গিয়া বসিতে হইল। তিনি তখন দীনেশবাবুর দিকে আরও সরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে লাগিলেন। একদিন যদুনাথ সরকার এ দেশের এক প্রবীণ ব্যক্তির মূল্যবান ঐতিহাসিক গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করিতেছিলেন : নিবেদিতা বেদনার সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ ব্যক্তির কথা আর বলবেন না, উনি ইংরেজের স্তাবক।'

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে (পৃঃ ২৫৬-৫৭) বুদ্ধগয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন—

ফেরবার সময় সকলে মিলে গয়া স্টেশনে যাওয়া হল। সকলের গন্তব্যস্থল এক নয়, তাই বিভিন্ন ট্রেন ধরতে হবে। সপত্নীক জগদীশচন্দ্র বম্বে মেলে কলকাতায় যাবেন—সেই ট্রেনই প্রথম এল। দৌড়াদৌড়ি করে কোনো কামরাতেই

জায়গা পেলেন না। প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় দেখা গেল দুটি লোক, দুজনেই শ্বেতাঙ্গ। ভারতীয়কে তারা ঢুকতে দেবে না দেখে আমরা দু-একজন স্টেশনমাস্টারের কাছে ছুটে গেলুম। ব্যাপার বুঝতে পেরে তিনি কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এলেন না। ফিরে এসে দেখি ভগিনী নিবেদিতা তাঁর স্বজাতি-দুটিকে বেশ তিক্ত মধুর ধমক দিচ্ছেন। ধমক খেয়ে সাহেবরা অবশেষে গাড়ির দরজা খুলে দিল। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীমতী বসু শেষমুহূর্তে কোনরকমে উঠে পড়লেন।

ট্রেন চলে গেলে দেখলুম নিবেদিতার প্রজ্জ্বলিত মূর্তি। কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারছেন না; সেই মুহূর্তেই ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে পারলে তবে যেন স্বস্তি পান। তাঁর সেই রাগ পড়তে-না-পড়তে আর-একটা ট্রেন এসে পড়ল। নিবেদিতাকে এই ট্রেনেই যেতে হবে পশ্চিমের দিকে। দুটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা—একটিতে একজন শ্বেতাঙ্গিনী, অন্যটিতে একটিমাত্র ভারতীয় পুরুষ। যে-কামরায় ইংরেজ মহিলা ছিলেন, আমরা নিবেদিতার মালপত্র সেই কামরায় তুলে দিতে গেলে তিনি বললেন: 'I am not going in there (আমি ওখানে যাচ্ছি না)।' অগত্যা অন্য কামরায় নিয়ে গেলুম। 'আমরা দরজা খুলে ঢুকতেই ভদ্রলোকটি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গড়গড়া সরিয়ে নিয়ে নিবেদিতার জন্য তাঁর নিজের জায়গা ছেড়ে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার সময় নিবেদিতা আমাদের সকলকে ডেকে বললেন: 'Now, you see the difference between the barbarous Englishmen and the civilized Indians (এখন বর্বর ইংরেজদের সঙ্গে সভ্য ভারতীয়দের পার্থক্যটা দেখ)।'

এরূপ মনোভাব থাকিলেও এদেশের বহু ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য-বাসীর সহিত তাঁহার অন্তরের সৌহার্দ্য ছিল। ইঁহাদের মধ্যে 'স্টেট্‌সম্যান'-সম্পাদক মিঃ কে. এস. র‍্যাটক্লিফ, 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদক মিঃ এ. জে. এফ. ব্লেয়ার, আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ই. বি. হ্যাভেল, মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজ প্রভৃতি তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন, এবং অনেকেই তাঁহার গৃহে প্রায় যাতায়াত করিতেন। অবশ্য প্রথম পরিচয়ে তাঁহার ভারত-প্রীতির উচ্ছ্বাস সকলকে বিস্মিত করিত। র‍্যাটক্লিফ 'স্টেট্‌সম্যানে'র কর্মচারিরূপে এদেশে আসার (১৯০২) কয়েক সপ্তাহ পরে, লাউডন স্ট্রীটে এক য়ুরোপীয় মহিলার গৃহে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। নিবেদিতাকে ইংরেজ সমাজে পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে গৃহকর্ত্রী ঐ দিন সন্ধ্যেবেলা চায়ের আসরে অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ভারতীয়গণের অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। নিবেদিতা ঐ

সম্মেলনে কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভারতীয় নারীর আদর্শের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তারপর শাসকজাতির সম্বন্ধে বলেন, তাহারা ভারতীয় রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রকৃত মূল্য না বুঝিয়া ঐগুলি ধ্বংস করিতে চায়, ইত্যাদি। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে আক্রমণ করিয়া এ ধরনের বক্তৃতা তিনি প্রায় দিতেন। নবাগত র‍্যাটক্লিফের জীবনে ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। স্বদেশ হইতে বহুদূরে এক প্রাচ্য-প্রতীচ্য সম্মেলনে ইংরেজকণ্ঠে ভারতীয় আদর্শ ও রীতিনীতির মহত্ত্ব এবং সৌন্দর্য ঘোষণা! আবার যে সকল ভারতীয় শুধু পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন নহেন, ভারতীয় জীবনযাত্রা ও আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাঁহাদেরই সম্মুখে! বলা বাহুল্য, চায়ের আসরের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, কিন্তু র‍্যাটক্লিফের উপর নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য বিষয় উভয়ই গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইলে ভারত-সম্বন্ধে র‍্যাটক্লিফের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নিবেদিতার সংস্পর্শে আসিবার পর পাশ্চাত্যবাসী অনেকেই ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছেন।

কাশী কংগ্রেস

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষে কাশীধামে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। নিবেদিতা এই প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন। সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। নিবেদিতার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ গোখলে বিশেষ মূল্যবান মনে করিতেন। প্রধানতঃ গোখলের অনুরোধে তিনি অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য ২৫শে ডিসেম্বর কাশী আগমন করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের পর স্বভাবতঃই কাশীর কংগ্রেসের গুরুত্ব ছিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নেতৃবর্গ আগমন করিয়াছিলেন। পঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ হইতে চরমপন্থী নরমপন্থী সমস্ত নেতারাই যোগ দিয়াছিলেন ; সুতরাং অনুমান করা যায়, কংগ্রেসের অধিবেশন এই বৎসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্যেই কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ ও চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয়। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির উপর যাঁহাদের অনাস্থা, তাঁহারাই চরমপন্থী বলিয়া অভিহিত হইলেন। অধিবেশনের পূর্ব হইতে এবং অধিবেশনকালেও উভয় দলের মধ্যে মতবিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। কংগ্রেসের সম্মুখে প্রবল সমস্যা—বাংলার বয়কট অর্থাৎ ব্রিটিশ-পণ্যদ্রব্য বর্জন কংগ্রেস সমর্থন ও গ্রহণ করিবে কি না। বিপিন পালের নেতৃত্বে চরম-পন্থিগণ পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করিতেই হইবে। নিবেদিতা কংগ্রেস অধিবেশনে কোন বক্তৃতা দিয়াছিলেন বলিয়া এতদিন জানা যায় নাই। সম্প্রতি শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন, '১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে তিনি ২২-সংখ্যক প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন ভারতের স্বাজাত্যবোধ কেবলমাত্র ভারতবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, ইংলণ্ডের পক্ষে এবং সমগ্র বিশ্বের পক্ষেও ইহার প্রয়োজন আছে। ইংলণ্ড সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে যাইয়া তাহার সভ্যতা সংস্কৃতির মূল কথা যে স্বাধীনতা তাহা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। ইওরোপ যুধ্যমান জাতিদের ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে যাইতেছে।' তিনি তিলভাণ্ডেশ্বরে অবস্থান করিতেন, এবং কলিকাতার ন্যায় এখানেও তাঁহার গৃহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের আগমন ও তুমুল

আলোচনা চলিত। যদিও দেশের স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেস এ পর্যন্ত কার্যকরী কোন প্রস্তাব অথবা উপায় গ্রহণ করে নাই, তথাপি নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, কংগ্রেস ক্রমেই দেশের জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। বস্তুতঃ কংগ্রেসই তখন ভারতবর্ষে একমাত্র রাজনৈতিক সংস্থা। বিশেষতঃ উহার মধ্যে চরমপন্থী দলের আবির্ভাব ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ। নিবেদিতা স্বয়ং রাজনৈতিক চরমপন্থী ; সুতরাং চরমপন্থিগণের সিদ্ধান্তে তাঁহার সম্মতি থাকিবার কথা। বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হইয়াছে, কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত হইলে তাহা সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা। এই সকল কারণে অধিবেশনের ফলাফল সম্বন্ধে নিবেদিতার ঔৎসুক্য ও উদ্বেগ কম ছিল না। সভাপতি শ্রীযুক্ত গোখলের জন্যও তাঁহার চিন্তা ছিল। তিনি নরমপন্থী এবং অত্যন্ত সাবধান। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অযথা আক্রোশ-প্রকাশ তাঁহার অভিমত নয় ; অথচ ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জনের অর্থ প্রকাশ্যে সরকারের বিরোধিতা। এমন প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে সহজে মত দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন। সরলা চৌধুরী (ঘোষাল) এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও লিখিয়াছেন, তিনি (গোখলে) সাবধানপন্থী, গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভাব রেখে কাজ করতে চান, গভর্নমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে চান না।' এই মন্তব্যের কারণ ছিল। সরলা দেবী 'বন্দে মাতরম্' গানটি ভাল গাহিতে পারিতেন। অধিবেশনে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া প্রতিনিধিগণ গোখলেকে অনুরোধ করিলেন, সরলা দেবী যেন সভায় ঐ গানটি করেন। গোখলে মহাবিপদে পড়িলেন, কারণ ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সভা-সমিতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কাশী অবশ্য বাংলাদেশের বাহিরে ; তাহা হইলেও নিষিদ্ধ সঙ্গীত গাহিয়া অনর্থক বিরুদ্ধতা প্রকাশ গোখলের অভিমত নয়। কিন্তু সমাগত প্রতিনিধিগণের দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না ; অগত্যা তিনি সরলা দেবীর নিকট ক্ষুদ্র অনুরোধ-লিপি পাঠাইলেন—সময় সংক্ষেপ, সরলা দেবী যেন দীর্ঘ গানটির সবটা না গাহিয়া কিছু অংশ বাদ দেন। অবশ্য সব গানটিই গাওয়া হইয়াছিল, এবং বলা বাহুল্য, শ্রোতৃবৃন্দও উহাতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

ফলতঃ স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া তখন এক প্রবল মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিপূর্বেই দেশের মধ্যে দলাদলি লক্ষ্য করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছিলেন। স্বাধীন দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও নানা মতবাদ কল্যাণকর, কিন্তু পরাধীন দেশে স্বাধীনতা-

সংগ্রামে যাঁহারা অগ্রদূত, তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি ও মতানৈক্য সমূহ ক্ষতিকর। জাতীয় মহাসভার মধ্য দিয়া যদি সমগ্র দেশ সমবেতভাবে একটি নীতি গ্রহণ করিয়া সরকারের বিরোধিতা করে, তাহা কার্যকরী হইবার সম্ভাবনা ছিল; অতএব দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে নিবেদিতার সংশয় ছিল না। আবার তাঁহার স্বভাবই ছিল এই যে, তিনি সুস্পষ্টভাবে ও জোরের সহিত নিজ মতামত প্রকাশ করিতেন। তাই তাঁহার গৃহে বিভিন্ন দলের এই সব যুক্তি, তর্ক ও আলোচনায় তিনি যে নীরব শ্রোতা ছিলেন না, তাহা বলা বাহুল্য। কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরে লিখিত 'ভারতের জাতীয় মহাসভা' প্রবন্ধ হইতে নিবেদিতার বক্তব্য অনুমান করা যায়। 'নব্য ভারত আজ য়ুরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক কার্যকলাপে মুগ্ধ। কেবল মুগ্ধ কেন, মোহাচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে। তাহার ধারণা, বিভিন্ন দলের হট্টগোলের স্থানরূপে পরিণত হইতে না পারিলে পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতার অন্তর্গত শক্তি ও উদ্যমের পরিচয় দেওয়া হইবে না। অন্ততঃ আমাদের মধ্যে পরস্পরকে অভিযুক্ত ও আক্রমণ করিবার যে দুর্নীতি দেখা দিয়াছে, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। একই দেশের অধিবাসিগণের আবাসে লড়াইএর অর্থ সময় ও যুদ্ধের উপকরণ নষ্ট করা। বস্তুতঃ আজিকার ভারত এখনো উপলব্ধি করে নাই যে, তাহার যে আন্দোলন, তাহা কোন দলীয় রাজনৈতিক প্রচেষ্টা মাত্র নয়, পরন্তু ইহা এক জাতীয় আন্দোলন। ভারতবর্ষে যাহারা প্রকৃত খাঁটী লোক, তাহাদের মধ্যে জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই। দেশের মধ্যে বহু কার্য বিপথে পরিচালিত হইতেছে, রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তাধারাও অসংবদ্ধ। ইহার কারণ ভারতীয় রাজনীতি অনেকাংশে অনুকরণপ্রবণ এবং মন্দ জিনিস অনুকরণের দিকেই তাহার ঝোঁক বেশী' (Civic and National Ideals, পৃঃ ৪৯)।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত অধিবেশনে চরমপন্থীগণের জয় হইল। লাজপত রায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রশংসা করিয়া উহাকে সমর্থন করিলেন, এবং নানা আপত্তি সত্ত্বেও বাংলার বয়কট বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত গোখলের উপর নিবেদিতার অত্যন্ত প্রভাব ছিল; অতএব এই প্রস্তাবে গোখলের বিরোধিতা না করার পশ্চাতে উহাই কার্য করিয়াছিল, বলিলে ভুল হইবে না। সকল পক্ষ হইতে মতানৈক্য পরিহার করিবার যে আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, তাহার উপর জোর দিয়া নিবেদিতা লিখিলেন, 'কংগ্রেস সম্বন্ধে পূর্বের সমস্ত ধারণা পরিহার করিয়া যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ ঘটনা দ্বারা বিচার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প এরূপ একজন প্রথম দর্শকের কাছে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের

ব্যাপার হইল চরম-দক্ষিণপন্থী হইতে চরম-বামপন্থী পর্যন্ত সকল সদস্যগণের মধ্যে মতের ঐক্য।' আরও লিখিলেন, 'কংগ্রেসের কাজ রাজনৈতিক অথবা দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করা নয়; কংগ্রেস হইতেছে জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক মাত্র।'

নিবেদিতা লিখিলেন, বর্তমানে কংগ্রেসের যথার্থ কাজ হইতেছে শিক্ষা-সংস্থারূপে সমগ্র দেশের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ সঞ্চার করা। যাহাতে জাতীয়তা-বোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, সেজন্য কংগ্রেসের সদস্যগণকে নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায় অভ্যস্ত করিতে হইবে। দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ ও কর্মতৎপর করিয়া তুলিতে হইবে, এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা ও মণিপুর হইতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট দেশের অধিবাসিগণের পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তার বোধ সমুজ্জ্বল করিতে হইবে। ইহাই কংগ্রেসের প্রকৃত কাজ। কংগ্রেসের নীতি ও কার্য সম্বন্ধে নিবেদিতার ঐ প্রবন্ধটি অতিশয় চিন্তাপূর্ণ ও মূল্যবান এবং বর্তমানেও প্রযোজ্য।

অধিবেশন শেষ হইয়া গেলেও নিবেদিতা কাশী রহিয়া গেলেন। স্বামিজীর আশীর্বাদ ও উৎসাহ লাভ করিয়া ইতিপূর্বে কাশীতে যে সেবাশ্রমটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ১৯০৩ খৃীষ্টাব্দে তাহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় নিবেদিতা ইংরেজীতে ইহার কার্যবিবরণী ও আবেদন-পত্র লিখিয়া দেন ও স্বয়ং বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সেবাশ্রমের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করেন।

বহুদিন হইতে তাঁহার রাজপুতানা ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। কাশী হইতে রওনা হইয়া তিনি প্রথমে সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপটি পরিদর্শন এবং পরে উজ্জয়িনী, চিতোর, আজমীর, অম্বর, আগ্রা প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। শুভ্র চন্দ্রালোকে চিতোর-দুর্গ দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হন। পদ্মিনীর কাহিনী তাঁহার চিত্তকে বিশেষরূপে অধিকার করে। ঐ উপাখ্যান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। সরলাবালা সরকার লিখিয়াছেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের নিকট নিবেদিতা এইরূপভাবে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিতেন, 'আমি পাহাড়ে উঠে পাথরের উপর হাঁটু গেড়ে বসলাম, চক্ষু মুদ্রিত করে পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করলাম।' বলিতে বলিতে তিনি যথার্থই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতজোড় করিয়া বসিলেন। নিবেদিতার তখনকার মুখের ভাব অপূর্ব। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'অনলকুণ্ডের সামনে পদ্মিনীদেবী হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছেন। আমি চোখ বুজে পদ্মিনীর শেষ চিন্তা মনে আনতে চেষ্টা করলাম। আঃ. কি সুন্দর! কি সুন্দর!' বলিতে বলিতে ভাবাবেশে মুগ্ধা হইয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। তিনি যে স্কুলঘরে ছাত্রীদের ইতিহাস-পাঠ দিতেছেন, তাহা

আর মনে নাই, পদ্মিনীর শেষচিন্তায় সেই মুহূর্তে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'চিতোর' নামক প্রবন্ধটি প্রমাণ করে তাঁহার কল্পনা ও অনুভব শক্তি কত প্রবল ছিল।

ভ্রমণান্তে পুনরায় তিনি কাশী আগমন করেন। এই সময় মিসেস অ্যানী বেশান্তের সহিত তাঁহার প্রায় সাক্ষাৎ এবং নানা আলোচনা হইত। এইবার কাশীতে তিনি সর্বশুদ্ধ তিনটি বক্তৃতা দেন। ২১শে জানুয়ারী (১৯০৬), ৪ঠা মাঘ, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে বিশেষ পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ন বেলা ৫টায় টাউন হলে স্বামিজীর স্মৃতিসভায় নিবেদিতা তাঁহার অপূর্ব ভাষায় 'হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ' এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ভিতরে স্থানাভাববশতঃ অনেককে বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। ২২শে জানুয়ারী তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ নিবেদিতার নিকট দুইটি শোক বহন করিয়া আনিল। স্বামী স্বরূপানন্দ ও গোপালের মা এই বৎসর পরলোক গমন করেন। মায়াবতীর ক্রমবর্ধমান কার্যের জন্য অধিকতর উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধানে স্বামী স্বরূপানন্দ নৈনীতাল গমন করেন, এবং সেখানেই সহসা নিউমোনিয়া রোগে ২৭শে জুন দেহত্যাগ করেন। স্বামী স্বরূপানন্দের সাহায্য নিবেদিতা কখনো বিস্মৃত হন নাই। তিনিও বরাবর প্রবুদ্ধভারত পরিচালনার কার্যে স্বামী স্বরূপানন্দকে সাহায্য করিয়াছেন। স্বামিজীকে কেন্দ্র করিয়াই উভয়ের পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। স্বরূপানন্দের আকস্মিক তিরোধান তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল।

গোপালের মা

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে সুপরিচিতা গোপালের মা নিবেদিতার জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ইঁহার সহিত নিবেদিতার প্রথম পরিচয় এবং উভয়ের মধ্যে স্নেহভালবাসার সম্পর্ক পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গোপালের মার দীর্ঘকাল তন্ময়ভাবে জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ এবং নানাবিধ দিব্যদর্শন উভয়ই বিস্ময়কর। এক নিতান্ত সরলা এবং লৌকিক বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা পল্লী-রমণীর পক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চতর সোপানে আরোহণ প্রমাণ করে যে, ধর্ম অন্তরের অনুভূতির জিনিস। স্বামিজীর নিকট গোপালের মার কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিবেদিতা, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, একরাত্রে (১৮৯৮) তাঁহারা তিনজনে বাগবাজার হইতে নৌকা করিয়া কামারহাটি যাত্রা করেন। সেদিন চন্দ্রালোকে গঙ্গাবক্ষে এক অপূর্ব শোভা! নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিলে তাঁহারা দীর্ঘ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এক পার্শ্বে বারান্দার প্রান্তে গোপালের মার ক্ষুদ্র কক্ষ। আসবাবপত্রের কোন বালাই নাই। পাশ্চাত্য মহিলারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—গোপালের মার আনন্দের সীমা রহিল না। কী করিয়া তিনি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবেন! অতিথিদের বসিতে দিবার জন্য একখানি মাদুরই সম্বল। তাকের উপর হইতে উহা নামাইয়া পাতিয়া দিলেন এবং শিকা হইতে পাড়িয়া মুড়ি ও বাতাসা খাইতে দিলেন। কুলুঙ্গীতে একখানি অতি পুরাতন রামায়ণ, তাঁহার জীর্ণ চশমা ও হরিনামের ঝুলি। শুভ্র চন্দ্রালোক, নানাবিধ বৃক্ষ ও পুষ্পশোভিত উদ্যান, তাহার মধ্যে গোপালের মার এই শান্ত-নীরব ক্ষুদ্র কক্ষটি যেন অন্য জগতের বার্তা বহন করিতেছিল। তাঁহার জগৎ কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ছিল না। যুক্তি ও তর্কের অতীত তাঁহার দিব্য অলৌকিক দর্শনের কাহিনী জ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দকেও বিচলিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ গোপালের মাকে দর্শন করিয়া আসিলে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 'আহা, তোমরা প্রাচীন ভারতকে দেখে এসেছ। উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপবাস ও রাত্রিজাগরণ—সে ভারত বিদায় নিচ্ছে।'

শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিয়াছেন (উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩১৩), গোপালের মার বাড়িতে এই নৈশ অভিযানে 'সম্ভবতঃ' নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন না।

প্রমাণস্বরূপ নিবেদিতার দুইখানি পত্র হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে মিসেস বুল, ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা একত্র গিয়াছিলেন। গোপালের মার আতিথ্য ও মুড়ি প্রভৃতি খাইতে দেওয়ায় নিবেদিতার বর্ণনার সহিত মিল আছে। আমাদের মনে হয়, নিবেদিতার পত্রে ম্যাকলাউড ও মিসেস বুলের গোপালের মার বাড়িতে যাওয়ার বিষয় যে উল্লেখ আছে তাহা অন্য কোন দিনের।

গোপালের মার প্রতি নিবেদিতা একপ্রকার আকর্ষণ অনুভব করিতেন। সুযোগ ও সময় পাইলেই তিনি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর হইয়া কামারহাটি যাইতেন। গোপালের মা অসুস্থতা ও বার্ধক্যহেতু অশক্ত হইয়া পড়িলে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়ি লইয়া আসেন। তখন পর্যন্ত শ্রীমার কলিকাতায় বাসের কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হয় নাই ; সাময়িকভাবে তাঁহার জন্যে বাড়ি ভাড়া করা হইত। সুতরাং নিবেদিতা যখন প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার বাড়িতে একখানি পৃথক ঘরে গোপালের মা বাস করিতে পারেন, এবং তিনি দেখাশুনার ভার লইবেন, তখন স্বভাবতঃই স্বামী সারদানন্দ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। ডিসেম্বর মাসের (১৯০৩) গোড়ার দিকে গোপালের মা নিবেদিতার নিকট আগমন করেন। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দিষ্ট হইল। একজন ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার পরিচর্যা করিতেন—নাম কুসুম। নিবেদিতা আনন্দে অধীর। ম্যাকলাউডকে প্রতি পত্রে গোপালের মার কথা লিখিতেন—'গোপালের মা এখানে আছেন, আমার যে কী আনন্দ! স্বামী সারদানন্দ বলছেন, তিনি (গোপালের মা) আমাদের কাছেই বরাবর থাকবেন—আমাদের আদরের ছোট্ট ঠাকুরমা।' গোপালের মা একজন উচ্চস্তরের সাধিকা ; তাঁহার আগমনে নিবেদিতার গৃহ পবিত্র, এবং সেবার অধিকার লাভ করিয়া তিনি স্বয়ং ধন্য।

১৭নং বোসপাড়া লেনে গোপালের মা দীর্ঘ আড়াই বৎসর অতিবাহিত করেন। প্রতিদিন অসংখ্য কাজের মধ্যেও নিবেদিতা গোপালের মার সংবাদ লইতে এবং তাঁহার নিকট একবার বসিতে ভুলিতেন না। উভয়ের মধ্যে এক গভীর, স্নেহ-মধুর সম্পর্ক ছিল। নিবেদিতা অসুস্থ হইলে গোপালের মার কী গভীর উদ্বেগ! গোপালের মা যখন একেবারে শয্যাশায়ী, তখন সময় পাইলেই নিবেদিতা তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিতেন। তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, আস্তে আস্তে হাত-পা টিপিয়া দিতেন। সেই মুহূর্তে নিবেদিতা যেন অন্য কেহ। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, কর্মক্ষমতা সব দূরে সরিয়া যাইত, এবং অন্তরের অন্তস্তলে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা লাভের

রোগশয্যায় গোপালের মা ও পার্শ্বে উপবিষ্টা ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা

এক গভীর ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিত। গোপালের মার সবটুকু গোপালময়—তিনি নিজেই গোপাল হইয়া গিয়াছেন!

ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। শ্রীমা একদিন আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া গেলেন। ১৯০৬ সালের জুলাই মাস চলিতেছে—গোপালের মার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। নিবেদিতা স্বয়ং পুষ্প, চন্দন ও মাল্য দ্বারা তাঁহার শয্যা সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিলেন। খোল-করতালের সহিত কীর্তন গাহিয়া তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। অনাবৃত-পদে ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে নিবেদিতা সঙ্গে চলিলেন। তীরস্থ করিবার পর গোপালের মা যে দুই দিন জীবিত ছিলেন, নিবেদিতা গঙ্গাতীরেই যাপন করেন। তাঁহার শিয়রে বসিয়া অপলকদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। গঙ্গার মৃদু পবন ও শুভ্র চন্দ্রালোকে মনে হইল যেন বৃদ্ধার জীবন-প্রদীপ ক্ষণকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে দুই রাত্রি কাটিয়া গেল—তাঁহার অন্তরে পূর্ণ জ্ঞান ও শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই জগতে তাঁহার কোন প্রত্যাশা ছিল না, তাই মুখমণ্ডল শান্ত, নিরুদ্বেগ। মধ্যরাত্রে জলোচ্ছ্বাসের অস্ফুট শব্দ শোনা গেল—ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলির মধ্যে পরস্পর ঠোকাঠুকির শব্দ হইতে লাগিল। বোঝা গেল জোয়ার আসিয়াছে। নিবেদিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, মৃত্যুপথ-যাত্রী, একাধারে তাঁহার বন্ধু, গুরু, অতি প্রিয়, এবার তাঁহাকে শেষ বিদায় দিতে হইবে। গোপালের মাকে খাট হইতে তুলিয়া যখন গঙ্গাগর্ভে অর্ধনিমজ্জিত করা হইল, ততক্ষণে পূর্ণ জোয়ার আসিয়া গিয়াছে, ভাগীরথী দুইকূল প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছেন। সমবেত কণ্ঠে 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' ধ্বনির মধ্যে গোপালের মা শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন ব্রাহ্ম মুহূর্ত, গোপালের মা অনন্তলোকে চলিয়া গেলেন, জীর্ণবস্ত্রের মত তাঁহার শরীর পড়িয়া রহিল। একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী তাঁহার শেষকৃত্য করিলেন।

শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নিবেদিতা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ৮ই জুলাই গোপালের মা দেহত্যাগ করেন। দশম দিনে তাঁহার স্মরণার্থে নিবেদিতা স্বগৃহে উৎসবের আয়োজন করিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বৃহৎ চিত্র পত্রপুষ্পে সজ্জিত করিয়া সভামণ্ডপে রাখা হইল; তাহার পার্শ্বে গোপালের মার ক্ষুদ্র ফটো। কীর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিবেদিতার আমন্ত্রণে পল্লীর বহু মহিলা আগমন করেন। কীর্তনান্তে সকলকে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হইল। নিবেদিতার যত্নে ও আতিথ্যে সকলেই পরিতৃপ্ত।

গোপালের মার জপের মালাটি নিবেদিতা অতি যত্নে নিজের কাছে রাখিয়া দেন।

দিনগুলি গভীর নিরানন্দে কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জুলাই মাসের মাঝামাঝি খবর আসিল, পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে বেলুড় মঠ হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে সেই অঞ্চলে প্রেরণ করা হইল। যতই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বিবরণ আসিতে লাগিল, নিবেদিতা ততই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি ছিলেন মূর্তিমতী করুণা। যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি প্লেগের কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই বিন্দুমাত্র নিজের জন্য চিন্তা না করিয়া তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া সেপ্টেম্বরের প্রথমেই পূর্ববঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বেই যাঁহারা সেবাকার্যে আসিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাঁহাদের সহিত নৌকায় করিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সাহায্য দিতেন। স্বামিজী তাঁহাকে একবার বলিয়াছিলেন, 'আমরা যেন প্রত্যেকের সঙ্গে তার নিজের ভাষায় কথা বলতে পারি।' নিবেদিতা এই উপদেশ কী সুন্দরভাবে মনে রাখিয়াছিলেন! এই সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গকে কেবল ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে, কৃষক-রমণীগণের সহিত আলাপের সময় তাহাদের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও ঘর-সংসারের কথা তিনি এত গভীর মনোযোগ দিয়া শুনিতেন যে, তাহারা মনে করিত নিবেদিতা যেন তাহাদেরই একজন। তিনি যে তাহাদের প্রকৃত দরদী ও হিতৈষিণী, একমুহূর্তের জন্য এ বিষয়ে তাহাদের সংশয় ছিল না। আজ দেশের অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশের যে-কোন দুঃখ-দুর্দশায় বহু নারী সভা-সমিতি গঠন করিয়া সেবাকার্যে অগ্রসর হন। সত্যই আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে নিবেদিতা কোন নারীকে সহকর্মিরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। অবশ্য তাহার জন্য দায়ী তৎকালীন সামাজিক অবস্থা। বলিবার উদ্দেশ্য—নিবেদিতার সাহস ও হৃদয়বত্তা ; দেশের যে-কোন বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য তিনি সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন, কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেন না। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ দৃশ্য নিবেদিতার কোমল প্রাণে কী গভীর আঘাত দিয়াছিল, তাঁহার 'Famine and Flood' নামক প্রবন্ধগুলিই তাহার প্রমাণ। বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করিবার কালে দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারগুলির মহত্ত্বও তিনি অনুভব করিয়াছেন। এক পল্লীতে রমণীগণ তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য নদীর তীর পর্যন্ত আসিয়াছিল। নৌকা ছাড়িয়া

দিলে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া নিবেদিতা দেখিলেন, তাহারা প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে। নিজেদের দুঃখ এবং দুর্দশার অন্ত নাই; তথাপি, নিবেদিতা বুঝিলেন, নীরবে তাহারা অন্তরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছে, 'তোমাদের শান্তি হউক।' নিবেদিতার চক্ষু অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

শরীরের উপর এত অত্যাচার সহ্য হইল না। পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বহুদিন শয্যাশায়ী রহিলেন। পূর্ব বৎসর ব্রেন ফিভারে এবং এই বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার এই অসুখে কৃস্টীন প্রাণপণ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। বসু দম্পতীও যথেষ্ট দেখাশুনা করিতেন। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ নিয়মিত খবর লইতেন ও দেখিয়া যাইতেন। আরোগ্যলাভের পর তিনি ও কৃস্টীন আনন্দমোহন বসুর দমদমে অবস্থিত 'ফেয়ারী হল' নামক উদ্যানবাটীতে কয়েক মাস অবস্থান করেন; সাময়িকভাবে বিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, কর্মক্ষমতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সুস্থ হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে লেখার কার্য আরম্ভ করেন। লংম্যানস্ কোম্পানী তাঁহার পুস্তক প্রকাশে সম্মত হওয়ায় তিনি যত শীঘ্র সম্ভব 'Cradle Tales of Hinduism' শেষ করিতে মনোনিবেশ করেন। ঐ পুস্তক রচনায় তিনি যোগীন মার নিকট বহু সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন এবং পুস্তকের ভূমিকায় তাহা উল্লেখও করিয়াছেন। স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পর তিনি প্রবুদ্ধভারতের সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিবার ভার গ্রহণ করেন, এবং 'Occasional Notes' প্রতিমাসে নিয়মিত বাহির হইতেছিল। 'The Master as I Saw Him' লেখাও আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বৎসরের প্রথম হইতে 'The Master as I Saw Him' ও 'Cradle Tales of Hinduism' এই দুইখানি পুস্তকের সহিত প্রবুদ্ধভারতে প্রতিমাসে 'Occasional Notes' ও অন্যান্য প্রবন্ধ লেখা চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত বসুর 'Comparative Electro-Physiology' পুস্তক রচনাতেও তাঁহার সাহায্য ছিল। মাত্র দশমাসের মধ্যে এই পুস্তকের চল্লিশটি অধ্যায় লেখা হয়। আবার এই সময়েই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের সমগ্র ইংরেজী অনুবাদ পড়িতে আরম্ভ করেন। 'Myths of the Hindus and Buddhists' নাম দিয়া একখানি পুস্তক রচনার তাঁহার পরিকল্পনা ছিল। বাস্তবিক কী অদ্ভুত পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল!

শরীর সুস্থ হইলেও তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই ; কারণ শহর হইতে দূরে এই নির্জন পরিবেশে লিখিবার সুযোগ অধিক ছিল।

১৯০৭ খৃীষ্টাব্দের প্রথমে মিসেস সেভিয়ার কলিকাতায় আসেন এবং নিবেদিতা ও কৃস্টীনের সহিত দমদমে কয়েকদিন অবস্থান করেন। স্বামী স্বরূপানন্দ-কৃত গীতার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মিসেস সেভিয়ার ও নিবেদিতা উহার প্রুফ দেখিতেন। মিসেস সেভিয়ারের অনুরোধে এবার গ্রীষ্মাবকাশে নিবেদিতা ও কৃস্টীন পুনরায় মায়াবতী গমন করেন। সঙ্গে বসু দম্পতীও ছিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পর মায়াবতীর অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী বিমলানন্দ সহকর্মী। অতিথিগণকে সকল প্রকারে আরামে রাখিতে স্বামী বিরজানন্দের চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি ছিল না। স্বামী স্বরূপানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী (Complete Works) প্রকাশের ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন। স্বামী বিরজানন্দ উহার প্রথম ভাগ মুদ্রিত করিবার কার্যে ব্যস্ত। তাঁহার ও নিবেদিতার মধ্যে আলোচনার ফলে স্থির হইল, নিবেদিতা উহার ভূমিকা লিখিয়া দিবেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরদিনই তিনি ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহার বিখ্যাত রচনা 'Our Master and His Message' (আমাদের আচার্যদেব ও তাঁহার বাণী) লেখেন।

পর পর দুই বৎসর গুরুতর পীড়িত হওয়ায় চিকিৎসকগণ ও পাশ্চাত্য হইতে নিবেদিতার বন্ধুগণ ক্রমাগত তাঁহাকে পাশ্চাত্যে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। তিনি নিজেও বহুবার স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য বাহিরে যাইবার কথা চিন্তা করিতেন। পুনরায় বক্তৃতাদি দ্বারা কিছু অর্থসংগ্রহেরও প্রয়োজন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, তিনি বেশীদিন বাঁচিবেন না। তাঁহার পত্রের মধ্যে বার বার এ বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃস্টীন অর্থাভাবে বিদ্যালয়-পরিচালনায় কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করেন, সেজন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। তথাপি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার চিন্তায় তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেন। মিসেস বুল ইতিপূর্বেই যাত্রার ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মনস্থির করিতে পারিতেছিলেন না। একাধিকবার বন্ধুগণের অনুরোধে ও প্রয়োজনে পাশ্চাত্যগমনের সংকল্প করিয়া পরে আবার লিখিয়াছেন, তিনি সুস্থবোধ করিতেছেন, সুতরাং এখন আর যাইবেন না। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার একান্ত প্রার্থনা, আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতবর্ষেই

অবস্থান করিতে পারি। অর্থাভাবে বা কোন ব্যক্তিগত কারণে আমাকে যেন এদেশ পরিত্যাগ করিতে না হয়।

তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। কারণ দেশে ইতিমধ্যে সরকারের দমন-নীতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ১৯০৬ এর ১৪ই এপ্রিল বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্সে উগ্র দমননীতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাহারই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল চরমপন্থিগণের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও বিপ্লবিগণের গুপ্তহত্যা-প্রচেষ্টায়। বরিশাল কনফারেন্স পণ্ড হইবার পর সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলিকাতায় বহু প্রতিবাদ-সভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাদি হয়। জুন মাসে লোকমান্য তিলকের উপস্থিতিতে 'শিবাজী-উৎসব' এবং স্বদেশী মেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ; অতএব আন্দোলন বৃদ্ধির দিকে। প্রকাশ্য আন্দোলনের অন্তরালে বিপ্লববহ্নিও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই বৎসরেই ছোটলাট ফুলারকে গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। চারিদিকে দারুণ উত্তেজনার মধ্যে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনেও বহু বাদ-প্রতিবাদের পর স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট প্রভৃতি সমর্থিত হয় ; উপরন্তু সভাপতি দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেসের আদর্শ 'স্বরাজ', এই কথা ঘোষণা করেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না। মার্চ ও এপ্রিলে কুমিল্লা ও জামালপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগিয়া গেল। দমননীতির সহিত সরকার ভেদনীতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯ই মে লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহ বিনা বিচারে নির্বাসনে প্রেরিত হইলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র নিবেদিতা তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন, 'সরকার কি উন্মাদ?' জুলাই মাসের প্রথমে হঠাৎ সংবাদ আসিল. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ধৃত হইয়াছেন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা এবং যুগান্তর পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার প্রতি নিবেদিতার সাতিশয় স্নেহ ছিল ; অতএব সংবাদ পাইয়াই তিনি ছুটিলেন তাঁহার জন্য জামিনের ব্যবস্থা করিতে। তিনি নিজে দশ হাজার টাকার জামিন দিতে চাহিয়াছিলেন। বিচারে ভূপেন্দ্র-নাথ দত্তের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যুগান্তর পত্রিকায় রাজদ্রোহ-মূলক প্রবন্ধ-প্রকাশ। স্বামিজীর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর নিকট নিবেদিতার পূর্ব হইতেই যাতায়াত ছিল। এই ঘটনার পর তিনি বৃদ্ধাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেন। জেল হইতে বাহির হইয়া ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমেরিকায় গমন করিয়া সেখানেই বহু বৎসর বাস করেন।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে যখন ভারতের চিন্তায় তিনি দিবারাত্র নিমগ্ন, তখন তাঁহার ভারতে থাকা অত্যাবশ্যক হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা

করিয়া বন্ধুগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ তাঁহার নিজের পক্ষেও উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। বিশেষতঃ ডক্টর বসু ও তাঁহার সহধর্মিণীর এই সময় বিদেশযাত্রার প্রস্তুতি চলিতেছিল। তাঁহারা নিবেদিতাকেও যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের এবং অপর হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি অবশেষে ভারতের বাহিরে যাইতে সম্মত হইলেন। শ্রীযুক্ত বসুর 'Plant Response' পুস্তকখানি বিজ্ঞান-জগতে সাড়া আনিয়াছিল। তাঁহার 'Comparative Electro-Physiology' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি হইতে আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। পুস্তক দুইখানিতে চিত্রসহ নূতন আবিষ্কারসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা থাকিলেও ব্যাবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শন ব্যতীত বিজ্ঞানক্ষেত্রে উহাদের গৃহীত হওয়ার বাধা ছিল। ভারত সরকার বাধ্য হইলেন শ্রীযুক্ত বসুকে ইংলন্ড ও আমেরিকায় পাঠাইতে। ইহাই তাঁহার তৃতীয় বিজ্ঞান-অভিযান। তাঁহার বিদেশযাত্রায় অনেক বিলম্ব হইল। কারণ যদিও ফার্লো পাওনা হইয়াছিল, সরকার তাহা মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত। ইহা লইয়া বিস্তর লেখালেখির পর সরকার রাজী হইলেন। এই সব ব্যাপারে নিবেদিতাই উৎসাহী হইয়া চিঠিপত্র লিখিয়া দিতেন।

নিবেদিতার এই সময়ে ভারতবর্ষের বাহিরে যাওয়া সম্বন্ধে কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ভূপেন দত্তের মোকদ্দমায় জামিন হইবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইবার পরেই তাঁহার গ্রেপ্তারের আয়োজন চলিতে থাকে, কিন্তু গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য তাঁহাকে কারাগারের বাহিরে রাখা প্রয়োজনবোধে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ভারতের বাহিরে যাইতে বাধ্য করেন। একথা সত্য নহে। ভূপেন দত্ত লিখিয়াছেন, তাঁহার জন্য জামিন হইতে চাওয়ায় নিবেদিতাকে তদানীন্তন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় 'স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক' (a traitor to her race) বলা হয়। ঐ সম্পর্কে কারাগারে যাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন নাই। ২৪শে জুলাই ভূপেন দত্ত ধৃত হন; তাহার বহুপূর্বে ৪ঠা এপ্রিলের পত্রে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন, সম্ভবতঃ আগস্ট মাসে তিনি পশ্চিম যাত্রা করিতে পারিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে, তাঁহার পাশ্চাত্যগমনের কথা বহুদিন ধরিয়া চলিতেছিল। বন্ধুগণের নিকট ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ এবং ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতিতে বিপ্লবাত্মক ভাব প্রচার করিলেও তিনি কোনদিন প্রকাশ্যে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা অথবা বিদ্রোহমূলক আচরণ করেন নাই, যাহার জন্য তাঁহার গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থাকিতে পারে। তবে সরকার তাঁহাকে সন্দেহের

চক্ষে দেখিতেন, এবং দেশের তদানীন্তন অবস্থা এরূপে ছিল যে, কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ ঘটিলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইত। সেরূপ কারণ তাঁহার পক্ষে সর্বদাই বর্তমান ছিল, তাঁহার পাশ্চাত্য গমনের পূর্বে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও। সুতরাং উহার জন্য তাঁহার ভারত ত্যাগ করিবার প্রয়োজন ছিল না। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য তিনি অবশেষে ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে সম্মত হন, কথাটির আদৌ ভিত্তি নাই। পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে তাঁহার কার্য যে ইহা প্রমাণ করে না, তাহা যথাসময়ে আলোচনা করা হইবে।

মণি বাগচি লিখিয়াছেন, 'পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এইবার গিয়া পড়িল নিবেদিতার উপর। গ্রেপ্তার অথবা নির্বাসন—যে-কোন মুহূর্তে সম্ভব। গভর্নমেণ্টের নিকট নিবেদিতার কার্যকলাপ কিছুই অবিদিত ছিল না' ইত্যাদি (নিবেদিতা, পৃঃ ২৩৭), কিন্তু ঐ পুস্তকের অন্যত্র (পৃঃ ২৬১) তিনি লিখিতেছেনঃ অরবিন্দ একদিন নিবেদিতাকে বলিলেন—"গ্রেপ্তার আপনাকেও তো করিতে পারে?"

নিবেদিতা হাসিয়া বলিলেন—"গায়ের চামড়ার রঙটাই যে ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইরিশ বিপ্লবের কোলে মানুষ হইয়াছি—কারাগার বা নির্বাসনে আমার ভয় আছে মনে করেন? এই যে কলেজ স্ট্রীটে আপনার এই বাসায় কত লোক আসিতে ভয় পায়, আর আমি কেমন স্বচ্ছন্দে দুইবেলা আসিতেছি যাইতেছি—পুলিশ কি দেখিতে পায় না মনে করেন?"

অরবিন্দ। "নিশ্চয়ই দেখিতে পায় আর সেই সঙ্গে তাহারা ইহাও দেখিতে পায় যে, আপনি একজন মেমসাহেব, এ্যানার্কিস্ট নহেন।"

মেমসাহেব বলিয়া যদি এখন পুলিশের হাত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন, তবে ইহার পূর্বেই গ্রেপ্তার বা নির্বাসনের ভয়ে তাঁহাকে ভারতের বাহিরে যাইতে তাঁহার বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন কেন? সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, তাঁহার পাশ্চাত্য গমন সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক।

যাত্রার সময় আসিয়া গেল। প্রবুদ্ধ ভারত ও মডার্ন রিভিউএর জন্য কয়েক মাসের মত লেখার ব্যবস্থা নিবেদিতা পূর্বেই করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী, পরিচিত সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে গেলেন। বিদ্যালয়ের ভার ক্রিস্টীন গ্রহণ করিলেন। নিবেদিতার অসুস্থতার পর বহুদিন ধরিয়া বিবাহিতা ছাত্রীগণের জন্য ক্লাস বন্ধ ছিল। ১২ই আগস্ট নিবেদিতা কলিকাতা হইতে রওনা হইলেন। বোম্বাই হইতে ১৫ই আগস্ট জাহাজ ছাড়িল।

জাহাজে বসিয়াও 'The Master as I Saw Him' ও অন্যান্য লেখা চলিতেছিল। কয়েকদিন ধরিয়া বেশ ঝড়বৃষ্টি দেখা গেল। এডেন পৌঁছিয়া তিনি কৃস্টীনের পত্র পাইলেন। কৃস্টীন লিখিয়াছেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ যথারীতি আসিতেছে, বিবাহিতা ছাত্রীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুধীরা প্রভৃতি সকলেই নিয়মিত ক্লাস লইতেছেন, ইত্যাদি। নিবেদিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পাশ্চাত্যে দুই বৎসর

য়ুরোপ হইয়া সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিবেদিতা ইংলণ্ড পেঁাছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মাতা ও ভাই-ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ। মেরীর বিস্ময়ের সীমা নাই। তাঁহার শিশুকন্যা মার্গট পিতার ভবিষদ্‌বাণী সফল করিয়াছে। তাহার জীবন এক বিরাট মহৎ কার্যে উৎসর্গীকৃত, ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার চালচলন, কথাবার্তা, চিন্তাধারা সমস্তই পৃথক। মেরী সবিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। ভারতের যে আধ্যাত্মিক জীবন নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহার আস্বাদ প্রিয়জনকে দিবার জন্য তাঁহার কী আগ্রহ! কত জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন আত্মীয় এবং বন্ধুগণের জন্য—মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপদানী, নানা রকমের মালা, কবচ, পাথরের নুড়ি, ছোট ছোট বেতের বাক্স, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার ক্ষুদ্র পট। জিনিসগুলি তুচ্ছ, কিন্তু নিবেদিতার নিকট তাহাদের সৌন্দর্য কম নহে। বোতলে করিয়া আনিয়াছেন গঙ্গাজল। একদিন গোপালের মার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিয়া নিবেদিতা যখন তাঁহার নিকট রক্ষিত মালাটি মাতাকে স্পর্শ করিতে দিলেন, তিনি অভিভূত হইলেন। কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় সুদূর ভারতবর্ষ! কিন্তু নিবেদিতা উভয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট ভারতবর্ষ যেন কত পরিচিত, কত প্রিয়।

ইংলণ্ড হইতে পুনরায় য়ুরোপ যাত্রা করিয়া ভিসবাডেনে নিবেদিতা শ্রীযুক্ত বসু ও অবলা বসুর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা সেপ্টেম্বরের প্রথমে রওনা হইয়াছিলেন। মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের সহিতও এখানে সাক্ষাৎ হইল। স্বামিজীর দেহত্যাগের পর এই প্রথম নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড মিলিত হইলেন। সেই মুহূর্তে অতীতের কত স্মৃতি তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল! নানা প্রসঙ্গে উভয়ে তন্ময় হইয়া গেলেন। য়ুরোপে স্বামিজীর সহিত শেষ সাক্ষাতের দৃশ্য নিবেদিতার বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল, কারণ এই স্থানান্তরে গমনাগমনের মধ্যেও তাঁহার 'The Master as I Saw Him' লেখা চলিতেছিল। অক্টোবর মাসে ইংলণ্ড আগমন করিয়া নিবেদিতা সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত বসুর সহিত ক্ল্যাপহামে মাতার নিকট অবস্থান করেন। মিসেস বুল আসিলেন আমেরিকা হইতে। শ্রীযুক্ত বসুর বৈজ্ঞানিক অভিযান যাহাতে সার্থক

হয়, সেজন্য তাঁহার সাহায্যের অন্ত ছিল না। ইতিমধ্যে লংম্যানস্ কর্তৃক নিবেদিতার 'Cradle Tales of Hinduism' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। 'The Web of Indian Life' ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, সুতরাং পরিচিত মহলে নূতন পুস্তকখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইয়া গেল ; ৩১শে ডিসেম্বর নিবেদিতা ডায়েরীতে লিখিলেন, 'অপূর্ব বর্ষ, দমদমে আরম্ভ—লণ্ডনে শেষ। দুইখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে—Comparative Electro-Physiology ও Cradle Tales of Hinduism. অন্যান্য বইএর কাজ চলিতেছে—মডার্ন রিভিউ ও প্রবুদ্ধ ভারত—আহা, ধন্য এ বৎসরটি। মা! মা! মা! স্বামিজী গ্রহণ করুন।'

নূতন বৎসরের প্রথম হইতে নিবেদিতা পুনরায় পরিচিত মহলে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এবারকার বক্তৃতার বিষয় প্রধানতঃ বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত। ক্যাক্সটন হলে রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। ইহা ব্যতীত লিক্রেম ক্লাব, হাইয়ার থট সেণ্টার ও ফেবিয়ান সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব' ও ২৯শে মার্চ 'স্বামিজীর জীবন ও কর্ম' বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডের বেদান্ত সমিতিটিকে পুনরায় চালু করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্যেও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সেবা। তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ভারত, ইহা তাঁহার সহিত পরিচয়ের কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে কেহ বুঝিতে পারিত। শ্রীযুক্ত গোখলে, রমেশ দত্ত ও আনন্দ কুমারস্বামী এই সময়ে ইংলণ্ডে আগমন করেন। পরিচিত এবং প্রিয় ভারতীয়গণের সাহচর্যলাভে নিবেদিতা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে রাজনীতিচর্চা এবং কুমারস্বামীর সহিত রামায়ণ, মহাভারত পাঠ ও আলোচনা সমভাবে চলিত। কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ই. বি. হ্যাভেল ইংলণ্ডে অবস্থান করায় তাঁহার সহিত ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা ব্যতীত বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দ্বারা নিবেদিতা তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

গুণী ব্যক্তিমাত্রেই নিবেদিতার সংস্পর্শে আসিয়া মুগ্ধ হইতেন। অধ্যাপক গেডিজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ টি. কে. চেইন এবং বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ নেভিনসন প্রায় তাঁহার ও শ্রীযুক্ত বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ইহা ব্যতীত বহু পত্রিকার সম্পাদকের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা

ছিল। ইঁহাদের মধ্যে 'রিভিউ অব রিভিউজ'-সম্পাদক মিঃ উইলিয়াম স্টেড ও লন্ডনের 'দি কামিং ডে'র সম্পাদক মিঃ জন পেজ হপের নাম উল্লেখযোগ্য। মিঃ র‍্যাটক্লিফ এবং মিঃ ব্রেয়ারও এই সময়ে ইংলন্ডে ছিলেন। ইঁহারা সকলেই নিবেদিতাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, এবং ভারতীয় আদর্শের প্রতি তাঁহাদের উদার ও সশ্রদ্ধ মনোভাবের মূলে ছিল নিবেদিতার প্রভাব।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের অনুকূলে ইংলন্ডের জনমত-সংগঠন প্রয়োজন, কিন্তু ঐ কার্য তাঁহার জন্য নয়। এখন ঘটনাচক্রে ইংলন্ডে ভারতীয় স্বার্থের প্রতি ব্রিটিশ নরনারীকে আকৃষ্ট করাই হইল তাঁহার অন্যতম প্রধান কার্য। বস্তুতঃ ভারতের স্বাধীনতা-লাভের চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। জার্মানীতে সেণ্ট মাইকেলের সম্মুখে বাতি জ্বালিয়া দিয়া তিনি বহুক্ষণ নীরবে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষ যেন স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার আন্দোলন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ তিনি অনুসন্ধান করিতেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পত্রিকায় 'ভারতীয় আদর্শ', 'ভারতীয় সমস্যা', 'ভারতীয় নারী' প্রভৃতি নিবেদিতার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। শাসকবর্গ এবং মিশনরীকুল কর্তৃক প্রচারিত 'অনগ্রসর, বর্বর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারত' এই সকল প্রবন্ধে পাঠকগণের নিকট অন্যরূপে আবির্ভূত হইত। ইহা ব্যতীত বহু পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিদেশীয় শাসনের দুর্নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সমালোচনার সহিত ভারত সম্বন্ধে যে অনুকূল ও উদার মনোভাব প্রকাশ পাইত, তাহার পশ্চাতে ছিল নিবেদিতার অনলস ও ঐকান্তিক উদ্যম।

পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ এবং পার্লামেন্টের কমন্স সভার কয়েকজন সদস্যকে লইয়া নিবেদিতা একটি দল সংগঠন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, এবং কেহ কেহ গোপনে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রচারকার্যে নিবেদিতাকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—'Our Friends in Parliament and Outside'; উহার রচয়িত্রী নিবেদিতা। তিনি লিখিলেন, 'আমাদের স্বার্থের প্রতি যে সকল বন্ধুগণের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে, তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কমন্স সভায় ভারতের নিম্নোক্ত বন্ধুগণ আছেন—স্যার্ হেন্‌রী কট্‌ন্, মিঃ ফ্রেডারিক ম্যাকারনেস, ডক্টর রদারফোর্ড, মিঃ কিয়ের্ হার্ডি, মিঃ জে. হার্ট-ডেভিস, মিঃ

জেমস ও-গ্রেডি, মিঃ ও-ডনেল, মিঃ সুইফ্‌ট ম্যাকনীল ও মিঃ উইলিয়াম রেডমন্ড। এই সকল বন্ধুগণ ব্যতীত আরও অনেকে আছেন, যাঁহারা সর্বদাই আমাদের কাজে নীরবে আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং প্রয়োজন হইলে ন্যায় ও সদ্‌বিচারের জন্য তাঁহাদের ভোট ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমুৎসুক। সর্বোপরি, ইংরেজ সাংবাদিক দলে আমাদের অগণিত বন্ধু আছেন, যাঁহারা আমাদের দাবীর পোষকতা ও পক্ষ-সমর্থনের জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইঁহাদের মধ্যে মিঃ নেভিনসন, কলিকাতা স্টেট্‌সম্যান-সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফ এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা পুরাতন বন্ধুবর্গের অন্যতম মিঃ হাইন্ডম্যান বিশেষ অগ্রণী।'

লেখা, বক্তৃতা ও আলোচনা—তিন বিষয়েই তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, এবং বলা বাহুল্য, তিনি যেখানেই গিয়াছেন, ভারতীয় স্বার্থের প্রতি সেখানকার নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের পূর্ণ ব্যবহার করিতেন।

ভারতবর্ষে তখন বিপ্লবের প্রজ্বলিত অবস্থা। সন্ত্রাসবাদীদের কার্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। কাহারো কাহারো মতে পাশ্চাত্যে দুই বৎসর নিবেদিতা বিপ্লব-প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। বিপ্লবে তাঁহার সক্রিয় যোগদানের বিপক্ষে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ঐ বিষয়ে পুনরায় এখানে আলোচনা প্রয়োজন। নিবেদিতা বিপ্লববাদ সমর্থন করিতেন, সুতরাং উহার কার্যক্রম ও সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা সহজেই অনুমেয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণের সহিত তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত জানিতেন। এই সময়ে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা প্রিন্স পিটার ক্রপটকিন ইংলন্ডে হাইগেটে অবস্থান করিতেছিলেন। জানুয়ারী মাসের প্রথমে নিবেদিতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা 'A Chat with a Russian about Russia' নামে ঐ বৎসর মডার্ন রিভিউতে বাহির হয়। ক্রপটকিনের মতে বহু বৎসর ধরিয়া গোপনে আন্দোলনের দ্বারা প্রধানতঃ কৃষক সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার সঞ্চার এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ব্যতীত বিপ্লব-আন্দোলন সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। নিবেদিতা এই মত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেন। তাঁহার বহু লেখার মধ্যে ক্রপটকিনের 'The Mutual Aid' পুস্তকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র দেশ রাষ্ট্রীয় চেতনা লাভ করিয়া সুসংবদ্ধ না হইলে যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ও গুপ্ত হত্যার প্রচেষ্টাদ্বারা সরকারকে সন্ত্রস্ত করার পরিণাম দেশের জনসাধারণের উপর

অযথা নির্যাতন। প্রকৃতপক্ষে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারতের নরনারী রাষ্ট্রীয় চেতনা লাভ করিতে আরম্ভ করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনের পর নিবেদিতা তাঁহার প্রবন্ধে কংগ্রেস কর্তৃক হিমালয় হইতে কুমারিকা ও মণিপুর হইতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত দেশের জনসাধারণকে জাতীয়তার আদর্শে সংবদ্ধ করিবার উপর জোর দিয়াছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে যদিও বাংলা দেশের জনসাধারণ দলে দলে যোগ দিয়াছিল এবং সভা-সমিতি, বক্তৃতা ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনির দ্বারা সরকারকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করিয়াছিল, তথাপি ঐ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও পরিসর সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র ভারতের জনসাধারণকে উহা স্বাধীনতালাভের জন্য উদ্বোধিত করে নাই। এমন কি, শিক্ষিত মহলেও ইহার প্রতিক্রিয়া একরূপ হয় নাই। শিক্ষিত-সমাজ-পরিচালিত কংগ্রেস কর্তৃক বিদেশী-দ্রব্য-বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন সমর্থিত হইলেও স্বাধীনতার দাবী স্পষ্টভাবে জোরের সহিত উচ্চারিত হওয়ার পরিবর্তে নেতৃগণের মধ্যে প্রবল মতভেদের ফলে কোন কার্যকরী পন্থা গৃহীত হয় নাই। ইহার উপর ছিল সরকারের দমননীতি-প্রয়োগ। সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনে এই আন্দোলন বন্ধ করিতে সরকার ছিলেন বদ্ধপরিকর। ১৯০৭এর ১১ই সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্র পাল ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। যে সকল সংবাদপত্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা ও আন্দোলন সমর্থন করিত, অচিরেই তাহাদের কণ্ঠরোধ করা হয়। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির অফিসে এবং সম্পাদকের গৃহে ঘন ঘন খানাতল্লাসী করা হইত। সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ দেখিলেই নির্বিচারে গ্রেপ্তার চলিত। ১৯০৮এর ডিসেম্বর মাসে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশ মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতি নয়জনকে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। ইংলণ্ডে বসিয়াও নিবেদিতা দেশের সকল সংবাদ রাখিতেন। স্বার্থসংরক্ষণে কৃতসংকল্প সরকার যে বিপ্লব-দমনে তাহার সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, তাহা নিবেদিতার ন্যায় বুদ্ধিমতীর না বুঝিবার কথা নহে। তিনি জানিতেন, প্রকাশ্য আন্দোলনের অন্তরালে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল মুষ্টিমেয় যুবক। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিশৃংখল বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ প্রমাণ করে না যে, উহার পশ্চাতে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। ঐ সম্বন্ধে যে খণ্ড খণ্ড ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতেও দেখা যায়, বিপ্লবাত্মক কার্য প্রধানতঃ ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত এবং সাহসী, বেপরোয়া, জীবন পর্যন্ত ত্যাগে প্রস্তুত একদল যুবকের দ্বারা

অনুষ্ঠিত। এদিকে নিবেদিতার মধ্যে ছিল পাশ্চাত্য চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি। পরিকল্পনাবিহীন, বিশৃঙ্খল কার্যের সমর্থন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি জানিতেন, বিপ্লবের সহিত জনসাধারণের সংযোগ ছিল না; বিপিন পাল প্রভৃতি কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতারাও বিপ্লবের বিপক্ষে। এই অবস্থায় মুষ্টিমেয় যুবকের বিপ্লবাত্মক কার্যের দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে, ইহা বিশ্বাস করা নিবেদিতার পক্ষে অচিন্তনীয় বলিয়াই মনে হয়।

বিপ্লবকার্যের সফলতার জন্য আবশ্যক ছিল দেশব্যাপী প্রস্তুতি ও উপযুক্ত সময়, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে হত্যার যে প্রচেষ্টা, তাহাতেই উহার ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল। তিন চার বৎসর ধরিয়া হত্যা ও ডাকাতির মাধ্যমে যে বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করে, তাহা যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রতা ও কঠোরতার সহিত দমন করা হইয়াছিল। ফাঁসী, দ্বীপান্তর, নির্বাসন, কঠোর কারাদণ্ড প্রভৃতি সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনে দেশ হইতে বিপ্লববাদ সাময়িকভাবে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছিল। যাহারা নির্ভীকচিত্তে, হাসিমুখে কঠোর শাস্তি এবং প্রাণদণ্ড পর্যন্ত বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহাদের জন্য সাধারণের সহানুভূতির অন্ত ছিল না, অশ্রু-বিসর্জনও অনেক করিয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, স্বাধীনতালাভের জন্য তাহাদের এই অপূর্ব আত্মত্যাগে অগণিত শিক্ষিত যুবক ব্যক্তিগতভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও দেশের জনসাধারণ প্রকাশ্যভাবে তাহাদের কার্যে যোগদান, সমর্থন বা সাহায্য কিছুই করে নাই, বরং সাবধানতার সহিত তাহাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছে। প্রকাশ্যে স্বদেশী আন্দোলন এবং গোপনে বিপ্লব আন্দোলন উভয়েরই ব্যর্থতার কারণ—দেশ তখনো প্রস্তুত হয় নাই। তবে এই উভয় আন্দোলনই যে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পথ অনেক দূর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কী? নিবেদিতার পর্যবেক্ষণ-শক্তি যথেষ্ট ছিল; দেশের প্রকৃত অবস্থা তিনি অনুধাবন করেন নাই, ইহা হইতে পারে না; সেইজন্যই তিনি জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ক্রপটকিনের সহিত আলোচনার পর এ বিষয়ে তাঁহার মত আরও দৃঢ় হইয়াছিল, এবং ঐ আলোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তিনি কি ইহাই বলিতে চাহেন নাই যে, বর্তমান অবস্থায় সমগ্র দেশে প্রকৃত কার্য হইতেছে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা? তাঁহার বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পত্রাবলীর মধ্যে ইহা সুস্পষ্ট। এমন কি, তিনি 'রাজনৈতিক' শব্দ ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না; কারণ উহার মাধ্যমে পাশ্চাত্য রাজনীতির নিকৃষ্ট অনুকরণ-স্পৃহা অনেকের মধ্যে দেখা গিয়াছিল।

পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, ভারতীয় ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র দেশের মধ্যে যে একাত্মতা-বোধ—তাহাকেই তিনি বলিতেন জাতীয়তা।

এ দেশে নিবেদিতা হিংসামূলক বিপ্লবকার্যে যোগদান করেন নাই ; এমন কি, সক্রিয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত তাঁহার যোগাযোগও তেমন নিবিড় নহে। সাহিত্য ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া জন-জাগরণের প্রচেষ্টায় উহা পর্যবসিত। পাশ্চাত্যেও তিনি ঐভাবেই স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতেন। ভারতের বাহিরে ভারতীয় স্বাধীনতার অনুকূলে জনমত-সংগঠনের আবশ্যকতা তিনি পরে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিপিন পাল ছয় মাস কারাদণ্ডের পর ১৯০৮এর মার্চ মাসে মুক্তিলাভ করিয়া কিছুদিন পরেই ইংলণ্ড গমন করেন। ঐ দেশে ভারতবর্ষের প্রচার সমর্থন করিয়া তিনি লেখেন, 'ইংলণ্ডে কাজের প্রয়োজন আছে। লাজপতের মুক্তির কারণ ব্রিটিশ জনমতের চাপ। ভারত সরকার ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন।'

শ্রীঅরবিন্দ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'বর্তমানে ইংলণ্ডে কাজ নৈরাশ্যজনক, অর্থ ও শক্তির অপচয়।'

দেখা যাইতেছে, নিবেদিতার ও বিপিন পালের কর্মপন্থার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইহা ব্যতীত ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ পর্যন্ত য়ুরোপ, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সর্বত্রই নিবেদিতা শ্রীযুক্ত বসু ও তাঁহার সহধর্মিণীর সহিত অবস্থান করিয়াছেন। বিপ্লবের সহিত তাঁহার কোনপ্রকার যোগাযোগ শ্রীযুক্ত বসুর পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক হইত। সরকার তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন ; শ্রীযুক্ত বসুর উপর উহার প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তিনিও উদ্বিগ্ন থাকিতেন। ১৯০৯, ৩রা এপ্রিলের পত্রে তিনি ম্যাকলাউডকে লেখেন, রাজনীতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংযোগের জনরব তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন। ইহা হইতে মনে হয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে সরকারের দমননীতি ও দেশের প্রস্তুতির অভাব উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে স্বাধীনতালাভের জন্য বিপ্লব কার্যকর হইবে না।

আমেরিকায় তিনি পলাতক বিপ্লবিগণকে একত্র করিয়া তাহাদের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেন ইত্যাদি কথা গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিয়াছেন (শ্রীঅরবিন্দ, পৃঃ ৬০০)। ভূপেন্দ্র দত্ত বলেন ঐ সময়ে মাত্র চার-পাঁচজন পলাতক বিপ্লবী যুবক পাশ্চাত্যে অবস্থান করিতেছিল। তিনি লিখিয়াছেন, বস্টনে নিবেদিতা ও জগদীশ বসু তাঁহার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করিয়া দেন। এখানে বিপ্লব সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ নাই (Swami Vivekananda—Patriot Prophet p. 120)।

নিবেদিতার পত্রে জানা যায়, বিদ্যালয়ের জন্য ঐ সময়ে বক্তৃতা করিয়া তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা দ্বারা ভূপেন্দ্র দত্তকে সাহায্য করিতে ব্যগ্র ছিলেন।

গুপ্ত সমিতির পরিচালনার জন্য পাঁচজন সদস্য লইয়া যে পরিষদ গঠিত হইয়াছিল, তাহা কার্যকরী হয় নাই, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। ইহা ব্যতীত বাংলা দেশে ১৯০৬ সাল হইতে যে সন্ত্রাসবাদ শুরু হয়, তাহা যে প্রথমে গুপ্ত সমিতির কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল না, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যতম বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো লিখিয়াছেন, 'বয়কট ও দেশজাত দ্রব্য প্রচলন-চেষ্টার দ্বারা যখন ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগল না, অধিকন্তু গুঁতোটা আশটা লাভ হতে লাগল, তখন প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি আরও বেড়ে গেল। তা' চরিতার্থ করার জন্য ক্রমে বোমা, রিভলবার প্রভৃতি জোগাড়ের চেষ্টা অনিবার্য হয়ে উঠল' (বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ৭৩-৭৪)। তিনি আরও লিখিয়াছেন, ১৯০৯এর প্রথমে গুপ্ত-সভার এক অধিবেশনে ইংরেজ কর্মচারী হত্যা, ডাকাতি, বিপ্লববাদের মুখপত্রস্বরূপ সাপ্তাহিক সংবাদ প্রকাশ ইত্যাদি কর্মসূচী গৃহীত হয় (ঐ, পৃঃ ৯৭)। হেমচন্দ্র কানুনগো বোমা প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্যারিস গমন করেন। তিনি ১৯০৬এর আগস্ট মাসে য়ুরোপ যাত্রা করিয়া ১৯০৭এর ডিসেম্বরে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার পুস্তকের মধ্যে ভারতবর্ষে অথবা য়ুরোপের গুপ্ত-সমিতির কার্যে নিবেদিতার উল্লেখ কোথাও নাই ; এমন কি, একজন ইংরেজ অথবা আইরিশ মহিলারও উল্লেখ নাই, যাহা দ্বারা ঐ সকল ব্যাপারের সহিত নিবেদিতার যোগাযোগ অনুমান করা যাইত। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ দেশের নেতৃবর্গের সম্পূর্ণ অননুমোদিত, স্বাধীন প্রচেষ্টা। কারাগারে যাইবার পূর্বে ভূপেন্দ্র দত্তকে রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদের শোচনীয় পরিণাম উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা তাঁহাকে সতর্ক করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেস ব্যর্থ হইবার পর শ্রীঅরবিন্দ যে নীতি গ্রহণ করেন, তাহা নিবেদিতার জানিবার কথা নহে ; কারণ তাহার পূর্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। অতএব ১৯০৮এর এপ্রিল মাসে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ ও দুইজন নিরপরাধ ইংরেজ মহিলার প্রাণহানির সংবাদ তাঁহার নিকট অপ্রত্যাশিত। স্বদেশী আন্দোলনের দমননীতি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ঘটনার ফল কি হইবে, তাহা সুদূর ইংলণ্ডে বসিয়াই তিনি কল্পনা করিতে পারিলেন। ইহার পর যখন সংবাদ আসিল, অরবিন্দ ঘোষ ধৃত হইয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্বেগের সীমা রহিল না। দেশের মুক্তিসংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের তদানীন্তন একনিষ্ঠ সাধনা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় নিবেদিতারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। উভয়ের

মধ্যে পূর্ব হইতেই ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যও স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য নিবেদিতা অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব ছিল না। শ্রীযুক্ত বসুর ইংলণ্ডের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বক্তৃতার আহ্বান আসিতেছিল। নিবেদিতাও পূর্ব হইতে স্থির করিয়াছিলেন, ঐ সঙ্গে আমেরিকায় গমন করিয়া পুনরায় তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করিবেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথমে তাঁহারা গেলেন আয়র্ল্যাণ্ডে। প্রায় এক মাস উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কতদিন পরে জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া নিবেদিতার মনে পড়িল শৈশবের কথা। এখানেই মাতামহের নিকট প্রথম দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে তাঁহার দীক্ষা। কেবল তাঁহার স্বদেশ এখন আয়র্ল্যাণ্ড নহে, ভারতবর্ষ। তথাপি জন্মভূমিরও কি যেন আকর্ষণ তিনি অনুভব করিলেন মর্মে মর্মে। শৈশবের সেই সহজ, অনাবিল আনন্দের দিনগুলি মনে পড়িয়া যায়।

অক্টোবর মাসে তাঁহারা বস্টনে মিসেস বুলের নিকট পৌঁছিলেন। পরদিন নিবেদিতা গ্রীনএকারে বেড়াইতে গেলেন। জনৈকা মহিলা মিস ফার্মারের আমন্ত্রণে স্বামিজী গ্রীনএকারে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। নদীর তীরে খোলা জায়গায় তাঁবুর মধ্যে তিনি বাস করিতেন। এখানে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত সরল বৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি ক্লাস করিয়াছিলেন। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। নিবেদিতার মনে হইল, জায়গাটি যেন দক্ষিণেশ্বর অথবা বেলুড়ের মত। আমেরিকায় পরিচিত অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মিস এমা থার্সবি, মাদাম কালভে, মিস ফার্মার প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাতে বিশেষ আনন্দিত হন এবং তাঁহার কার্যে সাহায্যও করেন। তিনি রিজলি ম্যানরে কয়েকদিন মিসেস লেগেটের নিকট কাটাইয়া আসিলেন। মিস ম্যাকলাউডও সেখানে ছিলেন। তিনজনেরই স্বামিজীর সহিত অবস্থানের দিনগুলি মনে পড়িতে লাগিল। অতঃপর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নিবেদিতা উইনস্লো, কন্‌কর্ড, হার্টফোর্ড, অ্যালবেনী, পিটস্‌বার্গ, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বাল্টিমোর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন ও বক্তৃতা দ্বারা কিছু অর্থও সংগ্রহ করেন। 'ভবিষ্যৎ জগতে ভারতীয় চিন্তার স্থান', 'প্রাচ্য নারীর শিক্ষা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ', 'বেদান্ত' প্রভৃতি তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল।

নিউইয়র্কে তিনি বিখ্যাত গায়িকা মিস এমা থার্সবির নিকট দিনকয়েক

অবস্থান করেন। ঐ সময় এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংবর্ধনা-সভায় যাইবার পথে সাংবাদিক এফ. জে. আলেকজাণ্ডার তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইঁহার পূর্ব হইতেই কৌতূহল ছিল। নিবেদিতা দীর্ঘকাল ভারতে অতিবাহিত করিয়াছেন শুনিয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার নিকট ভারত সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করেন। প্রথম দর্শনেই তাঁহার মনে হইল, নিবেদিতা কেবল উৎসাহী ও চিন্তাশীল নহেন, প্রকৃতপক্ষে একজন খাঁটী ভারতীয়। নিবেদিতা সেদিন সভায় তাঁহার প্রিয় প্রসঙ্গ ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য জীবন ও চিন্তাধারার উপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'মধ্য এশিয়াই আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল।' সাম্রাজ্যগঠন ও জাতিগঠন—এই দুইটির মধ্যে যে গভীর পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন : সভ্যতার অগ্রগতিমূলক কার্যে জাতিগঠন প্রকৃত সংগঠনাত্মক, আর সাম্রাজ্যগঠন কার্যটি ধ্বংসাত্মক। ঐ দিন বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বহুদূরে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র গলি বোসপাড়া লেনে অবস্থিত তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গীতে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়, ভারতীয় শিশুগণ, তাহাদের পাঠ্যবিষয়, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গের নিকট অভিনব বলিয়াই মনে হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার তাঁহার কথাবার্তায় এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, পরে তিনি যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন নিবেদিতার নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। নানাভাবে তিনি নিবেদিতার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বস্টনে নিবেদিতা বেদান্তের উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। তারক দাস, ভূপেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যে দুই-চারিজন পলাতক বিপ্লবী আমেরিকায় ছিলেন, তাঁহারা নিবেদিতার নিকট প্রায় যাতায়াত করিতেন। বিদেশে ইঁহাদিগকে পরামর্শ ও উপদেশ ব্যতীত সর্বপ্রকার সাহায্যদানে তাঁহার কী আগ্রহ! ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভে সহায়তার জন্য গঠিত আমেরিকান লীগের সভাপতি জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার বহু আলোচনা হয়।

তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্বামিজীর চিঠিপত্র ও বক্তৃতাদি সংগ্রহ করা। মায়াবতী হইতে স্বামিজীর রচনা ও বক্তৃতাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহার একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশে স্বামী বিরজানন্দ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। নিবেদিতা এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। তিনি মেরী হেলকে লিখিত স্বামিজীর পত্রগুলি মেরীর নিকট হইতে এই সময়ে সংগ্রহ করেন। তাঁহার অনুরোধে মেরী তাঁহাকে এবং হেল-

পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিকে লিখিত স্বামিজীর পত্রগুলি নিবেদিতাকে পাঠাইয়া দেন। তিনি পত্রগুলি নকল করিয়া মায়াবতী প্রেরণ করেন। মেরী হেল তাঁহাকে শিকাগো যাইবার জন্যও অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সে অনুরোধ রক্ষা সম্ভব হয় নাই।

অসংখ্য কার্যের মধ্যে তাঁহার মন পড়িয়া থাকিত কলিকাতার সেই ক্ষুদ্র গলিটিতে। কবে তিনি পরিচিতগণের মধ্যে ফিরিয়া যাইয়া কার্যভার গ্রহণ করিবেন! স্থির ছিল, শ্রীযুক্ত বসুর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা শেষ হইলেই তাঁহারা ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ইতিমধ্যে নিবেদিতার নিকট ক্রমাগত সংবাদ আসিতেছিল যে, তাঁহার মাতা বিশেষ অসুস্থা হইয়া পড়িয়াছেন। অবশেষে তার পাইয়া জানুয়ারী মাসে (১৯০৯) তিনি ইংলন্ড চলিয়া আসিলেন। মেরী নোব্‌ল হোয়ার্ফ-ডেল-বার্লি নামক স্থানে বাস করিতে-ছিলেন। মাতার প্রতি যথোচিত কর্তব্যপালন করিতে পারেন নাই বলিয়া নিবেদিতার মনে ক্ষোভ ছিল; অন্তিমসময়ে তিনি মাতার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে কন্যার সহিত সাক্ষাতে মেরী আনন্দিত হইলেন। তাঁহার অবস্থার ক্রমেই অবনতি দেখা গেল। ২৩শে জানুয়ারী ভ্রাতা ও ভগিনীদ্বয় একসঙ্গে 'হোলি কমিউনিয়ন' অনুষ্ঠান করিলেন। গ্রামের যাজক উহাতে উপস্থিত ছিলেন। মেরী এইবার যেন পরম নিশ্চিন্ত হইয়া শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

২৬শে জানুয়ারী সকাল হইতে অবস্থা খারাপ দেখা গেল। নিবেদিতা বুঝিলেন, শেষ সময় উপস্থিত। ঘরের জানালা খুলিয়া দেওয়া হইল। সমগ্র গৃহ নিস্তব্ধ। মাতার শয্যাপার্শ্বে নিবেদিতা ফুলের গুচ্ছ রাখিলেন, বাতি জ্বালিয়া দিলেন; ধূপের গন্ধে কক্ষ ভরিয়া উঠিল। সর্বত্র বিরাজ করিতে লাগিল এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি। নিবেদিতা মাতার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে 'হরি ওম্' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—মৃত্যুপথযাত্রীর কানে ইহাই যেন শেষ শব্দ হয়, এবং যাত্রাকালে হৃদয়ে যেন শান্তি ও আনন্দ থাকে। নীরব প্রার্থনায় নিবেদিতার অন্তর ভরিয়া উঠিল। সেই মুহূর্তে কি তাঁহার গোপালের মার কথা মনে পড়িয়াছিল? উদ্বেগহীন, প্রশান্ত, অপূর্ব সে মুখ। কি সুন্দর তাঁহার মৃত্যু! এক অনন্ত সত্তায় নিমগ্ন হইয়া যাওয়া, ইহাই মৃত্যুর অর্থ। ধীরে ধীরে মেরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জন্ম ও মৃত্যুর এক মহাপ্রবাহ চলিয়াছে। এক জীবন হইতে আর এক নবজীবনের পথে যাত্রা। নিবেদিতা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিলেন, সে যাত্রা শুভ হউক, শান্তিপূর্ণ হউক।

মাতার মৃত্যুর পর নিবেদিতা কয়েকদিন ভ্রাতা ও ভগিনীর সহিত কাটাইলেন। ইহাই হয়তো তাঁহাদের শেষ দেখা। আবার কি তিনি ইংলণ্ড আসিবেন? নিবেদিতা জানিতেন, তিনি আর আসিবেন না। ভারতের পবিত্র ধূলিতে, যেখানে তাঁহার শ্রীগুরুর অমর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া গিয়াছে, সেই মহাতীর্থে তিনিও যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।

মাতার প্রতি কর্তব্য পালন করিয়া তিনি আনন্দিত। তাঁহার অনুরোধ স্মরণ করিয়া তিনি পিতার ভাষণগুলি পুনর্লিখন ও সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়া দিলেন মে ও রিচমণ্ডের জন্য। মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত স্বামিজীর কয়েকখানি পত্রের নকল করা হইল। এপ্রিল মাসে তিনি ভ্রাতা ও ভগিনীর সহিত ডেভনের গ্রেট টরেণ্টন পল্লীতে গেলেন। স্যামুয়েলের সমাধির পার্শ্বে মেরীর ভস্মাবশেষ সমাহিত করা হইল। গ্রেট টরেণ্টন পল্লী তাঁহাদের শৈশবের লীলাভূমি।[১]

আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা শেষ করিয়া শ্রীযুক্ত বসু সস্ত্রীক ইংলণ্ড ফিরিলেন মার্চ মাসে। মে মাসের শেষে তাঁহারা য়ুরোপ গমন করেন। মিসেস বুল সঙ্গে ছিলেন। ম্যাকলাউডও পুনরায় নিবেদিতার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে য়ুরোপ আগমন করেন। সকলে মিলিয়া প্যারিস ভ্রমণান্তে ভিস-বাডেনে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। বহুদিন হইতে নিবেদিতার জোয়ান-অব-আর্কের জন্মভূমি পরিদর্শনের ইচ্ছা ছিল। এবার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ভিসবাডেন হইতে জেনিভা। ২রা জুলাই মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারা মার্সেলিস হইতে ভারতগামী জাহাজে উঠিলেন।

১লা জুলাই লণ্ডনে সার কার্জন ওয়াইলীকে এক পাঞ্জাবী যুবক হত্যা করে। এ হত্যার জন্যও কেহ কেহ নিবেদিতাকে প্রকারান্তরে দায়ী করিয়াছেন —অর্থাৎ পাশ্চাত্যে দুই বৎসর অবস্থানের সময় তিনি যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়াছেন, এ হত্যা তাহারই পরিণাম। এ সম্বন্ধেও কল্পনা ব্যতীত কোন প্রমাণ নাই। ভারত প্রত্যাবর্তনের পথে মিসর হইতে ৭ই জুলাই নিবেদিতা লেখেন, 'লণ্ডনে সার কার্জন ওয়াইলীর নিদারুণ হত্যার সংবাদে আমরা স্তম্ভিত। কাগজে লিখিয়াছে, ঐ ব্যক্তির সহিত হতভাগ্য বালকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল; সুতরাং হত্যার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত। আমাদের

[১] নিবেদিতার দেহত্যাগের এক বৎসর পরে এখানে তাঁহাদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার ভস্মাবশেষ যথোচিত অনুষ্ঠানের সহিত সমাহিত হয়।

মার্সেলিস যাত্রার রাত্রেই ঘটনাটি ঘটিয়াছে। যাহা হউক সংবাদটি অত্যন্ত দুঃখের, এবং ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া আমরা যাত্রা করিতেছি।'

১৬ই জুলাই তাঁহারা বোম্বাই উপকূলে অবতরণ করিলেন। ১৮ই জুলাই দীর্ঘ দুই বৎসর পরে নিবেদিতা তাঁহার প্রিয় বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

নিবেদিতার ভারত প্রত্যাগমন সম্পর্কে কয়েকখানি জীবনচরিতে লেখা হইয়াছে, তিনি ছদ্মবেশে বোম্বাই জাহাজ-ঘাটে অবতরণ করেন এবং বাগবাজারের বাড়িতে তিন সপ্তাহ আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করেন, কারণ তাঁহার উপর পুলিশের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, ইত্যাদি। একজন লিখিয়াছেন, বোম্বাই হইতে সোজা কলিকাতা না আসিয়া তিনি মাদ্রাজ চলিয়া যান এবং কিছুদিন পরে কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার ডায়েরী হইতে জানা যায়, তিনি বোম্বাই হইতে সোজা কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তিনি একাকী আসেন নাই, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত বসু সঙ্গে ছিলেন। তিন সপ্তাহ তিনি আত্ম-গোপন করিয়াছিলেন, এ কথাটিও সত্য নহে। ১৯শে ও ২২শে জুলাই তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন, অনুমান হয় শ্রীযুক্ত বসুর বাড়ি। ২০শে ও ২৪শে উদ্বোধন-বাড়িতে শ্রীমার সহিত দেখা করিতে যান। ২৫শে জুলাই কাশীপুর, বরানগর ও দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। ২০শে এবং ২১শে জুলাই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইহা ব্যতীত ২৫শে জুলাই হইতে দীনেশ সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ নিবেদিতার দ্বারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিদিন আসিতেন। অতএব তিন সপ্তাহ তিনি আত্মগোপন করিয়া বাড়ির মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন—এ কথার আদৌ ভিত্তি নাই। ভারতে প্রত্যাবর্তন তাঁহার পক্ষে বিপজ্জনক, পদার্পণ করিবামাত্র পুলিশ তাঁহাকে আটক করিতে পারে, এই সংবাদ তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, এবং সেজন্যই তাঁহার ছদ্মবেশে আগমন ও বোসপাড়া লেনের বাড়ির মধ্যে তিন সপ্তাহ আত্মগোপন—জীবনীগুলিতে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে অভিযোগে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার ধৃত হইবার আশঙ্কা ছিল, আত্মগোপনের পালা শেষ হওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে চলাফেরা আরম্ভ করিলে সে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইল কেন, এ কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। যদি অভিযোগ প্রত্যাহার না করা হইয়া থাকে, তবে পরেই বা তাঁহাকে গ্রেপ্তার না করিবার কারণ কি?

শ্রীশ্রীমা সমীপে

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'উদ্বোধন' বাটীতে শ্রীমার শুভ পদার্পণ হয়। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে নিজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া নিবেদিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ম্যাকলাউডকে লিখিলেন, 'বহু দিন পরে নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া ও শ্রীমার সান্নিধ্যলাভে আমি বিশেষ আনন্দিত'। নিবেদিতা সহজে কাহারো দ্বারা প্রভাবিত হইবার পাত্রী ছিলেন না। অথচ আশ্চর্য এই যে, শ্রীমার নিকট সেই তেজস্বিনী, পরমত গ্রহণে অনিচ্ছুক, তীক্ষ্নবুদ্ধি নিবেদিতা যেন একটি অনুগত, মুগ্ধ বালিকা মাত্র।

'যখন তিনি শ্রীশ্রীমার নিকট গিয়া বসিতেন, তখন বালিকার ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা,—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত নয়নের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটনেই সমর্থ,— মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া নিতান্ত শিশু-প্রকৃতি একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ-হাস্যে চাহিতেন তখন মায়ের আদরে, বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে আনন্দ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধুলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন ; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর এইটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন' (নিবেদিতা, পৃঃ ৪৬)।

এই যে শান্তভাবে তাঁহার অনুগামী হইতে চেষ্টা করা, তাঁহার সান্নিধ্য-লাভে নিজেকে কৃতার্থ মনে করা, ইহাকে কেবল পাশ্চাত্য সমাজের সৌজন্য মনে করা নিতান্ত ভুল। শ্রীমার প্রথম দর্শনেই নিবেদিতা তাঁহার অসামান্যত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন। আলমোড়ায় নিত্য মানসিক সংগ্রামে যখন তাঁহার হৃদয়-মন পীড়িত, ক্ষুব্ধ, তখনো শ্রীমার পরম শান্তিপূর্ণ সান্নিধ্য স্মরণ করিয়া তিনি এক বান্ধবীকে বিস্তৃতভাবে ঐ বিষয় লেখেন। শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের দিনটি তাঁহার জীবনে বিশেষ সৌভাগ্যদায়ক বলিয়া তিনি মনে করিতেন। বস্তুতঃ,

স্বামিজীর অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া শ্রীমা নিবেদিতাকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণে কখনো কৃপণতা করেন নাই। নারীজাতির শিক্ষাকল্পে নিবেদিতার যে উদ্যম, তাহাতে তিনি কতভাবে উৎসাহ দিয়াছেন! নিবেদিতা যখন ঐ উদ্দেশ্যে আমেরিকায় অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত, তখন শ্রীমা তাঁহাকে নিম্নোক্ত পত্রখানি লেখেন—

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

জয়রামবাটী
২১শে চৈত্র

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু,

স্নেহের খুকী নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি আমার শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার সহিত একত্র তোলা তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক সময় চাহিয়া দেখি ; তখন মনে হয়, তুমি যেন নিকটেই রহিয়াছ।...ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর [ভালয় ভালয়] ফিরিয়া এস, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম[১] সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করুন, এবং যথার্থ ধর্মশিক্ষা দ্বারা ঐ আশ্রমের উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়।...আমার আশীর্বাদ জানিও, আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ কর ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কার্য করিতেছ। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা যখন তুমি ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না। ধ্রুব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যালাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রভুর নাম এবং লীলা উভয়ই কত সুন্দর!

তোমার
মাতাঠাকুরানী

১১।৪।১৯০০ তারিখে স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতাকে এক পত্রে লেখেন, 'শ্রীশ্রীমা কুশলে আছেন। তোমাকে এক সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন। আমি মূল পত্রের সহিত উহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইতেছি। মনে হয়, পত্রের ইংরেজী

[১] Women's Home বা মেয়েদের আশ্রম সম্বন্ধে ১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ পাইলে তুমি আনন্দিত হইবে।' দুঃখের বিষয় বাংলায় লিখিত মূল পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। উপরে স্বামী সারদানন্দ-কৃত অনুবাদের কিয়দংশ পুনরনূদিত হইল।

ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে নিবেদিতার ধারণা অতিশয় পরিষ্কার ছিল। 'ভারতরমণীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে ভারতের আদর্শ মহীয়সী নারী চরিত্রগুলি উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা বলিয়াছেন, ঐ সকল চরিত্রের অনুকরণ দ্বারাই ভারতীয় নারী প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিবে। কিন্তু শুধু ভারতের অতীত ইতিহাসের অধ্যয়নেই তিনি এই আদর্শের সম্যক্ ধারণা লাভ করেন নাই। নারীজাতির আদর্শের প্রতিমূর্তি শ্রীসারদাদেবীকে তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। আত্মীয়-পরিজন, ভক্তবৃন্দ, ভাল-মন্দ লইয়া বাহ্যতঃ যে সাংসারিক জীবন শ্রীমা যাপন করিতেন, তাহার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে আধ্যাত্মিকতা, পরম নির্লিপ্ততা, প্রেম এবং সর্বোপরি অনির্বচনীয় প্রশান্তি বিরাজ করিত, নিবেদিতা তাহার আভাস পাইয়াছিলেন ; তাই ভারতীয় নারীচরিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয়ের অবকাশ ছিল না। পাশ্চাত্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় যাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই নিবেদিতার নিকট এই শান্ত, তপস্যাপূর্ণ জীবনটি বিশেষ আশ্চর্যময় ছিল। কোথায় ইহার মূল রহস্য? কেমন করিয়া এত সহজে শ্রীমা নিজেকে সর্ব ব্যাপারে লিপ্ত রাখিয়াও পরম নির্লিপ্ত? এই সরল, অনাড়ম্বর জীবনে ভালমন্দ-নির্বিশেষে সকলকে একান্ত করিয়া গ্রহণ ও স্নেহ করিবার কী অশেষ ক্ষমতা! অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত ক্ষমা ও অসীম করুণার যেন মূর্ত বিগ্রহ!

প্রতিদিন এবং বিভিন্ন কার্যের মধ্যে শ্রীমাকে দেখিয়া নিবেদিতা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিঃসংশয়ে বলিয়াছেন, 'আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না নূতন কোন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁহার মধ্যে দেখা যায় সাধারণতম নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য। তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। যত নূতন বা জটিলই কোন প্রশ্ন হউক না কেন, আমি তাঁহাকে উহার উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মত।'

শ্রীমা যখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেন, নিবেদিতা সহস্র কর্মের মধ্যে

সময় করিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইতেন। ক্রুস্টীনও সঙ্গে থাকিতেন। উভয়ে শান্তভাবে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতেন, অথবা সন্ধ্যাকাল হইলে নীরবে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ধ্যান করিতেন। স্বামিজীর দেহত্যাগের পর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের সদস্য পদ ত্যাগ করিলেও ঐ সংঘ এবং উহার আধ্যাত্মিক নেত্রী শ্রীমার সহিত তাঁহার সম্পর্ক লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

নিবেদিতা তাঁহার ডায়েরীতে শ্রীমার সহিত সাক্ষাতের দিন লিখিয়া রাখিতেন। ১৯০৪এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমা কলিকাতায় আগমন করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিবেদিতা তাঁহার বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হন। ঐ দিনই মিস ম্যাকলাউডকে এক পত্রে লেখেন, 'মাতা দেবী এখানে রহিয়াছেন। কি রকম ছোট, রোগা ও কালো হইয়া গিয়াছেন! পল্লীজীবনের কঠোরতাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ। কিন্তু পূর্বের ন্যায় সেই নির্মল অন্তঃকরণ—নারীত্বের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা! তাঁহাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার জন্য কত জিনিস যে দিতে ইচ্ছা করে! একটি নরম বালিশ, একটি তাক ও একখানি কম্বলের প্রয়োজন। কত জিনিসেরই দরকার! সর্বদা তাঁহার নিকট লোক-জনের ভিড় লাগিয়াই আছে। আমার ইচ্ছা করে, তাঁহাকে একখানি সুন্দর ছবি দিই।...অবশ্য অপেক্ষা করিতে পারা যায়।'

বস্তুতঃ শ্রীমাকে নানা জিনিস উপহার দিবার প্রবল বাসনা নিবেদিতার হৃদয়ে জাগিত, কিন্তু উহা পূর্ণ হইবার পথে বাধা ছিল অর্থাভাব। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় (১৯০৯) তিনি শ্রীমা ও রাধুর জন্য নানা দ্রব্য কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি যে সামান্য জিনিস উপহার দিতেন, শ্রীমা তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতেন। একবার তিনি একটি জার্মান সিলভারের কৌটা দিয়াছিলেন ; শ্রীমা উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখিতেন ; বলিতেন, 'পূজার সময় কৌটাটি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে।' নিবেদিতা-প্রদত্ত একখানি এণ্ডির চাদর জীর্ণ হইয়া গেলেও মা ফেলিয়া দিতে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন, 'ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমার দিয়েছিল ; ওখানি থাক।' তিনি সেই ছেঁড়া এণ্ডির ভাঁজে ভাঁজে কালজীরা দিয়া তুলিয়া রাখিলেন ; বলিলেন, 'কাপড়খানিকে দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কি মেয়েই ছিল, বাবা! আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম কথা কইতে পারত না। ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাংলা শিখে নিলে।'

নিবেদিতার প্রতি শ্রীমার স্নেহ নানাভাবে প্রকাশ পাইত। একদিন নিবেদিতা আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলে, শ্রীমা কুশলপ্রশ্নের পর একখানি ছোট

পশমের তৈয়ারী পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, 'আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।' নিবেদিতা উহা পাইয়া আনন্দে অধীর, একবার মাথায় ঠেকান, একবার বুকে রাখেন, আর বলেন, 'কী সুন্দর, কি চমৎকার!' শ্রীমা বলিলেন, 'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামিজী) কি ভক্তিই করে! নরেন এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এ দেশের উপরেই বা কি ভালবাসা' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩১৩)।

প্রণাম করিবার সময় নিবেদিতা রুমাল দিয়া অতি সন্তর্পণে শ্রীমার পা মুছিয়া লইতেন। সন্ধ্যার সময় আসিলে তাঁহার চোখে আলো লাগিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা কাগজ দিয়া আড়াল করিয়া দিতেন। যেদিন শ্রীমা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতেন অথবা বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিতেন, নিবেদিতা নিজের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। নিবেদিতার বিদ্যালয়ে মেয়েদের লইয়া আসিবার জন্য যে ঘোড়ার গাড়ি ছিল, সেই গাড়ি করিয়া ছুটির দিনে শ্রীমা গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং কখনো কখনো গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া আসিতেন।

শ্রীমা তাঁহার বিদ্যালয়ে বহুবার পদার্পণ করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর শ্রীমা যেদিন তাঁহার বিদ্যালয়ে আগমন করেন, ঐ দিনের কথা 'নিবেদিতা' (পৃঃ ৪৭) ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' (২য় ভাগ, পৃঃ ৩১৩-১৪) পুস্তকে উল্লিখিত আছে।'...মাতা দেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সম্বর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মত অকারণ কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনো বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনো দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।' বিকালবেলায় শ্রীমা রাধু, গোলাপমা প্রভৃতির সহিত আগমন করিলেন এবং গাড়ি হইতে নামিবামাত্র নিবেদিতা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাঁহার নির্দেশে বিদ্যালয়ের মেয়েরা ঐদিন শ্রীমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিল।

শ্রীমা যখন পূজায় বসিতেন, নিবেদিতা বিশেষ করিয়া মুগ্ধ হইতেন।

১৯০৫ সালে মা বাগবাজারে ছিলেন। ঐ বৎসর ৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে নিবেদিতা সকালে উঠিয়া মঠে গিয়াছিলেন। মঠ হইতে ফিরিয়া শ্রীমার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পূজায় বসিয়াছেন। সেই পূজারতামূর্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিবেদিতার অন্তর এক প্রশান্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, 'শ্রীমা যখন পূজা করিতে বসেন, তাঁহাকে কী সুন্দর দেখায়! সেই মুহূর্তে আমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসি।'

মিসেস বুলের অসুস্থতার সংবাদে যখন তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, তখন নিবেদিতা শ্রীমার আশীর্বাণী তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। আর বস্টন হইতে শ্রীমাকে লিখিত তাঁহার পত্রখানিই শ্রীমার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের অপূর্ব নিদর্শন।

পরবর্তী কালে নিবেদিতার প্রসঙ্গ উঠিলে শ্রীমা কাঁদিতেন। আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা)।' নিবেদিতার বিদ্যালয় এবং উহার কর্মিবৃন্দের প্রতি তাঁহার বরাবর স্নেহদৃষ্টি ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ যে শ্রীমাকে সাধারণ মানবী-রূপে দেখিতেন না, তাঁহাদের বিভিন্ন উক্তি এবং আচরণই তাহার প্রমাণ। নিবেদিতারও দৃঢ় ধারণা ছিল, তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির বিগ্রহস্বরূপ। আশ্চর্য হইয়া ভাবি, নিবেদিতা এই ধারণা কোথা হইতে পাইলেন? ইহা সত্য যে, বহু নরনারী শ্রীমাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন, এবং অনেকেই তাঁহার প্রতি অলৌকিক আকর্ষণ অনুভব করিতেন। আবার অনেকে তাঁহার অপার্থিব স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে সহজভাবে দিন কাটাইবার বহু পরে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 'তখন তো কিছুই বুঝিনি বা বোঝবার চেষ্টাও করিনি।' যাহা হউক, দেব বা দেবীজ্ঞানে কাহাকেও পূজা করিবার পশ্চাতে হিন্দু নরনারীর জন্মগত সংস্কার কার্য করে। তাহাদের সহজাত ভক্তি-বিশ্বাস বহু সময়ে অপরের দেখাদেখি কাহাকেও দেবতাজ্ঞানে আরাধনায় প্রবৃত্ত করে। স্বামিজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদের যে দিব্যদৃষ্টি শ্রীমার মধ্যে জগন্মাতার আবির্ভাব নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিল, নিবেদিতার মধ্যে তাহার অভাব ছিল; আবার অপরের দেখাদেখি সহসা তাঁহাকে ঐরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে তাঁহার জন্মগত সংস্কার এবং শিক্ষা-দীক্ষাও অনুকূল ছিল না। বরং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রবল বিচারবোধ হেতু নিজের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যতীত সাধারণ নরনারীর মত তিনি সহজে প্রভাবিত হইতেন না। তাই মনে হয়, শ্রীমার মধ্যে আদর্শ নারী চরিত্রের সন্ধান লাভ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন না হইলেও তাঁহার ঐশী

শক্তি সম্বন্ধে নিবেদিতার যে ধারণা, তাহা নিশ্চিত প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর বস্টনে নিবেদিতা মিসেস বুলের জন্য গীর্জায় প্রার্থনা করিতে যান। প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার ডায়েরীতে লেখেন, 'গীর্জায় গিয়াছিলাম। সারদা দেবীকে আমাদের মেরীমাতা বলিয়া মনে হইল। তাঁহার সান্নিধ্য শুদ্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়, আমরা সকলেই তাঁহার (শ্রীমার) মত হই।'

আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতালাভের জন্য নিবেদিতার অন্তরে সত্যকারের পিপাসা ছিল। তাঁহার নিকট কর্মই ছিল উপাসনা। কিন্তু কর্ম বা উপাসনা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। সকল কর্মের ঊর্ধ্বে যে শান্ত, মৌন, অবিচলিত ভাব, যেখানে 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'—অন্তরের অন্তস্তলে সেই অবস্থা লাভের আকাঙ্ক্ষা অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিত। সন্ধ্যারাত্রে বহুদিন একাকী অন্তহীন আকাশের তলে ছাদের উপর বসিয়া তিনি সমগ্র অন্তর দিয়া এক অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেন। অনির্বচনীয় নীরব প্রশান্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। আর এইরূপ এক অনুভূতি তিনি লাভ করিতেন শ্রীমার সান্নিধ্যে। অসংখ্য কর্মের মধ্যে যখনই কোন কারণে মন অশান্ত হইয়াছে, বিপদে বিচলিত হইয়াছে, তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন শ্রীমার নিকট। কথাবার্তা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না, ধীরে ধীরে মন শান্ত হইয়া যাইত ; আনন্দপূর্ণ চিত্তে ফিরিয়া আসিতেন।

কেবল শ্রীমার সহিত কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সহিত তাঁহার যে যোগ ছিল, তাহা সম্পূর্ণ অন্তরের ও আধ্যাত্মিক। স্বামিজীর অভিপ্রেত নারীজাতির শিক্ষাকার্যে তিনি মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও অকপট উৎসাহ ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছেন। আর স্বামী সারদানন্দের নানাভাবে সাহায্য ও পরামর্শ তাঁহার নিকট বিশেষ মূল্যবান ছিল। গোলাপমা, যোগীনমা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি সকলের তিনি অতিশয় স্নেহের পাত্রী ছিলেন, এবং ইঁহাদের উপর তাঁহারও যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। ইঁহাদের কেহ ধর্মজীবনের সহায়ক কোন উপদেশ দিলে নিবেদিতা সাগ্রহে তাহা যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করিতেন। এ কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ অনেকেই ভুল করিয়া তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যা বলিয়া অভিহিত করিতেন, এবং তাঁহার দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে কেহ কেহ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নিবেদিতার সহিত মঠ কর্তৃপক্ষ দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাকে সংঘ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন ইত্যাদি উক্তির পশ্চাতে কোন বাস্তব ঘটনার উল্লেখ বা প্রমাণ

দেখা যায় না। আমরা এ-পর্যন্ত অন্যরূপ নিদর্শনই দেখিয়াছি। স্বামিজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে নিবেদিতার মঠের সদস্য পদ ত্যাগ লইয়া একদল ব্যক্তি নানারূপ কাল্পনিক কথা প্রচার ও রামকৃষ্ণ মিশনকে কটূক্তি করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনো উহার অবসান হয় নাই। প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া এইরূপ প্রচারে যাঁহারা একপ্রকার আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদের নিকট অবশ্য অন্যরূপ আশা করা যায় না।

প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তিনি প্রভাতে বেলুড় মঠে গমন করিতেন। ভারতের বাহিরে অবস্থানকালে ঐ দিনগুলি বিশেষভাবে ধ্যান, জপ ও প্রার্থনায় অতিবাহিত হইত। স্বামিজীর নিকট দীক্ষালাভের পর ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে বেদান্তোক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে আর কোন বিরোধ ছিল না। চার্চের যে অনুষ্ঠানগুলি পূর্বে মনে হইত প্রাণহীন, বৃথা আড়ম্বরে পূর্ণ, পরে তাহারা নূতন তাৎপর্য লইয়া দেখা দিয়াছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তিনি বিশেষ দিনে গীর্জায় গিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন এবং খ্রীষ্টধর্মের নানা অনুষ্ঠান পালন করিতেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব-দিবস পালন করা হইত, এবং ঐ দিনটি ছাত্রীগণের নিকট বিশেষ আনন্দের ছিল। ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ বাংলা দেশে বাস হেতু এদেশের বিভিন্ন পূজানুষ্ঠান এবং সর্ববিধ পাল-পার্বণের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধার ভাব দেখা যাইত। দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বকর্মা ও মনসা পূজা পর্যন্ত কিছুই বাদ যাইত না। ঐ সকল পূজা-পার্বণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধগুলি হইতে জানা যায়, কতদূর শ্রদ্ধার সহিত তিনি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতেন। প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ে ঘটা করিয়া সরস্বতী পূজার দিন হোমের ফোঁটা কপালে পরিয়া খালি পায়ে আনন্দে ছুটাছুটি করিতেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাইয়া নিবেদিতা দীনহীনভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। মন্দিরে উঠিয়া দেবীদর্শনের অধিকার তাঁহার ছিল না। আমাদের মনে ইহা বেদনার সঞ্চার করে, কিন্তু নিবেদিতার মুখে এই প্রথার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শোনা যায় নাই। ভক্তিপূর্ণ অন্তরে তিনি দূর হইতে যে প্রণাম নিবেদন করিতেন, তাহা নিশ্চিত জগজ্জননীর চরণতলে পৌঁছিত। কালীঘাটে নাটমন্দিরে প্রবেশের নিষেধ ছিল না। তাই কখনো কখনো তিনি সেখানে প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া অন্তরের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিতেন।

'পূজা—এই নাম মাত্র শ্রবণে তাঁহার হৃদয় তন্মুহূর্তে ভক্তিবিভোর হইত। "অমৃতবাজার পত্রিকা" অফিসে একবার মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সর্বদা পাদুকা-পরিধান অভ্যাস থাকিলেও তিনি স্কুলবাড়ি হইতে খালি পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন এবং সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই এমন আগ্রহ ও সরল ভক্তির সহিত "পূজা কোথায়, পূজা কোথায়" জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, তাঁহার সেই ভাব দেখিয়াই উপস্থিত সকলে যেন সেই মুহূর্তেই পূজার সার্থকতা অনুভব করিলেন।'

এইরূপ নানা ছোটখাট ঘটনায় তাঁহার অন্তরের ভগবদ্‌ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। একবার দীনেশ সেনের সহিত তিনি খড়দহে গিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরের মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরে তিনি যখন টুপিটি খুলিয়া রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তখন কৌতূহলী জনতা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর মন্দিরের পুরোহিত নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তলিখিত ভাগবত ও যষ্টি আনিয়া দেখাইলে নিবেদিতা উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিতা ও আগমনী গানের প্রশংসা শুনিয়া তিনি প্রায়ই দীনেশবাবুকে তাগাদা দিতেন বৈষ্ণব কীর্তনীয়া ডাকিয়া আনিবার জন্য। একদিন দীনেশবাবু এক আগমনী-গায়ক বৈষ্ণব ভিখারীকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার মুখে 'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল' গানটি শুনিয়া নিবেদিতা অশ্রুসিক্ত-নয়নে গায়ককে একটি টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

জীবন বেদ

নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। অবশ্য তখনো খানাতল্লাসী ও ধর-পাকড় চলিতেছে। সন্দেহজনক ব্যক্তির গতিবিধির উপর পুলিশের তীক্ষ্ম দৃষ্টি। দমননীতির প্রকোপে সমগ্র বাংলা সন্ত্রস্ত। বাংলার নবজাগরণ-ক্ষণে আন্দোলনের যে বিপুল বন্যা তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং যাহার তরঙ্গ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আঘাত দিয়াছিল, তাহা তখন ক্ষীণ স্রোতে পরিণত। স্বদেশী ও বিদেশি-বর্জন আন্দোলনে যাঁহারা একান্তভাবে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই কারাগারে। ১৯০৮এর ডিসেম্বর মাসে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয় জন বিনা বিচারে নির্বাসিত হইবার পর ক্রমেই আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়। বাংলার বাহিরে তিলক মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ। বাংলা দেশের চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মুক্তিলাভের কয়েক মাস পরে ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসের মডারেট নেতারা পূর্ব হইতেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের বিপক্ষে। যাঁহারা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগ দেন নাই, কিন্তু পরোক্ষভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। যে পত্রিকাগুলি আন্দোলন সমর্থন করিয়া বিপ্লবেরও ইন্ধন যোগাইয়াছিল, তাহাদেব কণ্ঠ নীরব।

বিপ্লবের বহ্নিও নির্বাপিত-প্রায়। ১৯০৮ সালে বোমা বিস্ফোরণের পর মে মাসে যুগান্তর দলের সহিত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ধৃত হন। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা এক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে নভেম্বর মাসে কানাই দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসী হয়। তাহার পূর্বেই জেলের মধ্যে ইঁহাদের গুলিতে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই নিহত হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে মামলার রায় বাহির হইল, এবং অরবিন্দের সহিত দেবব্রত বসু, নলিনী গুপ্ত, শচীন্দ্র সেন প্রভৃতি সতের জন মুক্তি লাভ করিলেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের যাবজ্জীবন, কাহারো দশ বছর দ্বীপান্তর হইল। বারীন্দ্র ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের প্রতি প্রথমে ফাঁসীর আদেশ হইয়াছিল, পরে বহু চেষ্টায় তাহা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিণত হয়। ভূপেন্দ্র দত্ত এক বৎসর কারাদণ্ডের পর আমেরিকায় চলিয়া যান। ছোটখাট বিপ্লবিগণের অনেকে

দলভ্রষ্ট এবং নেতৃত্বহীন হইয়া স্বাধীনতালাভের উপায় সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করেন। সন্ত্রাসবাদ অবশ্য সম্পূর্ণ নিরস্ত হয় নাই, তবে তাহার যে রুদ্র মূর্তি গভর্নমেণ্টকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা অনেক শান্তভাব ধারণ করিতে বাধ্য হয়।

দেশের এই নিপীড়ন ও ভয়বিহ্বলতা নিবেদিতাকে কতখানি মর্মবেদনা দিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। যে স্বাধীনতা মনে হইয়াছিল আগত-প্রায়, তাহা যেন বহুদূরে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তবে নিবেদিতা ও অন্যান্য নেতাদের উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই। প্রকাশ্য আন্দোলন ও গুপ্ত বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতা লাভ না হইলেও দেশের সর্বত্র যে মহাজাগরণের সূত্রপাত হয় তাহাতে সমগ্র দেশের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ জাগিয়াছিল। পরানুকরণের পরিবর্তে অনেকের দৃষ্টি তখন স্বদেশের প্রতি নিবন্ধ। স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস কমিয়া গেলেও আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কথাবার্তা ও বিলাস-ব্যসনে স্বাদেশিকতার জের রহিয়া গেল। স্বাধীনতালাভের জন্য প্রয়োজন স্ব-নির্ভরতা। দেশে বহু ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ছোট ছোট কলকারখানা গড়িয়া উঠিল। 'জাতীয়তা' শব্দটি শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে বহুলরূপে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এবং তদানীন্তন মনীষিগণের প্রচেষ্টায় সত্যই জাতীয়তার উন্মেষ দেখা গেল দিকে দিকে। সর্বোপরি, দেশের মাটিতে দেশাত্ম-বোধের যে বীজ উপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রেরণায় আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ সাময়িকভাবে নিরস্ত হইলেও পরবর্তী কালে বারে বারে তাহা বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলি কেবল আন্দোলন ও বিপ্লবে প্রেরণা দান করে নাই; বরং দেখা গেল, বহু পরিমাণে জাতীয়তা এবং স্বাদেশিকতা বোধের মূলে কাজ করিয়াছে তাঁহার আদর্শ, ভাব ও বক্তৃতা। স্বামিজীর মধ্যে ছিল প্রচন্ড সক্রিয় শক্তি, যাহা বিশ্ব-আলোড়নে সমর্থ। সমগ্র দেশ ও জাতিকে ভাঙিয়া নূতন আদর্শে গড়িবার কার্য সকলের অলক্ষ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। স্বামিজী ভারতে যে গণতন্ত্রমূলক নেশন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়া-ছিলেন, তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান। স্বামিজীর মধ্য দিয়া এক লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এইরূপ মহাপুরুষের আদর্শ এবং কার্যের সম্যক্ ধারণা সমকালীন ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভব নহে। ক্রমাভিব্যক্তির সহিত উঁহাদের মর্ম উত্তরকালে পরিস্ফুট হয়। আন্দোলন ও বিপ্লবের অবসানে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার সংঘের প্রভাব সম্বন্ধে দেশের অনেকেই অধিক

সচেতন হইলেন। সবিস্ময়ে সকলে লক্ষ্য করিলেন, নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও বেলুড় মঠের কার্যের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে। ১৯০৯এর মে মাসে মুক্তিলাভের পর শ্রীঅরবিন্দ জুন মাসে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকা বাহির করেন, এবং ঐ সংখ্যাতেই আলোচনার একটি বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। বিচারে মুক্তিলাভ করিয়া দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ও শচীন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ) রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। ঘটনাটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কথা। ক্রমে আরও কোন কোন বিপ্লবী ঐ সময়ে বা কিছু পরে মঠে যোগদান করায় অনেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীমা তখন বর্তমান উদ্বোধন-ভবনে। ইঁহাদের অনেকেই তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম নিবেদন করিতেন। সম্ভবতঃ এই সকল দেখিয়া ভারত-প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরে নিবেদিতা আনন্দিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, 'সব দলগুলি ঐক্যবন্ধ হইয়া বলিতেছে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিকট হইতে নূতন প্রেরণা আসিতেছে। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দলে দলে সকলে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। শ্রীমা বলিতেছেন, "ছেলেরা কী নির্ভীক!"...দেশের মধ্যে কী পরিবর্তন আসিয়াছে! সকলেই বলিতেছে, তাহারা স্বামিজীর শিষ্য।'

নিবেদিতা একদিন শ্রীমাকে বলিলেন, 'মা, ঠাকুর যে বলেছিলেন, কালে আপনি বহু সন্তান লাভ করবেন, বোধ হয় তার সময় অতি নিকট। সমগ্র ভারতবর্ষই আপনার।'

শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'তাই তো দেখছি।'

এই সময়ে সিস্টার দেবমাতা ক্রিস্টীনের সহিত বোসপাড়া লেনে কিছুদিন বাস করেন,—অতি ভক্তিমতী মহিলা। ইহার পূর্বে ইনি মাদ্রাজে অবস্থান করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুবিধা হইলেই তিনি নৌকা করিয়া বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। শ্রীমা নিকটে থাকায় প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতেন এবং পরিবর্তে তাঁহার স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। আগস্ট মাসের শেষে তিনি চলিয়া গেলেন।

নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে দুই বৎসর ধরিয়া সমগ্র বিদ্যালয়ের ভার ছিল ক্রিস্টীনের উপর। ফলে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। বিশ্রামের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে দার্জিলিঙ গমন করেন। বিদ্যালয়ের ভার নিবেদিতাকেই গ্রহণ করিতে হইল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, দু-একখানি পুস্তকে (ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ, পৃঃ ১৫৯)

লেখা হইয়াছে জীবিতকালেই নিবেদিতা স্কুলের পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কারণ প্রথমতঃ অর্থাভাব, দ্বিতীয়তঃ স্কুল পরিচালনায় মঠের (বেলুড়) সন্ন্যাসীদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। অথচ এই তথ্যের যে আদৌ কোন ভিত্তি নাই, ইহা নিবেদিতা ও তাঁহার বিদ্যালয় সম্পর্কে যাঁহারা কিছুমাত্র অবহিত তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন এবং অপরেও কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন। নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে কৃস্টীনের কার্যে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করিয়াছিলেন ভগিনী সুধীরা। এখনও তিনিই হইলেন নিবেদিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। সুধীরা বিপ্লবী দেবব্রত বসুর ভগ্নী। সম্ভবতঃ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিদ্যালয়ে আগমন করেন। ঐ বৎসর নিবেদিতার অসুস্থতা-হেতু পূজার পর বহুদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। তবে পর বৎসর বিদ্যালয় খুলিবার পর প্রথম হইতেই তিনি কৃস্টীনকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ইহার পূর্বে পুষ্প দেবী নামে একজন শিক্ষয়িত্রী প্রায় প্রথমাবধি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা-কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ হইয়া যাইবার পর নিবেদিতা ও কৃস্টীন বেশ অসুবিধায় পড়েন। সেই সময়ে সুধীরা আসায় তাঁহারা আনন্দিত হন। নিবেদিতার পত্রে জানা যায়, সুধীরাই ছিলেন প্রধান শিক্ষয়িত্রী। প্রথম হইতেই তিনি পারিশ্রমিক না লইয়া কাজ করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ সময় বিদ্যালয়েই অতিবাহিত করিতেন। যেরূপ আন্তরিকতার সহিত তিনি কৃস্টীনকে সর্বকার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন সেইভাবেই নিবেদিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ভগিনী সুধীরা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আশুতোষ বসু ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মধ্যে প্রথমে যে দেশাত্মবোধ এবং পরে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের আগ্রহ দেখা যায়, তাহার পশ্চাতে ছিল জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবব্রত বসুর প্রেরণা ও সাহায্য। সাংসারিক জীবনের প্রতি সুধীরার বীতরাগ দর্শনে তিনিই তাঁহাকে নিবেদিতার বিদ্যালয়ে যোগদানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। নিবেদিতা ও কৃস্টীনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রাণেও ঐরূপ জীবন যাপনের ইচ্ছা জাগে, এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবব্রত বসু বেলুড় মঠে যোগদান করিবার পর উহা বলবতী হয়। তাঁহার চরিত্রে বহু দুর্লভ গুণ ছিল; ইহা ব্যতীত ভ্রাতার শিক্ষাপ্রভাবে তখনকার দিনেও তিনি পুরুষের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে সর্বকার্যে অগ্রসর হইতেন। স্বামিজীর আদর্শের প্রতি তাঁহার দৃঢ় অনুরাগ ছিল।

নিবেদিতাকে সুধীরা প্রথমে ভয় ও সমীহ করিয়া চলিতেন ; পরে তাঁহার অন্তরের পরিচয়-লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সুধীরার অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।[১]

দুই বৎসর অনুপস্থিতির পর সহসা বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া নিবেদিতা প্রথমে বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অর্থাভাবও দেখা দিল। জিনিসপত্রের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। প্রথম হইতেই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ করিতেন মিসেস বুল। অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে লিখিতে নিবেদিতা সঙ্কোচ বোধ করিতেন। মাসিক কিছু অর্থসাহায্যের জন্য তিনি মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়া ও নিউইয়র্কের কয়েকজন মহিলার নিকট আবেদন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। অর্থাভাব ঘটিলেই তিনি প্রথমে ব্যক্তিগত প্রয়োজন সংক্ষেপ করিতেন। এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছোট মেয়েদের জন্য দুটি ক্ষুদ্র পাঠশালা ছিল। উহাদের ব্যয় সামান্য হইলেও অর্থাভাবে যখন উহা বন্ধ করিয়া দিতে হইল, তাঁহার মনে বেদনার সীমা রহিল না।

বিদ্যালয়ের অবসরে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত লেখার কার্যে। 'The Master as I Saw Him' প্রকাশের আয়োজন চলিতেছিল। স্বামী সারদানন্দ ছাপাইবার খরচ সমেত উহার সর্ববিধ ভার গ্রহণ করিলেও তাঁহার সহিত দেখা করিয়া নানা বিষয় আলোচনা ও অন্যান্য ব্যাপারে

[১] ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর সুধীরা ক্রিস্টীনের সহিত বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ক্রিস্টীন স্বদেশে গমন করিলে বিদ্যালয়ের সমগ্র ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হয়। এই সময়ে তিনি স্বামী সারদানন্দের সাহায্যে ১৭নং বোসপাড়া লেনেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত আশ্রম-বিভাগ ও ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ আশ্রম-বিভাগ ও ছাত্রীনিবাসের নাম রাখা হয় 'মাতৃমন্দির'। পরে শ্রীমার স্বধাম প্রয়াণের পর সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছায় উহা 'সারদা মন্দির' নামে অভিহিত হয়। সুধীরার আন্তরিক উদ্যম ও পরিশ্রমে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতিসাধন হয়। সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সহিত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন বর্ধিত হওয়ায় ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎপূর্বেই মিশন-কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের বর্তমান-ভবনের জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। স্বামিজীর পরিকল্পিত মেয়েদের আশ্রম বা Women's Homeএর জন্য নিবেদিতার অশেষ আগ্রহ ছিল। স্বামী সারদানন্দের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে বহুবার আলোচনা হইয়াছে। সামাজিক এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকবশতঃ তিনি স্বয়ং উহা কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুধীরার নেতৃত্বে ঐ পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করিবে, সকলেরই এই আশা ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পূজার ছুটি সমাপ্ত হইলে হরিদ্বার হইতে এলাহাবাদ হইয়া প্রত্যাবর্তনকালে কাশীর নিকটে ছোট লাইনের ট্রেন হইতে পড়িয়া গিয়া পরদিনই তাঁহার কাশীলাভ হয়। সুধীরার অকালমৃত্যুতে সমগ্রভাবে বিদ্যালয়ের কার্যে যে ক্ষতি হয়, তাহা অপূরণীয়, এবং নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে স্বামিজীর পরিকল্পনাটির বাস্তব-রূপ-পরিগ্রহ বহু বৎসরের জন্য স্থগিত থাকে।

নিবেদিতাকে পরিশ্রম করিতে হইত। 'Footfalls of Indian History' তিনি এই বৎসর সেপ্টেম্বরে লিখিতে আরম্ভ করেন। 'Studies from an Eastern Home' নাম দিয়া আর একখানি পুস্তকেরও পরিকল্পনা ছিল। স্টেট্‌সম্যান ও মডার্ন রিভিউতে উহার প্রবন্ধগুলি বাহির হইতেছিল। শ্রীমা উদ্বোধনে অবস্থান করায় যোগীন মা অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকট যাপন করিতেন। নিবেদিতাও সুবিধামত তাঁহার নিকট গিয়া পূজা-পার্বণ সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতেন। দীনেশ সেনের ইংরেজীতে অনূদিত 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের সংশোধন, প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য নিয়মিত সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং মডার্ন রিভিউএর জন্য নানাবিধ লেখার কাজ তো ছিলই। আনন্দমোহন বসুর জীবনী-প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল। ঐ পুস্তকখানির সম্পাদনা ব্যতীত তাঁহার লিখিত 'Ananda Mohan Bose as a Nation-Maker' প্রবন্ধটি উহার শেষে সংযুক্ত হয়। আগস্ট মাসে তিনি হঠাৎ খবর পাইলেন, স্বামী সদানন্দ পীরগঞ্জে অতিশয় পীড়িত। তৎক্ষণাৎ বহু কাজের মধ্যেও তাঁহাকে দেখিয়া আসেন। তখন হইতেই তাঁহার জন্য বিশেষ চিন্তা রহিল। বস্তুতঃ প্রত্যাবর্তন অবধি মুহূর্তের জন্য তাঁহার সময় ছিল না। এই অসংখ্য কর্মের মধ্যে বিদ্যালয়ে সুধীরার নিঃস্বার্থ, অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁহাকে বহু পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়ে বিপিন পালের কন্যা অমিয়া দেবীও কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর 'The Master as I Saw Him' ছাপিতে দেওয়া হইল। ২৯শে প্রুফ দেখা আরম্ভ হইল। এই পুস্তকখানির জন্য তাঁহার মনে সর্বদা উদ্বেগ ছিল।

অক্টোবর মাসে পূজার ছুটিতে নিবেদিতা দার্জিলিঙ গেলেন। কলিকাতা গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, তাহার উপর প্রতিদিন অত্যধিক পরিশ্রম ; কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও বৎসরে দুইবার কোন পার্বত্য স্থানে বেড়াইয়া আসা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। নানা কারণে তাঁহার মন ভাল ছিল না। অর্থাভাব তাহার মধ্যে প্রধান। বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি সঞ্চিত অর্থে হাত দিতেন না। আগস্টের শেষে মিঃ লেগেটের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। মিঃ ও মিসেস লেগেট উভয়েই ছিলেন স্বামিজীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল ও নিবেদিতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। মিঃ লেগেট নানাভাবে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও করিবার আশা ছিল। সর্বোপরি, তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, তিনি স্বামিজীর কার্যে অবহেলা করিয়াছেন, আর সেইজন্যই তাঁহার যত অনুশোচনা। ২৮শে অক্টোবর নিবেদিতার জন্মদিন।

ঐদিন তিনি আকুলভাবে স্বামিজীর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—উদ্দেশ্যসাধনে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন, স্বামিজী যেন আর একবার তাঁহার সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে সেবা করিবার সুযোগ দেন, তাঁহার জীবনের নববর্ষে যেন নূতন কর্মজীবন আরম্ভ হয়। এই হতাশা, বেদনা কিসের জন্য? কী তাঁহার ভুল-ত্রুটি কে বলিবে?

১৫ই নভেম্বর নিবেদিতা দার্জিলিঙ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ডিসেম্বর মাসে মিসেস হেরিংহ্যাম ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি অজন্তা চিত্রাবলীর প্রতিলিপি করিয়া লইয়া যাইবেন। ইংলণ্ডেই নিবেদিতার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মিসেস হেরিংহ্যামের শিল্পীর প্রয়োজন। নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথকে বলিলেন, 'অজন্তায় মিসেস হেরিংহ্যাম এসেছে। তুমিও তোমার ছাত্রদের পাঠিয়ে দাও, তার কাজে সাহায্য করবে। দু পক্ষেরই উপকার হবে। আমি চিঠি লিখে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।' অবনীন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। স্থির হইল নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার অজন্তায় যাইবেন। নিবেদিতা মিসেস হেরিংহ্যামকে চিঠি লিখিলেন। উত্তরে তিনি জানাইলেন তাঁহার কাজে সাহায্যের জন্য বম্বে হইতে তিনি আর্টিস্ট পাইয়াছেন। নিবেদিতা ছাড়িয়া দিবার পাত্রী নহেন। অজন্তায় যাইলে নবীন শিল্পীরা শিক্ষালাভ করিবেন। সুতরাং পুনরায় চিঠি লিখিলেন। নন্দলালের বাহিরে যাইবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কিন্তু নিবেদিতা শুনিবেন না। একদিন আসিয়া বলিলেন, 'তোমাদের যাত্রার সব ব্যবস্থা করেছি, তোমরা প্রস্তুত হও।' নন্দলাল বসু লিখিয়াছেন,'...আমরা যাব কি না, এ-কথা জিজ্ঞাসা না করেই দুটো টিকিট ক্রয় করে দিনস্থির করে টাকা সঙ্গে দিয়ে একটি লোক পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ঐরূপভাবেই নির্দেশ দিতেন। তাঁর কথা অমান্য করা অসম্ভব ছিল। তারপর আমরা অজন্তা পৌঁছানর পর, সিস্টার, ডক্টর বোস, লেডি বোস ও গণেন মহারাজ সকলে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সিস্টার টাঙ্গা থেকে নামবার সময় 'দুর্গা', 'দুর্গা' বলে নামছেন। তাঁর পরনে সাদা সিল্কের আলখাল্লা, চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের একটি মালা, মুখ দীপ্ত ও আনন্দে উদ্ভাসিত' (শিল্প-জিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল, পৃঃ ২৭)। বড়দিন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় বন্ধ হইলে নিবেদিতা বসু দম্পতীর সহিত অজন্তা গমন করেন। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথও সঙ্গে গিয়াছিলেন। গণেন্দ্রনাথকে তিনি রাখিয়া আসেন শিল্পি-গণের সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধানের জন্য। অজন্তার গুহাগুলি পরিদর্শনকালে নিবেদিতা চিত্রগুলি সম্বন্ধে নোট লইয়াছিলেন। পরে উহা অবলম্বনে 'The

Ancient Abbey of Ajanta' প্রবন্ধটি লিখিত হয়। এই যাত্রার তাঁহারা অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যাণ্টা ও কনহেরী গুহাগুলি পরিদর্শন করেন।

প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে বহু চিত্র কপি করিয়া নন্দলাল প্রভৃতি ফিরিয়া আসিলেন। খবর লইতে গিয়া নিবেদিতা জানিতে পারিলেন, চিত্রগুলি সবই তাঁহারা মিসেস হেরিংহ্যামকে দিয়া আসিয়াছেন। নিবেদিতা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'এত কষ্ট করে তোমরা ছবিগুলি আঁকলে, সমস্তই দিয়ে দিলে! তোমাদের জন্য কিছু রাখতে পারতে।' অতঃপর মিসেস হেরিংহ্যামের সহিত পত্র লেখালেখির ফলে তিনি ছবিগুলির জন্য শিল্পীদের যথাযথ মূল্য দিতে রাজী হইলেন। কিন্তু নিবেদিতার পক্ষে তাহাতে স্বীকৃত হওয়া সম্ভব নহে। শিল্পিগণকে মিসেস হেরিংহ্যাম যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন, ক্যাম্পে অবস্থানকালে তাঁহারা তাঁহার উদার আতিথেয়তা বিলক্ষণ উপভোগ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অজন্তা গমনের সুযোগলাভে শিল্পীরা যথেষ্ট উপকৃতও হইয়াছেন। সুতরাং চিত্রগুলির বিনিময়ে অর্থগ্রহণ তাঁহার মনঃপূত নহে। যাহা হউক, পরে স্থির হইল, নন্দলাল প্রভৃতি চিত্রগুলির কপি করিয়া লইবেন। মিসেস হেরিংহ্যাম কলিকাতায় আসিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি বসিয়া সমস্ত চিত্রের কপি করা হইল। অবনীন্দ্রনাথ পরে বলিয়াছেন, 'নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের অজন্তায় যাওয়া হত না।'

১৯১০ খৃষ্টাব্দ। এই বৎসরে 'The Master as I Saw Him' নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ অবদান। এই কার্যে স্বামী সারদানন্দের সাহায্যের উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'আচার্যকে যেরূপ দেখিয়াছি (The Master as I Saw Him) পুস্তকটির প্রকাশন ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবার জন্য স্বামী সারদানন্দ এখন ঐ গ্রন্থটি হাতে নিয়েছেন। বড়দিন বা নববর্ষে তোমাকে পুস্তকটি পাঠাবার আশা রাখি।...স্বামী সারদানন্দ মুদ্রণ কার্য ও বিতরণের ব্যয় বাবদ অগ্রিম অর্থ সাহায্য করছেন এবং প্রকাশনের জন্য কোন অর্থ নিচ্ছেন না। উনি বলছেন, বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে তাঁদের উপহার হবে ঐ অর্থ। আমার মনে হয়, এটি খুবই ভদ্রতা। আমি এখন বুঝতে আরম্ভ করেছি, প্রকাশকদের কতখানি করতে হয়' (২৩।৯।০৯)।

পুস্তকখানি প্রকাশের জন্য নিবেদিতা বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই হারিকেন জ্বালিয়া প্রুফ দেখা চলিত। আবার কতদিন প্রুফ দেখিতে দেখিতে রাত্রি গভীর হইয়া যাইত; অবশেষে যখন অবসন্ন বোধ করিতেন রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেন। মনে চিন্তার আলোড়ন—তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া স্বামিজীর চরিত্রের যথার্থ মাহাত্ম্য

কি উন্মোচিত হইবে! স্বামী সারদানন্দ ও নিবেদিতা উভয়েরই একান্ত ইচ্ছা ছিল, ১লা ফেব্রুয়ারী, স্বামিজীর জন্মতিথির দিন পুস্তকখানি বাহির হয়। জানুয়ারী মাসের শেষে খুবই ব্যস্ততা পড়িয়া গেল। ৩১শে জানুয়ারী সারাদিন মুদ্রকের যাতায়াত চলিতে লাগিল। এই সকল চেষ্টার ফলে পরদিন 'The Master as I Saw Him' উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত হইল। স্বামী সারদানন্দ পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, 'গুরুর প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিয়া নিবেদিতা তাঁহার গুরুর সকল ভ্রাতৃগণের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছেন।'

তখনো বাঁধানোর কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। একখানি মাত্র ভাল বাঁধানো বই পাওয়া গেল। নিবেদিতা উহা লইয়া বেলুড় মঠে ছুটিলেন। স্বামিজীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে সোফায় তিনি উপবেশন করিতেন, তাহার উপর বইখানি রাখিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। চক্ষু মুদ্রিত, মনের ভাব অবর্ণনীয়। দীর্ঘ চার বৎসরের পরিশ্রমের অবসান! গ্রন্থের ভাল-মন্দের বিচারের ভার অপরের হাতে। তাঁহার সান্ত্বনা, তিনি সাধ্যমত সেই মহাপুরুষের জীবন চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তক লিখিবার সময় তাঁহার নিরন্তর প্রার্থনা ছিল, স্বামিজী যেন প্রত্যেকটি ছত্র রচনায় তাঁহাকে সাহায্য করেন।

আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে স্বামিজীর শিষ্য এবং বন্ধুগণের অনেকেই সাগ্রহে নিবেদিতার পুস্তকের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। একই সঙ্গে ইংলণ্ডেও লংম্যানস্‌ গ্রীন কর্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি পুস্তকের অজস্র প্রশংসা করিয়া লিখিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ও কর্মযোগিন্

নিবেদিতা পাশ্চাত্য হইতে ফিরিবার পর শ্রীঅরবিন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ তিনি লিখিয়াছেন, 'পরবর্তী কালে আমি মাঝে মাঝে সময় করিয়া বাগবাজারে নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। এই সাক্ষাৎকালেই একদিন তিনি আমাকে সংবাদ দেন যে, সরকার আমাকে নির্বাসন দেওয়া স্থির করিয়াছেন' (Sri Aurobindo on Himself, p. 117)। আমরা দেখিয়াছি, এক বৎসর কারাবাসের পর ১৯০৯এর মে মাসে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। জুলাই মাসে তাঁহার নির্বাসনের কথা উঠায় তিনি ৩১শে জুলাই দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক 'খোলা চিঠি' ছাপান। উহাতে তাঁহার বর্তমান রাজনৈতিক মতামত পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অসহযোগ, সম্মিলিত কংগ্রেস, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বয়কট, বিভিন্ন প্রদেশে সংঘগঠন ইত্যাদি। নিবেদিতা প্রত্যাবর্তন করেন ১৮ই জুলাই। ডিসেম্বর মাসে শ্রীঅরবিন্দ অনুরূপ আর একখানি চিঠি ছাপান। অনুমান হয়, শেষোক্ত খোলা চিঠির পূর্বে নিবেদিতা তাঁহাকে সতর্ক করেন ও ব্রিটিশ ভারত পরিত্যাগ করিতে বলেন। তবে শ্রীঅরবিন্দের ৩১শে জুলাইএর খোলা চিঠিতেও নিবেদিতার সহিত আলাপ-আলোচনার প্রভাব থাকিবার সম্ভাবনা, কারণ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর শ্রীঅরবিন্দের মত ও কর্মধারার যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা ক্রমশঃই নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করিতেছিল। ইহার মূলে রাজনৈতিক পরিবর্তন তো ছিলই, নিবেদিতার উপদেশও কতকটা ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎকারের সময় উভয়ের মধ্যে দেশের তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা খুবই স্বাভাবিক। তখন সন্ত্রাসবাদ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হইয়াছে, এবং সরকারের কঠোর দমননীতির ফলে বাংলা দেশের প্রথম বৈপ্লবিক উদ্যম ব্যর্থপ্রায়। বিপিন পাল ও নিবেদিতা পূর্ব হইতেই ইহা উপলব্ধি করিয়া সন্ত্রাসবাদের বিরোধী। মুক্তিলাভের পর শ্রীঅরবিন্দ জুন মাসে ইংরেজীতে 'কর্মযোগিন্' ও আগস্ট মাসে বাংলায় 'ধর্ম' নামে সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। উক্ত পত্রদ্বয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, যোগ, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গ ব্যতীত রাজনীতি, দেশের বর্তমান অবস্থা ও সরকারের সমালোচনাও

চলিত। তবে তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তিনি সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত নহেন, তাঁহার উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ; এবং সন্ত্রাসবাদিগণের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন, তাহারা যেন আর উদ্দাম উত্তেজনা বশে কার্য না করে। সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে বিপিন পালের ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা ও অন্যান্য প্রবন্ধও 'কর্মযোগিন'এ প্রকাশিত হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তখন হইতে শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা উভয়েই ভাবরাজ্যে এক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইলেন। নিবেদিতা কোনদিনই আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব করেন নাই ; এমন কি, আন্দোলন সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতাও দেন নাই ; শুধু পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করিয়াছেন, প্রেরণা দিয়াছেন। এ-ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সংগ্রাম-পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প শ্রীঅরবিন্দ বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। নিবেদিতা তাঁহার সহায় রহিলেন। কিন্তু দারুণ উত্তেজনার পর ও উগ্র দমননীতির ফলে দেশের সর্বত্র হতাশা ও অবসাদ দেখা দিয়াছিল ; দেশবাসী আর তেমন করিয়া তাঁহার বক্তৃতায় সাড়া দিল না।

শ্রীঅরবিন্দ নিজ মত-পরিবর্তন সম্বন্ধে কাহারো নিকট ঋণ স্বীকার করেন নাই, দেশের অবস্থাকেও উহার কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন, কারাগারে বাসকালেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য তিনি যোগ অবলম্বন করেন, এবং ইহার পর হইতে তিনি দৈব কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছেন। যাহা হউক, মে হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতামুখে ও লেখনীদ্বারা তিনি দেশবাসীকে পুনরায় দৃঢ়তার সহিত জাতীয় আন্দোলন পরিচালনায় আহ্বান করিলেন। ইহার মধ্যে মডারেট দলের সহিত তাঁহার পুনরায় বিরোধ ঘটিল, এবং লর্ড মর্লির শাসন-সংস্কার তিনি অস্বীকার করিলেন। বিপিন পাল তখন ইংলণ্ডে ; অন্যান্য নেতাদের অনেকে কারাগারে। সরকার দেখিলেন, শ্রীঅরবিন্দ একাকী বাংলা দেশে আন্দোলনের পুনঃপ্রসারে উদ্যোগী : অতএব তাঁহাকে নির্বাসিত করিলে দেশে শান্তি বজায় থাকে। এই সংবাদ ব্যতীত নিবেদিতা তাঁহাকে আরও পরামর্শ দিলেন, 'আপনি লুকিয়ে থাকুন অথবা ব্রিটিশ ভারত পরিত্যাগ করুন এবং বাইরে থেকে কাজ করে যান, যাতে কোনরকম বাধার সৃষ্টি না হয়' (. . .and she wanted me to go into secrecy or to leave British India and act from outside so as to avoid interruption of my work)।

শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বলেন, 'আপনার এই পরামর্শ গ্রহণ করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমি কর্মযোগিনে খোলা চিঠি দেব, মনে হয় তাতেই

সরকারের এই প্রচেষ্টা নিবৃত্ত হবে' (I told her that I did not think it necessary to accept her suggestion ; I would write an open letter in the *Karmayogin* which, I thought, would prevent this action by the Government)। (Sri Aurobindo on Himself, p. 117)

সুতরাং ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিনে পুনরায় 'খোলা চিঠি' প্রকাশ করিলেন। ইহার পরেই নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার নিকট জানিতে পারেন যে, তাঁহার কার্য সফল হইয়াছে—সরকার তাঁহাকে নির্বাসনে পাঠাইবার নীতি পরিহার করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, সরকারের সকল সংবাদ নিবেদিতা রাখিতেন। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, উগ্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের সহিত নিবেদিতার বন্ধুত্ব থাকায় তাঁহার ঐ সময় কারাগারে যাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। নিবেদিতা রাজনৈতিক মতবাদে চরমপন্থী এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একান্ত বিরোধী, ইহা তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানিতেন ; তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুগণও ইহা অবগত ছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী তিনি কোনদিন গোপন করেন নাই। সরকারেরও ইহা অবিদিত ছিল না। তথাপি এই সময়েই সম্ভবতঃ শ্রীঅরবিন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগবশতঃ পুলিশের দৃষ্টি তাঁহার উপর বিশেষ রকম পড়িয়াছিল।

১৯০৯এর ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। নিবেদিতা কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। বড়দিনের ছুটিতে অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া নববর্ষের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় ফিরিলেন। ইহার পর 'The Master as I Saw Him' এর প্রকাশন লইয়া তিনি বিশেষ ব্যস্ত রহিলেন। ইতিমধ্যে ২৪শে জানুয়ারী সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলমকে হত্যা করা হইল। ইনি আলিপুর বোমার মামলার তদ্বির করিয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডে কলিকাতায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ইহার প্রতিক্রিয়া কিভাবে দেখা দিবে, ভাবিয়া নিবেদিতা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। সম্ভবতঃ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেও তাঁহার চিন্তা হইয়া থাকিবে।

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯১০) অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নির্বাসিত নয় জন নেতা মুক্তিলাভ করিলেন। নিবেদিতার সেদিন কী আনন্দ! বিদ্যালয়গৃহদ্বারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের চিহ্নস্বরূপ পূর্ণকুম্ভ ও কলাগাছ রাখা হইল, এবং আনন্দের দিন বলিয়া বিদ্যালয়ে মেয়েদের ছুটি দেওয়া হইল। নির্বাসিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ছিলেন ব্রাহ্ম প্রচারক, অতিশয় ধর্মভীরু। তাঁহার নির্বাসনে পরিবারস্থ স্ত্রী, পুত্র সকলের দুর্গতির সীমা ছিল না। নিবেদিতার

মহৎ প্রাণ ইঁহাদের বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল, এবং তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির মুক্তি-সংবাদে তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেন বহুদিন পরে তাঁহার নিজের পিতা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের সঠিক তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই। তবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী নিবেদিতা চন্দননগরে গমন করেন। ঐদিন সরস্বতী পূজা। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হইত, এবং নিবেদিতা ও কৃস্টীন সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু এ বৎসর ঐদিন নিবেদিতা বেলা দেড়টায় গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া নৌকাযোগে চন্দননগর যাত্রা করেন। তখন জোয়ার ছিল। রাত্রি এগারটায় তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় তিনি চন্দননগর গিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর-প্রস্থান সম্বন্ধে রামচন্দ্র মজুমদার বলেন, তিনিই তাঁহাকে গ্রেপ্তারের সংবাদ দেন। শ্রীঅরবিন্দ উহা ধীরচিত্তে শ্রবণ করিয়া নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। নিবেদিতা বলেন, তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে বল। শ্রীঅরবিন্দ উহাতে সম্মত হইলেন এবং যাত্রার পূর্বে বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেখান হইতে বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে গেলেন (উদ্বোধন, ১৩৫২, পৃঃ ২৩১)। শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর-প্রস্থান সম্পর্কে নিবেদিতাকে জড়িত করিয়া অনেক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বহু বাদ-প্রতিবাদ উঠিয়াছে। আমরা সে সকল লইয়া আলোচনা করিতে চাহি না। তবে, শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ সর্বপ্রথম যোগীন মা জানিয়েছিলেন, এবং ঐ সংবাদ ব্রহ্মচারী গণেন শ্রীঅরবিন্দকে দেন ; যাত্রার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ উদ্বোধন বাড়িতে শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করেন ; ব্রহ্মচারী গণেন ও নিবেদিতা তাঁহার সহিত গঙ্গার ঘাটে গিয়াছিলেন—ইত্যাদি কাহিনী যাহা লিজেল রেম' ফরাসী ভাষায় নিবেদিতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে (The Dedicated) তাহা নাই।[১] ইহা শ্রীঅরবিন্দের প্রতিবাদের ফল কি না জানি না। নারায়ণীদেবী-কৃত অনুবাদেও ইংরেজী পুস্তকের সাদৃশ্য আছে, ফরাসী পুস্তকের কাহিনীর উল্লেখ নাই। রামচন্দ্র মজুমদারের বিবৃতি হইতেও উপরি-উক্ত কাহিনী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। অবশ্য তাঁহার

[১] শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর-যাত্রার ঠিক পূর্বে অথবা কিছুদিন পূর্বে শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল কাহিনী, তাহার প্রমাণ, শ্রীমা ১৯০৯এর ১৬ই নভেম্বর জয়রামবাটী যাত্রা করেন এবং ১৯১০এর জুলাই মাসে পুনরায় আগমন করেন (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৩০৭)। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০, ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগর যাত্রা করেন।

বিবৃতিও কতখানি নির্ভরযোগ্য বলিতে পারি না। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং রামচন্দ্র মজুমদার প্রদত্ত বিবরণের কোন কোন অংশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে সংবাদ দেন যে, দুই একদিনের মধ্যে কর্মযোগিন্ অফিস সার্চ করা হইবে এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার সম্ভাবনা। এই সংবাদ পাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৈবাদেশ প্রাপ্ত হন যে, তাঁহাকে চন্দননগর যাইতে হইবে। দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া তিনি গঙ্গার ঘাটে আসেন এবং একখানি নৌকা করিয়া চন্দননগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সুতরাং নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিল না। তিনি অফিস হইতে এক ব্যক্তি দ্বারা নিবেদিতাকে তাঁহার প্রস্থানের সংবাদ দিয়া অনুরোধ করেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে নিবেদিতা যেন 'কর্মযোগিন্' সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। নিবেদিতা সম্মত হইয়াছিলেন, এবং তখন হইতে যতদিন উক্ত পত্রিকা বর্তমান ছিল, নিবেদিতাই উহার পরিচালনা করেন (Sri Aurobindo on Himself, p. 119)।

নিবেদিতার পরামর্শে তিনি চন্দননগরে গিয়াছেন এ কথা শ্রীঅরবিন্দ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, নিবেদিতা তাঁহাকে ব্রিটিশ ভারত পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে কার্য করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইবামাত্র উপর হইতে আদেশ আসিয়াছিল, 'চন্দননগর যাও।' নিবেদিতার ব্রিটিশ ভারত পরিত্যাগের উপদেশ যদি শ্রীঅরবিন্দের অবচেতন মনে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা বিচিত্র নহে।

শ্রীঅরবিন্দের প্রস্থানের পূর্বে নিবেদিতার সহিত দেখা হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। সেজন্যই নিবেদিতা ব্যস্ত হইয়া ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সরস্বতী পূজার দিন চন্দননগর গিয়াছিলেন। 'কর্মযোগিন্' পত্রের পরিচালনা-ব্যাপারে পরামর্শ ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের জন্যও তিনি চিন্তিত ছিলেন, এবং তাঁহার ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে অবস্থানের সকল ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীত তাঁহার দুইদিন চন্দননগর গমনের অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। আমরা কাহারো কাহারো নিকট শুনিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার পাথেয় নিবেদিতা জগদীশ বসুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই।

মণি বাগচি তাঁহার 'নিবেদিতা' পুস্তকে (পৃঃ ২৬২) শ্রীঅরবিন্দের প্রস্থান প্রসঙ্গে এই নূতন বিবরণ দিয়াছেন—'আর একদিন। নিবেদিতা বাগবাজার হইতে কলেজ স্ট্রীটে আসিলেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে, অরবিন্দ সেখানে

নাই। সেখান হইতে নিবেদিতা ছুটিলেন ১৪নং শ্যামবাজার স্ট্রীটে, কর্মযোগিন্" কার্যালয়ে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।...নিবেদিতা দরজায় কড়া নাড়িতেই একজন যুবক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। নিবেদিতা ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। দেখিলেন নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে, প্রশান্ত মনে অরবিন্দ একখানি তক্তাপোষের উপর বসিয়া একমনে লিখিতেছেন।' অতঃপর অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার কথোপকথন, অরবিন্দের প্রস্থান ইত্যাদি। এই বিবরণ রামচন্দ্র মজুমদারের ও শ্রীঅরবিন্দের নিজ বিবরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং শ্রীযুক্ত বাগচির স্বকল্পিত। কারণ এ পর্যন্ত ঐরূপ বিবরণ কেহই দেন নাই।

মণি বাগচি অতঃপর লিখিয়াছেন, 'অরবিন্দ নাই। নিবেদিতা একা। অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। আট বৎসর পূর্বে একজনের অসমাপ্ত কার্যের গুরুভার দায়িত্ব লইয়াছিলেন তিনি। আজ আবার আরেকজনের আরব্ধ কার্য শেষ করিতে হইবে' (নিবেদিতা, পৃঃ ২৬২)।

তবে সুখের বিষয়, এইবারের আরব্ধ কার্য বেশীদিনের জন্য নহে, কারণ তিনি লিখিতেছেন, 'নিবেদিতার কার্য শেষ। অধ্যাত্মশক্তি সহায়ে এক নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার বিরাট ব্রত লইয়া অরবিন্দ চলিয়া গিয়াছেন। নিবেদিতা পড়িয়া রহিলেন একা। দিন যায়। ক্লান্তিতে, অবসাদে ভাঙিয়া পড়িলেন নিবেদিতা। রণরঙ্গিনী এইবার তাঁহার হস্তের প্রহরণ নামাইয়া রাখিলেন ভূমিতলে। সংকল্পের দৃঢ়তা আর কর্মক্ষমতা সবই নিঃশেষিত-প্রায়। নির্জনতার মধ্যে বসিয়া থাকেন এখন নিবেদিতা' (ঐ, পৃঃ ২৬৫-৬)।

অর্থাৎ অরবিন্দের পন্ডিচেরী পেঁছান পর্যন্তই নিবেদিতার আরব্ধ কার্যের জের এবং তারপরেই কর্মক্ষমতা নিঃশেষিত। যে নিবেদিতা স্বামিজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে অন্তরের সমগ্র শোক নিরুদ্ধ রাখিয়া দেশসেবা-ব্রতে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই নিবেদিতা অরবিন্দের প্রস্থানের সহিত ক্লান্তিতে, অবসাদে ভাঙিয়া পড়িলেন—ইহা কি তাঁহার চরিত্রে সম্ভব? নিবেদিতা কি এত দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন যে, অরবিন্দের উপর ভরসা করিয়া রাজনীতি এবং দেশসেবা-কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? নিবেদিতার সহিত যাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহার জীবনী আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি, অরবিন্দের সহিত সাক্ষাতের বহু পূর্ব হইতেই তিনি দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁহার ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। দেশের মুক্তি-প্রচেষ্টায় প্রকাশ্যে ও গোপন আন্দোলনে তাঁহার সমর্থন ও সহায়তা আমরা পূর্বেই

বিশদ আলোচনা করিয়াছি। গোপন আন্দোলনেও তিনি যেমন সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন নাই, প্রকাশ্য আন্দোলনেও তেমনি কখনো নেতৃত্ব করেন নাই। তবে তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, প্রকাশ্য জাতীয় আন্দোলন সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করুক। তাই দেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ন্যায় তিনিও এই আন্দোলনের উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই মিঃ এইচ. ডব্লিউ. নেভিনসন বলিয়াছেন, 'আমি জানি না, ধর্মের দিক দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় কি না যে, দার্শনিকপ্রবরের মত তিনি ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৈনন্দিন জীবন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক হইতে এ কথা নিশ্চিত বলা চলে যে, তিনি ছিলেন ভারতপ্রেমে মাতোয়ারা' (Studies from an Eastern Home)।

শোনা কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রীঅরবিন্দের স্বলিখিত ক্ষুদ্র বিবরণেই প্রমাণ, নিবেদিতার উপর তিনি কতখানি আস্থা রাখিতেন। 'কর্মযোগিনে'র প্রবন্ধগুলির পশ্চাতে নিবেদিতার প্রভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান। সম্ভবতঃ এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতার যোগাযোগ লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ নিবেদিতার বৈপ্লবিক কার্যের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ বলে। অরবিন্দের বক্তৃতা ও রচনা প্রমাণ করে যে, অরবিন্দ এই সময়ে তাঁহার নীতি ও কর্মপন্থা পরিবর্তন করিয়াছিলেন। অরবিন্দকে নিবেদিতা সাহায্য করিয়াছেন, বিনা দ্বিধায় তাঁহার পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই নিবেদিতার কার্য—নিঃশব্দে প্রয়োজনমত সাহায্য, অলক্ষ্যে থাকিয়া উৎসাহ ও প্রেরণা দান, কোন কর্মের ভার পড়িলে দৃঢ়তার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ। রাজনৈতিক মতামত ব্যতীত অন্য সর্বক্ষেত্রে তিনি গুরুর পদানুসরণ করিয়াছেন। জীবনে তিনি একজনের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন, অপর কাহারো দ্বারা নহে—অরবিন্দের দ্বারাও নহে। নিবেদিতা নিজ আদর্শে অবিচলিত, স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। গুরুর আশীর্বাদ তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল। একাধারে জননী, সেবিকা ও বান্ধবীরূপে দৃঢ়হস্ত তিনি প্রসারিত করিয়াছিলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে।

ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা এপ্রিল 'কর্মযোগিন্' বন্ধ হইয়া যাওয়া পর্যন্ত নিবেদিতা ইহার পরিচালনা করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাঁহার পরিচালনাধীনে উক্ত পত্রিকার শেষ সংখ্যাগুলিতে রাজনীতি অপেক্ষা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারা অধিক স্থান পাইয়াছে। ঐ বৎসর তাঁহার জন্মতিথির উৎসব-বিবরণও উহাতে বাহির হইয়াছিল। ইহারই এক সংখ্যায় নিবেদিতা তাঁহার অন্তরের দৃঢ় আকুতি ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন—

'আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত।

'আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং আজিকার দিনে উহারই নাম জাতীয়তা।

'আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান তাহার অতীতের সহিত দৃঢ়সংবদ্ধ, আর তাহার সামনে জ্বলজ্বল করিতেছে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ।

'হে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে বেশে ইচ্ছা আমার নিকট আইস। আমাকে তোমার করিয়া লও।'

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর ও তথা হইতে পণ্ডিচেরী গমনের পূর্বে এবং পরেও কিছুদিন ধরিয়া নিবেদিতার উপর সরকারের দৃষ্টি বিলক্ষণ পড়িয়াছিল। অরবিন্দের প্রস্থান-ব্যাপারে নিবেদিতার হাত ছিল, এ কথা সকলেই জানিতেন। সরকারেরও উহা অবিদিত থাকিবার কথা নহে। তাঁহার গতিবিধির উপর পুলিশের তীক্ষ্ন দৃষ্টি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না ; কিন্তু যখন বহু সময় চিঠিপত্র খোলা ও ছিন্নপ্রায় অবস্থায় হাতে আসিত, তখন ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। লেডি মিণ্টোর সহিত সাক্ষাতের ফলে এই অত্যাচার হইতে তিনি কতকটা নিষ্কৃতি লাভ করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো ছিলেন ভারতের বড়লাট। তাঁহার পত্নী লেডি মিণ্টো পূর্বেই নিবেদিতা ও তাঁহার বিদ্যালয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত পরিচয়ে উৎসুক ছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, এই ইংরেজ মহিলা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী এবং ভারতের জননায়কগণ ব্যতীত বহু য়ুরোপীয় ব্যক্তিবর্গেরও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী। ২রা মার্চ সহসা লেডি মিণ্টো মিসেস ফিলিপসনকে লইয়া নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি এক সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'সম্প্রতি জনৈকা মিস নোব্‌লের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কলিকাতার এক দরিদ্রতম পল্লীতে আগমন করিয়া আমি বিশেষ কৌতূহল বোধ করিয়াছিলাম। মিস নোব্‌ল ভারতীয় জীবন যাত্রা গ্রহণ করিয়াছেন ও সিস্টার নিবেদিতা নামে নিজের পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি একজন আদর্শবাদী এবং হিন্দুধর্মের ভিতর গভীর অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি আত্মগোপন করিয়া গিয়াছিলাম।

আমার সঙ্গে ছিলেন মিসেস ফিলিপসন নামে একজন আমেরিকান মহিলা ও মিঃ ভিক্টর ব্রুক।...সিস্টার নিবেদিতা যে স্কুলে এক শ্রেণীর ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহা আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলেন, যাঁহাদের মধ্যে তিনি বাস করেন, তাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দু, কিন্তু অতিশয় দরিদ্র ও বিশেষ গর্বিত। আমার মনে হয়, তাঁহাদের সদ্‌গুণাবলী তিনি অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। পৃথিবীর সহস্র বৎসরের ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার ধারণা, ভারতবর্ষ হইল দর্শন ও জ্ঞানের জন্মদাতা।

'সিস্টার নিবেদিতা দেশীয় পল্লীর এক অপরিসর গলির মধ্যে ক্ষুদ্র এক বাড়িতে বাস করেন। সেখানে যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে বর্তমান গোলযোগের মধ্যে বিশেষ পুলিশ প্রহরী ব্যতীত আমাকে শহরের ঐ অংশে যাইতে দেওয়া হইত না। বিদায় লইবার সময় আমাকে বড়লাট-পত্নী জানিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মুখ অনিন্দ্যসুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল' (Lady Minto's Journal, March, 1910)।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'আজ আমরা তোমাকে কি খবর দেব, তা তুমি কখনো অনুমান করতে পারবে না। গতকাল লেডি মিণ্টো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।..মোট কথা, এই অসাধারণ ঘটনাটি ঘটেছে। কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। বসু খুব স্বস্তি বোধ করছেন। কারণ ইদানীং পুলিশের উপদ্রব বেড়েই চলেছিল, তাই তিনি চাইছিলেন আমরা কয়েকজন রাজকর্মচারীকে বন্ধু হিসাবে লাভ করি।...অবশ্য লেডি মিণ্টোর নিজের দলের লোকজনের মধ্যে এ ঘটনার উল্লেখ করা হবে না। তাঁর স্বামী জানেন, তাছাড়া ঘটনাটি গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা পাড়ার মধ্যে কথাটা রটিয়ে দেব। আর, তার মূল্য সর্বাধিক তা তুমি সহজেই বুঝতে পারছ' (৩।৩।১০এর পত্র)।

লেডি মিণ্টো ইতিপূর্বে কালীঘাটে গিয়া বিশেষ নিরাশ হইয়াছিলেন। উহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। কথাপ্রসঙ্গে উহা জানিয়া নিবেদিতা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে অনুরোধ জানান। লেডি মিণ্টো সম্মত হইলেন। অতঃপর ৮ই মার্চ তাঁহাকে লইয়া নিবেদিতা ও কৃস্টীন দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। ঐ প্রসঙ্গে লেডি মিণ্টো যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল—

'ভিক্টর ব্রুকের সহিত এক ভাড়া-করা মোটরে আমরা যাত্রা করিলাম। পথে সিস্টার নিবেদিতাকে তুলিয়া লওয়া হইল। মন্দিরে পেঁৗছিয়া বাগানের

বাহিরের ফটকের নিকট গাড়ি রাখিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া চলিতে লাগিলাম। অবশেষে পাথরে বাঁধানো বেদীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। সামনেই হুগলী নদী। এখানেই বেদীর উপর এক বৃক্ষের নীচে বিবেকানন্দ বসিতেন (লেডি মিণ্টো ভ্রমবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণকে বহুবার বিবেকানন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)। স্থানটি প্রকৃতই ধ্যানের উপযোগী। অস্তগামী সূর্যের আভায় উহা শান্তিপূর্ণ ও মনোরম দেখাইতেছিল। পরে আমরা মন্দিরসংলগ্ন গৃহগুলির নিকট গেলাম। বেশী দূর যাওয়া আমাদের নিষেধ থাকায় দূর হইতে নাটমন্দিরের খিলানের মধ্য দিয়া কালীমন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটি সুন্দর, চারদিকে শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ।

'...আমরা তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। সেই পবিত্র কক্ষে প্রবেশের পূর্বে আমাদের জুতা খুলিয়া ফেলিতে হইল। বেশ সহজ, অনাড়ম্বর ভাব। দেওয়ালে টাঙ্গানো বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্রের মধ্যে আমাদের প্রভু জলমগ্ন পিটারকে উদ্ধার করিতেছেন, এই চিত্রটিও ছিল। মনে হইল, এই ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিস্টার নিবেদিতার হৃদয় এক পবিত্র ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমার কিন্তু সুন্দর পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের মধ্যে এই ঘরখানি এলোমেলো বলিয়া মনে হইল।

'স্থির ছিল, আমরা নৌকায় প্রত্যাবর্তন করিব। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দেখিলাম, ঘাটে বহু স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আমরা আরোহণ করিলাম। নৌকা চলিতে লাগিল। সিঁড়ির উপর উপবিষ্ট লোকগুলিকে ছবির মত দেখাইতেছিল। বারাকপুর যাতায়াতের পথে লঞ্চ হইতে বহুবার আমি তাহাদের লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু আমি নিজে একদিন নৌকায় উঠিব, তাহা ভাবিতে পারি নাই। নৌকার মধ্যে আমার জন্য আসন পাতা ছিল। সিস্টার নিবেদিতার বান্ধবী সিস্টার ক্রস্টীন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। চা প্রস্তুত হইল। চায়ের সুগন্ধে আমার মনে হয়, উহা নিশ্চয় 'অরেঞ্জ পিকো', কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, বিস্কুট, চা, চিনি হইতে আরম্ভ করিয়া পেয়ালা, ডিস সবই স্বদেশী।

'সেদিনের অপরাহ্ণ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার চারিপার্শ্বের সবই সুন্দর দেখেন। আলোচনার বিষয়বস্তুর উপযোগী পারস্য কবিতা হইতে আবৃত্তি করিবার চমৎকার ধরন তাঁহার জানা আছে। অপূর্ব উচ্চস্বরে ও শ্রদ্ধাভক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বহু কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। আমি অপরাহ্ণটি যথার্থ উপভোগ করিয়াছি দেখিয়া তিনি আন্তরিক আনন্দপ্রকাশ করেন' (Lady Minto's Journal, March, 1910)।

ইহার পরদিন লেডি মিণ্টো মিস সোরাবজী নামে জনৈক পার্শী মহিলার সঙ্গে বেলুড় মঠ দেখিয়া আসেন। পরে তিনি জানিতে পারেন যে, বেলুড় মঠের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

প্রথম সাক্ষাতেই ভারতবর্ষ, হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলোচনা লেডি মিণ্টোর উপর প্রভাব বিস্তার করে। নিবেদিতার পুস্তকরচনায় তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহার পর নিবেদিতা ক্রস্টীনকে সঙ্গে লইয়া গভর্নমেণ্ট হাউসে লেডি মিণ্টোর চায়ের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, এবং ঐদিনও তাঁহার জন্য স্বদেশী বিস্কুট লইয়া গিয়াছিলেন। নিবেদিতার সহিত আলোচনাকালে লেডি মিণ্টো দুঃখিত ও উত্তেজিতভাবে বর্ণনা করেন, তাঁহার স্বামী লর্ড মিণ্টো যখন আমেদাবাদ যাইতেছিলেন, তখন এদেশের ছেলেরা কিভাবে তাঁহার ট্রেনের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল।

লেডি মিণ্টো জানিতেন, নিবেদিতার প্রতি সরকার প্রসন্ন নহেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে নিবেদিতা পুলিশ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'মধুরস্বভাবা লেডি মিণ্টোর আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝে গত সপ্তাহে আমাকে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে হল। তিনি আমাকে তাঁর অফিসে না ডেকে বাড়িতে দেখা করতে বলে বিশেষ বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। বারান্দায় বসে নিরিবিলিতে আমরা তাঁর সঙ্গে চা খেলাম।.. আমাদের আলাপ-আলোচনা বেশ চলছিল এবং আরও চমৎকার হত যদি না তিনি বলতেন যে, দেশী পাড়ায় বাস করা তিনি অপমানজনক বলে মনে করেন' (৬।৪।১০এর পত্র)। 'দেশী পাড়ায় বাস অপমানজনক' এই উক্তিতে নিবেদিতার ক্রোধ ও উত্তেজনা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সরকারী খাতায় তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, ঐ সাক্ষাতের ফলে তাহার গুরুত্ব অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং এই সংবাদে জগদীশ বসু বিশেষ আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইহার কয়েক মাস পূর্বে নভেম্বরে (১৯০৯) ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিকদলের নেতা মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (পরে প্রধানমন্ত্রী) কলিকাতায় আগমন করেন। মিঃ নেভিনসন নিবেদিতার নিকট তাঁহার পরিচয় দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। ঐ চিঠি লইয়া মিঃ র‍্যামজে ম্যাক-ডোনাল্ড বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতার সহিত সাক্ষাতে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি আরও কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নিবেদিতার আকস্মিক দেহত্যাগে লেডি মিণ্টো বিশেষ দুঃখিত

হইয়াছিলেন, এবং টাউন হলে তাঁহার স্মৃতিসভায় আন্তরিক দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন।

মার্চ মাসের শেষে নিবেদিতা কয়েকদিনের জন্য গিরিডি বেড়াইয়া আসিলেন। কৃস্টীন দীর্ঘকাল বিশ্রামান্তে দার্জিলিঙ হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রত্যাবর্তন করেন। এপ্রিল মাসে সুদূর স্বদেশ হইতে আহ্বান আসিল, গুরুতর পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁহার উপস্থিতি নিতান্ত আবশ্যক। দীর্ঘদিন পরে তিনি স্বদেশে যাইতেছেন, এবার নিবেদিতাকেই একাকী অবস্থান করিতে হইবে। যাত্রার পূর্বে উভয়ে মঠে গেলেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার বিদায়-সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে এক সভা হইল। ঐ সময় ছাত্রীগণের সহিত কৃস্টীনের একটি ছবি তোলা হইল। ১২ই এপ্রিল কৃস্টীন যাত্রা করিলেন।

সান্ত্বনা

ক্রিস্টীন চলিয়া যাইবার পর নিবেদিতাকে পুনরায় বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে হইল। প্রায় প্রথমাবধি ক্রিস্টীন বিদ্যালয় পরিচালনায় সাহায্য করায় নিবেদিতা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন এবং সকলের নিকট শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। ঐ কার্যে তিনি নিজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগে অক্ষম, তজ্জন্য দুঃখ ও ক্ষোভ মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডকে লিখিত বহু পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'আমার বই লেখা চলছে। বলতে গেলে বর্তমানে লেখাই আমার প্রধান কাজ। ভারী আশ্চর্য। একলা বসে লেখার কাজেই আমার সময় কাটে। যে সব কাজ করতাম, তার কিছুই করি না। আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হচ্ছে। আগেকার যে সব পরিকল্পনা, তা ক্রিস্টীনই কাজে পরিণত করবে। জীবনের গতি কী অনির্দিষ্ট! স্বামিজীর বিশ্বাস ছিল, আমি সিংহী, ভারতের কাজ করবার জন্যই আমার জন্ম। কিন্তু এখন দেখছি, আমার জন্য তাঁর নির্দিষ্ট কাজ ক্রিস্টীনই সম্পন্ন করবে।

'আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি যে, আমি আর কর্মী নই। কর্মীর স্থান এখন ক্রিস্টীনের। এমন কি, বিদ্যালয়ের কাজও আমার পক্ষে আর বেশী দিন করা সম্ভব হবে না। তার হাতেই সব ভার ছেড়ে দিতে হবে। তুমি জিজ্ঞাসা করবে, কারণ কী? কতক আমার অদৃষ্ট, আর সত্য কথা বলতে গেলে, আমাকে লেখার কাজ চালাতেই হবে। আমার বিশ্বাস ও ধারণা, লেখাই আমার প্রকৃত কাজ।'

তাঁহার বহু পত্র পড়িলে মনে হয়, বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্ব বহন ব্যতীত উহার সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাঁহার ছাত্রীগণ ও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ সম্পূর্ণ পৃথক। অনুমান করা যায়, তাঁহার ক্ষোভের দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে, উহা বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, নানাবিধ কার্যে ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়টির প্রতি তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারিতেন না। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করিলেও বিদ্যালয়টি সর্বদাই তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল বলিলেও চলে। প্রতিদিন অসংখ্য কর্মের মধ্যে উহার এবং ছাত্রী-গণের উন্নতির চিন্তা তিনি একমুহূর্তও বিস্মৃত হইতেন না। তাহাদের সহিত ক্রিস্টীন অপেক্ষা তাঁহারই ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাহারা নিয়মিত

বিদ্যালয়ে আসিতেছে কিনা, তাহার সংবাদ তিনিই রাখিতেন, এবং বাড়ি বাড়ি গিয়া অভিভাবকগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা দ্বারা তাহাদের বিদ্যালয়ে আসার সর্বপ্রকার বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। সর্বদা লেখাপড়ায় মগ্ন থাকিলেও উহারই মধ্যে তিনি প্রতিদিন ক্লাস লইতেন। সাধারণতঃ তিনি চিত্রবিদ্যা ও ইতিহাস শিক্ষা দিতেন। ছোট মেয়েদের মাটির কাজ ও ড্রিল করাইতেন এবং বড় মেয়েদের মধ্যে মধ্যে ইংরেজী পড়াইতেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে ছোট ছোট বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহিতা ও বিধবাগণ পর্যন্ত যে শিক্ষা পাইতেন, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বয়স্কা ছাত্রীগণ ছোট মেয়েদের পড়াইত। তিনি নিজেই শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ঐ সময়ে সুধীরা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন এবং কোন বিষয়ে মেয়েরা বুঝিতে না পারিলে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। বহু সময় তিনি নিঃশব্দে দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন, মেয়েরা কিরূপ পড়িতেছে বা পড়াইতেছে। মেঝেতে পিঁড়ার উপর কুশন পাতিয়া মেয়েদের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। কেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়াছে দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া পিঠে হাত দিয়া তাহাকে সোজা করিয়া বসাইয়া দিতেন। শৃঙ্খলার প্রতি তাঁহার সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রীগণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে সরলাবালা সরকার তাঁহার 'নিবেদিতা' পুস্তকে অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।

ছাত্রীদের প্রস্তুত মাটির পুতুল, ও অন্যান্য বস্তু, তাহাদের আঁকা ছবি, আলপনা প্রভৃতি তিনি নিজের ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন ও উৎসাহের সহিত সকলকে দেখাইতেন। ঐ সকল জিনিস দেখিয়া শ্রীমা যখন প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কী আনন্দ! কুমারস্বামী যেদিন তাঁহার ঘরে একটি ছাত্রীর আঁকা আলপনা দেখিয়া প্রশংসা করেন, সেদিনও মহা আনন্দে ছাত্রীদের নিকট বলিয়াছিলেন, 'কুমারস্বামী আজ এই আলপনার অনেক সুখ্যাতি করলেন।' এক সময়ে মেয়েদের সংস্কৃত শিখাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল ; নিবেদিতা তখন উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন, 'যেদিন মেয়েদের হাতে তালপাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরে শোভা পাবে, সেদিন কী আনন্দের দিনই হবে!'

ছাত্রীদের সর্ববিধ উন্নতির জন্য সর্বদাই তাঁহার আগ্রহ দেখা যাইত। তাঁহার ইচ্ছা হইত, তাহাদিগকে পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থান এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখাইয়া আনিবেন। অর্থাভাবে তাহা কোনদিন সম্ভব হইয়া উঠে নাই ; অতএব নিজের ভ্রমণকাহিনী নানাভাবে তাহাদের নিকট বর্ণনা করিতেন। রাজপুতানা ভ্রমণের পর রাজপুত রমণীগণের বীরত্ব-

কাহিনী মেয়েদের নিকট জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলিতেন, 'তোমরা সকলে এই রকম বীর হও, ক্ষত্রিয়জাতির এইরূপ আচরণ। ভারতবর্ষের কন্যাগণ, তোমরা এই ক্ষত্রিয়-বীরব্রত গ্রহণ কর।' ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে চিতোর-দুর্গ, তাজমহল, পদ্মিনী প্রভৃতির ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মেয়েদের লইয়া তিনি মাঝে মাঝে নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইতেন। বড় বড় স্টীমার চলিয়া গেলে ঢেউয়ের আঘাতে নৌকা দুলিলে মেয়েরা যখন ভয় পাইত, তিনি উৎসাহ দিয়া বলিতেন, 'ভয় কী? ঢেউ দেখে ভয় পেয়ো না। ভাল মাঝি খুব শক্তভাবে হাল ধরে ঢেউএর সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমরাও হাল ধরতে শিখব, তাহলে আর কখনো ভয় আসবে না, নিশ্চয় আসবে না।' এত জোর দিয়া তিনি কথাগুলি বলিতেন যে, মেয়েদের ভয় দূর হইয়া যাইত।

ঐভাবে মেয়েদের মিউজিয়াম ও আলিপুর পশুশালায় লইয়া যাইতেন। মিউজিয়ামের প্রত্যেকটি জিনিস তিনি মেয়েদের ভাল করিয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেন। প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি ও বৌদ্ধযুগের প্রস্তরময় মূর্তি ও স্তম্ভগুলি দেখাইবার সময় তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। একবার বেড়াইতে বেড়াইতে একখানি শিলালিপির নিকট আসিয়া তিনি মেয়েদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এই পাথরখানির নাম কাম্য-প্রস্তর। মহারাজ অশোক এর কাছে বসে কামনা করেছিলেন। এস, আমরাও সকলে এখানে বসে কামনা করি।' পরে সকলকে লইয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, 'তোমরা সকলেই মনে মনে কামনা কর', এবং নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তারপর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কী কামনা করেছিলে?' মেয়েরা উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ঠিক, কাম্য-মন্ত্র মনেই রাখতে হয়, বলতে নেই।'

মেয়েদের লইয়া বেড়াইতে যাইবার সময় তাহাদের প্রয়োজনের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি থাকিত। মিউজিয়াম দর্শনকালে বহুক্ষণ ঘোরাঘুরির ফলে তাহারা ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়াছে, বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সকলকে জলের কলের নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে গ্লাস ছিল; মাটি দিয়া কলের মুখটি উত্তমরূপে মাজিয়া এক গ্লাস জল ভরিয়া অস্থিরভাবে মেয়েদের এক-জনের সামনে ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার হাত হইতে গ্লাস লইয়া জলপান করিতে মেয়েটির সাহস হইল না। তিনি খ্রীষ্টান বলিয়া পরে কোন গোলমাল হইতে পারে। তাহারা যে আচার-বিচার পালনে অভ্যস্ত, তাহা লঙ্ঘন করাও কঠিন ছিল। এদিকে তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তখন আর একটি মেয়ে সহসা অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া জলপান করিলে

নিবেদিতা আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপর মেয়েটির দ্বিধার কারণ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল এবং তাহার প্রতি লেশমাত্র বিরক্ত না হইয়া তিনি সস্নেহে তাহাকে কল হইতে জল ধরিয়া খাইতে বলিলেন। বস্তুতঃ এরূপ নিষ্ঠা তিনি ভালবাসিতেন।

আর একবার তিনি বিদ্যালয়ের ছোট-বড় সব ছাত্রীদের লইয়া ট্রাম রিজার্ভ করিয়া আলিপুরে পশুশালায় গিয়াছিলেন। ছাত্রীদের খুব আনন্দ। শহর দেখিতে দেখিতে তাহারা পশুশালা পেঁাছিল, এবং নানা জানোয়ার দেখিয়া অবশেষে ক্যাঙগারু-নামক অদ্ভুত জন্তুর ঘরের কাছে আসিল। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাগুলিকে ভয়ে মার পেটের থলিতে মুখ লুকাইতে দেখিয়া তাহারা অবাক। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দেখ মা, এই বাচ্চাগুলি খেলাধুলো সব করে : কিন্তু যেই দেখে শত্রু এসেছে, অমনি মার কাছে নিরাপদ জায়গায় দৌড়ে যায়। আমাদেরও মা আছেন। আমরাও বিপদ দেখলে তাঁর কাছে ছুটে পালাব। যার মা আছেন, তার আর ভয় কী জগতে?'

মেয়েদের শিক্ষা দিবার সময় তিনি তাহাদের সর্বদা মনে করাইয়া দিতেন, তাহারা ভারতবর্ষের কন্যা, ভারতের আদর্শই তাহাদের আদর্শ। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি বড় মেয়েদের বক্তৃতা শুনাইবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে লইয়া যাইতেন। ঐ স্কুলের পার্শ্ববর্তী পার্কে বিপিন পাল প্রভৃতি বক্তৃতা দিতেন। ইহা ব্যতীত ঐ স্কুলের হলে যখনই মেয়েদের জন্য কোন বিষয়ে ভাল বক্তৃতাদি হইত, তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে লইয়া যাইতেন। বহু অনুসন্ধানপূর্বক একজন বৃদ্ধাকে লইয়া আসিয়াছিলেন, মেয়েদের চরকাকাটা শিখাইবার জন্য। মেয়েরা তাহাকে চরকা-মা বলিত। স্কুল আরম্ভ হইবার পূর্বে মেয়েরা সমস্বরে দেব-দেবীর স্তোত্র আবৃত্তি করিত। পরে তাঁহার নির্দেশে ঐ সঙ্গে তাহারা 'বন্দেমাতরম্' গানটির প্রথম চার লাইন গাহিত। বলা বাহুল্য, এইভাবে তাহাদের মনে সহজেই দেশাত্মবোধ জাগিত।

বস্তুতঃ এই বিদ্যালয় ছিল তাঁহার ভারতবর্ষের সর্ববিধ কার্যের কেন্দ্র। তিনি বাগবাজার পল্লীতে অবস্থান করিয়া এখানকার হিন্দু মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করিবেন, স্বামিজীর এই অভিপ্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি মনে রাখিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের বাড়িটি ছিল অত্যন্ত পুরাতন ও অস্বাস্থ্যকর। অর্থাভাবে পূর্বেই ১৬ নম্বর বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরমে তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিত, মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেন। তাঁহার কোন কোন বন্ধু বহুবার তাঁহাকে গলির মধ্যে অবস্থিত ঐ বাড়ি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতেন ; বলা বাহুল্য, নিবেদিতা তাহাতে সম্মত

হন নাই। হাসিয়া বলিতেন, 'এই গলি আমাকে আশ্রয় দিয়াছে, একে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। নিজের শারীরিক, মানসিক কোন প্রকার কষ্টই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। বিদ্যালয়ে যে মেয়েরা আসিতেছে, তাহারা একটু ফাঁকা জায়গায় খেলাধুলা করিতে পারে না, ইহাই তাঁহার দুঃখের কারণ ছিল। বাড়ির পাশে যে ছোট বাগান ছিল, সেটি ভাড়া লইবার জন্য তিনি বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিশনের লোকজনের উপর রাগ থাকায় বাগানের মালিক কিছুতেই তাঁহাকে বাগানটি ভাড়া দিবেন না। অবশেষে ১৯১০ সালে ঐ বাগান পাওয়া গেলে, তাঁহার কী আনন্দ! ম্যাকলাউডকে লিখিয়া নানারকম ফুলের বীজ আনাইয়া লাগাইলেন। এক পাশে মেয়েদের খেলার জন্য খালি জায়গা রাখা হইল। মেয়েরা শাড়ির আঁচল কোমরে জড়াইয়া ছুটাছুটি করিত, ব্যাডমিণ্টন খেলিত. ইহা দেখিয়াই তিনি আনন্দে বিভোর হইতেন।

বিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রতি তাঁহার অপার স্নেহ ছিল। তাঁহার অগাধ বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে তাহাদের কতটা ধারণা ছিল, বলা কঠিন ; কিন্তু তাঁহার মাতৃহৃদয়ের পরিচয় সকলেই পাইয়াছিল। কতভাবেই না তাঁহার স্নেহ প্রকাশ পাইত! বিশেষতঃ যাহারা অল্পবয়সেই বিধবা, তাহাদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। কাহারো মুখ শুষ্ক দেখিলে তৎক্ষণাৎ নিজের কাছে ডাকিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতেন। হিন্দুঘরের বিধবা মেয়েদের আহারাদি-ব্যাপার সহজ নহে ; সুতরাং বহুদিন অনেকে না খাইয়াই স্কুলে আসিত। তিনি কিভাবে বুঝিতে পারিয়া খাওয়াইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অন্যতমা ছাত্রী প্রফুল্লমুখী দেবী বোসপাড়া লেনে বিদ্যালয়ের অতি নিকটে বাস করিতেন। অতি অল্পবয়সে তিনি বিধবা হন। তিনি নিবেদিতার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। প্রতি একাদশীর দিন নিবেদিতা তাঁহাকে নিজের নিকট বসাইয়া সরবৎ ও মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। একদিন নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় ভুলিয়া গিয়াছেন। স্কুলের ছুটির পর জগদীশ বসুর বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছেন ; সেখানে কথাবার্তা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, সেদিন একাদশী এবং প্রফুল্লকে খাওয়ানো হয় নাই। আর বসা হইল না ; তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চাকরকে পাঠাইলেন প্রফুল্লকে ডাকিয়া আনিবার জন্য। তারপর তাহাকে খাইতে দিয়া বার বার এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 'আমার মেয়ে (My Child)[১] আমি ভুলে গেছি, কী অন্যায়! তোমাকে খেতে

[১] নিবেদিতা তাঁহার ছাত্রীদিগকে ঐরূপে সম্বোধন করিতেন।

দিইনি, আমি নিজে খেয়েছি, কী অন্যায়!' প্রফুল্ল দেবী তাঁহার অপার্থিব স্নেহের কথা বলিতে গিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। নরেশ-নন্দিনী নামে আর একটি অল্পবয়সের বিধবা মেয়েকেও তিনি প্রতি একাদশীর দিন খাওয়াইতেন।

গিরিবালা ঘোষ বলেন, তিনি যখন নিবেদিতার বিদ্যালয়ে প্রথম পড়িতে যান, তখন তাঁহার বয়স ২২।২৩ বৎসর। একটি কন্যা লইয়া তিনি অল্পে বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন ও বাগবাজারে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার স্কুলে পড়িতে যাওয়ায় অভিভাবকগণের বিশেষ মত ছিল না ; পাড়ার লোকেরাও 'বিধবা মেয়ের স্কুলে যাওয়া ভাল নয়', ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিতেন। স্কুলের ছাত্রীরা সমস্বরে নানারূপ স্তবপাঠ করিত। একদিন তাঁহার দিদিমা গঙ্গাস্নানের পথে উহা শুনিয়া যদিও খুশী হইয়াছিলেন, এবং সাময়িকভাবে সকলে নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছিলেন, তথাপি নানা ছুতায় তাঁহার স্কুল যাওয়াটা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। তিনি স্কুলের গাড়িতে যাইতেন, কোনদিন প্রস্তুত হইতে একটু দেরী হইলেই গাড়ি ফেরৎ দেওয়া হইত। তাঁহাদের বাড়ি গলির ঠিক মুখে অবস্থিত হইলেও সদর দরজা গলির ভিতর ছিল। গাড়ি বড় বলিয়া কোচম্যান গলির ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিত না। অথচ তিনি গলিটা হাঁটিয়া গাড়িতে উঠিবেন, তাহাতে অভিভাবকদের আপত্তি। পরে সিস্টারের আদেশে গাড়ি গলির ভিতর প্রবেশ করিত ; একদিন তাঁহাদের বাড়ির কোণে লাগিয়া গাড়ির কিছু ক্ষতি হইল ; সিস্টার শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। কোন জিনিসের ক্ষতি বা অপচয় তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, পরদিন সিস্টার নিজে গাড়ি লইয়া গিরিবালার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অনেকক্ষণ কথা-বার্তার পর তিনি বলিলেন, 'ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য—যিনিই ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন, তাঁকেই অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল ; আপনি আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলুন, তবু আপনাদের গৃহকর্মের অবসরে মাত্র ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই কন্যাটিকে আমি ভিক্ষা চাই। আপনাদের মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যায়, কালীঘাটে যায়। এই অল্প সময়ের জন্য মেয়েটিকে আমায় দেবেন কিনা, বলুন, বলুন আপনি।' এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ভদ্রলোকের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার এই আচরণে বিচলিত হইয়া মাতুল তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উঠাইয়া গিরিবালাকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলেন। তিনিও দুই বাহুদ্বারা গিরিবালাকে বেষ্টন করিয়া, 'আমার মেয়ে, আজ থেকে তুমি প্রতিদিন স্কুলে যেতে পারবে', এই বলিয়া তাঁহাকে লইয়া

গাড়িতে উঠিলেন। পরে স্কুলে গিয়া তাঁহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আদর করিয়া বড় একখানা বোম্বাই চাদর তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'আমার মেয়ে, এইরকম চাদর জড়িয়ে গাড়িতে উঠবে।'

মেয়েদের স্কুলে দেখিবামাত্র, 'এই যে আমার মেয়ে এসেছ?' বলিয়াই হাতজোড় করিয়া অভিবাদন জানাইতেন। মেয়েরা উঠিয়া নমস্কার করিবার পূর্বেই তিনি চলিয়া যাইতেন। তাঁহার সময় কোথায়? সর্বদাই কাজে ব্যস্ত।

মহামায়া নামে স্কুলের একটি ছাত্রী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলে নিবেদিতা ও কৃস্টীন তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবার কত চেষ্টাই করিয়াছিলেন। পুরীতে বাড়ি ভাড়া করিয়া মেয়েটিকে তাহার মাতা ও ভ্রাতার সহিত লইয়া গিয়া তিন মাস সেখানে অবস্থান করেন। সমস্ত ব্যয়ভার তাঁহারাই বহন করিয়াছিলেন। দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে মেয়েটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তাহার মৃত্যুতে নিবেদিতা ও কৃস্টীন উভয়েই বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন।

মধ্যে মধ্যে তাঁহার ছাত্রীগণকে খাওয়াইবার ইচ্ছা হইত। যখন তাহাদের লইয়া কোথাও বেড়াইতে যাইতেন, তাহাদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। গ্রীষ্মাবকাশ প্রভৃতির বিদায়গ্রহণকালেও ঐরূপে মেয়েদের খাওয়াইতেন। সুন্দর, ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙগায় ফল-মিষ্ঠান্নাদি সাজাইতেন ; পরে ঐগুলি একটি ঝোড়ায় তুলিয়া একে একে, সকলকে পরিবেশন করিতেন। আবার খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা ঠোঙগা ফেলিবে বলিয়া নিজেই ঝুড়ি হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরূপেই ক্ষুদ্র অতিথিগণের সেবা হইত।

প্রতি বৎসর মেয়েদের লইয়া উৎসাহের সহিত সরস্বতী পূজা করিতেন। খালি পায়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন। আবার যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব-দিবসও যথোচিত পালন করা হইত। ঐ উপলক্ষ্যে ক্রিস্‌মাস তরু সাজাইতেন ; বাইবেল হইতে যীশুর জীবনী পাঠ হইত ; আর মেয়েদের অজস্র লজেঞ্জ-বিস্কুট ও কেক উপহার দিতেন।

তাঁহার স্নেহের মধ্যে শাসনও ছিল। কোন বালিকা অপরাধ করিলে তাহার দিকে এমন কঠোর দৃষ্টিতে চাহিতেন যে, তাহাতেই তাহার শাস্তি হইয়া যাইত। সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে ভয় করিলেও পরক্ষণেই কিন্তু তাঁহার মধুর ব্যবহারে মেয়েদের ভয় দূর হইয়া যাইত। পাঠ দিবার সময় তাঁহার নিয়ম ছিল, কোন বালিকাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে সে ছাড়া অপর কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। একদিন ঐরূপ পড়াইবার সময় তাঁহার অন্যতমা ছাত্রী নির্ঝরিণী সরকার প্রবল আগ্রহবশতঃ যেন অজ্ঞাতসারেই অন্য একটি মেয়েকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহার উত্তর দিয়া ফেলেন। নিবেদিতা

তাঁহার দিকে শুধু একবার চাহিলেন। তাহাতেই যথেষ্ট শাস্তি হইয়া গেল। কিন্তু নিবেদিতা বালিকার কল্যাণের জন্য আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার এই ছাত্রীটি প্রত্যেক প্রশ্নেরই ভাল উত্তর দিয়া থাকে ; সুতরাং শাস্তিস্বরূপ তাহাকে কয়েক বার প্রশ্ন করিলেন না। তাহাকে বাদ দিয়া পরবর্তী বালিকাকে প্রশ্ন করা হইল। এই শাস্তিতেই নির্ঝরিণী যথেষ্ট আঘাত পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কোন পূজাবাড়িতে নিবেদিতাকে দেখিয়া তিনি যেই 'সিস্টার' বলিয়া আনন্দে তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়াছেন, নিবেদিতা তখনই 'মাই চাইল্ড' বলিয়া স্নেহের সহিত তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। বাড়ি ফিরিয়া তিনি জননীকে বলিয়াছিলেন, 'মা, আজ সিস্টারকে কী সুন্দর দেখতে হয়েছিল! তিনি কেমন আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলেন! তাঁকে দেখে আমার একটুও ভয় হয়নি, তবে স্কুলে মাঝে মাঝে তাঁকে দেখে অত ভয় হয় কেন, মা? তখন যেন তিনি আর একজন হয়ে যান।'

কোন মেয়ে অন্যায় করিলে অথবা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তিনি যখন দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেন, 'আমার মেয়ে, এরকম আর কখনো করবে না, এরূপ কাজ আর করবে না।' তখন তাঁহার কঠিন কণ্ঠস্বরে মেয়েরা ভয় পাইত। আবার যখন সহাস্য মুখে বলিতেন, 'আমরা নিশ্চয় পারব, নিশ্চয় করব', তখন তাহাদের হৃদয়ে কত আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইত!

বিদ্যালয় ছিল মেয়েদের আনন্দ-নিকেতন। এখানে যাঁহারা তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও সত্যলাভের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। অনেকেই জীবন-পথে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া নির্ভীকভাবে চলিবার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নিবেদিতা বলিতেন, 'বিদ্যালয়ের ওপর স্বামিজীর দৃষ্টি রয়েছে, এটি ভারতের নব-জাগরণের উদ্বোধন-মন্ত্রস্বরূপ হবে।'

অনন্যা

নিবেদিতার প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বদেশসেবক—প্রত্যেকে তাঁহার মধ্যে নিজ জীবনাদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং সর্বদাই তাঁহার নিকট নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য, উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ বোধ করিতেন।

তাঁহাকে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, 'আমি শিক্ষয়িত্রী।' সত্যই তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার আদর্শ ও অভিলাষ ছিল শিক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্-গণের চিন্তাধারা ও শিক্ষাপ্রণালীর সহিত পরিচয় এবং শিক্ষাকার্যে উহাদের যথাযথ প্রয়োগ তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ করিয়াছিল। স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের ফলে জীবনের গতি পরিবর্তিত না হইলে তিনি যে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌রূপেই খ্যাতিলাভ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কী? শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে কত প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি বলিতেন, 'হায়, শিক্ষাই তো ভারতের সমস্যা। কেমন করে প্রকৃত শিক্ষা—জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, য়ুরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণের পরিবর্তে, ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে পারা যায়, তাই সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতি-সাধন। তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে, পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র-স্থাপন।'

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর এবং প্রকার পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নহে। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষা অখণ্ড ও পরস্পরসংযুক্ত—ইহাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের চিন্তার বৈশিষ্ট্য। নিবেদিতা ইহা নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্ববিধ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, কারিগরী শিক্ষার সহিত চাই উচ্চ গবেষণার সুযোগ, কারণ উচ্চ গবেষণা ব্যতীত কারিগরী শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। নর-নারী-নির্বিশেষে শিক্ষার প্রয়োজন। প্রয়োজন বৈষয়িক শিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষা, এবং সর্বোপরি প্রয়োজন জনসাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা। পরাধীন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রশ্ন উঠে না; সুতরাং ঐ বিষয়ে ভারতবাসীকে স্বনির্ভর হইতে হইবে। এই জন-শিক্ষা কার্যকরী

করিবার উপায় সম্বন্ধে নিবেদিতা বলিয়াছেন, পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে প্রত্যেক যুবকের যেমন চার-পাঁচ বৎসর সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, ঐরূপ আমাদের দেশে শিক্ষালাভের পর যুবকগণের কিছুকাল শিক্ষাসৈনিক-রূপে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাকার্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার চিন্তাধারা লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্মিত হই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের প্রথম যুগে ইহার যে সকল সমস্যা ছিল, আজও তাহার সম্পূর্ণ সমাধান হইয়াছে, বলা চলে না। বিদেশী সরকারের অধীনে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে স্বভাবতঃই শিক্ষার গতি ছিল আড়ষ্ট ও মন্থর। তাহার উপর ছিল শিক্ষার লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার অভাব। ফলে যে মুষ্টিমেয় নারী সে সময় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষা পুরুষগণেরই অনুরূপ ছিল। এখন পর্যন্ত মূলতঃ তাহাই অব্যাহত আছে। এই শিক্ষা স্বরূপতঃ ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা সত্য যে, আমরা যদি 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করি, তবে কিছু পার্থক্য আপনিই আসিয়া পড়ে। পুরুষ ও নারী লইয়া সমাজ গঠিত। উভয়ে মিলিয়া গৃহের এবং সমাজের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন নির্বাহ করে। অতএব সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর বিভিন্নপ্রকার কার্য ও শিক্ষার প্রয়োজন আছে; ইহা দ্বারা একটি শ্রেষ্ঠ ও অপরটি হীন, এরূপ বুঝায় না। এই প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষে সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াই বর্তমানে কোন কোন অংশে বিশেষ ব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতা বলিয়াছেন, '...ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই সঙ্কটকালে স্ত্রীশিক্ষার পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত। এই পরিবর্তন কিরূপ হইবে, তাহাই প্রশ্ন। আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ দ্বারা শিক্ষার যথার্থ ফললাভ অসম্ভব। অতীতের হিন্দু নারীগণ কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন যে, তাঁহাদের প্রাচীন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাঁহাদের নম্রতা ও ধর্মভাব, তাঁহাদের সহিষ্ণুতা এবং প্রেম ও করুণার শিশুসুলভ গভীরতা বর্জন করিয়া আমরা পাশ্চাত্যের বিবিধ তথ্যসংগ্রহ—সামাজিক উন্দামতার যাহা প্রথম অপরিণত ফল, তাহাই গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইব?...যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন করিতে যাইয়া নম্রতা ও কমনীয়তা বিনষ্ট করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না।...সুতরাং ভারতীয় নারীগণের জন্য এমন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন, যাহার লক্ষ্য

হইবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতায় বিকাশ-সাধন' (Hints on National Education in India, pp. 54-55)।

শিক্ষার প্রণালী উদ্ভাবন সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাহার পূর্বে আবশ্যক শিক্ষার লক্ষ্য বা আদর্শ নির্ণয়। নিবেদিতা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, 'অন্ততঃ এই আদর্শ নির্বাচনে বোধ হয় জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য অধিক। অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী। ইতিহাস, সাহিত্য, যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্বত্র তাঁহাদের মহিমময় মূর্তি উদ্ভাসিত।...ভারতের ইতিহাস এবং সাহিত্যে নারীত্বের যে জাতীয় আদর্শ বিরাজমান, যে শিক্ষা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শকে উচ্চ স্থান প্রদান না করে, তাহা কখনই ভারতীয় নারীগণের প্রকৃত শিক্ষারূপে পরিগণিত হইতে পারে না' (Hints on National Education, pp. 55-56)।

বিদেশীয় সরকারের শাসনাধীনে, বিদেশীর অনুকরণে যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করিবার পরিপন্থী। সেজন্যই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশের নেতৃবর্গের উদ্যোগে 'জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' স্থাপিত হয়। নিবেদিতা তখন হইতে নানা পত্রিকায় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষে বর্তমানে শিক্ষা কেবল জাতীয় হইবে, তাহা নহে, পরন্তু উহা জাতিগঠনমূলকও হওয়া প্রয়োজন।'

স্বাধীন ভারতে সর্বতোমুখী শিক্ষার যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, এবং উহাকে কার্যকরী করিবার যে আয়োজন চলিতেছে, তাহা যদি জাতীয়তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সমস্তই বৃথা হইবে। নিবেদিতা বলিয়াছেন, শিক্ষার্থীকে মনে রাখিতে হইবে, তাহার উন্নতির লক্ষ্য কেবল আত্মকল্যাণ নহে, পরন্তু জন-দেশ-ধর্মই তাহার প্রধান লক্ষ্য। এই জন-দেশ-ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে শিক্ষাদান, তাহাই শিক্ষার্থীকে যথার্থ মানুষ করিয়া তুলিয়া স্বদেশের সেবায় নিযুক্ত করে। এই স্বদেশপ্রীতি যখন হৃদয়ে দৃঢ় হইয়া দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে গর্বের সহিত শ্রদ্ধা করিতে শিখায় তখনই অপর জাতির মহত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শের যথার্থ মর্মগ্রহণ সম্ভবপর হয় ; নতুবা আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়া অপর জাতির অনুকরণ চরিত্রকে নিকৃষ্ট করিয়া ফেলে।

শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার মূল্যবান প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ 'মডার্ন রিভিউ', ও 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে উহাদের কয়েকটি 'Hints on National Education in India' (ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষার

ইঙ্গিত) নাম দিয়া তাঁহার দেহত্যাগের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতাগুলি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

নিজেকে শিক্ষয়িত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেও ভারতবর্ষে নিবেদিতার যথার্থ পরিচয় দেশসেবিকারূপে। ভারতে তাঁহার প্রথম বসবাসের যুগে বক্তৃতা সহায়ে এবং পরবর্তী কালে লেখার মধ্য দিয়া এদেশের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বহুভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বক্তা হিসাবে তাঁহার তুলনা বিরল। বক্তব্য বিষয়কে তিনি সুস্পষ্টরূপে এবং দৃঢ়তার সহিত স্থাপিত করিবার কৌশল জানিতেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি যে প্রাণস্পর্শী হইত, তাহার কারণ--উহাতে হৃদয়ের আবেগের পশ্চাতে থাকিত চরিত্র। তাঁহার কথা এবং কার্যের মধ্যে মিল ছিল। নিজ জীবনে যাহা কার্যে পরিণত করেন নাই, সে সম্বন্ধে তিনি কখনো বৃথা বক্তৃতা দিতেন না। তিনি যখন বক্তৃতা দিতে উঠিতেন, তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, এবং তাঁহার অগ্নিময় বাণীর প্রতি অক্ষরে এদেশের প্রতি যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইত, তাহা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত ; তাঁহারা দেশের জন্য কিছু করিতে ব্যাকুল হইতেন। ১৯০২ ও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বহু স্থানে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা টাউনহলে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ডাইনামিক রিলিজন'। ঐ বক্তৃতায় সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, '৬।৭ বৎসর পূর্বে কলিকাতার টাউনহলে আমি তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছিলাম। মঞ্চের উপর বহু য়ুরোপীয় নরনারী উপস্থিত ছিলেন, এবং হলঘরটি বহু বাঙ্গালী যুবকের সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—ডাইনামিক রিলিজন, অন্য কথায় বলিতে গেলে "স্বাদেশিকতা"। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরিয়া নিবেদিতা বক্তৃতা দেন। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের মত নিঃশব্দে উপবিষ্ট ছিল। তাহাদের হৃদয়ে ঐ বক্তৃতা সেদিন উত্তেজনার বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার বলিষ্ঠ ও মধুর কণ্ঠে সেদিন যে সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছিল তাহার সারমর্ম হইতেছে, "আর বৃথা বাক্যব্যয় নয়, এখন চাই কাজ—কাজ—কাজ।" তাঁহার প্রত্যাশিত সময়ের পূর্বেই এই বক্তৃতার ফল দেখা গিয়াছিল।' বিপিন পাল ঐ বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহা ডাইনামিক রিলিজন নয়, ডিনামাইট (অর্থাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরক)।' তিনি বহু বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন ; কিন্তু যে বিষয়টি তাঁহার সমগ্র মনঃপ্রাণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতেছে—জাতীয়তা।

নিবেদিতা ছিলেন শিল্পী। ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ে তাঁহার দান কতখানি, তাহার উল্লেখ ব্যতীত আধুনিক ভারত-শিল্পের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি বলিতেন, 'শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অবশ্য ঐ শিল্প জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।' বস্তুত তাঁহাকে ভারতীয় চিত্রকলার ধাত্রী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কলিকাতায় স্থায়ী বসবাসের প্রারম্ভে কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ই. বি. হ্যাভেলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ঐ সময় হইতেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শিল্পী ও শিল্পরসিকগণের যে সভা বসিত, তিনি ছিলেন তাহার অন্যতম উৎসাহী। তখন হইতেই অবনীন্দ্রনাথের সহিতও তাঁহার পরিচয়। মিঃ হ্যাভেল, নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ, এই তিন জনের মিলন ভারতীয় চিত্রকলায় যুগান্তর আনিয়াছিল। ঐ চিত্রকলা সম্বন্ধে মিঃ হ্যাভেলের উচ্চ ধারণা থাকায় তিনি উহার গূঢ় অর্থ গ্রহণে উৎসুক ছিলেন। নিবেদিতার সহিত প্রথম সাক্ষাতে তিনি চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি ছেলেদের তুলি ধরতে এবং রং দিতে শেখাতে পারি, কিন্তু কাউকে শিল্পী বা গুণী করে তুলতে পারি না।' নিবেদিতার মনে হইল তিনি নিজে পারেন। এ কাজ কঠিন নয়। দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, বংশগৌরব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ভারতবর্ষের জন্য এক অদম্য ব্যাকুলতা, এইগুলির সমাবেশ হইলেই শিল্পে, বিজ্ঞানে, ধর্মে শক্তির এরূপ জোয়ার আসিবে যাহা কেহই রোধ করিতে পারিবে না। সুতরাং তুলি ধরিতে শিখাইবার সময় ছাত্রদের ঐভাবে অনুপ্রাণিত করাই বড় কাজ। তবেই যথার্থ শিল্পী গড়িয়া তোলা যাইতে পারে।

ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম শিক্ষালাভ স্বামিজীর নিকট। উত্তর ভারত ভ্রমণকালে ভারতীয় চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান হয়। শিকাগো শহরে 'ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া স্বামিজীর নিকট হইতেই তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন। প্যারিস ধর্মেতিহাস-কংগ্রেসে স্বামিজী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ভারতীয় সভ্যতা গ্রীক চিন্তা ও গ্রীক শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। নিবেদিতা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত শিল্প সম্বন্ধে স্বামিজীর সহিত তাঁহার বহুবার আলোচনা হইয়াছে। স্বীয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি ভারতীয় শিল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও গভীর ভাবব্যঞ্জনা সহজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার পত্রিকায় প্রথম প্রথম কেরল-শিল্পী

রবিবর্মার ছবির প্রতিলিপি এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রতিলিপি ছাপিতেন। নিবেদিতা ক্রমাগত তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, রবিবর্মার ও ঐ ধরনের অন্যান্য চিত্রের রীতি ভারতীয় নহে ; পাশ্চাত্য রীতির চিত্র হিসাবেও সেগুলি উৎকৃষ্ট নহে। গ্রীক-গান্ধার মূর্তিশিল্প যে ভারতীয় মূর্তিশিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, এবং গান্ধার মূর্তিশিল্পের বাহ্য কারিগরী গ্রীক হইলেও তাহাতে প্রাণ যতটুকু আছে, তাহা যে ভারতীয়, তাহা তিনি প্রদর্শন করেন।

চিত্রের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও উহা ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা তাঁহার বিশেষরূপ ছিল। 'মডার্ন রিভিউ'তে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য শিল্পি-গণের বহু চিত্রের পরিচয় তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল সমালোচনায় ব্যক্ত চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত মতামতের মূল্য কম নহে। প্যারিস হইতে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অঙ্কিত বহু চিত্র তিনি সংগ্রহ করিয়া 'মডার্ন রিভিউ'তে ধারাবাহিকরূপে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ চিত্রগুলির পরিচয় তিনি নিজেই লিখিয়া দিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, পাশ্চাত্য চিত্রের নিকৃষ্ট অনুকরণ না করিয়া উহার মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, এদেশের শিল্পীরা তাহা উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় ভঙ্গীতে, নিজস্বভাবে প্রকাশ করিবেন। আর্ট স্কুলে তিনি বহুবার বক্তৃতা দিয়াছেন। ঐ বক্তৃতাগুলি পাওয়া গেলে 'আর্ট' সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইত সন্দেহ নাই। 'জাতীয়তা গঠনে আর্টের কাজ', 'আর্টের বাণী' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি হইতে তিনি যে আর্টের কত বড় সমঝদার ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ভারতীয় কলাশিল্পের পুনর্জাগরণ ও সম্প্রসারণকল্পে মিঃ হ্যাভেলের অকুণ্ঠ সাধনার পশ্চাতে ছিল নিবেদিতার ঐকান্তিক উদ্যম ও সহায়তা। হ্যাভেল-রচিত 'ভারতীয় ভাস্কর্য ও অঙ্কন' (Indian Sculpture and Painting) পুস্তকের সমালোচনার প্রারম্ভে নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 'এই সর্বপ্রথম একজন য়ুরোপীয় ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ভারত ও ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পরিচয় সুপরিস্ফুট। মিঃ হ্যাভেলের নিকট ভারতীয় আর্ট আর পণ্যদ্রব্য মাত্র নহে। তিনি কেবল ভারতের গৌরবময় অতীত প্রসঙ্গেই মুখর হন নাই ; তাঁহার দৃষ্টিতে ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক হইয়া দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে মিঃ হ্যাভেলের অভিমত সে যুগে বাস্তবিক বিস্ময়কর। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় আর্টের তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, য়ুরোপীয় আর্টে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ, তাহা পার্থিব ; ভারতীয় আর্টের

সৌন্দর্য স্বগীয়। নিবেদিতা ও হ্যাভেল উভয়ে মিলিয়া সেদিন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সমালোচকের হীন আক্রমণ হইতে ভারতীয় আর্টকে রক্ষা করিয়া বিশ্বের দরবারে উহাকে যথাযথ মর্যাদাদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আর তাঁহাদের সহায়তায় উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও রূপায়ণের ভার লইয়াছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে বলিয়াছেন, ভারতীয় চিত্রকলা ও প্রাচ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে তাঁহার প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল নিবেদিতার অনুপ্রেরণা। চিত্রাঙ্কনে প্রথমে তিনি পাশ্চাত্য ভাবেরই অনুকরণ করিতেন ; নিবেদিতাই তাঁহাকে ভারতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিবার প্রেরণা দেন। নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরস্পরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের বহু চিত্রপরিচয় নিবেদিতা লিখিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার 'ভারতমাতা' চিত্রের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। এই স্বদেশী চিত্র-শিল্পের প্রচারের ভার লইয়াছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নিবেদিতাকে দিয়া তিনি চিত্রকলা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখাইতেন। চিত্রপরিচয় লিখাইয়া স্বয়ং অনুবাদ করিয়া প্রবাসীতেও ছাপাইতেন। অজন্তা গুহার চৈত্য ও বিহারগুলি সম্বন্ধে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জগদীশ বসুর স্বদেশী শিল্প ও চিত্রকলার প্রতি যে অনুরাগ, তাহারো পশ্চাতে ছিল নিবেদিতার প্রভাব। তাঁহার গৃহের দেওয়ালে ভারতমাতার চিত্র সম্ভবতঃ নিবেদিতাব ইচ্ছাতেই অঙ্কিত হয়। নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির শিল্প-সাধনায় পরে যোগ দেন আনন্দ কুমারস্বামী। এই সূত্রেই নিবেদিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নিবেদিতার নিকট কেবল উৎসাহ ও প্রেরণালাভ করেন নাই, ভারতীয় পদ্ধতি অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন করিবার জ্ঞানও অর্জন করিয়াছিলেন। নন্দলাল বসু বলেন, আর্ট স্কুলে প্রথম তাঁহার অঙ্কিত 'কালী', 'সত্যভামা', 'দশরথ ও কৌশল্যা', 'জগাই-মাধাই' প্রভৃতি চিত্রগুলি দেখিয়া নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ত্রুটিগুলি উল্লেখপূর্বক সংশোধন করিতে বলেন। নন্দলালের শিল্প-প্রতিভা তাঁহাকে দেখামাত্র নিবেদিতার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ; তাই তাঁহাকে তাঁহার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া যান।

নন্দলালবাবু বলেন, 'একদিন আমি আর সুরেন গাঙ্গুলী গেলুম সিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে। বাগবাজার বোসপাড়া লেনের একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ির একটা ছোট্ট কামরা। আমাদের বসতে বললেন। আমরা বসলুম

একটা সোফাতে। নীচে মেঝেতে কার্পেট পাতা ছিল। সিস্টার বললেন, "তোমরা আসন করে বস, আমি দেখি।" বলতে আমাদের খুব রাগ হ'ল। মেমসাহেব আমাদের অপমান করল! সিস্টার কিন্তু তখনই বললেন, আমাদের ভাব বুঝে, "তোমরা বুদ্ধের দেশের লোক। তোমাদের সোফায় বসা দেখতে আমার ভাল লাগে না। তোমরা এই যেভাবে বসেছ ঠিক বুদ্ধের মত। ভারী ভাল লাগছে আমার দেখতে।"' তারপর নিবেদিতা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কী দেখিলেন তিনিই জানেন, তবে বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ করিলেন, এবং ক্রিস্টীনকে ডাকিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। নন্দলাল একখানি ছবি লইয়া গিয়াছিলেন—'দশরথের মৃত্যু'। ছবিখানি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, 'আমার খুব ভাল লাগছে। এই যে ঘরটা করেছ, এটা খুব কাম অ্যান্ড কোয়ায়েট হয়েছে ; ঠিক শ্রীমার ঘরের মত কোয়ায়েট মনে হচ্ছে। তাই বোধ হয় এত ভাল লাগছে আমার। ইহার পর তাঁহার টেবিলের উপরের বুদ্ধমূর্তি দেখাইয়া বলিলেন, 'কার মূর্তি বল দেখি?' নন্দলাল উত্তর করিলেন, 'এটি বুদ্ধমূর্তি।' নিবেদিতা বলিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু দেখ, আমার গুরুদেবের চেহারার সঙ্গে এ মূর্তির কি আশ্চর্য মিল! তিনিই যে বুদ্ধ।'

নন্দলাল বসু স্বামিজীর ছবি আঁকিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। ছবি পাইয়া তিনি খুব আনন্দিত হন, কিন্তু বলিলেন, ছবিতে বেশী কাপড় জড়ানো হইয়াছে। নন্দলালবাবুকে তিনি স্বামিজীর ছবি আঁকিবার পরিকল্পনা এইরূপ দিয়াছিলেন—হিমালয়, গঙ্গার ধারা নামিয়া আসিতেছে, পার্শ্বে স্বামিজী বসিয়া আছেন ধ্যানস্থ হইয়া। অতঃপর নন্দলাল প্রভৃতি প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনিও নানা উপদেশ দিতেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার পরিচয় ইঁহারা তাঁহার নিকটেই লাভ করেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে বীরত্বপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে ছবি আঁকিবার জন্য তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেন।[১]

অসিতকুমার হালদার লিখিয়াছেন, 'আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণা-কাল। ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজার যেতাম। আমদের উপদেশছলে বারবার সাবধান করতেন, আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দি। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের

[১] উদ্বোধন, ১৩৪৭, পৃঃ ৫৬৬ ও আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই পৌষ, ১৩৬০।

নবজাগরণ নির্ভর করছে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।...আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, আমাদের ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে আসতেন এবং শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন।'

প্রত্যেক দেশের জাতীয় জীবনের মর্মকথা সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই ভাবী বংশধরগণের নিকট অভিব্যক্ত হয়। নিবেদিতা তাহা জানিতেন বলিয়াই জাতীয় শিল্প-জাগরণে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যম ছিল।

ভারতবর্ষে নিবেদিতার পরিচয় যতরূপেই হউক, বিশ্বের নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় লেখিকারূপে। রচনায় তাঁহার জন্মগত অধিকার ছিল। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'কালী দি মাদার' বিদ্বৎসমাজে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই পুস্তক পড়িয়া তাঁহার সহিত পরিচয়ের পূর্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার 'The Web of Indian Life' পুস্তকখানি পাশ্চাত্য জগতে যুগান্তর আনিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকখানির গুণাগুণ-বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহার কোন কোন স্থলে ভারতীয় জীবনযাত্রাকে নিখুঁত ও আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিবার প্রচেষ্টা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু চিন্তার গভীর সামঞ্জস্য ও রচনাশৈলী অপূর্ব। এই পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং এক পত্রে (৩০।৬।০৪) মিস ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ম্যাকলাউড পুস্তকখানি প্রকৃতপক্ষে স্বামিজী কর্তৃক লিখিত বলিয়া মনে করিবেন এবং ইহা দ্বারা কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথমতঃ, এই পুস্তক মিশনরী-দের অন্তঃপুরে প্রচারের অবসান ঘটাইবে ও ভারত সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ তাহার নিজের সম্বন্ধে যথার্থরূপে চিন্তা করিতে শিখিবে—যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ; আর সর্বোপরি, যাহারা অকপট, তাহাদিগকে স্বামিজীর রচনা ও শিক্ষানুযায়ী জীবন-গঠনে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবে। আর এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা-সাধন।'

নিবেদিতার উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই বিচার্য। বহুদিন হইতে মিশনরীগণ ও বিদেশী পর্যটকগণ ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে যে মিথ্যা ও জঘন্য কুৎসা রটনা করিয়া আসিতেছিলেন, সাধারণ ভারতবাসী তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিত না। ইংরেজী-শিক্ষিত পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রতিবাদ

করার পরিবর্তে নিজেদের দৈন্য ও কুসংস্কার স্মরণ করিয়া লজ্জায় মৃতপ্রায় হইতেন। যাঁহারা পাশ্চাত্যে গমন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'আমাদের দেশ বর্তমানে অনেক উন্নত হইয়াছে, এবং আমরা নানারূপ সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত' ইত্যাদি ক্ষীণ স্বরে বলিয়া দেশের কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতে সগৌরবে, উচ্চকণ্ঠে ভারতের মহিমা, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঘোষিত করেন। ইহার ফলে মিশনরীগণ স্বভাবতঃই, নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়, দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। স্বামিজীর কয়েকখানি পত্রে তাঁহাদের এই হীন প্রচেষ্টার আভাস মাত্র পাওয়া যায়। এতদিন পরে মেরী লুইস বার্ক প্রণীত 'Swami Vivekananda in America : New Discoveries' নামক পুস্তকে তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমেরিকায় অবস্থানকালে নিবেদিতা ইঁহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন ; পরে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডেও অনুরূপ অভিজ্ঞতায় তিনি ক্রুদ্ধ হন। 'Lambs among Wolves' নামক প্রবন্ধে তিনি ইহার প্রতিবাদ করেন। অতঃপর মিশনরীগণের অপপ্রচারের সমুচিত উত্তর দিবার জন্য তিনি 'The Web of Indian Life' লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষকে মিশনরীরা যেরূপ বিকৃতভাবে চিত্রিত করিত, এই পুস্তকে তাহার কোন প্রতিবাদ বা সমালোচনা নাই। তিনি অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া ভারতীয় জীবনযাত্রাকে যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এই কৌশল অবলম্বনেই তাঁহার উদ্দেশ্য শতগুণে সফল হইয়াছিল। তাঁহার ইংলণ্ড ও আমেরিকার বন্ধুগণ এই পুস্তকখানির প্রচার-সাফল্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মিসেস বুল ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোগী। ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট, পলমল গেজেট, ডেলী নিউজ, সান্‌ডে, প্লাসগো হেরাল্ড, সান, ডেলী ক্রনিকল, বার্মিংহাম পোস্ট, ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস প্রভৃতি ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। প্রত্যেক সমালোচক পুস্তকখানির নানা স্থান উদ্ধৃত করিয়া মুক্তকণ্ঠে রচনার প্রশংসার সহিত ভারতীয় জীবনকে মর্যাদা দিয়াছেন। একজন ইংরেজ নারী কর্তৃক পাশ্চাত্য জগতে এই ধরনের পুস্তকপ্রকাশের গুরুত্ব আজ আমরা কল্পনাও করিতে পারিব না। বিশেষতঃ, এই পুস্তকের অন্তর্গত ভারতীয় নারীগণ সম্বন্ধে তাঁহার বিভিন্ন রচনাগুলি সত্যই সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল।

স্বামিজী মেরী হেলকে এক পত্রে (৯।৭।৯৭) লেখেন, '...প্রিয় মেরী, ধর যদি ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথা বলেই থাকি তবু তারা

আমার মা-বোনদের বিরুদ্ধে যে সব কথা বলে, তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কি তাতে প্রতিশোধ হয়?'

নিবেদিতাও উত্তেজিত হইয়া বহুবার ঐ সকল কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই পুস্তকখানিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর উত্তর। ভারতীয় পরিবারে জননী, পত্নী এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার রক্ষয়িত্রী-রূপে নারীগণের যে প্রকৃত পরিচয়, তাহাব বর্ণনা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া লেডি হেন্‌রী সমারসেট 'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষের পারিবারিক জীবনে নারীগণের স্থান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমাদের সমুদয় জ্ঞান মিশনরীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। জনৈকা ইংরেজ মহিলা, মিস নোব্‌ল তাঁহাদের জীবনযাত্রার এবং চরিত্রের যে উচ্চ আদর্শ, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে নূতন এবং যথার্থ জ্ঞান আহরণ করিলাম।'

'দি সান্‌ডে' পত্রিকায় হেনরী মারী (Henry Murry) লিখিয়াছিলেন, 'মিস নোব্‌ল আমাদের যে ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত করিয়াছেন, তাহা অর্ম, অথবা মিল, বা কর্নেল মেডাজ টেলর, বা মিঃ রাডিয়ার্ড কিপলিঙ, কিংবা মিসেস স্টীলের ভারতবর্ষ নহে। তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া আমরা প্রকৃত ভারতবর্ষকে চিনিলাম।'

নিবেদিতার রচনার মধ্যে ভারতবর্ষ সেদিন সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল। বিশ্বৎসমাজে তাঁহার পুস্তকখানি কেবল সমাদর ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করে নাই, তাঁহার অপূর্ব সাহিত্য-প্রতিভা পূর্ণ মর্যাদার সহিত সাহিত্য-জগতে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। বহু গুণী ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকপটে প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়লাভে তাঁহাদের কী আগ্রহ! বাস্তবিক, কেবল এই পুস্তকখানি রচনার জন্যই সেদিনের ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে পারিত। এমন কি, মিসেস এফ এ. স্টীল এবং রাডিয়ার্ড কিপলিঙ্ পর্যন্ত পুস্তকখানির প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নিবেদিতার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, ইহা বুঝিতে মিশনরীগণের বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং ইহার প্রতিবাদস্বরূপ মিস এমি উইলসন কারমাইকেল নামক জনৈক মিশনরী মহিলা অনতিবিলম্বে 'Things as they are' নাম দিয়া এক পুস্তক ছাপাইলেন। 'মাদ্রাজ মেল' উহার সমালোচনা করিয়া বলিল, 'সত্যই মিস এমি উইলসন কারমাইকেলের নৈরাশ্যবাদ অপেক্ষা ভগিনী নিবেদিতার আশাবাদই আমরা পছন্দ করি।'

বস্তুতঃ মিশনরীরা ক্ষিপ্ত হইয়া নিবেদিতাকে অভদ্রভাবে আক্রমণ করিয়া পুস্তকখানির বিরুদ্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছিল, তাহাতে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন, কারণ ইহাতে তাহাদের স্বরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সমাজে প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি এক পত্রে লেখেন, 'মিশনরীদের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সময় সময় তাহারা বেশ মজার কথা বলে, এবং সব সময়ই তাহারা বেচারা গ্রন্থকারদের ধারণার অধিক অনেক কথা বলিয়া যায়। ভারতবর্ষেই আমার পুস্তকের মর্মবোধ হওয়া উচিত—যাহাতে জগৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, ইহা দ্বারা প্রকৃত অবস্থার অর্ধেকও বলা হয় নাই' (৪।২।০৫)।

'পাইওনীয়ার' পত্রিকা তীব্র আক্রমণ করিয়া দীর্ঘ সমালোচনান্তে লিখিল, 'ইহা ছদ্মবেশে রাজনৈতিক প্রচার-পুস্তিকা ব্যতীত কিছুই নয়।' প্রকৃতপক্ষে পুস্তকখানি সে সময়ে যে চাঞ্চল্য এবং আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে তবেই ইহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে।

পুস্তকখানির অসামান্য সাফল্য তাঁহাকে ভারতবর্ষের সেবায় প্রকৃত কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের যে পরিচয় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট লাভ করিয়াছেন, অতঃপর লেখনীর মাধ্যমে ভারতবাসী ও পাশ্চাত্যবাসীর নিকট তাহার ব্যাখ্যা করাই হইবে তাঁহার প্রধান কাজ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের বক্তৃতা-সফরের পর তিনি ব্যাপকভাবে বক্তৃতাদান বন্ধ করিয়া সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন বিভিন্ন পুস্তকরচনায়। 'The Master as I Saw Him' (স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি) তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ স্বামিজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে স্বামিজীর জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিবেদিতার মনে হইয়াছিল, যে জীবনী একাধারে সরল ও মহৎ হইবে, যাহার মধ্যে ধ্বনিত হইবে ভারতের হৃৎস্পন্দন, অথচ যাহাতে অভ্রান্তরূপে এক মহামানবের জীবনকাহিনী বিবৃত হইবে, তাহা লিখিবার পূর্বে বহু সময় অতিবাহিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় জীবনের নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী সম্বন্ধে লিখিবার সংকল্প তাঁহার দৃঢ় হইতে থাকে। স্বভাবতঃই, দীর্ঘদিন চিন্তার ফলে স্বামিজীর জীবন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও ব্যাখ্যার প্রণালী স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল, এবং স্বীয় অন্তরের আবেগকেও তিনি সংযত করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামিজীর জীবনী যেন একখানি মহাগ্রন্থ হয়, যাহার পৃষ্ঠাগুলি

মনোযোগ সহকারে উল্টাইলে ধীরে ধীরে ভারতাত্মার পূর্ণ আদর্শ ফুটিয়া উঠিবে—বারে বারে ইতিহাসের উত্থান-পতনের ও বহু বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া যে মহান্ আদর্শের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে ; যাহার মধ্যে ভারতের অতীত ও বর্তমান রূপায়িত এবং ভবিষ্যৎ ভারতের অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত। কিন্তু স্বামিজীর জীবন-বেদ রচনা করিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়? তিনি কেবল যেভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাহার কাহিনীই বলিতে পারেন। তাই প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষদিন পর্যন্ত তিনি স্বামিজীকে যেমন দেখিয়াছেন, 'The Master as I Saw Him' তাহারই যথাযথ বিবরণ ও ব্যাখ্যা—স্বামিজীর জীবনের কয়েকটি আলেখ্য মাত্র। কিন্তু সে আলেখ্য কী সুন্দর ও স্বচ্ছ! নিবেদিতা কেবল লেখিকা নহেন, উচ্চদরের শিল্পী। বর্ণ-বিন্যাসের দ্বারা সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করা শিল্পীর ধর্ম।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ টি. কে. চেইন 'হিবার্ট জার্নাল' পত্রিকায় ঐ পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, 'শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে এই পুস্তকখানিকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে ; ঐ স্থান বিবিধ শাস্ত্রের নীচেই, কিন্তু "কনফেশনস্ অব সেণ্ট অগাস্টীন" ও সাবাডিয়ের "লাইফ অব সেণ্ট ফ্রান্সিসে'র পার্শ্বে' (...it may be placed among the choicest religious classics, below the various Scriptures, but on the same shelf with 'Confessions of Saint Augustine' and Sabatier's 'Life of Saint Francis')।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে তিনি ভবিষ্যৎ রচনাবলী সম্পর্কে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া লেখেন যে, 'Cradle Tales of Hinduism' ও স্বামিজীর জীবনী ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশের সংকল্প আছে, যথা, 'Indian Nationality' (ভারতীয় জাতীয়তা), 'Foot Falls of Indian History' (ভারতীয় ইতিহাসের পদক্ষেপ) 'Education' (শিক্ষা), 'Indian Studies' (ভারত পর্যবেক্ষণ) এবং সম্ভব ও সুবিধা হইলে পাশ্চাত্য আদর্শ সম্বন্ধে কোন পুস্তক। ঐ পুস্তকগুলি তিনি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয় রচনাগুলি অবলম্বনে 'Religion and Dharma' (রিলিজিয়ন ও ধর্ম), এবং ব্রহ্মবাদিন্, মডার্ন রিভিউ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ অবলম্বনে 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' (স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে), 'কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ' এবং 'শিব ও বুদ্ধ' উদ্বোধন কর্তৃক পরে প্রকাশিত হয়। 'Myths of the Hindus and Buddhists' (হিন্দু ও

বৌদ্ধগণের পুরাণকাহিনী) পুস্তকখানির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ তিনি লিখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, আনন্দ কুমারস্বামী উহা শেষ করেন।

তাঁহার পুস্তকগুলি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার পুস্তকগুলি সবই স্বামিজীর। তিনিই আমাকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়াছিলেন। সুতরাং উহাদের সমগ্র আয় তাঁহার অভিলষিত নারীজাতির শিক্ষাকার্যে ব্যয়িত হইবে।'

পুস্তক-প্রণয়ন ব্যতীত তিনি আজীবন অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রায় সকল ইংরেজী মাসিক ও দৈনিক পত্রে তাঁহার লেখা বাহির হইত। পাশ্চাত্যেরও বহু পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নিবেদিতার ধর্মবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব এবং চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল। এই সকল বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। তদ্ভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে ত' তিনি খুব ভাল প্রবন্ধই লিখিতে পারিতেন। তাঁহার প্রবন্ধ তিনি যেরূপ লিখিতেন প্রায় সেইরূপই ছাপিতাম। দু-একটির কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে ; টিপ্পনী, মন্তব্য, বা নিবন্ধিকা তিনি যাহা লিখিতেন, তাহার কোন কোনটি পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত করিতাম। তাহা করিবার একটি কারণ, আমাদের দেশের "রাজদ্রোহ-বিষয়ক আইন"। কেননা তিনি অনেক সময় খুব স্পষ্ট ভাষায় কঠোর সত্য লিখিতেন। "আপনার বিবেচনার উপর আমার বিশ্বাস আছে" পরিবর্তন করিবার ভার আমাকে এই বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা কোন কোন নোট আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া স্বাক্ষরবিহীনভাবে প্রকাশিত হওয়ায় এখন আর সহজে তাঁহার বলিয়া ধরিবার জো নাই ; যাঁহারা তাঁহার লিখনভঙ্গী ও চিন্তার ধারার সহিত বিশেষ পরিচিত তাঁহারাই ধরিতে পারেন' (উদ্বোধন, ১৩৩৫, মাঘ)। নিবেদিতা বহু সময় কোন্ রচনা কোন্ পত্রিকায় প্রেরণ করিলেন, তাহা ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। উহাতে দেখা যায়, ১৯০৭ হইতে ১৯১১ পর্যন্ত মডার্ন রিভিউএর সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিবার ভার কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি অপরের কত লেখা যে সংশোধন এবং বহু স্থলে পুনর্লিখন করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মিঃ গুড্উইনের সাঙ্কেতিক নোট অবলম্বনে লিখিত স্বামিজীর 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ' পুস্তকের উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণের সম্পাদনা তিনিই করেন।

ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যে গভীর জ্ঞান, তাহা তিনি ভারতে আগমনের পূর্বেই অর্জন করিয়াছিলেন : আশ্চর্য এই যে, যখন এ দেশের বহু শিক্ষিত, জ্ঞানী ব্যক্তি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী

লইয়া সমগ্র ভারতকে দেখিতে ও পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে ভারতীয় জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করিয়া উহার সংস্কার-সাধনে ব্যস্ত, নিবেদিতা তখন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্রভাবে উহার কল্যাণ ও উন্নতির চেষ্টায় তৎপর। তিনি বলিতেন, 'আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি আমার যাত্রার আরম্ভ ভারতবর্ষে, আর ভারতবর্ষেই তার পরিসমাপ্তি। তার ইচ্ছা হলে সে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে' (India is the starting point, and the goal, as far as I am concerned. Let her look after the West if she wishes.)।

মহীয়সী

পরিচয়ের প্রারম্ভেই যে সকলে নিবেদিতার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, তাহার কারণ তাঁহার দুর্লভ অনুপম ব্যক্তিত্ব, হৃদয়বত্তা ও চরিত্রের মাধুর্য। তাঁহার আকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের সহিত এমন একটা দীপ্তি ছিল, যাহা সচরাচর চোখে পড়ে না। তাঁহার ছাত্রীগণের নিকট শোনা যায়, তিনি ছিলেন সুন্দরী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'সুন্দরী, সুন্দরী তোমরা কাকে বল জানি না। আমার কাছে সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা। সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠলো।' মনে হয়, উহা কেবল দৈহিক সৌন্দর্য নহে; তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য মুখে ও সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া উহাদিগকে এক স্বর্গীয় আভা দান করিত। তাঁহার আকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন লিখিয়াছেন, তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী, বলিষ্ঠ। মুখাবয়ব শক্তি ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। প্রশস্ত ললাট। শান্ত ও গাঢ়নীল উজ্জ্বল নয়ন। আলগা ও চূড়া করিয়া বাঁধা বাদামী ঘন কেশ শাড়ির মত ললাটের প্রান্তভাগ বেষ্টন করিয়া থাকিত। বর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত; কণ্ঠস্বর মধুর ও সতেজ। সাধারণতঃ শান্ত, সহাস্য মুখ এবং মধুর, উজ্জ্বল দৃষ্টির প্রায়ই রূপান্তর ঘটিত; কারণ তাঁহার মনোভাব চোখে মুখে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইত (Prabuddha Bharat, 1911, p. 215)।

ছবিতে যেরূপ দেখা যায়, প্রায় সর্বদাই ঐরূপ শুভ্র, দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা তাঁহাকে অন্যান্য য়ুরোপীয় মহিলা হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিত। শাড়ি কদাচিৎ পরিতেন। বাহিরে যাইবার সময় কখনো কখনো গাউন পরিতেন; তাহাও অত্যন্ত সাধারণ। তাঁহার চালচলন, কথাবার্তা ও সকল আচরণ দ্রুত ও তেজঃপূর্ণ ছিল। আনন্দ ও উৎসাহের যেন সজীব প্রতিমূর্তি। মিঃ নেভিনসন লিখিয়াছেন, 'নিবেদিতার চারিদিকে অগ্নিশিখার মত একটা উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ হইত। শুধু তাঁহার অপূর্ব বাক্যবিন্যাস নহে, তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রায়ই আমাকে প্রদীপ্ত বহ্নির কথা স্মরণ করাইয়া দিত। শিব, কালী ও অন্যান্য ভারতীয় দেবদেবীগণের মধ্যে যেমন একাধারে ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রকাশ, ভীষণ ও মধুর ভাবের বিকাশ, নিবেদিতার মধ্যেও ছিল ঐরূপ একাধারে রুদ্র ও কমনীয় মূর্তি। নিকটতম বন্ধুর সহিতও তাঁহার মতানৈক্য অত্যন্ত প্রবলাকার ধারণ করিত; বিরোধিতা ছিল অতি স্পষ্ট।

গভীর অজ্ঞতার প্রতি অবজ্ঞা ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ছিল অপরিসীম। তাঁহাকে কোনক্রমেই মৃদুস্বভাবা বলা চলিত না' (Studies from an Eastern Home—A Few Tributes)।

তাঁহার ভাবের পরিবর্তনের সহিত পাশ্চাত্য বন্ধুগণই সম্ভবতঃ অধিক পরিচিত ছিলেন। কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনায় তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসামান্য বিচারনৈপুণ্য, তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শ্রোতৃমাত্রকেই মুগ্ধ করিত। যখন তিনি শান্ত, কোমল কণ্ঠে গভীর আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সহিত ভারতীয় জীবনযাত্রার কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, তখন পাশ্চাত্য শ্রোতার হৃদয় সহজেই সহানুভূতির সহিত উহার মর্মার্থ গ্রহণে প্ররোচিত হইত। পূর্বে যাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও বিরক্তিকর মনে হইয়াছিল, তাহাও যেন সমর্থনযোগ্য মনে হইত। আবার যখন তিনি আত্মম্ভরি, গর্বিত, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অনুদারতা ও ক্ষমতালোলুপতার প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তখন তাঁহার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিত ; চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত ; তাঁহার কঠোর বাক্যে শ্রোতা স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

পাশ্চাত্য দেশে সন্ধ্যাবেলা অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে মেঝের উপর বসিয়া তিনি যখন তন্ময় হইয়া ছোট ছেলেমেয়েদের নিকট রামায়ণ, মহাভারত, অথবা পুরাণ হইতে নানা কাহিনী বর্ণনা করিতেন, তখন তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও অপূর্ব বচনভঙ্গী শিশুচিত্তে এক মায়াজাল বিস্তার করিত। তাহাদের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে সুদূর, স্বপ্নময় প্রাচ্যদেশ ভাসিয়া উঠিত ; ইচ্ছা হইত, বক্তার সহিত তাহারাও সেই দেশে চলিয়া যায়। আবার যখন তিনি বন্ধুগণপরিবেষ্টিত হইয়া গীতা বা উপনিষদ হইতে বিচিত্র শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহার পাশ্চাত্য কণ্ঠে প্রাচ্য সুরের ঝঙ্কার, উৎসাহ-দীপ্ত মুখমণ্ডল, অন্তরের গভীর আবেগ, নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে শ্রোতৃবর্গের চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করিত ; কিছু না বুঝিয়াও তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া থাকিতেন।

কাহারো ধৃষ্টতা, দম্ভ বা অন্যায় আচরণের সমুচিত উত্তর দিবার সময় তাঁহার চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। কঠোর বাক্যে, নির্মমভাবে বক্তাকে নিরস্ত করিতে তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিতেন না। ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোনপ্রকার কটাক্ষ বা সমালোচনা তাঁহার অসহ্য ছিল। দেবেন্দ্রমোহন বসুর নিকট শুনিয়াছি ব্যারিস্টার ইন্দুভূষণ সেন একদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া সমালোচনা করিতেছিলেন · নিবেদিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'মনে করবেন না, আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

সুধাংশুমোহন বসু বলেন, ইক্‌মিক্‌ কুকার-নির্মাতা ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক জগদীশ বসুর বাড়িতে প্রায় যাতায়াত করিতেন। একদিন তিনি কথায় কথায় বলেন, হিন্দুরা পূর্বে গরুর মাংস আহার করিত। এখন কেবল তরিতরকারী খাওয়ার ফলে দেহাভ্যন্তরস্থ অন্ত্রে এক প্রকার বিষক্রিয়ার (toxin) সৃষ্টি হয়, এবং উহাই মস্তিষ্কে ক্রিয়া করার ফলে তাহারা ধার্মিক হইয়াছে। ধার্মিকের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া নিবেদিতার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কঠোর ভাষায় বক্তাকে জর্জরিত ও অপদস্থ করিয়া ছাড়িলেন। বস্তুতঃ সহসা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠা তাঁহার স্বভাব ছিল ; পর-মুহূর্তেই ক্রোধের উপশম হইলে অনুতাপের সীমা থাকিত না। একদিন তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষের সহিত কোন বিষয় লইয়া তর্ক করিতে করিতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং সেই উত্তেজিতভাবেই বিদায় লইয়া যান। পরদিনই আবার পত্রিকা অফিসে আসিয়া যখন বালিকাসুলভ সরলতার সহিত হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন, 'মতিবাবু, কাল আমি বড় দুষ্ট হয়েছিলাম—' তখন মতিবাবুর চক্ষু অশ্রুতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল।

অধ্যাপক গোকুলদাস দে লিখিয়াছেন শ্রীমা তখন উদ্বোধন বাড়িতে ; একদিন তিনি ও তাঁহার অগ্রজ তথায় গিয়াছেন, নিবেদিতাও গিয়াছিলেন। শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিবেদিতা ও গোকুলবাবুর অগ্রজ বাটীর প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বে রোয়াকের সিঁড়ির উপর বসিয়া গভীরভাবে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের খেয়াল ছিল না যে, কাহাকেও উদ্বোধনে যাতায়াত করিতে হইলে তাঁহাদের উভয়ের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে গোকুল দে অন্যমনস্কভাবে বাহিরে আসিলেন। নিবেদিতা তাহা লক্ষ্য করিলেন। বাহিরে আসিয়া গোকুলবাবুর মনে হইল, তিনি ছাতাটি ফেলিয়া আসিয়াছেন ; সুতরাং পুনরায় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছাতাটি লইয়া আসিলেন। এই আচরণে বিরক্ত হইয়া নিবেদিতা তাঁহার অগ্রজের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করিলেন। ইহার পর কথামৃতকার মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে পথে যাইতে যাইতে পুনরায় গোকুলের অশিষ্টতা সম্বন্ধে আলোচনান্তে নিবেদিতা বলিলেন, 'We ought to hammer them' (এদের হাতুড়ী পেটা করা উচিত)। গোকুল দে তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে যাইতে উহা শুনিয়া ভীত হইলেন। নিবেদিতা স্কুলবাড়ির দিকে চলিয়া গেলে মাস্টার মহাশয় ফিরিবার পথে গোকুলকে দেখিয়া বলিলেন, 'দেখ, নিবেদিতা তোমার ওপর বড় রাগ করেছেন।' গোকুল তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'ও'রা বড় ডিসিপ্লিনের (নিয়মনিষ্ঠার)

পক্ষপাতী। এতটকু বেচাল দেখলে সহ্য করতে পারেন না। তোমার যাতায়াত করবার সময় প্রত্যেকবার "একস্‌কিউজ মি, ম্যাডাম" (মাপ করবেন) বলা উচিত ছিল।' গোকুল দে বলিলেন, 'উনি আমাকে হ্যামার করবেন বলছিলেন, তাই ভয়ে তাঁর নিকট মাপ চাইতে পারিনি।' মাস্টার মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন, 'হ্যামার করা' মানে হাতুড়ী মারা নহে ; উহার অর্থ কঠোর হস্তে শাসন করা। তারপর তিনি নিবেদিতার অশেষ গুণ বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন, যেন একটি দেবীপ্রতিমা ; ও'দের রাগ ক্ষণিক, সর্বদাই আনন্দময় হয়ে আছেন।' কিন্তু তাঁহার এই আশ্বাসপ্রদানেও গোকুলের ভয় দূর হইল না। কয়েকদিন পরে সন্ধ্যার সময় উদ্বোধনের কাছাকাছি গিয়া দূর হইতে নিবেদিতাকে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া তিনি সন্তর্পণে রাস্তার একপার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে নিবেদিতা একেবারে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার বুকে হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন, 'তুমি বড় রোগা। বেশী পড়ো না, উপযুক্ত ব্যায়াম করে নিজেকে সবল কর। মাঠে যাবে ও সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাধুলো করবে। আমার কথা বুঝেছ? গায়ে জোর না করলে কিছুই করতে পারবে না। আমার ওপর রাগ করো না, আমি তোমার বড়দিদি।' গোকুল দে অবাক। কোথায় গেল সেই ক্রোধ? এমন স্নেহের সহিত মিষ্টসুরে কথাগুলি বলিলেন, যেন কত হিতৈষিণী (উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, পৃঃ ৬১৪-৫)।

যে সকল ছেলেরা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত, তিনি তাহাদের সহিত যথার্থই হিতৈষিণীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাহাদের কাছে বসাইয়া নানা-ভাবে উপদেশ দিতেন, স্বামিজীর কথা বলিতেন, দেশ সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান আছে, তাহার সন্ধান লইতেন। এই প্রসঙ্গে একজন লিখিয়াছেন, ভগিনী নিবেদিতার সহিত রামানন্দের বন্ধুত্ব ও কর্মক্ষেত্রে যোগ কলিকাতায় আসার পর আরও ঘনিষ্ঠ হয়। প্রায়ই দেখা যাইত প্রবাসী অফিস হইতে ছবি কিংবা প্রবন্ধের প্রুফ লইয়া কেহ তাঁহার সেই বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে চলিয়াছে।...ভগিনী নিবেদিতার নিকট যাঁহারা কাজ লইয়া যাইতেন তাঁহাদেরও তিনি শুধু পত্রবাহক হিসাবে দেখিতেন না। রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের কতটা জ্ঞান, দেশের বিষয় তাঁহারা কিছু জানেন কি না সব খোঁজ লইতেন। যদি দেখিতেন, হিন্দুর ছেলে হইয়াও হিন্দুর মহাকাব্য সম্বন্ধে ইঁহারা তেমন কিছু জানেন না, তাহা হইলে নিবেদিতা চটিয়া যাইতেন। এই ভয়ে অফিসের কেহ কেহ তাঁহার কাছে যাইতে চাহিতেন না' (রামানন্দ ও অর্ধ-শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ১৫৬)।

তাঁহার নিজের মধ্যে যে শক্তি ও উৎসাহ ছিল, অপরের মধ্যে তিনি তাহা সঞ্চার করিতে পারিতেন। জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট যাইলে মনে বল পাওয়া যাইত। তাঁহার নির্ভীক, দৃঢ় উৎসাহপূর্ণ বাক্যে হতাশভাব ও অবসন্নতা দূর হইয়া যাইত। এই পৃথিবী ছিল তাঁহার নিকট সংগ্রামক্ষেত্র। তিনি নিজে সর্বদা যোদ্ধার ন্যায় সংগ্রামে প্রস্তুত থাকিতেন, অপরকেও অনুরূপ প্রেরণা দিতেন। কাহারো মধ্যে বীরত্বের অভাব বা কাপুরুষতা সহ্য করিতে পারিতেন না। দীনেশ সেনকে তিনি প্রায়ই ভীরু, কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিতেন। একদিন দীনেশবাবু সত্যই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতা, দীনেশবাবু ও ব্রহ্মচারী গণেন বাগবাজারের রাস্তা দিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন। দীনেশবাবু সর্বাগ্রে, তারপর নিবেদিতা সর্বশেষে ব্রহ্মচারী গণেন। এমন সময় একটা ষাঁড় হঠাৎ ক্ষেপিয়া তাঁহাদের সামনে ছুটিয়া আসিল। দীনেশবাবু প্রাণভয়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহাতে যে নিবেদিতাকে ষাঁড়ের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। ব্রহ্মচারী গণেন তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া ষাঁড়টিকে তাড়াইয়া দিলেন। তারপর তিনজন একত্র হইলে নিবেদিতা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দীনেশবাবু, আপনি আজ পুরুষজাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন—একজন অসহায়া নারীকে ষাঁড়ের সামনে ফেলে দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করেছেন। আজকের এই কাজটি আপনার একটা কীর্তিস্তম্ভের মত হয়ে রইল।' পরক্ষণেই মুখ হইতে হাসি চলিয়া গেল এবং ঝাঁঝালো সুরে বলিলেন, 'দীনেশবাবু, আপনার একটা লজ্জা হল না?' দীনেশবাবু কাজটা ভাল করেন নাই, তাহা বুঝিয়াছিলেন; সুতরাং নিঃশব্দে নিবেদিতার শ্লেষ হজম করিতে হইল।

কিন্তু বীরোচিত দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মধ্যে নারীজনোচিত কোমলতা ও স্নেহপ্রবণতারও অভাব ছিল না। নিজেকে তিনি পুরুষভাবাপন্ন, অথবা পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে কল্পনা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেদিন তাঁহার সহিত দমদমে প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যান, সেদিন দোতলার বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ার দেখাইয়া নিবেদিতা তাঁহাকে বসিতে বলেন। রামানন্দবাবু যখন তাঁহাকেই উহাতে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, 'না, ওটি মেয়েদের বসবার নয়, পুরুষদের।' মনে হয়, এই কথায় তিনি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ মেয়েদের জন্য নহে। তাহাদের জীবন কঠোর, সংযত। বিশেষতঃ

তাঁহার মনে হইত, ভারতবর্ষের মেয়েরা যে স্বেচ্ছায় সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া, অনলসভাবে সর্বদা অপরের সেবায় তৎপর থাকে, ইহা তাহাদের মাতৃ-হৃদয়ের সহজাত স্নেহ ও ভোগের প্রতি স্বাভাবিক উদাসীনতার পরিচয়। সহজভাবে দৃঢ়তার সহিত দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি পালন করিয়া যাওয়াই যেন তাহাদের ধর্ম। আর এইভাবেই কি তাহারা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে না! তাঁহার নিজের মধ্যেও এই স্নেহ ও সেবার ভাব অতিমাত্রায় ছিল। তাঁহার বাড়ি কেহ আসিলে অধিকাংশ সময় তাহাকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রতি তাঁহার স্নেহের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিদ্যালয়ের ঝি যদি কোন দিন আহার না করিয়া আসিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন ও পয়সা দিতেন কিছু কিনিয়া খাইবার জন্য। তাঁহার ভৃত্য রামলালের প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ ছিল। এক সময় তিনি তীব্র শীত উপেক্ষা করিয়া নিজের গরম আলোয়ানটি তাহাকে দান করিয়াছিলেন। নিজের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পয়সা ব্যয় করিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু মাসান্তে বাগবাজার পল্লীর কত অনাথা, দুঃখিনী বৃদ্ধা তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য পাইতেন! তিনি যেন তাঁহাদের স্নেহময়ী জননী ছিলেন। বিদ্যালয়ের কোন কোন দুঃস্থ ছাত্রীকে খামের ভিতর সিকি আধুলি প্রভৃতি পুরিয়া গোপনে দিয়া যাইতেন, পাছে তাহাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। প্রতিবেশিগণের দুঃখে, বিপদে সর্বদাই ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার এই অযাচিত সাহায্য ও দান অত্যন্ত গোপন ছিল: উহা লইয়া কোন দিন তাঁহাকে আলোচনা করিতে দেখা যাইত না।

প্রথম বার ভারতে আগমনের সময় জাহাজে একটি ইংরেজ যুবকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অশান্তি ও সমস্যা হইতে পরিত্রাণের আশায় তাহার পিতামাতা তাহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। যুবকটি দুর্বিনীত, অসংযমী। শীঘ্রই জাহাজের সমস্ত লোক বিরক্ত হইয়া তাহার সংস্রব পরিহার করিতে আরম্ভ করিল। নিবেদিতার মহৎ হৃদয় কিন্তু তাহার প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহ-প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঐ হতভাগ্যের শোচনীয় ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি বিচলিত হইলেন। এক সময়ে তাহার সহিত নিরিবিলি সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে নিজের মূল্যবান সোনার ঘড়িটি উপহার দিয়া বলিলেন, তাঁহার ধারণা সে নূতনভাবে ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে, এবং তাহার প্রতি বিশ্বাসের নিদর্শনস্বরূপ উহা প্রদত্ত হইল। ঐ সোনার ঘড়িটি তাঁহার মাতৃ-প্রদত্ত জন্মদিনের উপহার ও একমাত্র মূল্যবান জিনিস ছিল। যে উদ্দেশ্যে এই মহৎ দান, তাহা ব্যর্থ হয়

নাই। তাঁহার দেহত্যাগের এক বৎসর পূর্বে যুবকটির মাতার এক পত্রে তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার স্নেহ ও সাহায্য তাহাকে যথার্থই নবজীবন গঠনে প্রেরণা দিয়াছিল এবং সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্তিমশয্যায় তাহাকে সে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছিল।

তাঁহার এই গভীর করুণা ও স্নেহ জীবজন্তুর প্রতিও দেখা যাইত। স্কুলের ঘোড়ার গাড়িতে তিনি সব সময় উঠিতে চাহিতেন না; জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ঘোড়ার কষ্ট হইবে। নিবেদিতার সহিত দমদমে প্রথম সাক্ষাতের দিন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র নিবেদিতা বাহিরে আসিয়া রামানন্দবাবুর নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার করিয়া প্রথমেই গাড়োয়ানকে ঘোড়া দুইটিকে আহার ও বিশ্রাম দিবার নির্দেশ দিলেন। গাড়োয়ানকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার খাওয়া হইয়াছে কি না। আর একদিন রামানন্দ-বাবু সুকিয়া স্ট্রীট দিয়া কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যাইতে যাইতে দেখিলেন, বিপরীত দিক হইতে নিবেদিতা ও আর একজন পাশ্চাত্য মহিলা আসিতেছেন। মদন মিত্রের গলির মোড়ের নিকট একটি কুকুরছানা অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া ধুঁকিতেছিল। কতলোক যাইতেছে, আসিতেছে, কাহারো তাহার প্রতি দয়া হয় নাই। নিবেদিতা তাহাকে দেখিবামাত্র থামিলেন এবং নিকটস্থ খাবারের দোকান হইতে দুধ কিনিয়া কুকুরছানাটিকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উদ্বোধনে একদিন একটি বিড়াল কেবল বিরক্ত করিতেছে দেখিয়া গোলাপ-মা তাহার ঘাড় ধরিয়া শূন্যে তুলিয়াছেন —উদ্দেশ্য, দূরে ছুঁড়িয়া দিবেন। নিবেদিতা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, 'গোলাপ-মা, মৃত্যু, মৃত্যু', অর্থাৎ ঐরূপ করিলে মরিয়া যাইবে।

তাঁহার এই স্নেহ ও করুণা নিতান্তই সহজাত ছিল। ইহার মধ্যে জোর করিয়া কিছু করিবার প্রয়াস ছিল না। তাই প্লেগে, দুর্ভিক্ষে যাহারা পীড়িত, আর্ত, অসহায়, তাহাদের একেবারে অতি নিকটে একান্ত সমব্যথীর মত গিয়া দাঁড়াইতেন। স্পর্শ বাঁচাইয়া দূর হইতে কিছু সাহায্য করিয়া কর্তব্য শেষ করিতেন না।

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর ও সংযত। তাঁহার কৃচ্ছ্র-সাধন ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ ব্যতীত কেহ জানিতে পারিত না। বিলাসিতা দূরে থাক, নিজের আহার সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন। তাঁহার মত ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া চলিবার ক্ষমতা ক্রুস্টীনের ছিল না। যতদিন ক্রুস্টীন ছিলেন, আহার

ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থার উপর নিবেদিতা কথা বলিতেন না। কিন্তু ক্রিস্টীন চলিয়া যাইবার পর তিনি সর্বপ্রকার ব্যবস্থার সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। ফলে আহারের অপ্রাচুর্য ও শারীরিক কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

তিনি নিজে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের সামান্য জিনিসের অপচয়ও সহ্য করিতে পারিতেন না। সুতা, পেন্সিল, কাপড়ের টুকরা প্রভৃতি মেয়েরা যাহাতে নষ্ট না করে, সে দিকে সর্বদা তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। সহজ বৈরাগ্যবশতঃ সুধীরা একদিন ক্রিস্টীনের নিকট বলিয়াছিলেন, 'আমরা তো সন্ন্যাসিনী, এত ছোট ছোট বিষয়ে আসক্তি থাকা কি ভাল?' ক্রিস্টীনের নিকট এই কথা শুনিবামাত্র তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, 'সুধীরার এ রকম কথা বলা উচিত নয়। এ রকম মনোভাবের কখনো প্রশ্রয় দেবে না।'

যে কঠোর তপস্যার জীবন তিনি বরণ করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি ছিলেন একাকী, কিন্তু তাঁহার গভীর মানবতাবোধ স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়বত্তার সহিত পরিচিত সকলের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণে সর্বদাই উন্মুখ ছিল। কি ব্যক্তিগত পরামর্শে, কি জনসাধারণের কোন গুরুতর কার্যে, অথবা সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় উপদেষ্টা। তাঁহার বিচারক্ষমতা ছিল আশ্চর্যরূপ দ্রুত ও অবধারিত। তাঁহার বন্ধুত্ব, ভালবাসা, স্নেহ ছিল সত্যই দুর্লভ সম্পদ ; কারণ প্রিয়জনের কল্যাণার্থে অকপটে নিজেকে উৎসর্গ করিবার ক্ষমতা অল্প ব্যক্তিরই থাকে।

তাঁহার অপার্থিব বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়া র‍্যাটক্লিফ লিখিয়াছেন—'তাঁহার সেই মহৎ দুর্লভ বন্ধুত্বলাভের সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী বলিয়াই জানিতেন। আর ঐ বন্ধুত্বের স্মৃতি তাঁহাদের নিকট জগতের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁহার বৎসরের পর বৎসর অবিরাম, ঐকান্তিক উদ্যম, নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্তে সত্যানুসন্ধান, অপরাজেয় সাহস ও মহৎ, করুণাপূর্ণ হৃদয় তাঁহাদের সর্বদাই মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগে আর্ত ও পীড়িতের সেবায় তাঁহার আত্মনিয়োগ ; যে অজ্ঞ জনসাধারণের সহিত তাঁহার ভাগ্য গ্রথিত হইয়াছিল, দিনের পর দিন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া নিরলসভাবে কার্য করিয়া যাওয়া ; জীবনযুদ্ধে যাহারা পরাজিত, অসহায়, তাহাদের প্রতি হৃদয়ের সমবেদনা। বিমূঢ়, উদ্‌ভ্রান্ত যুবকগণকে তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন জ্বলন্ত বিশ্বাস ও লক্ষ্যের ধ্রুবতারা। যাঁহারা প্রয়োজনে তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য

তিনি নিজের অগাধ বুদ্ধিমত্তা ও অসীম মানবতা উদার হস্তে বিতরণ করিয়াছেন।

'আর যাঁহারা এই জ্যোতির্ময় দেববালার মনে কিছুমাত্র প্রবেশাধিকার পাইয়া তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে জীবনের অমূল্য সম্মান বলিয়া মনে করেন' (Studies from an Eastern Home—In Memoriam)।

অনন্তের সুর

ভারতবর্ষে নবজীবনের প্রারম্ভে নিবেদিতা গিয়াছিলেন স্বামিজীর সহিত তীর্থভ্রমণে। সেই তীর্থযাত্রার বিবরণ তিনি লিপিবন্ধ করিয়াছেন 'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে' নামক পুস্তকে। জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত হইয়া আর একবার তীর্থযাত্রার জন্য তাঁহার অন্তরে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। জগদীশ-চন্দ্র বসুরও আগ্রহ দেখা গেল। এবার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ কেদার-বদরী ; যাত্রী চারজন—সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত বসু, নিবেদিতা ও শ্রীযুক্ত বসুর ভাগিনেয় অরবিন্দমোহন বসু বা 'খোকা'।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ। গ্রীষ্মের ছুটিতে যাত্রিগণ রওনা হইলেন মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। প্রথমে হরিদ্বার। কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করিলেন। কনখলের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা হইল। সন্ধ্যাবেলা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে বসিয়া তাঁহারা গঙ্গার আরতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। হরিদ্বার যেন বারাণসীর ক্ষুদ্র সংস্করণ। একজন কথায় কথায় বলিলেন, হরিদ্বার ও কাশীধামের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাশীতে লোকে যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য আর হরিদ্বারে আসে তপস্যা করিবার উদ্দেশ্যে।

হরিদ্বার হইতে ১৭ই মে তাঁহারা হৃষীকেশ পোঁছিলেন। হৃষীকেশের প্রাকৃতিক শোভার তুলনা নাই। খরস্রোতা জাহ্নবী, সাধু-সন্ন্যাসিগণের শত শত কুটির আর অদূরে হিমালয় পর্বত। আরও কিছুদূর গিয়া কুলী, ডাণ্ডী প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার স্থান। হরিদ্বারেই একজন ভাল পাণ্ডা পাওয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এখান হইতেই কেদার-বদরীর যাত্রা আরম্ভ। লছমনঝোলা সেতু পার হইয়া গঙ্গার ধার দিয়া উত্তর দিকে পথ চলিয়া গিয়াছে। যাত্রীরা আপনমনে মালা জপ করিতে করিতে দলে দলে চলিয়াছে, কাহারো মুখে বিশেষ কথা নাই। পরস্পর দেখা হইলে অভিবাদন করিয়া বলে. 'জয় কেদারনাথকী জয়! জয়, বদরীবিশালকী জয়!' নিবেদিতা দেখেন মেয়েরা কেমন স্বচ্ছন্দে পথ চলিতেছে! শহরের সে আড়ষ্ট ভাব নাই, চাল-চলন সঙ্কোচদ্বিধাহীন।

পথে সাধারণতঃ তাঁহারা ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতেন। যেখানে তাহার অভাব, সেখানে চটি অথবা ধর্মশালাতেই সাধারণ যাত্রীদের সহিত অবস্থান

করিতে হইত। নিবেদিতা সেই অবসরে যাত্রীদের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিতেন। বেদনার সহিত তাঁহার মনে হইত, সভ্যতার কৃত্রিমতা তাঁহাদিগকে সাধারণ যাত্রী হইতে পৃথক করিয়াছে। নিবেদিতা সকলের নিকটই একটি বিস্ময়; সুতরাং তাঁহার সহিত আলাপে সকলেরই আগ্রহ দেখা যাইত। কখনো পদব্রজে, কখনো ডাণ্ডীতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে কেদারের পথে শেষ চটিতে তাঁহারা পৌঁছিলেন। শেষের চার মাইল খাড়া চড়াই, দুর্গম পথ। সঙ্গের পাণ্ডা বলিল, 'স্বর্গে যাবার রাস্তা এইরকম দুর্গমই হয়।' অবশেষে যখন মন্দির দেখা গেল, মনে হইল, সব কষ্ট সার্থক। ৩০শে মে, সোমবার, দ্বিপ্রহরে তাঁহারা কেদারনাথের মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মন্দির বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আরতির সময় খুলিবে। সন্ধ্যার পূর্ব হইতে ঘন কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল; প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। বিশ্রামের পর নিবেদিতা চলিলেন মন্দিরের দিকে। যাত্রীরা দ্রুতপদে চলিয়াছে। ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কুয়াশা সরিয়া যাওয়ায় মাথার উপর নক্ষত্র এবং চারিদিকে বরফ বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। আরতি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মধ্যে কোলাহল আরম্ভ হইল। আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, উন্মত্তের মত সকলে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, কতক্ষণে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতাকে স্পর্শ করিবে। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিয়া নিবেদিতা জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। জীবনে তিনি যত সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছেন, এ দৃশ্য তাহার অন্যতম। ঊর্ধ্বে তুষারমৌলি কেদারশৃঙ্গ, পাদদেশে প্রসারিত সমগ্র ভারত। ভারতের সকল প্রান্ত হইতে বিভিন্ন পথ দিয়া জনস্রোত আসিতেছে, সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে; হৃদয়ে একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, দেবতার চরণ স্পর্শ করিবে। জ্ঞানী, সাধক, যোগী-ঋষির চির-আবাসভূমি কেদার-বদরী। করজোড়ে নিবেদিতা কেদারনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন। শান্তিতে মনঃপ্রাণ ভরিয়া উঠিল। শিব! শিব!

পরদিন তাঁহারা বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে গেলেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গলিত তুষারধারা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। দূর হইতে কেদারনাথের মন্দিরটি মনে হইতেছে যেন পল্লীর এক ক্ষুদ্র দেবালয়। নিবেদিতা অনেকক্ষণ পর্বতের ধারে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। উপরে অবিরাম হিমানীপ্রপাত হইতেছে, তাহার ক্ষীণ শব্দ শুনিতে পাইলেন। এই স্থান হইতে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। তুষারাবৃত পথ ধরিয়া তাঁহারা কিছুদূরে গেলেন। মহাভারত-কাহিনীর এখানেই পরিসমাপ্তি। জাগতিক সকল সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনার নির্বাপণ। অতঃপর যাত্রা ঊর্ধ্বে, অনন্তলোকে; পৃথিবীর

সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। ইহাই ভারতবর্ষের চিরন্তন ইতিহাস। নিবেদিতা মনে মনে বলিলেন, 'ধন্য ভারতবর্ষ!'

কেদারনাথ হইতে বদরীনারায়ণ। পথে দুইজন বৃদ্ধা চলিয়াছেন, একজন সহসা পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। নিবেদিতা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে দুঃখ প্রকাশ পাইল, কিন্তু বৃদ্ধা উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, 'ভগবানই তো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যখন কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন, তখন আর কী আসে যায়?' এক অন্ধ ব্যক্তি চলিয়াছে দুই হাতে পাথর স্পর্শ করিয়া লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে। মন্দির পেঁাছিতে তখনো কিছু পথ বাকি। নিবেদিতা বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, এতদূর সে কী করিয়া আসিয়াছে! এই সব তীর্থ যাত্রীর সরলতা, ভগবদ্‌ভক্তি ও নির্ভরতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের যথার্থ পরিচয় যেন তীর্থস্থানেই পাওয়া যায়। এই তীর্থযাত্রাতেই তিনি অলকানন্দার তীরে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন ; বিদ্যালয়ে মেয়েদের কাছে তাঁহার কথা এইভাবে বর্ণনা করিতেন, 'তিনি স্নান করে উঠেছেন, তখনো ভিজা কাপড় পরে আছেন। তিনি বৃদ্ধা হয়েছেন, মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি শীতকে গ্রাহ্য করেন না। অলকনন্দার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জোড়হাতে (বলিতে বলিতে নিবেদিতা হাতজোড় করিলেন) সূর্যের দিকে চেয়ে প্রণাম করছেন! কী সুন্দর! কী সুন্দর তাঁর মুখ! আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।'

বদরিকার পথে আর এক স্থানে এক প্রাচীনা তুষারের উপর দিয়া অগ্রে চলিয়াছেন, নিবেদিতা তাঁহার পশ্চাতে। তাঁহার কথা নিবেদিতা এইভাবে বলিতেন, 'বরফ গলে গেছে, তাঁর পা পিছলে যাচ্ছে। আমার ভয় হল, তিনি পড়ে যাবেন। জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করবেন? আমি তাঁর বাহু ধরতে পারি কি? আমি তাঁর কাছে ঐভাবে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। আঃ, কী সুন্দর সে হাসি! এবং নিজের লাঠির উপর ভর দিয়ে চলে গেলেন।'

১৩ই জুন তাঁহারা বদরীনারায়ণ আসিয়া পেঁাছিলেন। পরদিন ভোরে নিবেদিতা মঙ্গল-আরতি দর্শনের অভিপ্রায়ে মন্দিরে গেলেন, কিন্তু তাঁহাকে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। স্বভাবতঃই তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু এই সকল বাধা-নিষেধের প্রতিবাদ তিনি কখনো করিতেন না। নিরুপায় হইয়া তিনি দরজার নিকট দাঁড়াইয়া তীর্থযাত্রীদের দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা জপ করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন, সকলেই নিবিষ্ট-

চিত্ত। সর্বত্র এক শান্ত, মধুর পরিবেশ। ধীরে ধীরে ক্ষোভ দূর হইয়া বিমল আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। দূর হইতে বদরীনারায়ণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

বদরীনারায়ণ কেদারনাথ অপেক্ষা বহু পরবর্তী কালের বলিয়াই নিবেদিতার মনে হইল। মন্দিরটির গঠন-ভঙ্গী আধুনিক। উহার বহু স্থানে সংস্কার করা হইয়াছে, এবং প্রাচীরে ও ফটকে মোগল যুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন দেখা যায়। আধুনিক বলিয়া পূজার ব্যবস্থা কেদারনাথ অপেক্ষা উন্নততর; পাণ্ডারা যাত্রীদের সহিত মন্দিরে প্রবেশ করে না। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। দূরে তুষারে আবৃত পর্বতশৃঙ্গ, তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, শুভ্র চন্দ্রালোক, চারিদিকে সাদা বন্য গোলাপ ও ভায়লেট ফুল। দুঃখের বিষয়, ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদের এখানে বেশী দিন থাকা হইল না। অবলা বসু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বদরীনারায়ণ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা চামোলী ও নন্দপ্রয়াগ হইয়া কর্ণপ্রয়াগে আসিলেন। এখান হইতে রাস্তা পৃথক হইয়া গিয়াছে। একটি পথ গিয়াছে কাঠগোদামের দিকে ; সাধারণ যাত্রীরা এই পথ ধরিয়াই চলে। অপর পথটি শ্রীনগর হইয়া হরিম্বার অথবা কোটম্বারা গিয়াছে। ডাকবাংলার সুবিধার জন্য তাঁহারা কোটম্বারার পথ ধরিলেন। সুন্দর, নির্জন পথ। ২৯শে জুন সকলে সমতলে পৌঁছিলেন। হিমালয় হইতে বিদায়!

প্রত্যাবর্তনের স্বল্পকাল পরেই নিবেদিতা 'উত্তরের তীর্থ ; যাত্রীর ডায়েরী' নাম দিয়া তীর্থযাত্রার বিবরণ মডার্ন রিভিউতে প্রকাশ করেন।

তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই নিবেদিতা সংবাদ পাইলেন, মিসেস স্যারা বুল অসুস্থ। তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। মিসেস বুল ছিলেন একাধারে তাঁহার স্নেহময়ী জননী ও অন্তরঙ্গ বান্ধবী, এবং তাঁহার শিক্ষাকার্যে প্রথমাবধি আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। ক্রিস্টীনের ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন। শ্রীযুক্ত বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার সাহায্য কম ছিল না। নিবেদিতা তাঁহাকে একবার লিখিয়াছিলেন, 'এই বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে তোমার, আমার যাহা কিছু রচনা সমস্তই তোমার, বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি তোমার, ভবিষ্যতে যে ল্যাবরেটরী স্থাপিত হইবে, তাহাও তোমার।' তুমি কি জান না, তোমার সাহায্যেই এই সকল ভাল ভাল কাজ সম্ভব হইয়াছে?...যাহা হউক, আমার আশা আছে, শেষ পর্যন্ত হিন্দুনারীর শিক্ষার জন্য এই উদ্যম তোমার অন্যান্য সৎকার্যের তুলনায় তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। বলিতে গেলে, প্রথমাবধি তুমিই ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছ।'

এই সময় হইতে শ্রীযুক্ত বসু নিজস্ব ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। নিবেদিতার আগ্রহ তাঁহার অপেক্ষা কম ছিল না। তিনি বলিতেন, যদি ইহা মায়ের কাজ হয়, তবে তিনিই ইহা সম্ভবপর করিবেন। ইহা ব্যতীত নিবেদিতার একান্ত অভিপ্রায় ছিল যে, শ্রীযুক্ত বসুর জীবনচরিত লিখিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মনীষিগণের সাধনা ও কৃতিত্ব কাহিনী দেশের ভাবী সন্তানগণকে পথ প্রদর্শন করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। বিশেষতঃ জগদীশ বসুর বৈজ্ঞানিক সাধনার মূল্য পরাধীন দেশে অপরিসীম। প্রতিপদে তাঁহাকে কী বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কী কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, নিবেদিতা তাহা অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন. তাঁহার মত কেহই ঐ সকল লিখিতে পারিবেন না। কিন্তু উহা লিখিবার জন্য তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন না। ১৯১০ খৃীষ্টাব্দে এক পত্রে তিনি মিসেস বুলকে লিখিয়াছিলেন—'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বার বছর শেষ হয়ে আসছে।... আশঙ্কা হয়, বোধ হয় আমি জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখবার জন্য বেঁচে থাকব না। কিন্তু জানি, তুমি অন্ততঃ এক শত পাউন্ড রেখে যাবে।...এইটি ভারতের খরচে ভারতেই ছাপা হতে পারবে, আর আমার সব কাগজপত্র তাদের হাতে তুলে দেব। তবু আমি যেভাবে তাঁকে দেখেছি, সেভাবে বোধ হয় আর কেউ কোনদিন দেখবে না। বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে তাঁর প্রতি মুহূর্তের বিরামহীন সংগ্রাম এবং কি সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি ঐ সংগ্রাম করে গেছেন, ন—বোধ হয় সব চেয়ে ভাল করে তার বর্ণনা দিতে পারবে।'[১]

মিসেস বুলের ইচ্ছা, নিবেদিতা আমেরিকায় গমন করেন। মাত্র এক বৎসর পূর্বে নিবেদিতা ভারতে ফিরিয়াছেন ; এখনই ভারত ত্যাগ করিতে তাঁহার মন চাহিতেছিল না। তিনি নানাভাবে উৎসাহ দিয়া মিসেস বুলকে চিঠি লিখিতেন। শ্রীমা এই সময়ে উদ্বোধন বাড়িতে ছিলেন। নিবেদিতা তাঁহার আশীর্বাণী প্রেরণ করিলেন। গভীর উদ্বেগে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। পূজার ছুটিতে তিনি যথারীতি বসু-দম্পতির সহিত দার্জিলিঙ গমন করিলেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম আসিল, মিসেস বুল অত্যন্ত পীড়িত, তাঁহার যাওয়া প্রয়োজন। অগত্যা দার্জিলিঙ হইতেই তাঁহাকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইল। জাহাজে বসিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার অন্ত রহিল না। কেদার-বদরী দর্শনের পর তিনি অন্তরে এক প্রকার শান্তি

[১] মিসেস বুল এই উদ্দেশ্যে কোন অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন কি না আমাদের জানা নাই। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২০ খৃীষ্টাব্দে অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজ কর্তৃক 'Life and Work of Sir J. C. Bose' লিখিত হয়।

অনুভব করিয়াছিলেন। কাজ-কর্মের অবসরে মন চাহিত হিমালয়ের ভাব-গম্ভীর, শান্ত-নির্জন পরিবেশের মধুর স্মৃতিতে মগ্ন হইয়া যাইতে। হিমালয়ের সহিত তাঁহার জীবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত। তিনি অন্তরে প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার আর কোন অভিলাষ নাই, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্তি ও আনন্দ দিন। মনে পড়িল, শ্রীমা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, বহু পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে নহবতের সেই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে বাস করিয়া তাঁহার হৃদয় সর্বদা আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ থাকিত। নিবেদিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, তিনি কবে সেই শান্তি ও আনন্দের অধিকারিণী হইবেন! এক মুহূর্ত তাঁহার বিশ্রাম নাই, চিন্তার বিরাম নাই। ভরসা কেবল যে, তিনি জানেন, সমস্তই স্বামিজীর কাজ। স্বামিজী কি তাঁহাকে পরিচালনা করিতেছেন? কবে আবার তাঁহাকে প্রিয় ভারত-ভূমিতে ফিরাইয়া আনিবেন?

চিন্তাকুল হৃদয়ে ১৫ই নভেম্বর নিবেদিতা বস্টনের কেম্ব্রিজে পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্যারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এমন কি, পীড়ারও অনেক উপশম দেখা গেল। ধীর, স্থির বুদ্ধির জন্য স্বামিজী তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'ধীরা মাতা'। ধীরা মাতার সেই বিচারবুদ্ধি আজ নিষ্প্রভ। তাঁহার পীড়া রক্তাল্পতা, তাহার সহিত সর্বদা এক অজানা আতঙ্ক। নিবেদিতাকে তিনি এক মুহূর্ত কাছছাড়া করিবেন না। দিবারাত্র তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নিবেদিতা পুরাতন প্রসঙ্গ করেন। বেলুড়, আলমোড়া ও কাশ্মীরের ঘটনাগুলি মনে হয় যেন সেদিনের। কখনো স্বামিজীর কথা বলিয়া স্যারার মনকে আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় নিবেদিতা স্বামিজীর 'জ্ঞানযোগ' সম্পাদনা করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে উহা হইতে পড়িয়া শুনাইতেন। কখনো বা ডক্টর বসুর নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-গুলির বর্ণনা করিয়া তাঁহার মনে উৎসাহ আনিতে প্রয়াস পাইতেন। স্যারা কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলে নিবেদিতা অবকাশ সময়ে পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়া পড়াশুনা করিতেন। এই বৎসর লণ্ডনে বিশ্বজাতি কংগ্রেস (Universal Race Congress) আহূত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উহাতে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া নিবেদিতা লিখিত বক্তৃতা পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বক্তব্য বিষয় নির্বাচন করিয়াছিলেন—'ভারতবর্ষে নারীর বর্তমান স্থান'। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে উহা লণ্ডনে উক্ত কংগ্রেসের সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণের কথা ছিল। সুতরাং মানসিক এই অবস্থার মধ্যেই মিসেস বুলের পাঠাগারে বসিয়া প্রবন্ধটি লিখিতে হইল। সময় পাইলেই 'জ্ঞানযোগ' লইয়াও বসিতেন।

স্যারার ভ্রাতা মিঃ ই. জি. থর্প ও কন্যা ওলিয়াকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। স্যারা ছিলেন ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। তাঁহার মৃত্যুসময়ে নিবেদিতার উপস্থিতি অনেকের নিকটেই সন্দেহের কারণ হইয়াছিল। নিবেদিতা অন্তরের অন্তস্তল হইতে স্যারার জন্য প্রার্থনা করিতেন ও সেই সঙ্গে প্রার্থনা করিতেন, তিনি যেন নিজে ঐশ্বর্যের মোহে না পড়েন। স্যারার সহিত তাঁহার গভীর সম্পর্ক না বুঝিয়া অনেকে অনেক কথা বলিবে ; তিনি যেন খাঁটী থাকেন, দৃঢ়চিত্তে শেষ পর্যন্ত যেন কর্তব্য করিয়া যাইতে পারেন। ১১ই ডিসেম্বর, রবিবার, সকালে নিবেদিতা গীর্জায় গেলেন স্যারার জন্য প্রার্থনা করিতে। পূর্বেই বলিয়াছি, ঐদিন সেখানে বসিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, শ্রীশ্রীসারদা-দেবীই যীশু-জননী মেরী। বাড়ি ফিরিয়া তিনি শ্রীমাকে চিঠি লিখিলেন—

কেম্ব্রিজ, ম্যাস
রবিবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১০

আদরিণী মা,

স্যারার জন্য প্রার্থনা করবো বলে আজ ভোরে আমি গীর্জায় গিয়েছিলাম। সবাই ওখানে যীশু-জননী মেরীর কথা চিন্তা করছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা দৃষ্টি, পরনের সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—সবই যেন তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, তোমার সেই দিব্যসত্তাই যেন বেচারী স্যারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম, জানো মা? ভাবছিলাম, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আমার কী নির্বুদ্ধিতাই হয়েছিল! আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মত বসে থাকতে পারাটাই তো যথেষ্ট। মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মত উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা। তোমার ভালবাসা হল এক স্নিগ্ধ শান্তি, যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং কারও অমঙ্গল চায় না। ও যেন লীলচঞ্চল একটি হৈম দ্যুতি! কয়েক মাস আগেকার সেই রবিবারটি কী আশিসই না বয়ে এনেছিল! গঙ্গাস্নানে যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য দৌড়ে তোমার কাছে গেলাম। তোমার আনন্দময় ঘর-খানিতে তুমি আমায় যে আশীর্বাদ জানালে, তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি। প্রেমময়ি মা, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমায়

লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু তাতেও মনে হয়, বড় বেশী শব্দ করা হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মত! সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম-ধারণের পাত্র। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে তাঁর প্রতীকস্বরূপ; আর আমাদের উচিত, তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা—অবশ্য, কখনো কখনো একটু মজা করা ছাড়া। বাস্তবিকই, ভগবানের যা কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই শান্ত, নীরব। গোপনে, অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদের জীবনে—যেমন বাতাস ও সূর্যের আলো, যেমন বাগানের ও গঙ্গার মাধুর্য। এই সব শান্ত জিনিসই তোমার তুলনা।

বেচারী এস স্যারাকে তোমার শান্তির উত্তরীয়খানি পাঠিয়ে দিও। রাগদ্বেষের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমার চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত ভগবৎ-সত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনো মলিন হয় না?

প্রিয়তমা মা আমার,
তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকী
নিবেদিতা।[১]

শ্রীমাকে চিঠি লিখিয়া নিবেদিতার মন অনেক শান্ত হইল। স্যারার জন্য প্রার্থনা ছাড়া তাঁহার আর কিছু করিবার নাই।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়া আসিল মাতাকে দেখিবার জন্য। ওলিয়ার হিস্টিরিয়া ছিল। কন্যাকে লইয়া স্যারার অশান্তির সীমা ছিল না। নিজের খেয়ালমত চলাই ছিল ওলিয়ার প্রকৃতি। মাতার মত তাহার জেদও ছিল প্রচণ্ড। মাতা ও কন্যার মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য নিবেদিতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮ই জানুয়ারী (১৯১১) সকাল পাঁচটার সময় স্যারা বুল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পূর্বদিন তাঁহাকে বেশ সুস্থ মনে হইয়াছিল। স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। ধীরে ধীরে জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল। সংসার-নাট্যের এক-একটি পালা শেষ হইয়া আসিতেছে। কত পুরাতন স্মৃতি নিবেদিতার মনে পড়িতে লাগিল। বেলুড়ের সেই জীর্ণ বাড়িটিতে তাঁহাদের বাস, উত্তর ভারত ভ্রমণ! রিজলি ম্যানরে তাঁহাকে ও স্যারাকে স্বামিজীর

---

[১] স্বামী তেজসানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

গৈরিক উত্তরীয় প্রদানান্তে অন্তরের আশীর্বাদ! সেজন্যই তো নিবেদিতার স্যারাকে সেণ্ট (সন্ন্যাসিনী) স্যারা বলিয়া সম্বোধন! ব্রিটানীতে স্যারার গৃহে স্বামিজীর আগমন! নিবেদিতার সব কাজে স্যারার প্রগাঢ় সহানুভূতি, তাঁহার প্রত্যেক পুস্তক রচনায় অসীম উৎসাহ ও সাহায্য, এবং পুস্তক প্রকাশ হইলে অকপট উচ্ছ্বাসের সহিত প্রশংসা! সব শেষ হইয়া গেল। এক এক করিয়া সকলে মৃত্যুর ক্রোড়ে বিশ্রাম লইতেছে।

মিসেস বুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। নিবেদিতার আর অনর্থক এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ স্যারার উইলের সংবাদ জানিবার জন্য, তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। ইতিমধ্যে তিনি শিব ও বুদ্ধের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। স্যারার উইলে পূর্বকথানুযায়ী শ্রীযুক্ত বসুর ল্যাবরেটরী ও নিবেদিতার বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ থাকিবার কথা। কিন্তু ওলিয়ার ব্যবহার নিবেদিতাকে উদ্বিগ্ন ও ভীত করিয়া তুলিল। তাহার ধারণা, নিবেদিতা তাহার সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছেন। নিবেদিতার প্রতি ওলিয়ার ভালবাসার অভাব ছিল না, কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে কোন ধারণা ঢুকিলে বিচার-বুদ্ধি লোপ পাইত। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, নিবেদিতা তাহার মাতাকে বিষপ্রয়োগ করিয়াছেন। উহার কারণ, নিবেদিতা স্যারাকে কবিরাজী ঔষধ মকরধ্বজ সেবন করাইয়াছিলেন। কথাটি অবশ্য শোনা ; সঠিক জানা নাই! তবে একথা সত্য যে নিবেদিতা স্যারাকে কবিরাজী ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন ও তাঁহার পত্রগুলি পাঠে মনে হয়, একটা কিছু গোলমাল হইয়াছিল এবং ওলিয়ার অস্বাভাবিক আচরণে তিনি আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাহার সহিত এক বাড়িতে অবস্থান যুক্তিযুক্ত নহে, মনে করিয়া তিনি স্যারার বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া বস্টনে অন্যত্র মিস অ্যালিস লংফেলোর সহিত কয়েক দিন অবস্থান করেন। অন্তর হইতে তিনি কেবলই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি কি ঐশ্বর্যের প্রার্থী? না, তিনি তো স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন। কিন্তু কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন। শীঘ্রই মিসেস বুলের উইল প্রকাশ হইবার পর জানা গেল, ওলিয়া উহার বিরোধিতা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রত্যাশিত। নিবেদিতা মিঃ ই. জি. থর্পের উপর সব ভার অর্পণ করিয়া ইংলণ্ড যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি যেন ধীর, স্থির, অবিচলিত থাকিতে পারেন। যাহা সত্য, তাহাই হউক। শিব! শিব!

স্যারার মৃত্যু ও ওলিয়ার আচরণে নিবেদিতা অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্বামী

সদানন্দ কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিবেদিতা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। স্বামী সদানন্দ তাঁহার পরমাত্মীয়। স্বামিজীর দেহত্যাগের পর হইতে তিনিই কতকটা তাঁহার স্থান পূরণ করিয়াছিলেন। গত বৎসর অসুস্থ হইয়া আসিলে নিবেদিতাই তাঁহার থাকিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ির অতি নিকটে একটি বাড়ি ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। নিবেদিতা বহু সময় তাঁহার পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। অবসরমত তাঁহার নিকট গিয়া বসিয়া নানা কথাবার্তা বলিতেন। মিসেস বুলের কঠিন পীড়া সম্বন্ধে টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি দার্জিলিঙ হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য-গমন স্বামী সদানন্দ অবগত ছিলেন না। দার্জিলিঙ যাইবার পূর্বে যখন তিনি স্বামী সদানন্দের নিকট বিদায় লইতে গিয়াছিলেন, তখন কি একবারও ভাবিয়াছিলেন, ইহাই শেষ সাক্ষাৎ! এক এক করিয়া অনেক কথা মনে পড়িল। প্লেগকার্যে তিনি সদানন্দের কী উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছেন! বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, কাশী, সর্বত্র তাঁহার বক্তৃতা-সফরে সদানন্দই ছিলেন সঙ্গী। তাঁহার সমস্ত কার্যে সদানন্দের আন্তরিক সমর্থন তাঁহাকে কত আশ্বাস দিয়াছে! নিবেদিতার প্রতি তাঁহার কী অগাধ স্নেহ, বিশ্বাস! 'The Master as I Saw Him' প্রকাশ হইলে সদানন্দের কত আনন্দ! সব শেষ। নিবেদিতা যেন ধীরে ধীরে মৃত্যুর পদধ্বনি নিজের অন্তরেও শুনিতে পাইলেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না, কারণ তিনি জানিয়াছেন, মৃত্যুর অর্থ এক অনন্ত সত্তায় নিজের সত্তার বিলুপ্তি।

আমেরিকা ত্যাগ করিয়া নিবেদিতা ভারত-যাত্রার পথে ইংলণ্ডে আসিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র পুরাতন বন্ধুবর্গ আসিয়া দেখা করিলেন। মিঃ র‍্যাটক্লিফ, মিঃ নেভিনসন, অধ্যাপক চেইন, সকলেই তাঁহার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎলাভে আনন্দিত। হায়, কেহই জানিতেন না, নিবেদিতা তাঁহাদের নিকট শেষ বিদায় লইতেছেন। নিবেদিতার প্রতি ইঁহাদের অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার উপদেশ, পরামর্শ ইঁহারা মূল্যবান মনে করিতেন। অধ্যাপক চেইন তাঁহার নির্দেশানুসারে ভগবদ্‌গীতা ও স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অকপটে লিখিয়াছেন, 'সিস্টার নিবেদিতা জানিতেন, আমি প্রাচ্যের নিকট সাহায্যের প্রত্যাশী—বিশেষ করিয়া তাঁহার এবং তাঁহার গুরুদেবের নিকট।'

ইংলণ্ড হইতে প্যারিস। প্যারিসে মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস লেগেট তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামিজীকে কেন্দ্র করিয়া মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, মিসেস

বলে তাহা ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই চলিয়া যাওয়াটা নিতান্তই মিথ্যা। 'শরীর আসে ও যায়' স্বামিজীর মুখে শোনা কথাটা বার বার নিবেদিতার মনে পড়িতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে যে সত্যকারের বন্ধন তাহার ক্ষয় নাই, কারণ তাঁহারা সকলেই সেই অসীম সত্তার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সেখানে সকলেই এক।

মিস ম্যাকলাউডের সহিত সাক্ষাতের পর নিবেদিতার হৃদয়ের ভার অনেকাংশে লঘু হইল। বর্তমান কর্মপন্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইল। ম্যাকলাউড কেবল সান্ত্বনা দিলেন না, উৎসাহ দিলেন। স্বামিজীর অর্পিত কর্মভার সম্পন্ন করাই তো নিবেদিতার জীবনের ব্রত। সুতরাং হতাশ হইলে বা ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে কেন?

২৩শে মার্চ নিবেদিতা ম্যাকলাউডের নিকট বিদায় লইলেন। ম্যাকলাউড কি তখন জানিতেন, নিবেদিতার সহিত ইহাই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ।[১] মার্সেলিস হইতে তিনি ভারতগামী জাহাজে উঠিলেন। মনে মনে য়ুরোপের নিকট বিদায় লইলেন। জাহাজ ছাড়িল, নিবেদিতা আপন মনে বলিলেন, 'দুর্গা! দুর্গা!'

[১] ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকলাউড এক পত্রে নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন, 'তুমি প্রত্যেক পত্রে তারিখ দিও, কারণ আমি পত্রগুলি রাখিতে চাই।' তাঁহাকে লিখিত নিবেদিতার সমস্ত পত্র তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ পত্রগুলি হইতে নিবেদিতার জীবনী-রচনার বহু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

শেষযাত্রা

৭ই এপ্রিল (১৯১১) সকাল ছটা! দূরে হইতে ভারতবর্ষের তটরেখা দেখা গেল। ধীরে ধীরে জাহাজ বোম্বাই আসিয়া থামিল। শেষবারের মত নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভারত তাঁহার স্বদেশ, তীর্থস্থান। ৯ই এপ্রিল তিনি অতি পরিচিত বোসপাড়া লেনের বাড়িতে পদার্পণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আর তাঁহার চিন্তা নাই। ১১ই এপ্রিল শ্রীমা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর পুরী হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐ দিনই নিবেদিতা উদ্বোধনে গিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। শোকার্তহৃদয় শ্রীমার স্নেহকর-স্পর্শে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিল। মিসেস বুলের দেহত্যাগে শ্রীমা, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখ করিয়া শ্রীমা অনেক কথা বলিলেন।

শ্রীমার এবার কলিকাতায় বাস অল্পদিনের জন্য ; মাসখানেক পরে, ১৭ই মে তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। শেষবারের মত তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভের সুযোগ নিবেদিতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত কাজ ফেলিয়া তিনি ছুটিয়া যাইতেন শ্রীমার নিকট। তাঁহার অন্তরে কে যেন সর্বদা বলিতেছে, 'আর সময় নাই, যাহা করিবার সত্বর করিয়া লও।' অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তিনি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া বেলুড় মঠে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীর ঘরে গিয়া তিনি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। বার বার মনে হইতে লাগিল, স্বামিজী তাঁহার উপর যে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কতটুকুই বা তিনি সম্পন্ন করিতে পারিলেন? কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ম্যাকলাউডকে এক পত্রে (১৭।৩।০৪) লিখিয়াছিলেন, 'তোমার কি মনে পড়ে, কাইরো[১] বলিয়াছিলেন, বিয়াল্লিশ হইতে উনপঞ্চাশের মধ্যে আমার মৃত্যু হইবে। এখন আমার বয়স ছত্রিশ : সুতরাং মনে হয়, এই যুগটা (cycle) দেখিয়া যাইব। আমার ধারণা, ১৯১২তে আমার মৃত্যু হইবে। এই কয় বছরে ভারতের অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে কি? স্বামিজীর কাজে এতটুকুও লাগিয়াছি ইহা কি দেখিয়া যাইতে পারিব? আমি শুধু চাই, এবং চিরকাল শুধু চাইব, আমি যেন তাঁহার ভার বহন করিবার অধিকার পাই। মুক্তির জন্য আমার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই।'

---

[১] প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিৎ।

এবার গ্রীষ্মাবকাশে পুনরায় মায়াবতী। ১২ই মে মায়াবতী রওনা হইলেন। সঙ্গে সস্ত্রীক ডক্টর বসু ও অরবিন্দ বসু (খোকা)। যাত্রার দিন তিনি উদ্বোধন বাড়িতে গিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীমার সহিত ইহাই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ। মায়াবতীতে তাঁহারা মাসখানেক ছিলেন। দিনগুলি আনন্দেই কাটিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বসুর নূতন পুস্তক লেখা আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার নিজেরও নানাবিধ লেখার কাজ ছিল। শ্রীযুক্ত বসু একদিন আশ্রমে উদ্ভিদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। নিবেদিতাও এইবার ১৮ই জুন, রবিবার, আশ্রমে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের সম্মুখে বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন' (Intellectual culture)। বলিয়াছিলেন, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও জাগতিক, এইরূপে ভেদ করিবার প্রয়োজন নাই। ২৬শে জুন তাঁহারা মায়াবতী ত্যাগ করিয়া কাঠগোদামের পথে ৩রা জুলাই কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

স্যারা বুলের উইলের জন্য নিবেদিতার চিন্তা ছিল। বিদ্যালয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বহুদিন পূর্বে মিসেস বুল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বিভিন্ন সৎকার্যে দানের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক হাজার পাউন্ড তাঁহার উইলে রাখিয়া যাইবেন, এবং নিবেদিতার অভিপ্রায় অনুযায়ী উহার সদ্ব্যয় হইবে। যদি অগ্রে তাঁহারই মৃত্যু হয়, ইহা ভাবিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে নিবেদিতা স্যারা বুলকে ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্বপ্ন জাতীয় শিল্পকলার পুনরভ্যুদয়। 'যখন ভারতে প্রাচীন শিল্পকলার পুনরুত্থান হইবে, তখনই তাহার একটি শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিবার সূচনা হইবে।' সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা, ভারতীয় শিল্পকলা প্রতিযোগিতার জন্য এক হাজার পাউন্ড নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং উহার সুদ হইতে প্রতিবৎসর ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচ্য ধরনে অঙ্কিত চিত্রের জন্য ভারতীয় শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হইবে। ঐ চিত্র ও পুরস্কার সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছিলেন। ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য থাকিবে তিন হাজার পাউন্ড, এবং উহা ব্যয় করিবেন শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার অভিপ্রায় মত। ক্রিস্টীনের কার্যের জন্য—অর্থাৎ নিবেদিতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁহার নিজের সঞ্চিত এক হাজার পাউন্ড, তাঁহার রচনাবলীর বিক্রয়লব্ধ সমুদয় আয়, এবং স্যারা বুলের প্রতিশ্রুত দুই হাজার পাউন্ড রাখিয়া যাইতে চাহেন। ঐ পত্রে আরও লিখিয়াছিলেন, 'আয়র্লণ্ডকে স্মরণ করিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম, কিন্তু উহা আমার কাজ নয়। ক্রিস্টীনের যদি ইচ্ছা হয়, তবে সে সামান্য অর্থ উহার জন্য রাখিতে পারে।'

এখন অবস্থা অন্যরূপ হইয়া গেল। ওলিয়া তাঁহাকে এক হাজার পাউণ্ডও দিতে রাজী নহে। বার বার মনে হইল, তিনি যদি অর্থের দাবী পরিত্যাগ করিতে পারিতেন! কিন্তু তাহা যে সম্ভব নয়। তাঁহার অবর্তমানে নির্দিষ্ট অর্থ ব্যতীত কৃস্টীনের পক্ষে বিদ্যালয় পরিচালনা অসম্ভব। লেডি মিণ্টোর সহিত আলাপের পর নিবেদিতার পক্ষে তাঁহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া খুবই সহজ ছিল, এবং ঐ প্রস্তাবও আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এদেশ হইতে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ ছিল তাঁহার লক্ষ্য, অতএব জাতীয় শিক্ষা-কার্যে বিদেশী সরকারের কোন প্রকার সাহায্য-গ্রহণে তাঁহার প্রবল অসম্মতি সহজেই অনুমেয়। এমন কি, তাঁহার উইলে তিনি এই শর্ত করিয়াছিলেন যে, বিদেশী সরকারের সহিত তাঁহার স্কুলের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।[১] বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত কারণে তিনি অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। অবশেষে মিঃ ই. জি. থর্পের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, উইলের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট অর্থের ব্যবস্থা হইয়াছে।[২] তাঁহার অন্তর হইতে একটি গুরুভার নামিয়া গেল ; এইবার তিনি প্রশান্তচিত্তে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারিবেন।

ইতিমধ্যে ২৫শে জুলাই স্বামিজীর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হইল। নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহার মাতাকে দেখিবেন। তাই মধ্যে মধ্যে ভুবনেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইতেন। মৃত্যুর দিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন ও শ্মশান পর্যন্ত মৃতদেহের অনুগমন করেন। শ্মশানঘাটে বসিয়াই তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে সমবেদনা জানাইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। একদিন পরে ভুবনেশ্বরী দেবীর মাতাও পরলোক গমন করিলেন। কয়েকদিন পরে দুঃসংবাদ আসিল, ১৮ই জুলাই মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়ার মৃত্যু হইয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিবেদিতা মর্মাহত হইলেন। ওলিয়ার প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, ওলিয়া ছিল অত্যন্ত জেদী, খামখেয়ালী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ও হিস্টিরিয়া রোগী। তাহাকে লইয়া মিসেস বুল চিরকাল অশান্তি ভোগ করিয়াছেন। সে নিজেও কোন দিন সুখী হয় নাই, এবং বাঁচিয়া থাকিলে তাহার দুর্ভোগের অন্ত থাকিত না। তথাপি তাহার মৃত্যু নিবেদিতার নিকট অপ্রত্যাশিত, বেদনাকর।

১ ভগিনী নিবেদিতার অভিপ্রায় অনুযায়ী ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই।

২ ভগিনী নিবেদিতা যে উইল করিয়া যান, তাহাতে ঐ অর্থের মধ্যে সাত শত পাউণ্ডের উল্লেখ আছে ; কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের পর মিঃ থর্প বহুদিন যাবৎ বাৎসরিক দুই শত পাউণ্ড করিয়া তাঁহার বিদ্যালয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরলোকে ওলিয়া যেন সুখী হয়, ইহাই তাঁহার একান্ত প্রার্থনা।

২১শে আগস্ট স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উদ্বোধন বাড়িতে দেহত্যাগ করিলেন। নিবেদিতা স্বামিজীর যে কয়জন গুরুভ্রাতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পর নিবেদিতা প্রায় তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। কত পুরাতন স্মৃতি মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার মাদ্রাজে অবস্থান ও বক্তৃতাকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নানাভাবে তাঁহাকে কত সাহায্যই না করিয়াছিলেন! ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন বেলুড় মঠে আগমন করেন, তখন নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বামিজীর জীবনী রচনায় তাঁহাকে কত উৎসাহ দিয়াছিলেন! এক গৌরবময় কর্মজীবনের অবসান। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তিনি প্রাণপাত করিয়া স্বামিজীর কাজ করিয়া গেলেন। কী সুন্দর!

তাঁহার নিজেরও যাত্রার সময় আসিয়া গেল। নানাভাবে এই সময়ে তিনি গভীর মানসিক অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন। মিসেস বুলের প্রতিশ্রুত অর্থ উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে বহু চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে হইয়াছিল। ইহা লইয়া তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না। কি কারণে বলা যায় না, এই সময়ে ক্রস্টীনের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য চলিতেছিল। ইহা তাঁহার গভীর মনোবেদনার অন্যতম কারণ। ক্রস্টীন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নিবেদিতা ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিন পরেই তিনি ১৯শে এপ্রিল ফ্রান্সিস জন আলেকজাণ্ডারের সহিত মায়াবতীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মায়াবতীতে তাঁহাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। সেখানেই তিনি নিবেদিতার সহিত একসঙ্গে বাসের অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে কাজ লইবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। নিবেদিতা ও ক্রস্টীনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। সুখে, দুঃখে উভয়ে মিলিয়া বহুদিন একসঙ্গে কাজ করিয়াছেন। সেই প্রীতির সম্পর্ক সহসা কেন ছিন্ন হইল, কী সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। নিবেদিতা কিন্তু তাঁহাকে দোষারোপ করেন নাই। স্বামিজীর অভীপ্সিত নারীজাতির শিক্ষাকার্যে ক্রস্টীনের সাহায্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি অকৃতজ্ঞ নহেন, এবং এ কথাও তিনি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, ক্রস্টীনের উপরেই তাঁহার আরব্ধ কার্যের ভার অর্পণ করিয়া যাইতে হইবে; তাঁহার কেবলই মনে হইত, তিনি যদি চলিয়া যাইতে পারেন,

কৃস্টীনের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের কার্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে চলিবে। নিবেদিতার জীবিতকালে কৃস্টীন আর বোসপাড়া লেনে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া কৃস্টীন দার্জিলিঙ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ আসে।

দীনেশ সেন লিখিয়াছেন, শেষবার দার্জিলিঙ-যাত্রার দুই মাস পূর্বে নিবেদিতা তাঁহার নিকট হইতে একটি প্রস্তরময় প্রজ্ঞাপারমিতার বিগ্রহ চাহিয়া লইয়াছিলেন। দীনেশবাবু বলিয়াছিলেন, 'এ মূর্তি আপনাকে দিতে আমি দ্বিধা বোধ করছি, আমার ইচ্ছা, এটি আপনি না নেন।' নিবেদিতা উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমি আপনার মত ঐতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না।' প্রায় জোর করিয়া ঐ মূর্তি লইয়া নিবেদিতা তাঁহার ঘরের কুলুঙ্গীতে রাখিয়াছিলেন, এবং প্রতিদিন যত্নের সহিত সেখানে পুষ্প ও ধূপ, দীপ দিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের প্রায় তিন মাস পরে কৃস্টীন পুনরায় বিদ্যালয়ে আগমনের অব্যবহিত পরে ঐ মূর্তিটি দীনেশবাবুকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলেন, ঐ মূর্তিটি আনিবার পর হইতে নিবেদিতার নানারূপ অশান্তি ঘটিয়াছিল।

এই কয়মাস নিবেদিতার মুহূর্তমাত্র অবকাশ ছিল না। কৃস্টীন না থাকায় বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব-পালনের অবসরে তাঁহাকে লেখার কার্য করিতে হইত। স্বামিজীর সহিত মিসেস বুলের পরিচয় ও তাঁহার গভীর ভারত-প্রীতির উল্লেখ করিয়া তিনি 'ইন মেমোরিয়াম : স্যারা চ্যাপম্যান বুল' নাম দিয়া সংক্ষেপে স্যারা বুলের জীবনী মডার্ন রিভিউতে প্রকাশ করেন। 'Sayings of Ramakrishna' (রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী) পুস্তকের সম্পাদনা মায়াবতী বসিয়াই শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিতে হইয়াছিল ; কারণ এই সময়ে লংম্যানস্ কর্তৃক 'Studies from an Eastern Home' ও 'Footfalls of Indian History', এই দুইখানি পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধরচনা ও শ্রীযুক্ত বসুর নূতন পুস্তক-রচনায় সাহায্য তো ছিলই। আর ছিল, প্রবুদ্ধ ভারত ও মডার্ন রিভিউএর জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা।

সময় সময় বিষণ্ণতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। হায়! কত কাজ অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল! কৃতকর্মের পরিমাণ কত ক্ষুদ্র! স্বামিজীর অর্পিত কর্মের কতটুকু তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন? তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী মেয়েদের আশ্রম বা ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়

ভাঙিগয়া যাইত। তাঁহার কত আগ্রহ ছিল, শ্রীযুক্ত বসুর বিজ্ঞান-গবেষণায়, ল্যাবরেটরী-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন। ভারতীয় শিল্পকলার পুনরভ্যুদয় সবে আরম্ভ হইয়াছে। নবীন শিল্পিগণকে সাহায্য ও উৎসাহ দান কত প্রয়োজন! তাঁহার রচনাবলীর অধিকাংশই অপ্রকাশিত। দেশ এখনো স্বাধীন হয় নাই ; জাতীয়তার পুনরুত্থানে কত কী করিবার ছিল! কিন্তু কে যেন পরক্ষণে তাঁহার অন্তর হইতে বলিয়া উঠিত, 'জগতের বোঝা বহন করবার তুমি কে? তোমার নিজের কাজ করে যাও, অপরের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। নিজের কাজ আগে শেষ কর।' ধীরে ধীরে অন্তরের অন্তস্তলে এক গভীর প্রশান্তি তিনি অনুভব করিতেন। জীবনের শেষ কথা আত্মসমর্পণ। যে দেবতার চরণে তিনি একদা নিবেদিত হইয়াছিলেন, সেই জীবন-দেবতার আহ্বান তিনি যেন শুনিতে পাইতেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সেই বাঞ্ছিত দেবতার সহিত মিলন। সেই জীবন-দেবতার জন্য, ঈশ্বরের জন্য গভীর ব্যাকুলতাই কি জীবনের অর্থ নয়? 'প্রিয়তম' (Beloved) নামক রচনার মধ্যে তাঁহার অন্তরের এই অনুভূতি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

'আমি যেন সর্বদাই স্মরণ রাখি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ। আমার প্রিয়তমই অতি প্রিয়, শুধু তিনি এই বাতায়নের মধ্য দিয়া চাহিয়া আছেন, শুধু এই দ্বারে করাঘাত করিতেছেন। প্রিয়তমের কোন অভাব নাই ; তথাপি তিনি মানুষের অভাবের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসেন, যাহাতে আমি তাঁহার সেবার সুযোগ পাই। তাঁহার ক্ষুধা নাই, তথাপি প্রার্থী হইয়া আসেন, যাহাতে আমি তাঁহাকে দিতে পারি। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, যাহাতে আমি রুদ্ধদ্বার খুলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারি। তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন, শুধু যাহাতে আমি তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে পারি। তিনি ভিক্ষুকের বেশে আসেন, যাহাতে আমি দান করিতে পারি। প্রিয়তম, হে প্রিয়তম, আমার যাহা কিছু সকলই তোমার। হাঁ, আমি একান্তভাবে তোমারই। আমাকে সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া তুমি সেইখানে আসিয়া দাঁড়াও।'

পূজাবকাশ আসিয়া গেল। প্রতিবারের মত এবারেও বসু-দম্পতির সহিত দার্জিলিঙ গমন স্থির ছিল। যাত্রার পূর্বে একদিন গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দেখিতে গেলেন। গিরিশবাবু তাঁহার নিকটতম প্রতিবেশী। নিবেদিতার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল। নিবেদিতা সুবিধা হইলেই তাঁহার নিকট গিয়া বসিতেন ; নানারূপ আলোচনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর প্রসঙ্গও হইত। তাঁহার নাটক পড়িয়া তিনি আনন্দিত হইতেন। গিরিশ ঘোষ তখন অসুস্থ ; অসুখের

মধ্যেই তাঁহার শেষ রচনা 'তপোবল' নাটক লেখা চলিতেছে। নিবেদিতা তাঁহাকে নাটকখানি শীঘ্র শেষ করিবার জন্য উৎসাহ দিলেন—তিনি যেন দার্জিলিঙ হইতে ফিরিয়া আসিয়া উহা পড়িতে পারেন। দার্জিলিঙ হইতে তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। গিরিশচন্দ্র তপোবল' পুস্তকে নিবেদিতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছেন—

পবিত্রা নিবেদিতা,

বৎসে! তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? দার্জিলিঙ যাইবার সময়, আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি ত' জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শেষযাত্রার পূর্বে নিবেদিতাকে আর একটি আঘাত পাইতে হইয়াছিল। সেপ্টেম্বরের প্রথমেই সুধীরা তাঁহার বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণ অজ্ঞাত। নিবেদিতার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। তবে তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার পরেই নিবেদিতা দুই বৎসরের জন্য বাহিরে চলিয়া যান। সুতরাং স্বভাবতঃই কৃস্টীনের সহিত একত্র কার্যের ফলে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। কৃস্টীন প্রায়ই তাঁহার বাড়ি যাইতেন। কৃস্টীন ছিলেন ধীর, শান্ত প্রকৃতির; নিবেদিতার হৃদয়ের কোমলতা বাহিরে সব সময় প্রকাশ পাইত না; বরং কখনো কখনো তাঁহার রুদ্রমূর্তি অনেকের হৃদয়ে ভীতিব সঞ্চার করিত। কর্মে কোনপ্রকার ত্রুটি তিনি সহিতে পারিতেন না। কাহারো কোন কাজ অপছন্দ হইলে, অথবা মতবিরোধ ঘটিলে তাহা অকপটে মুখের উপর বলিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কোন ঘটনাই কি তাঁহার সহিত সুধীরার মনোমালিন্যের কারণ? অথবা কৃস্টীনের সহিত ইহার যোগাযোগ ছিল? নিবেদিতার ছাত্রী ও পরবর্তী কালে বিদ্যালয়ের জনৈকা কর্মীর নিকট শুনিয়াছি, সুধীরাও ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে যোগদানের সংকল্প করিয়াছিলেন। দার্জিলিঙ যাত্রার পূর্বে নিবেদিতা সুধীরার বাড়ি গিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়াছিলেন, তিনি যেন পূজার ছুটির পর পুনরায় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সুধীরা তখন তাঁহাকে সে প্রতিশ্রুতি দেন নাই; কিন্তু পরে তজ্জন্য বিশেষ অনুতাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার

অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া সুধীরা দার্জিলিঙ যাইবার জন্য অধীর হইয়াছিলেন। পরে নিবেদিতার আরব্ধ কার্যে তাঁহার আত্মোৎসর্গের মূল্য অপরিসীম।

যথাসময়ে পূজার ছুটি হইয়া গেল। সমস্ত বাড়ি ফাঁকা। পরদিন সকাল হইতে যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। স্বামী সারদানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে নিবেদিতা উদ্বোধন বাড়িতে গেলেন। যোগীন-মাকে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন, 'যোগীন-মা, আমি বোধ হয় আর ফিরব না।' যোগীন-মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'এ কি নিবেদিতা, তুমি এ কথা বলছ কেন?' নিবেদিতা বলিলেন, 'কি জানি যোগীন-মা, আমার কি রকম মনে হচ্ছে, এই বোধ হয় শেষ।' যোগীন-মা তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলিতে বা চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু তাঁহার মন নিবেদিতার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। বয়স্কা ছাত্রীগণের কেহ কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্কুলে আসিয়াছিলেন; গিরিবালা, প্রফুল্ল প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। প্রফুল্লের তখন শরীর খুব খারাপ। নিবেদিতা তাঁহাকে ঔষধ কিনিয়া খাওয়াইতেন এবং সঙ্গে করিয়া দার্জিলিঙ লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার মেমসাহেবের সহিত কোথাও যাইবার কল্পনাও তখন অসম্ভব। যাত্রার পূর্বে নিবেদিতা স্কুলের গাড়ি করিয়া মেয়েদের বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। তারপর ভৃত্য রামলালকে বাড়ি দেখাশুনার যথাযথ উপদেশ দিয়া জিনিসপত্র লইয়া স্বয়ং গাড়িতে উঠিলেন।

বাগবাজার পল্লীর প্রতিবেশিগণ নিবেদিতার গুণমুগ্ধ ছিলেন। প্রতিদিন তাঁহার বাড়িতে লোকজনের আসার বিরাম ছিল না। প্রতিবার যেমন অনেকে আসিয়া দেখা করিয়া যান, এবারেও তেমনি আসিয়াছিলেন। কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই যে, নিবেদিতা শেষ বিদায় লইতেছেন; বাগবাজার পল্লীর পথে ঘাটে তাঁহার আনন্দময় মূর্তি আর দেখা যাইবে না। সকলের দুঃখে, বিপদে তাঁহার অযাচিত সান্ত্বনা ও সাহায্য, সুখে ও সম্পদে অকৃত্রিম আনন্দের উচ্ছ্বাস, দেখা হইলেই মধুর হাসির সহিত করজোড়ে সম্ভাষণ—সব শেষ!

দার্জিলিঙে তাঁহারা ডি. এন. রায়ের বাড়ি 'রায়ভিলা'য় ছিলেন। প্রথম কয়েক দিন আনন্দেই কাটিল। ছুটিতে পরিচিত অনেকেই আসিয়াছেন দার্জিলিঙ ভ্রমণে। সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, নানারূপ প্রসঙ্গে ও অবসরমত লেখার কার্যে সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। দার্জিলিঙ হইতে

কয়েক মাইল দূরে 'সন্দক ফু' নামক এক তুষারাবৃত গিরি-শিখরে অভিযানের প্রস্তাবে নিবেদিতা সানন্দে সম্মতি দিলেন। দুই তিন দিনের পথ, ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে হইবে। যাত্রার দিন স্থির, এমন সময় নিবেদিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কঠিন ব্যাধি, রক্ত আমাশয়। বহুদিন ধরিয়া মানসিক উদ্বেগ ও দৈহিক পরিশ্রমের ফলে শরীর পূর্ব হইতেই বিশেষ খারাপ ছিল। সকলেরই আশা ছিল, বিশ্রাম ও স্থানপরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। সহসা এই কঠিন পীড়ায় সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার দার্জিলিঙে অবস্থান করিতেছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিলেন। নিয়মিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কখনো একটু ভাল থাকেন ; তখন আশায় সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন—হয়তো এ যাত্রা সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু নিবেদিতা জানিতেন, তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত। মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন ব্রেন ফিভারে শয্যাগত ছিলেন, তখনো মৃত্যুর স্বরূপ তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। যখনই তিনি গভীরভাবে মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতেন, তখনই মনে হইত, উহার অর্থ সেই অনন্ত সত্তার অতল গর্ভে মগ্ন হইয়া যাওয়া। স্বামিজীর কথা মনে পড়িত ; কতবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, 'শরীর আসে, যায় ; আত্মা অবিনশ্বর।' জীবনের ন্যায় মৃত্যুও আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুভূতিরূপ প্রবাহের এক অংশ মাত্র। আর তাঁহার নিকট ইহা তো কেবল চিন্তার বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির গোচর ; উহারই ফলে আজ মৃত্যুর দ্বার-প্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল আধ্যাত্মিক বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। উজ্জ্বল, প্রশান্ত চক্ষু সকলের প্রতি প্রেম ও করুণায় পূর্ণ। হৃদয়ে অপার শান্তি, আনন্দ। মৃত্যুর মহিমা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন—'কাল রাত্রে মনে হইল, এই সমগ্র জড় জগতের সহিত সংমিশ্রিত, ইহার অন্তরে ওতপ্রোত হয়তো আর একটি সত্তা বিদ্যমান—উহাকে গভীর ধ্যান, চিত্ত বা যাহা ইচ্ছা বলিতে পার,—সম্ভবতঃ উহাই মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ। ইহাকে স্থানান্তরে গমন বলা চলে না ; কারণ এই সত্তা জড় নহে, সুতরাং ইহার দেশরূপ আধার থাকিতে পারে না। দেহবুদ্ধির কল্পনা হইতে ক্রমশঃ অধিকতর বিমুক্ত হইয়া সেই সত্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে মগ্ন হইয়া যাওয়া—ইহাই মৃত্যু। সুতরাং আমাদের মৃত স্বজনবর্গ আমাদের স্থূলদেহেরই সন্নিকটে রহিয়াছেন বলা যাইতে পারে, যদি তাহাদের সম্বন্ধে এই চিন্তা আমাদের সান্ত্বনা দান করে ; অথচ এই সংস্পর্শ থাকা সত্ত্বেও তাহারা বিরাটের সহিত এক, চরম মুক্তি ও আনন্দের সহিত অভিন্ন।

'ভাবিয়া দেখিলাম, অসীম যেন এইরূপে মিলিত হইয়াছে সসীমের সহিত,

আর আমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সীমারেখার উপরে দণ্ডায়মান ; উভয়ের উপর অধিকার স্থাপন—সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি—ইহাই আমাদের প্রতি নির্দেশ। আমি ক্রমশঃ অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, মৃত্যুর অর্থ কেবল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাওয়া—উপলখণ্ডের নিজ সত্তার কূপমধ্যে (অতল প্রদেশে) নিমজ্জন। মৃত্যুর পূর্বে শান্ত দীর্ঘ প্রহরগুলির মধ্যেই এই অবস্থার সূচনা—মন যখন তাহার জীবনের বিশিষ্ট ভাবটি লইয়া নাড়াচাড়া করে, যে ভাবটিতে ইহার সকল চিন্তা, কর্ম ও অভিজ্ঞতা পর্যবসিত। এই প্রহরগুলিতে ইতিমধ্যেই জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে।

'আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি, কাহারো সমগ্র জীবন প্রেম ও মৈত্রীভাবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব কি না, যেখানে বিরুদ্ধ ভাবের একটি তরঙ্গও উঠিবে না, যাহাতে সেই অন্তিম সময়ে সে এক বিরাট ধারণায় চির-সমাহিত হইয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে সে অন্ততঃ অনন্তের ক্রোড়ে স্বার্থ-চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং বিশ্বের সমগ্র অভাব ও দুঃখকে ধারণ করিয়া নিজেকে এক শান্তিময় ও শিবময় জাগ্রত আবির্ভাবরূপে অনুভব করিতে পারিবে।'[১]

বিদেশে অবলা বসু যখন অসুস্থ হইয়াছিলেন, তখন আপন ভগিনীর মত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন নিবেদিতা। অবলা বসুর মনে হইল, এবার তাঁহার পালা। দীর্ঘদিন অবিচ্ছিন্ন সাহচর্যের ফলে পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসায় তাঁহাদের অন্তর পূর্ণ ছিল। সর্বক্ষণ তিনি নিবেদিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত ছিলেন। সুচিকিৎসক বলিয়াও বটে, এবং নিবেদিতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসাবশতঃ ডাঃ নীলরতন সরকার প্রাণপণ চিকিৎসার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ক্রমশঃই সকলে উপলব্ধি করিতে-ছিলেন, এই কঠিন ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশা ক্ষীণ। তাঁহার প্রিয় বন্ধুবর্গের সকলেরই চিত্ত বিষাদমগ্ন, কিন্তু তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়ামাত্র নাই। জীবনেও যেমন, মরণেও তেমন নির্ভীক, তেজস্বিনী। প্রতিদিন সকালে তিনি প্রশান্ত, মধুর হাস্যে সকলকে অভ্যর্থনা করিতেন। ভারতবর্ষে যে কার্য তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, যে উদ্দেশ্যে তাঁহার গুরু তাঁহাকে এদেশে আনিয়াছিলেন, সেই 'আমাদের মেয়েদের শিক্ষা'র চিন্তাই এই শেষ মুহূর্তে তাঁহার জাগ্রত চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। উহারই ভবিষ্যৎ পরিচালনা সম্বন্ধে তিনি আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতেন।

[১] 'প্রিয়তম' ও 'মৃত্যু' নামক তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা দুইটি তাঁহার দেহত্যাগের পর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস সেভিয়ার, ভগিনী কৃস্টীন, অবলা বসু

(মায়াবতীতে)

১৬নং বোসপাড়া লেন—বাড়ির ছাদে

Sister
Bose-para Lane

দার্জিলিঙে নিবেদিতার সমাধি
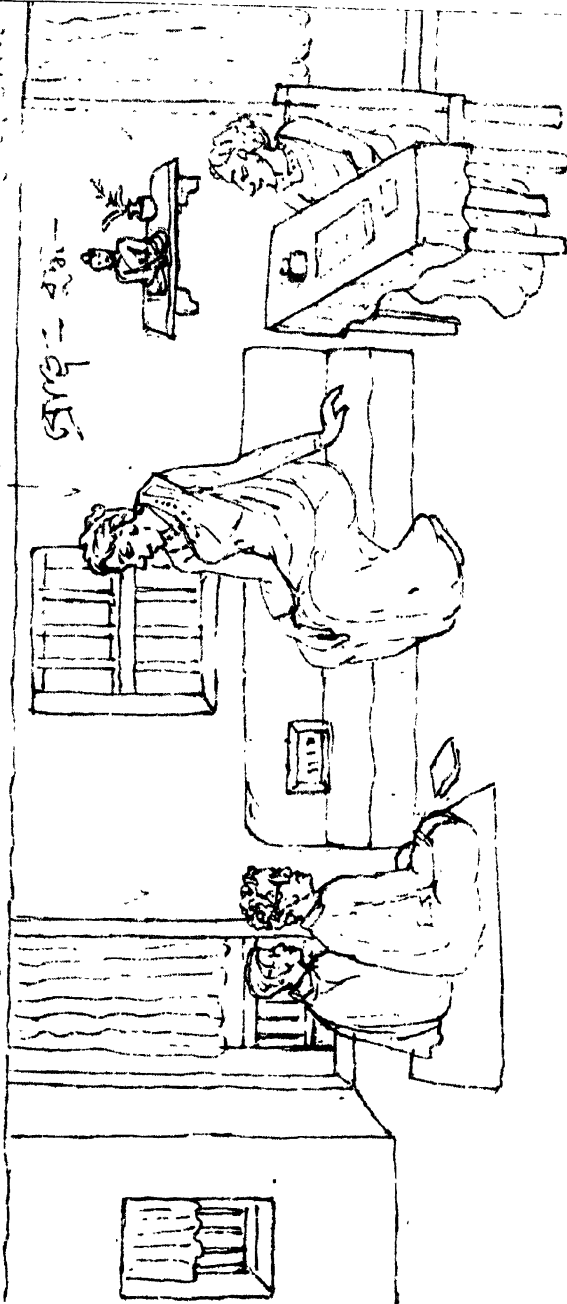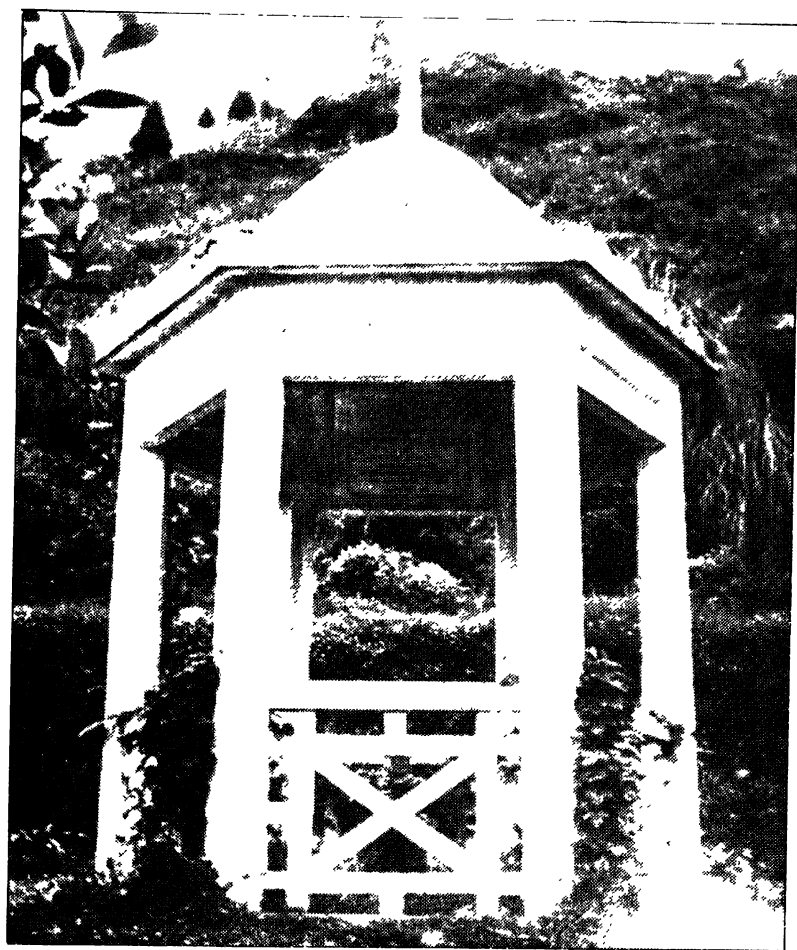
৭ই অক্টোবর। নিবেদিতা বুঝিলেন, মহাপ্রস্থানের সময় নিকটবর্তী, শেষ কর্তব্য সম্পাদনের সময় উপস্থিত। তাঁহার নির্দেশে নিম্নোক্ত উইল প্রস্তুত হইল—

'বস্টন শহর-নিবাসী উকীল মিঃ ই. জি. থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যাহা কিছু দিবেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার যে তিন শত পাউন্ড আন্দাজ জমা আছে, পরলোকগতা ওলি বুল-পত্নীর সম্পত্তির মধ্যে আমার যে সাত শত পাউন্ড রহিয়াছে, এবং আমার যাবতীয় পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় ও উহাদিগের মধ্যে যেগুলির গ্রন্থস্বত্ব আমার আছে, সেই সকল আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্বামিজীর মঠের ট্রাস্টিগণকে দিতেছি। তাঁহারা ঐ অর্থ চিরস্থায়ী ফান্ডরূপে জমা রাখিবেন এবং ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে, জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহারা মিস ক্রস্টীন গ্রীনস্টাইডেলের পরামর্শমত উহার আয় মাত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন।'

শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আর কিছু করিবার নাই। একপত্রে তিনি ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, স্বামিজী আমাকে একটিমাত্র জিনিস দিয়া গিয়াছেন আজীবন রক্ষা করিবার জন্য—তাহা হইল ব্রহ্মচর্য। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উহা অক্ষুণ্ন রাখিতে না পারিলে সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিব না।' ব্রহ্মচর্যব্রত তিনি পালন করিয়াছেন। স্বামিজীর কার্যে একান্তভাবে জীবন উৎসর্গ করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জীবনব্যাপী যাহা কিছু সঞ্চয়, পুস্তকের যাবতীয় ভবিষ্যৎ আয় সমস্তই স্বামিজীর প্রিয় কার্যে, দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত। সারাজীবন তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তথাপি এই অন্তিম সময়ে তাঁহার মনে হইল, তিনি তো নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। একবার একজন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার প্রবল ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছিলেন ; সম্ভবতঃ সে কথা তাঁহার মনে পড়িল ; তাই একান্ত-চিত্তে প্রার্থনা করিলেন, তিনি যেন এইবার চলিয়া যাইতে পারেন, যাহাতে অপরের নিরঙ্কুশভাবে কার্য করিবার পথ উন্মুক্ত হয়।

দার্জিলিঙ আগমনের কয়েকদিন পূর্বে তিনি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম হইতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণোদ্দেশে একটি প্রার্থনা-বাণী ইংরেজীতে অনুবাদ করেন, এবং উহা মুদ্রিত করিয়া বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন ছিল মুক্তির জন্য এক নিরন্তর প্রার্থনা। সম্ভবতঃ তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, এই প্রার্থনাই তাঁহার শেষ বিদায়-বাণী। তাঁহার অনুরোধে উহা আবৃত্তি করা হইল—

জগতের সকল প্রাণী, শত্রুহীন, বাধাহীন, শোকজয়ী হইয়া আনন্দচিত্তে স্বচ্ছন্দগতিতে নিজ নিজ মার্গে অগ্রসর হউক।

পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, সকল প্রাণী—যাহারা শত্রুহীন, বাধাহীন, শোকজয়ী, আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, তাহারা অবাধগতিতে নিজ নিজ মার্গে অগ্রসর হউক।

তাঁহার চিত্তের যে একাগ্রতা বহু সময় কর্মে ও চিন্তায় তাঁহাকে এতদূর তন্ময় করিত যে, দেহবোধ পর্যন্ত প্রায় বিস্মৃত হইত, চিত্তের সেই গভীর একাগ্রতাই যেন এই শেষের দিনগুলিতে তাঁহাকে অনন্ত সত্তার ধ্যানে সমাহিত করিয়াছিল। তিনি অভ্যাসবশতঃ মালা লইয়া জপ করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সম্ভব হইয়া উঠিত না। রুদ্রস্তুতিটি ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আজ জাগতিক সর্বপ্রকার বন্ধন চূর্ণ করিয়া সর্ববিধ অজ্ঞানের পারে চলিয়া যাইবার জন্য তাঁহার অন্তর ব্যাকুল, তাই শেষ মুহূর্তে ধীরে ধীরে তিনি আবৃত্তি করিলেন, 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।

—অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া চল, অজ্ঞানান্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম, আমার নিকট জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভূত হও।'

উপনিষদের এই দিব্যবাণী উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার অন্তরের আনন্দ মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

হিমালয়ের শান্ত, নির্জন ক্রোড়ে শেষের দিনগুলি ছিল মেঘ ও কুহেলিকায় ঢাকা। ১৩ই অক্টোবর (১৯১১) শুক্রবার, প্রভাতে মেঘ সরিয়া গেল, পর্বত-শিখরের ঊর্ধ্বে উদার, অনন্ত আকাশ যেন প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। নিবেদিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা অবলা বসুর মনে পড়িল, উমা-হৈমবতীর উপাখ্যান, যাহা নিবেদিতা তাঁহাদের নিকট একসময় জ্বলন্তভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই শরৎঋতুতেই উমা পিত্রালয়ে আসিয়া-ছিলেন, এখানেও আর এক উমা, হিমপ্রধান দেশের দুহিতা, দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহার স্বীয় আবাস ভারতবর্ষে। সকাল সাতটার সময় সহসা নিবেদিতার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অস্ফুট মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, 'The boat is sinking. But I shall see the sunrise—তরণী ডুবছে, আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখব।'

হিমালয়ের তুষারশিখরে তখন সবে সূর্যের আবির্ভাব হইয়াছে, নবারুণ-রশ্মির এক ঝলক আসিয়া পড়িল কক্ষের মধ্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার

আত্মা বিলীন হইয়া গেল অসীম, অনন্ত সত্তায়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গতপ্রাণা সাধিকার ব্রত সংসিদ্ধ হইল.

বিদ্যুৎ-বেগে নিবেদিতার মহাপ্রয়াণের সংবাদ দার্জিলিঙ শহরে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। পূজাবকাশে যাঁহারা দার্জিলিঙ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাঁহাদের প্রায় সকলের পরিচিত ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। দেখিতে দেখিতে 'রায়ভিলা'র সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়া উঠিল। তাঁহার শেষকৃত্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। বেলা ২টার সময় 'রায়ভিলা' হইতে মৃতদেহ লইয়া শোকযাত্রা শ্মশানাভিমুখে চলিল। যদিও সংবাদ অপ্রত্যাশিত, এবং অধিক সময় থাকিতে সকলকে জানানো যায় নাই, তথাপি শহরের বিশিষ্ট হিন্দু মহিলা ও ভদ্রলোকগণ মৃত ভগিনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে শোকযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যক্ষ শশিভূষণ দত্ত, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহালনবীশ, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার, মিসেস সরকার, যোগেন্দ্রনাথ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ইন্দুভূষণ সেন, মিঃ পি. এডগার, মিস পিগট, এস. এন. ব্যানার্জী, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, মিসেস সেন, মিসেস হালদার, সুরেন্দ্রনাথ বসু, রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর, পূর্ণিয়ার সরকারী উকিল, বশীশ্বর সেনগুপ্ত, 'দার্জিলিঙ অ্যাডভার্টাইজার'সম্পাদক রাজেন্দ্রনাথ দে এবং আরও বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।

শোকযাত্রা যখন কার্ট রোডে পোঁছিল, তখন জনতা বিপুল আকার ধারণ করিল। শবদেহের অনুগমনে এরূপ বৃহৎ শোভাযাত্রা দার্জিলিঙ শহরে এই প্রথম। বাজারের মধ্য দিয়া হিন্দু শ্মশানভূমির নিকট যাইবার সময় সকলেই পথের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া মস্তক নত করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল। মৃতদেহ বহন করিবার জন্য অনেকের মধ্যেই আগ্রহ দেখা যাইতেছিল। বেলা ৪টার সময় সকলে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাযথভাবে চিতাশয্যা রচিত হইল। মৃতদেহের মস্তক ও মুখ পবিত্র গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া, সর্বাঙ্গে গঙ্গাবারি সিঞ্চন করিবার পর উচ্চ 'হরিবোল' ধ্বনির সহিত উত্তর-শিয়র করিয়া উহা চিতার উপর স্থাপিত হইল; তখন ৪-১৫ মিঃ। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া শেষ সময়ে আসিয়া পোঁছিয়াছিলেন। তিনিই মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। চিতা জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। চিতাগ্নি

নির্বাপিত হইবার পর রাত্রি ৮টার সময় চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া সকলে অশ্রুরুদ্ধ-চক্ষে ও ভারাক্রান্তহৃদয়ে নীরবে প্রত্যাবর্তন করিলেন ('বেঙ্গলী' সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত)।

হিমালয়ের নির্জন ক্রোড়ে, শ্মশান-প্রান্তরে ঐ পবিত্র ভূমির উপর নির্মিত নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভটি ঘোষণা করিতেছে : এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত—যিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থের উপাদান

নিবেদিতা : সরলাবালা সরকার, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল
(বর্তমান নাম—নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি)

ভগিনী নিবেদিতা : স্বামী তেজসানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়

শ্রীমা সারদা দেবী : স্বামী গম্ভীরানন্দ, ,, ,,

যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতীয় খণ্ড : স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা ১ম ও ২য় ভাগ : ,, ,,

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী : ,, ,,

ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য : দীনেশচন্দ্র সেন, শিশির পাবলিশিং হাউস

জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী

মার্কিনে চারিমাস : বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী পাবলিশার্স

পরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী

পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা

শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ : গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী,
নবভারত পাবলিশার্স

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা : শান্তাদেবী

নির্বাসিতের আত্মকথা : উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য সাময়িক পত্র : উদ্বোধন পত্রিকা, প্রবাসী, আর্যাবর্ত, আনন্দবাজার
পত্রিকা, দেশ প্রভৃতি

The Life of Swami Vivekananda : Published by Advaita Ashrama

The Life of Swami Vivekananda : By Romain Rolland

The Dedicated : By Lizelle Reymond

The Life and work of Sir Jagdis C. Bose : By Patrick-Geddes

Sri Aurobindo on Himself : Published by Aurobindo Ashram,
Pondichery

Reminiscences of Swami Vivekananda : Published by Advaita
Ashrama

Complete Works of Sister Nivedita : Published by Ramakrishna
Sarada Mission, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta.

Periodicals : Prabuddha Bharata, Brahmavadin, Modern Review, Indian Review, Hindu Review, New India, Karmayogin, Dawn, Behar Herald, Amrita Bazar Patrika, The Bombay Gazette, The Bengalee, The Hindu, The Statesman, The Times of India, Young India.

নির্দেশিকা